কথা কল্পনা কাহিনী

(ষষ্ঠ স্তবক)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

উৎসর্গ

শ্রীমান্ শিথীন্দ্রকুমার মিত্র

কল্যাণীয়েষু

সূচীপত্র

চিত্ত ও চিত্র

অলৌকিক

প্রসন্ন-মধুর

এই গল্প-গ্রন্থমালার প্রথম স্তবকে তেত্রিশটি, দ্বিতীয় স্তবকে আটত্রিশটি, তৃতীয় স্তবকে সাঁইত্রিশটি, চতুর্থ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি, এবং পঞ্চম স্তবকে চৌত্রিশটি বিভিন্ন রসের গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রথম স্তবক ২২্, দ্বিতীয় স্তবক ২০্, তৃতীয় স্তবক ২২্ চতুর্থ স্তবক ২৪্ ও পঞ্চম স্তবকের মূল্য ২৪্।

গল্পের কাঠামো

কী গল্প লিখব ব'সে ব'সে ভাবছি—এমন সময় ছোট শালা এলেন প্রায় লাফাতে লাফাতে; অভিনবত্বের আনন্দ ও উত্তেজনায় তাঁর মুখ-চোখ উদ্ভাসিত,—'জামাইবাবু শুনেছেন? আমাদের পাড়ায় এই মাত্র একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে!'

চিন্তায় ছেদ পড়ল। তবু বিরক্তিটা প্রাণপণে চেপে বললুম, 'না, শুনি নি। কিন্তু এ আর এমন কি একটা অসাধারণ খবর? হামেশাই তো কত মেয়ে গলায় দড়ি দিচ্ছে, বিষ খাচ্ছে! তা ব্যাপারটা কি? হতাশ প্রণয়?'

'না গো মশাই!' বিজয়-গর্বে মুখ ঘুরিয়ে বলেন তিনি। 'অত সোজা নয়! তিন ছেলের মা, বড় ছেলেটির বয়স কম ক'রেও আঠারো—থার্ড ইয়ারে পড়ে। বড় মেয়েটা এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে। ছোটটিও মেয়ে—ইস্কুলে পড়ছে। বয়স চল্লিশের কম হবে না—স্বামী বড় চাকরি করে, আমাদের পাড়ায় নতুন বাড়ি ক'রে উঠে এসেছে। গাড়ির দরখাস্ত ক'রে রেখেছে—পাওয়া গেলেই গাড়িও কিনবে—সব ঠিকঠাক। বামুন চাকর আছে—সচ্ছল অবস্থা। শখ শৌখীনতা খুব, এ পাড়ায় এসে পর্যন্ত দেখি প্রায়ই স্বামী-স্ত্রী লেকে বেড়াতে যেত। হঠাৎ কী যে হ'ল—বড় দুজন কলেজে গেছে, ছোটটার ছুটি—চাকরের সঙ্গে তাকে পাঠিয়েছে পয়সা দিয়ে চকোলেট কিনতে। চাকরকে ব'লে দিয়েছে সেই সাদার্ন মার্কেট থেকে কিনে আনতে—সেখানকার জিনিসগুলো নাকি ভাল। মানে যতটা সময় পাওয়া যায় আর কি! ঠাকুর কোনদিনই দুপুরে বাড়ি থাকে না—কোথায় ওদের দেশওয়ালা লোকের আড্ডা আছে, সেইখানে যায়। ফাঁকা বাড়ি—শোবার ঘরে ঢুকে দোর দিয়ে এই কাণ্ড। মেয়ে আর চাকর ফিরে দেখে সদর দোর খোলা—কেউ কোথাও নেই। খুঁজতে খুঁজতে ওপরে গিয়ে দেখে, মার ঘরের দোর বন্ধ। ডাকাডাকি ক'রে সাড়া পায় না—তখন চিৎকার ক'রে পাড়ার লোক ডেকেছে। তা তিনটে-চারটের সময় আমাদের পাড়ায় আর ক'টা লোক থাকে বলুন, ঘুম ভেঙে দু-একজন মহিলা এসেছেন অনেক পরে—কী ভাগ্যি, তাঁদেরই মধ্যে কে

একজন বুদ্ধি ক'রে পাশের বাড়ি থেকে পুলিসে ফোন করেছেন। পুলিস আর বড় ছেলে একসঙ্গেই বাড়ি ঢুকেছে প্রায়—ওরা দোর ভেঙে দেখে এই কাণ্ড। চিঠিপত্র কিচ্ছু নেই—কী কারণ কিচ্ছু জানা যায় নি।'

এক নিশ্বাসে এতটা ব'লে, সম্ভবত দম নেবার জন্যই, একবার থামলেন তিনি। কিন্তু দেখা গেল উত্তেজনার বাষ্প তখনও একেবারে নিঃশেষ হয় নি, আরও কিছু বার হওয়া দরকার। বললেন, 'গুজব কিন্তু এখনই বেশ চালু হয়ে গেছে। এই তো ঘণ্টা তিনেকের ব্যাপার—এর মধ্যেই কত রকম শুনছি। আসল কথা ঐ পুরুষটাই বদমাইশ।'

'তা তো বটেই।' সবিনয়ে স্বীকার করলুম, 'মেয়েরা যা কিছু ভালো কাজ করেন সব তাঁদের গুণ—খারাপ কাজের দোষটা নির্ঘাতভাবে পুরুষদের।'

ভাগ্যিস আমার এসব বাজে কথায় তাঁর কান দেবার সময় ছিল না—নইলে এই নিয়েই হয়তো আরও খানিক বকুনি চলত (ব'লে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়েছিলুম বৈকি !) । তাঁর ভেতরের বাষ্পই তাঁকে ঠেলে নিয়ে চলল, কাছাকাছির মধ্যে যতগুলি আত্মীয় আছে, সবাইকে খবরটা দিতে। যেমন দমকা হাওয়ার মতো এসেছিলেন, প্রায় তেমনি ভাবেই চ'লে যেতে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। স্ত্রী একটু হেসে বললেন, 'গল্প খুঁজছিলে—এই তো এসে গেল। এখন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, বানিয়ে বুনিয়ে একটা খাড়া ক'রে ফেল—আর কি ! তোমাদের তো ঐ কাজ।'

স্ত্রী-বাক্য অবশ্যই শিরোধার্য।

কিন্তু মূল প্রশ্নটা যে থেকেই যাচ্ছে—লিখি কি ? একটি চল্লিশ বছরের মহিলা আত্মহত্যা করেছেন—এটা অত্যন্ত স্থূল এবং বর্ণহীন তথ্য। বেলুনের চোপ্সানো মূল বস্তুটার মতোই আকারহীন সামান্য পদার্থ একটা। যতক্ষণ না এর মধ্যে কল্পনার বাতাস ভ'রে এর একটা আকার দেওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এর কোন মূল্যই নেই। গৃহিণী তো ব'লেই খালাস—'ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বানিয়ে বুনিয়ে খাড়া কর'—কী দিয়ে ফোলাব সেইটেই তো ভেবে পাচ্ছি না !

আসলে এটা হ'ল গল্পের পরিণতি। কবিগুরুর মতে এটা নিতান্তই তথ্য—তুচ্ছ। গল্পের সত্য হচ্ছে সেই বস্তু, যাকে বাস্তব জীবনে কল্পনা ও মিথ্যা

বলা হয়। সেই মিথ্যার ফুঁ দিয়ে ভরাতে না পারলে এটুকু তথ্যের পদার্থ বাজারে চালানো যাবে না যে কিছুতেই।

অর্থাৎ এই আপাত-অর্থহীন কার্যের একটা জুতসই লাগসই কারণ ভাবতে হবে। এই নিদারুণ পরিণতির একটি হৃদয়গ্রাহী পৃষ্ঠপট রচনা করতে হবে।...

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। গৃহিণী নিচে তাঁর ছেলে-মেয়ে, কুকুর-বেড়াল, চাকর প্রভৃতি নিয়ে চেঁচামেচি বকাবকি শুরু করেছেন। ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে, আশপাশের বাড়িতেও। সামনের বাড়ির দুষ্টু ছেলেটা বোধ করি আজ বাপের ভয়ে এখনই পড়তে বসেছে। ওপাশের বাড়ি থেকে আহ্লাদী মেয়েটার বেসুরো গলার প্রাণপণ চিৎকার ভেসে আসছে (তার বিশ্বাস সে গানই গাইছে; তার মায়ের আশা এই সুরের তরণী নিয়েই বিবাহসমুদ্রে পাড়ি জমাবে!)। তারই মধ্যে অন্ধকারে ব'সে ব'সে আমি ভাবছি ঐ মহিলাটির কথা।

কেন আত্মহত্যা করলেন তিনি? কী দুঃখে এত সাধের সাজানো ঘরকন্না ছেড়ে, ছেলে-মেয়ে স্বামী—নতুন বাড়ি, ভবিষ্যতের আরও অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসের সম্ভাবনা ছেড়ে নিজের জীবনে এমন অসময়ে অকালে ছেদ টানলেন? বরণ ক'রে নিলেন এই বীভৎস মৃত্যু?

সম্ভাব্য কারণ অনেক হ'তে পারে। অনেক সময় তুচ্ছ এবং হাস্যকর কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে। বিশেষত মেয়েমানুষ। বৈজ্ঞানিকরা সে আত্মহত্যার একটিমাত্র কারণ নির্দেশ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছেন—সাময়িক উন্মত্ততা। কিন্তু তা দিয়ে আমার গল্প জমবে না। সহজ মানুষের সাধারণ আচরণের কারণ আর গল্পের পাত্র-পাত্রীর আচরণের কারণ এক হ'লে চলবে কেন?

সুতরাং আমাকে অন্য রকম একটা কিছু ভাবতে হবে। জটিল মনস্তত্ত্বের গহন অরণ্য থেকে কাঁটার ফুল তুলে এনে গাঁথতে হবে এই কথার মালা।

অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে ভাবলাম।

তিন রকমে সাজানো যায় গল্পটা। অন্তত আমার এখন এই তিনটের কথাই মনে পড়ছে।

প্রথমত ধরুন : আমার শালীর কথাই ঠিক। স্বামীটাই পরোক্ষভাবে দায়ী। তা যদি ধরা যায় তা হ'লে ঘটনাটা কী দাঁড়াবে ?

মহিলার নাম মনে করুন—রমা। স্বামীর নাম নরেশ।

এই রমার যখন বিয়ে হয় তখন মনে হয়েছিল নরেশ সব দিক দিয়েই যোগ্য পাত্র। এম-এ পাস, ভাল চাকরিতে ঢুকেছে, পৈতৃক অবস্থাও মন্দ নয়। স্বভাব-চরিত্র যত দূর জানা যায়—খুবই ভালো। সিগারেট পর্যন্ত খায় না।··· বিয়ের সময় মনে হয়েছিল বহু জন্মের তপস্যার ফলেই রমার এমন পাত্র মিলেছে। আত্মীয়জনদের মধ্যে অনেক অনূঢ়া কন্যার বাপ-মাই রীতিমতো ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন !

আনন্দ রমারও কম হয় নি। বিবাহের পর প্রথম কিছুদিন অব্যাহত ও নিরবিচ্ছিন্ন ছিল সে আনন্দ। নবদম্পতির প্রেমগুঞ্জনমুখর সে স্বপ্ন-কল্পনার দিনগুলি সৌভাগ্যের এক সুখ-স্বর্গ রচনা করেছিল রমার জীবনে।

কিন্তু কয়েক মাস যেতে-না-যেতেই রমা বুঝল একটা মস্ত ফাঁকির ওপর এই স্বর্গ রচনা করেছে সে। যেটাকে সে প্রস্ফুটিত সৌভাগ্য-পুষ্প ব'লে মনে করেছিল আসলে সেটা কীটদষ্ট। মদ-ভাঙ তো দূরের কথা—নরেশ বিড়ি-সিগারেটও খায় না। কিন্তু এর চেয়ে মদ-ভাঙ খাওয়াও বোধ করি ভাল ছিল। স্বামীর চরিত্রের যে দিকটা নিয়ে সবচেয়ে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ মেয়েদের—সেই-খানেই একটা বড় দুর্বলতা আছে নরেশের। ক্রমে আরও বুঝল—এটা তার সহজাত, স্বভাবের অঙ্গীভূত। এর আর পরিবর্তন সম্ভব নয়।

অর্থাৎ, বহু নারী ছাড়া নরেশের তৃপ্তি হয় না। এবং এ স্বভাব তার প্রকাশ পেয়েছে বহুকাল—বলতে গেলে কৈশোরকাল থেকেই। রমার পূর্বেও বহু নারী এসেছে তার জীবনে—রমা আসাতে কয়েকটা দিন থেমেছিল মাত্র সে স্রোত,—আবারও আসতে শুরু করেছে।

কিন্তু তবু যদি, এতটুকু ভদ্র আচ্ছাদনও থাকত ওর এই ক্লেদাক্ত লোলুপতার।

ক্রমে ক্রমে নরেশের পূর্ব-জীবনের বহু ইতিহাসই কানে যায় রমার। আত্মীয়স্বজনরা নাকি বয়স্কা মেয়ে নিয়ে ওদের বাড়িতে আসতে সাহস করতেন না—নিকট আত্মীয়ের কন্যারাও ওকে দেখে ত্রস্ত হয়ে উঠত।

তবু রমা আশা ছাড়ে নি প্রথমটা। মান-অভিমান, কান্নাকাটি, উপবাস—নারীর তূণে বিধাতা যে ক'টি অস্ত্র দিয়েছেন—তার কোনটারই প্রয়োগে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নি। কিন্তু তবু পেরে ওঠে নি সে স্বামীর সঙ্গে। লোকে কথায় বলে 'পায়ে-পড়ারে ছাড়া ভার'—যে অপরাধী সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্বীকার করে, অনুতপ্ত হয়—যে নিজেও চোখের জল ফেলে, উপবাস করে—তাকে কী ক'রে সংশোধন করতে পারা যায়! অনুতাপ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে—প্রতিজ্ঞা করে আর কখনও এমন করবে না—আবার পরক্ষণেই, প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র, সেই কাজ করে।

এই ভাবেই ওরা কাটিয়ে এসেছে দীর্ঘকাল। ছেলেপুলেও হয়েছে, তাদের প্রতি বা স্ত্রীর প্রতি অন্যান্য কর্তব্যে কখনও ত্রুটি করে নি নরেশ। অফিসেও খ্যাতি ছিল, বছর বছর পদোন্নতি হয়েছে। ঘরবাড়ি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সবই পেয়েছে সে। রমার মাও ওকে অনেকটা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন ; বুঝিয়েছিলেন, 'সেকালে সব বড়মানুষই তো রক্ষিতা রাখত, মনে কর্ না কেন এ তাই। তোর পিতামহ প্রপিতামহ যে গণ্ডাকতক ক'রে বিয়ে করতেন—তার চেয়ে তো ভাল। সতীনের সঙ্গে অধিকারের ভাগ দিয়ে তো বাস করতে হচ্ছে না। তোর মর্যাদা তো ক্ষুণ্ণ করে নি সে। এদিকে-ওদিকে কি ক'রে বেড়ায় তা নিয়ে আর মাথা ঘামাস নি।'

এ যুক্তি তো ছিলই—তা ছাড়াও রমা অনেক ব্যবস্থা করেছিল। সকালে বাড়ি থেকে বেরোতে দিত না, অফিস থেকে সকাল ক'রে বাড়ি ফিরতে বাধ্য করেছিল—সন্ধ্যের সময় সঙ্গ ছাড়ত না। লেকেই হোক, সিনেমাতেই হোক, আর খেলার মাঠেই হোক— সর্বদা ছায়ার মতো সঙ্গে থাকত। দুর্বল ও লোভীকে সুযোগ দিতে নেই—এটা সে বুঝেছিল ভালোমতোই।

কিন্তু পাহারা দিয়ে চরিত্র বাঁচানো যায় না—স্ত্রী-পুরুষ কারুরই না। আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য সিন্দুকে পুরে সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখেও একটা মেয়ের চরিত্র সামলাতে পারে নি। ওটা উল্‌টো হ'লেও ফল বোধ হয় একই হ'ত।

রমা ঝি রাখা বন্ধ করেছে বহুকাল। কিন্তু পরের বাড়ির ঝি কোনদিন কোনকালে আসবে না—এমন তো হ'তে পারে না। এখানে আসার পর পাশের বাড়ির মিসেস সেনের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাল

শিল্পী—তাঁর কাছে রমা বোনার নতুন প্যাটার্ন শিখছিল, সেই উপলক্ষেই তাঁর অল্পবয়সী ঝি আসা-যাওয়া করত। গতকাল সন্ধ্যাতেও এমনি একটা প্রয়োজনেই সে এসেছিল। ছেলেমেয়েরা পড়ার ঘরে, রমা বাথরুমে—নরেশ অফিস থেকে এসে চা-খাওয়া শেষ ক'রে ব'সে কাগজ পড়ছিল। সামান্য একটু সময়। রমা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই কিছু অশোভন ঘটনা ঘটে গিয়ে থাকবে। ঝি বোনার নমুনাটা রমার গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব'লে গেল, 'আর কখনও তোমাদের বাড়ি আসতে বোল নি বৌদি! ছি ছি, এই তোমাদের ভদ্দরলোকের বাড়ি? এই ব্যাভার নেকাপড়াজানা বাবুদের? কী ক'রে এমন মানুষের ঘর কর বৌদি?'

এর পর রমা যদি আজ এই কাণ্ড ক'রেই থাকে তো ওকে খুব দোষ দেওয়া যায় কি?

এই পর্যন্ত গেল—সেকালের ভাষায়—প্রথম প্রস্তাব।

আবার উল্‌টো ভাবেও ধরা যায় বৈকি গল্পটা।

রোমান্টিক মেয়ে রমা। জীবনটা সে ছোটবেলা থেকেই রঙিন চশমার মধ্যে দিয়ে দেখতে চেয়েছে। পড়তে শিখে বেছে বেছে শুধু প্রেমের কবিতা পড়ত, কেবল রোমান্টিক ধরনের কাহিনী পাঠেই ছিল তার আনন্দ। ছবি আঁকত, গান গাইত—ফুরফুরে হয়ে ঘুরে বেড়াত শুধু।

তাই নরেশের সঙ্গে যখন ওর বিয়ে হ'ল তখন সবাই সেটাকে পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করলেও, পূর্বজন্মের বহু তপস্যার ফল ব'লে ভাবলেও, রমা তা ভাবতে পারে নি। বরং একটা আশাভঙ্গের বেদনাই অনুভব করেছিল মনে মনে। নরেশ ছিল স্থূল বস্তুবাদী মানুষ। অফিস, কাজ, সংসার—এবং নিতান্তই সহজ, সাধারণ জীবন এ ছাড়া কিছু জানত না। স্বপ্ন-কল্পনার ধার দিয়েও যেত না সে—কোনপ্রকার কাব্যের ধার ধারত না।

তবু ওদের জীবন একরকম ক'রে কেটেছে। বাইরের কেউ ওকে দেখে কোন ব্যর্থতা, কোন ক্ষোভের সন্ধান পায় নি। ছেলেপুলে, ঘর-সংসার, স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এরই মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল রমা; মনে করেছিল অন্তরের সে বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত রোমান্টিক সত্তাটা একেবারে শুকিয়ে মরে গিয়েছে।

তারপর—এই এতকাল পরে, কোথা থেকে এল বিমল, ওর ছেলেমেয়ের তরুণ প্রাইভেট টিউটার। এম এ.-তে ফার্স্ট হয়েও কোন ভাল চাকরির চেষ্টা করে নি বা করতে পারে নি—সম্ভবত উদ্যমের অভাবেই। একটা বেসরকারী কলেজে প্রফেসারী করে, আর নিতান্ত সাংসারিক কারণে করে এই অতিরিক্ত পাঠনের কাজটুকু—এই টিউশনি। কিন্তু কাজ ওর ভাল লাগে না, ও চায় পড়তে—বিশেষ ক'রে কবিতা পড়তে।

পাতলা ছিপছিপে চেহারা, অবিন্যস্ত চুল, বেশভূষা যৎপরোনাস্তি শিথিল ও আলুথালু—চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে ধ'রে ব'সে থাকে এক ঘণ্টা, খেতে মনে থাকে না। ট্রামে উঠে আবিষ্কার করে মনিব্যাগটা বাড়িতে ফেলে এসেছে। টাকার গোছা বাজে কাগজ মনে ক'রে বাইরে ফেলে বাড়িতে ঢোকে। চোখের দৃষ্টি সর্বদা উদ্‌ভ্রান্ত, অন্যমনস্ক ও স্বপ্নালু।

ওকে দেখে প্রথম দিন থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল রমা। ওকে যত্ন করবার জন্য, ওর অভিভাবকত্ব করার জন্য সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় দিয়ে ওর অন্তরের কবি-প্রকৃতিকে সযত্নে লালন করবার জন্য রমার সমস্ত অন্তর লালায়িত হয়ে উঠেছিল। এই তো তার স্বপ্নের পুরুষ, এমনি লোকই তো সে চেয়েছিল সারাজীবন।

বিমলও ওকে দেখে কম চমৎকৃত হয় নি। বস্তুত ছাত্রছাত্রীর মা মধ্যবয়সী এক মহিলার মধ্যে এমন একটি কাব্যরসিক রসবুভুক্ষু মন যে আবিষ্কার করবে তা রমার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে স্বপ্নেও ভাবে নি। ছাত্রছাত্রীদের পড়ায় ফাঁকি দিয়ে কাব্যচর্চা করলে তাদের অভিভাবিকা অসন্তুষ্ট হন না—বরং খুশী হন, এ অভিজ্ঞতা যে একেবারে অভিনব!

বিমল, যথার্থই যাকে বলে, কাব্যপাগলা—তাই। তার হাতের খাবার মুখে তুলতে মনে থাকে না, আগের মুহূর্তে কোন জিনিস পকেটে পুরে পরের মুহূর্তে সে পকেট ছাড়া সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়—কিন্তু কবিতা তার আশ্চর্য মুখস্থ থাকে। রাশি রাশি কবিতা শোনায় সে রমাকে—শুধু বাংলা নয়, ইংরিজিও। সে-সব কবিতার অর্থ বুঝতে পারে না রমা, কিন্তু তার ধ্বনি, বিমলের আশ্চর্য নরম আবেগ-থরো-থরো গলার আবেদন, তাকে অভিভূত করে। তারও মনে প'ড়ে যায় বহু দিনের পড়া কবিতাগুলো—এতকাল পরেও

সে ভোলে নি তাদের। এও এক আবিষ্কার তার কাছে। অবাক হয়ে যায় সে নিজে নিজেই। বুঝতে পারে যে, যে-মন তার চিরকালের জন্য মরে গেছে ভেবে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল—আসলে তা সংসারের স্থূল বাস্তবতার চাপে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল মাত্র। সামান্য দক্ষিণা বাতাস পাওয়া মাত্রই তা আবার নতুন ক'রে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

রমার মনে হ'ত—প্রথম কৈশোরের সেই স্বপ্নে ও সঙ্গীতে মেশা দিনগুলিতে যদি এর সঙ্গে দেখা হ'ত।

বিমল প্রকাশ্যেই বলত, 'জীবনপথে যদি আপনার মতো কোনো সঙ্গিনী পেতাম বৌদি!'

কোথায় কা বলা অশোভন বা অসঙ্গত—এতটা সাংসারিক জ্ঞান আজও হয় নি বিমলের। আর সেটা আশা করে না রমা। এ জ্ঞান নেই ব'লেই বিমলকে তার এত ভালো লাগে। সে প্রসন্ন কৌতুকহাস্যে মুখ রঞ্জিত ক'রে অভয় দেয়, 'খুঁজুন, পাবেন বৈকি! অনেক মেয়ের মধ্যেই আমার মতো মন ঘুমিয়ে আছে, ঠিক মানুষটি ছুঁলেই তা জেগে উঠবে!'

এই ভাবেই চলছিল—হঠাৎ একদিন এসে বিমল বলল, 'বৌদি, আপনার কাছে যদি খুব অসঙ্গত এবং অন্যায় একটা আবদার করি—আপনি কি খুব রাগ করবেন?'

চমকে কেঁপে উঠল রমা। বুকের রক্ত যেন ছলাৎ করে উঠল একবার। রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে গেল সমস্ত মুখ। অতিকষ্টে শুধু বলল, 'বলেই দেখুন না!'

তবুও অনেক ইতস্তত ক'রে, অনেক মাথা চুলকে, অবশেষে বিমল বলেছিল কথাটা—'যদি শ' পাচেক টাকা ধার চাই?'

আশ্বস্ত হ'ল কি হতাশ হ'ল—রমা তা নিজেও বুঝল না। তবে উত্তর দিতে একটু দেরি হ'ল তার। বলল, 'ও, এই!...তা এর জন্যে এত ভূমিকা কেন, এখনই দিচ্ছি!'

যাকে অনেক, অনেক বেশি দেওয়া যায়, তার হাতে মাত্র পাঁচশো' টাকা তুলে দেওয়াটা কি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হয় নি সেদিন?

কৌতূহলও হয়েছিল বৈকি, তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি—হঠাৎ এত টাকার কি দরকার হ'ল বিমলের।

অনুচ্চারিত সে প্রশ্নের জবাব পেল রমা দিন-তিনেক পরেই। বিমল তার কলেজের একটি ছাত্রীকে বিয়ে করেছে। স্ব-শ্রেণীর মেয়ে নয় ব'লে বাপ-মা তাকে ঘরে তুলতে রাজি হন নি, সেই জন্যে নতুন বাসা ভাড়া ক'রে, সে-বাসা সাজিয়ে সেইখানে এনে তুলতে হয়েছে বৌকে। সলজ্জ হেসে বললে বিমল, 'সেই জন্যেই হঠাৎ অত টাকার দরকার হয়েছিল। আপনার দয়াতেই এ যাত্রা অনেক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম। হয়তো বিয়ে করাই হ'ত না এখন—টাকাটা না পেলে। আপনার কাছে আমার ঋণের অন্ত রইল না।...যদি অনুমতি করেন তো একদিন নিয়ে আসব—আপনাকে দেখিয়ে যাব।'

আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করেছিল রমা? প্রতারক ব'লে মনে হয়েছিল বিমলকে? বিদ্বেষ বা ঘৃণাবোধ হয়েছিল ঐ লোকটা সম্বন্ধে? ঠিক কী হয়েছিল তা রমা নিজেও বোধ করি জানে না।

তবে দিন কতক একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ওর মধ্যে, এটা ঠিক। বহুকাল যে স্বামার সঙ্গে ওর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না, সেই স্বামীকে নিয়েই অকস্মাৎ যেন মেতে উঠল ও। একদণ্ড ছাড়তে চায় না—চায় না একটি মুহূর্তের জন্যেই চোখের আড়াল করতে। জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায় লেকে, নিয়ে যায় সিনেমায়, খেলার মাঠে। এক-একদিন শুধুই যে-কোন ট্রামে বা বাসে চেপে বেরিয়ে পড়ে—পাশাপাশি ব'সে অনির্দেশ্য পথে যাত্রার রোমাঞ্চ উপভোগ করতে।

কে জানে হয়তো নতুন ক'রে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল সে স্বামীকে—অথবা চেয়েছিল মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

নরেশের মন্দ লাগে নি ব্যাপারটা। সেও নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিল স্ত্রীর এই প্রেমের আতিশয্যের মধ্যে। হয়তো তারও—এত দিনের নিরস, একঘেয়ে বিবর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে এ বর্ণ-বৈচিত্র্যটুকু ভালোই লেগেছিল।

কিন্তু—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রমা সামলাতে পারল না নিজেকে। এই কাণ্ড ক'রে বসল।

এও একরকম হ'তে পারে গল্প। কিন্তু ধরুন, যদি এ-দুটোর কোনটাই না করা যায়?

যদি ধরা যায় যে, নরেশ আর রমা—দু'জনেই সহজ, স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ ছিল?

মনে করা যাক—ওরা সুখীই হয়েছিল পরস্পরকে পেয়ে। দুজনেই দুজনকে ভালবেসে ছিল। বিবাহের আগে যে-জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল রমা, যে সুখসৌভাগ্য সে কল্পনা করেছিল তার অনেকখানিই মিলে গিয়েছিল বাস্তবের সঙ্গে। স্বামী পুত্র কন্যা—সবই মনের মতো দিয়েছিলেন বিধাতা। যেটুকু সাধ ছিল—ভদ্র পল্লীতে নিজস্ব একটি বাড়ি, তাও পূরণ হয়েছিল, বরং আশার অতীত ভাবেই হয়েছিল। লেকের ধারে তার বাড়ি হবে—এতটা সে কল্পনা বা প্রার্থনাও করে নি কখনও।

হয়তো এতটা সুখসৌভাগ্যই কাল হ'ল শেষ পর্যন্ত। এই কথাটাই স্বামী-স্ত্রীর আলোচ্য বিষয় হয়েছিল ইদানীং। আচ্ছা, মৃত্যুর পরও, পরলোকে গিয়েও তাদের এই জীবন এমনি থাকবে তো? এমনি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধা—এমনি মধুর সুখের জীবন? এপার-ওপারে পার্থক্যের মধ্যে যদি শুধু এই দেহটার অভাবই একমাত্র হয় তো আপত্তি নেই ওদের। কিন্তু—কিন্তু যদি এই সাময়িক বিচ্ছেদই চিরবিচ্ছেদ হয়?

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল হয়তো একদা খুব হালকাভাবেই, কিন্তু ক্রমশ সেটা ওদের পেয়ে বসল। আবিষ্ট হয়ে উঠল ঐ চিন্তাতে। মনস্তাত্ত্বিকরা যাকে 'অবসেসান' বলেন তাই হয়ে দাঁড়াল।

শেষে এমন হ'ল—ভোরবেলা ঘুম ভেঙে প্রথম কথা উঠত ঐটেই। তারপর অবশ্য প্রাত্যহিক সংসারের কাজে সেটা মুলতুবী রাখতে হ'ত—কিন্তু নরেশ অফিস থেকে ফেরা মাত্র আবার শুরু হয়ে যেত আলোচনাটা। বাড়িতে তেমন জমত না ব'লে ইদানীং ওরা সন্ধ্যার পর লেকের ধারে চ'লে যেত, সেখানে পরিচিত পরিবেশের বাইরে নির্জন অন্ধকারে প্রসঙ্গটা জমে উঠত ভাল। এক-একদিন ভাবতে ভাবতে যখন মাথা গরম হয়ে যেত, অজানা রহস্যের বধির অন্ধ সেই কঠিন যবনিকায় মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে ওদের অন্তর

রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠত, তখন এক-একদিন ওরা বেরিয়ে পড়ত অনির্দেশ যাত্রায়—সামনে যে-কোন পথের যে-কোন বাস বা ট্রাম পেত তাতেই উঠে পড়ত এবং যতক্ষণ না একেবারে লাইন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ত ততক্ষণ পর্যন্ত তেমনি পাশাপাশি ব'সে থাকত ওরা স্তব্ধ হয়ে—নিবিড়ভাবে পরস্পরের সাহচর্য অনুভব করত শুধু।

সমস্ত প্রশ্ন এখন শুধু একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে সংহত হয়েছিল: জীবনের পরেও কোন জীবন আছে কি না! কেউ কি বলতে পারে না 'ওপারের' খবর? কেউ কি জানে না? জানা কি সম্ভব নয় কোনমতেই—মরণের পরে কে কোথায় যায়?

এই বিষয়ে লেখা প্রচুর বিলিতী বই সংগ্রহ করেছিল নরেশ, লাইব্রেরি থেকেও আনত গাদা গাদা। নিজে প'ড়ে তার মর্মার্থটা বুঝিয়ে দিত রমাকে—কিন্তু ওদের কারুরই তাতে মন ভরত না। ঠিক বিশ্বাস হ'ত না যেন। যে সব বন্ধুবান্ধব প্ল্যানচেট ক্লেয়ারভয়েনস্ ইত্যাদির সাহায্যে পরলোকের খবর জানবার চেষ্টা করতেন, তাঁদের বৈঠকেও দু-চারবার যোগ দিয়েছে ওরা। কিন্তু সবটাই বিরাট ধাপ্পাবাজি ব'লে মনে হয়েছে। নিজেরাও দু-চারবার চেষ্টা করেছিল—সুবিধা হয় নি। একবার নরেশ ভূতাবিষ্ট হয়ে প্ল্যানচেটে অনেক প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিক লিখে ফেলেছিল। কিন্তু সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসিনী রমা তার মাসিমার শ্বশুরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে এমন হাস্যকর সব জবাব আসতে লাগল যে, সে হেসে উঠে প্ল্যানচেটের টেবিল ঠেলে ফেলে দিয়ে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

অবশেষে একদিন রমা এক অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে বসল: সে নিজে মরে খবর সংগ্রহ করবে।

নরেশ শিউরে উঠে ওর দুটো হাত চেপে বলে, 'ছি ছি, এমন কথা মুখেও এনো না।'

'না গো। এ অনিশ্চয়তা, এ সংশয় আমার অসহ্য লাগছে। দেহটা থাকতে যদি এ যবনিকার ওপারে পৌঁছনো না যায়—দেহটা ত্যাগ ক'রেই না হয় গেলাম! তবু—জানতেই হবে আমাকে, না জেনে থাকতে পারছি না আর?'

'কী বলছ যা-তা। পাগল হয়ে গেলে নাকি? তুমি গেলে ছেলেমেয়েগুলোর

কী অবস্থা হবে বল তো? আমিই বা কি করব?'

'দ্যাখো, আর কে কী পারে না পারে তা জানি না—কিন্তু আমি তোমাকে জানাবই—এ আমি কথা দিচ্ছি। যদি মৃত্যুর ওপারে কোনরকম জীবনের অস্তিত্ব থাকে, যদি সত্যিই তোমার আমার কোন অবিচ্ছেদ্য অনন্ত মিলনের সম্ভাবনা থাকে তো তোমাকে আমি সে খবরটুকু পৌঁছে দেবই—যেমন ক'রে হোক। তখন তুমিও সেই পথে গিয়েই মিলবে আমার সঙ্গে। আর কোন ভয় কোন সংশয় থাকবে না—কোনদিন কোন মৃত্যু এসে আর আমাদের আলাদা করতে পারবে না। সেই তো ভাল গো।'

'কিন্তু যদি আর কোন জীবনের আস্তত্ব না থাকে? যদি নিতান্তই পঞ্চ-ভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশে যায়? আত্মা পরলোক যদি সব ভুয়ো, সব বাজে কথা হয়? তখন?'

'তাহ'লে এই জীবনের প্রেম ভালবাসা আকর্ষণ—এসবেরও তো কোন মূল্য থাকে না। তাহ'লে বেঁচেই বা লাভ কি? যা এত ক্ষণস্থায়ী, এত অল্পে যার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি—সে-জীবন আঁকড়ে ধ'রে থেকেই বা লাভ কি? এত সাধনা, অত সংগ্রাম কিসের জন্যে তাহ'লে?'

'কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো? তাদের কথা ভাবছ না? তাদের আমরাই এ পৃথিবীতে এনেছি। তারা স্বাধীনভাবে জীবন আরম্ভ না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।'

'দ্যাখো—কত রকমেই তো আমার মৃত্যু হ'তে পারে। যে-কোন দিন যে-কোন রোগে—যে-কোন একটা য়্যাকসিডেন্টে। তখন ওরা কি করবে! সে অবস্থায় যা করত—এখনও না হয় তাই করবে। তোমার পয়সা আছে, ঝি চাকর রেখে চালাতে পারবে। খোকা তো আর এক বছর পরেই বি. এ. পাস করবে—ওর জীবন তো শুরুই হয়ে যাবে বলতে গেলে।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে নরেশ আবারও যেন শিউরে উঠে সবলে ওকে জড়িয়ে ধরলে, 'না না রমা, এ সব ছেলেমানুষি কোর না। আমাদেরই ভুল হয়ে গিয়েছিল এ সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামাতে যাওয়া। ভূত ভূত করতে করতে ভূতই ভর করে বসেছে। ছিঃ! পরে যা আছে তা পরেই দেখব। এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—।'

রমা তখনকার মতো চুপ ক'রে গেল।

এর পর দিনকতক নরেশ ওকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ ক'রে বেড়াল। পর পর সিনেমায় গেল ক'দিন; থিয়েটার, ম্যাজিক—কিছু বাদ দিলে না। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি গেল খুঁজে খুঁজে, তাদের নেমন্তন্ন করলে নিজেদের বাড়ি—অর্থাৎ একটা নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততার, একটা নিরন্ধ্র নিরবসরতার ঘূর্ণাবর্তে রমার মনের এই বুকচাপা চিন্তাটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে।

এই পর্ব চলেছিল দিন পনেরো ধ'রে। এই সপ্তাহটাই ক্লান্ত হয়ে থেমেছিল নরেশ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে চেয়েছিল—যদিও এসব প্রসঙ্গ যত্নসহকারে এড়িয়ে যেত।

রমার আচরণ বরাবরই সহজ ও স্বাভাবিক। কাজেই, এই পাগলামির ভূতটা তার ঘাড় থেকে নামল কি না তা বুঝতে পারল না নরেশ। তবু তার মনে হ'ল যে, অনেকটা প্রকৃতিস্থই হয়েছে নিশ্চয়। এতদিনে যখন ও প্রসঙ্গ একবারও তোলে নি—তখন অন্তত আগের মতো আচ্ছন্ন ক'রে নেই নিশ্চয় চিন্তাটা।

সেইখানেই ভুল হয়ে গিয়েছিল। বাইরের প্রশান্তি দেখে অন্তরের আলোড়নটা আন্দাজ করতে পারে নি।

কারণ, তার পরেই তো এই কাণ্ড ঘটল।

এখন হয়তো নরেশের কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো অবস্থা, হয়তো নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে এই সর্বনাশের জন্য। আবার রমার কথাটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতেও পারছে না। রমা যে এই কারণেই আর এই উদ্দেশ্যেই স্বেচ্ছায় মরেছে তাতে নরেশের কোন সন্দেহ নেই। কৌতূহলে ও ঔৎসুক্যে আগু বেড়ে গেছে মৃত্যুর দিকে।

সত্যি কি পারবে রমা কোন সংবাদ পাঠাতে? পাঠানো কি সম্ভব?

সেই সংশয়, সেই অন্তহীন প্রশ্ন। শুধু তার সঙ্গে যোগ হবে একটা সীমাহীন সমাপ্তিহীন প্রতীক্ষা।...একটা ক্ষীণ আশা উন্মুখ উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করবে, ওপারের সামান্য একটু ইঙ্গিতের জন্য।

কিন্তু যদি সত্যিই সে ইঙ্গিত কোনদিন আসে—নরেশ কি পারবে রমার মতো সেই অপার্থিব বিদেহ চিরমিলনের আশায় পার্থিব ভোগসুখ এবং এই

দেহটার মায়া কাটাতে ? পারবে কি অমনি প্রশান্ত মুখে স্বেচ্ছায় ওপারের দিকে পা বাড়াতে ?

আর যদি কোনদিনই না আসে সে ইঙ্গিত, না পৌঁছায় সে সংবাদ ?

তখন নিজের মূঢ়তার অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে এই ক্লান্ত নিঃসঙ্গ জীবনই কি টেনে বেড়াবে সে ?

কে জানে।

মোটামুটি গল্পের কাঠামোগুলো এই। এর মধ্যে কোনটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রং চড়িয়ে খাড়া করতে পারলে পাঠকদের পছন্দ হবে তাই ভাবছি। সেইটে ঠিক করতে পারলেই লিখতে ব'সে যাব।

সোনার হরিণ

ট্যাকসিটা ছেড়ে চলে গেল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতেই টের পেলেন হৈমবতী। আর কেউ রইল না বাড়িতে। মানে কোন ছেলেমেয়ে রইল না। অবশ্য হ্যাঁ, একটি ছেলে আছে, সুনীল আছে। কিন্তু সুনীলের থাকাটাকে—এ বাড়ির কোন ছেলে থাকা হিসেবে কেউ গণ্য করে না। এমন কি তার মা স্বয়ং হৈমবতীও তাকে হিসেবে ধরতে ভুলে যান এক এক সময়। ও আছে, মানে ও তো থাকবেই। রুগ্ন, জন্মাবধি অসুস্থ ; লেখাপড়া শেখে নি ; স্নায়ুর দোষ আছে, টেনে টেনে কথা বলে—দু-একজন ছাড়া ওর সব কথা বুঝতে পারে না লোকে ; উপার্জন ক'রে খাবার শক্তি নেই ; চিরদিনই ও—মানে সেই ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকেই—দিনরাতের বেশির ভাগ সময় ওর বাবার আপিসঘরে বসে থাকে চুপ ক'রে—আজও তাই আছে।

ওর অস্তিত্বকেই কেউ কোনদিন হিসেবের মধ্যে ধরে না। আজই বা ধরবে কেন ? চাকরবাকররাও ওর কথা ভুলে যায় এক-একদিন। শুধু পুরনো ঠাকুর বনমালী মনে ক'রে রাখে, সে-ই হুঁশ ক'রে খেতে দেয় দুবেলা। চা-জলখাবারও দেয়। সে না দিলে বোধ হয় অর্ধেক দিন খাওয়াই হ'ত না বেচারীর। মারই মনে থাকে না যার কথা—তার কথা অপরে খেয়াল করবে সর্বদা, এতটা আশা করা যায় না। আর, ও যা ছেলে, খাওয়া হয় নি—এ

কথাটাও কোনদিন নিজে থেকে বলবে না, অমনি চুপ ক'রে বসে থেকে থেকে একসময় ওর সিঁড়ির পাশের স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে গিয়ে ঝুপ ক'রে শুয়ে পড়বে। তাই কি সে বিছানাটার দিকেও কেউ নজর দেয়? অনেক সময়, এক মাস দেড় মাসই হয়ত—চাদর ওয়াড় বদলানো হয় না। সাধারণভাবে নিত্য ঝাড়াঝুড়ি তো হয়ই না। সেটাও—বনমালীরই মনে পড়লে কিংবা চোখে পড়লে যখন খুব বকাবকি করে, তখন হয়ত হৈমবতীরও হুঁশ হয়, চাকরকে ডেকে ধমকান, বলেন পাল্‌টে দিতে। বনমালীর বড় ছেলে আগুনে পুড়ে মারা গিছল দেশে, তারই ঠিক ন' মাস পরে নাকি এই ছেলে জন্মেছে। বনমালীর ধারণা সেই ছেলেই এসেছে এখানে—বনমালীর কাছাকাছি থাকবে বলে।

এখন এ বাড়িতে থাকার মধ্যে রইল বনমালী, পুরনো চাকর গিরিধারী আর একটা ঠিকে-ঝি। কেউ না থাকলে সে এসে গিন্নিমার ঘরে মেঝেয় শোয়, তার জন্যে দৈনিক চার আনা অতিরিক্ত দিতে হয় তাকে। আজও তাকেই খবর দিতে হবে। নইলে রাতবিরেতে মুশকিল বাধবে। বাতের শরীর—এক এক সময় কব্জা আটকে যাবার মতো হাত-পা ধরে যায়।

ঝি চাকর ছাড়া ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজন—আর কেউ রইল না। অথচ অশৌচ এখনও কাটে নি। আরও দুদিন বাকি আছে। ঘাটকামানো, শ্রাদ্ধ সবই পড়ে রয়েছে; করতেও হবে যেমন ক'রেই হোক, তাঁকেই করতে হবে। করবেনও, নিয়মমতো যেটুকু করবার। পুরুতকে খবর দিয়েছেন, তাকেই টাকা ধরে দেবেন, যা-যা দরকার সে-ই নিয়ে আসবে, বাজার-হাটও। সুনীলকে দিয়েই করাবেন। ব্রাহ্মণভোজনটাও পুরুতবাড়িই টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করবেন। ছেলেরাও করবে অবশ্য—বলেই গেল বড় ছেলে শুদ্ধোদন—তার পাটনার বাড়িতে সবাই মিলে শুদ্ধ হবে। কিন্তু হৈমবতীর সঙ্গে সে সবের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

হাসি পায় হৈমবতীর। অদৃষ্টের পরিহাস বুঝি একেই বলে। মরে হেজে গিয়েও সাত ছেলে তাঁর, চার মেয়ে। ছেলেরা সকলেই অল্পবিস্তর কৃতী। বড় ছেলেই বেশী সম্পন্ন, চাকরি এবং ব্যবসা দুই-ই করে পাটনায়—তা হলেও বাকি কেউই দরিদ্র কি অক্ষম নয়। মেয়েরাও মোটামুটি ভাল ঘরেই পড়েছে।

সবাই এসেছিল এই খবর পেয়ে। তিনটি ছেলে—মেজ সলিল, ন সরল, ছোট শুভাশিস—এরা তো এখানেই থাকত, এই বাড়িতেই—সরল আর শুভাশিস বিয়ে করে নি, সলিল তো স্ত্রী পুত্র নিয়েই থাকত। কাল অবধিও ছিল। বাকি তিনজন বাবা মরণাপন্ন খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। না, বাবার প্রতি অত্যধিক টানে নয়—এখন যা দেখাচ্ছে—কেন এসেছিল তা হৈমবতী জানেন। ওদের বাবা রূপকথার যক্ষ ওদের কাছে, পুরাণের কুবের ; রহস্য আর অনুমানে গড়া। বাবার টানে এলে এমন ভাবে সবাই চলে যেত না অন্তত, বাবা যেখানে মরেছেন শ্রাদ্ধটা সেখানেই ক'রে যেত।

সবাই একে একে চলে গেল, তাঁকে গঞ্জনা ধিক্কার দিয়ে। 'পতিঘাতিনী' আকারে ইঙ্গিতে একথাও বলতে দ্বিধা করে নি তারা। শুধু ঐ সুনীল—অক্ষম অর্ধনর, যার অস্তিত্ব তার মায়েরও মনে থাকে না সব সময়, যাকে সন্তানদের তালিকায় গণনা করে না কেউ—সে-ই রইল। তার অন্য জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয় বলেই, কিংবা অন্য ছেলেদের যা বক্তব্য তা তার মাথায় ঢোকে না বলে।

দোষ? অবশ্যই তাঁর।

অন্তত তা-ই বলবে লোকে। তাঁকেই দোষ দেবে, হৈমবতীকে।

কিন্তু কেন? কেন তিনি চিরদিন এমন ভাবে সকলের কাছে মাথা নুইয়ে নিজের সব ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে পরের মতে গা ভাসিয়ে চলবেন? কেন তাঁর দুর্বল ভাগ্যের সুযোগ নেবে সকলে : তাঁর মাথায় পা দিয়ে নিজেদের দিন কিনে নেবে? কেন তিনি এত অবিচার সহ্য করবেন?

এতকাল তো ক'রে এসেছেন, এখন মরবার সময়ও কি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন না? জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসেও!

ভাগ্য। ভাগ্যই সবচেয়ে বেশি অবিচার করেছে, প্রতারণা করেছে তাঁর সঙ্গে। বাবা বলতেন সৌভাগ্য—হৈমবতী জানেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছেন, গরিবের ঘরে অসামান্য রূপ নিয়ে জন্মানোর মতো দুর্ভাগ্য আর নেই। এই রূপের জন্যেই উনিশ বছরের স্নেহময়—তখনও বি. এ. পড়ছেন তিনি—দেখে পাগল হয়ে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে লোক পাঠিয়েছিলেন। ওঁর বাবাও

হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছিলেন। স্নেহময় বাপের এক ছেলে, মা নেই—আর কেউ নেই সংসারে—অগাধ ঐশ্বর্য—কাশীতে তিনখানা বাড়ি, কলকাতার বেলেঘাটা-নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে খানচারেক, কলিয়ারী, ব্যাঙ্কে লাখকতক টাকা, এঁদের স্বপ্ন-কল্পনার রাজপুত্র ছাড়া কি? ছেলে রূপবান না হলেও সুদর্শন, সবচেয়ে বড় কথা, বড়লোকের একমাত্র ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সচ্চরিত্র।

হৈমবতীর বাবা দ্বিধা করবেন না সে তো জানা কথাই, হৈমরও তখন আনন্দই হয়েছিল। স্নেহময়ের বি. এ. পরীক্ষা শেষ হবার পরই মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল। সে সমারোহতেও খুশী হয়েছিলেন হৈমবতী। এ তো তাঁদের ঘরে আশাতীত শুধু নয়—কল্পনারও অতীত। এর সিকি কেন, এক দশমাংশও খরচ করার মতো অবস্থা নয় তাঁদের। বাবা অবিনাশবাবুর থাকার মধ্যে ছিল তিলভণ্ডেশ্বরে একখানি একহারা তিনতলা বাড়ি, য়্যাংলো-বেঙ্গলী ইস্কুলে বাইশ টাকা মাইনের চাকরি—আর দু-এক ঘর যজমান; পুজো বিয়ে শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে কিছু কিছু কাপড়চোপড় চাল ডাল আসত তাতে—এই পর্যন্ত। সেখান থেকে লাক্‌সার দামী-দামী-আসবাবে-সাজানো অত বড় বাড়িতে এসেই মনে হয়েছিল রাজপ্রাসাদে এলেন, সত্যি সত্যিই রাজরাণী হলেন তিনি।

বিয়ের পরও অতটা বুঝতে পারেন নি। পরে বুঝলেন।

স্নেহময় বি. এ. পাসটা করেছিলেন কোনমতে, তারপর আর কিছুই করলেন না। না চাকরি, না উপার্জনের অন্য কোন চেষ্টা। বাবা মরার পর সব সম্পত্তি হাতে পেয়ে দালাল মারফত শেয়ার মার্কেটে ফাটকা খেলেছিলেন কিছুদিন, লাখ তিন-চার টাকা লোকসান দিয়ে সেটা বন্ধ করেন। তারপর আর কিছুই করেন নি। কিছু ভাল শেয়ার পুরো টাকা দিয়ে কিনে রেখে-ছিলেন, তার ডিভিডেণ্ড, কোম্পানীর কাগজ আর ব্যাঙ্কের সুদ, আর বাড়ি ভাড়া—এতেই চলে যেত। কলিয়ারীর আয় আগে হ'ত। বাবা মধ্যে মধ্যে যেতেন, গিয়ে দু-চার মাস থাকতেন, টাকা আদায় ক'রে আনতেন—তাঁর মৃত্যুর পর আর কিছু পাওয়া যায় নি, দেদার চুরি করেছে সবাই। দু-চার বছর দেখে সেটাও বেচে নিশ্চিন্ত হলেন স্নেহময়। জলের দামেই বেচলেন বলতে গেলে। এখন সে কলিয়ারী থেকে বছরে লাখ টাকা আয় হচ্ছে নাকি—তবু স্নেহময় একবার, দুদিনের জন্যেও, যেতে রাজী হলেন না।

আসলে বাড়ি ছেড়ে নড়তেই চাইতেন না। বিয়ের পর আট বছর কাশীর বাইরে পা দেন নি। শেষে হৈমবতী জোর ক'রে ব্যবস্থা করতে, তিনি একাই চলে যাবেন নইলে—ভয় দেখাতে, কলকাতা এসেছিলেন। সেই ভাবেই একবার পুরী আর দার্জিলিঙ গেছেন। তারপর এই যে বছর কুড়ি আগে কলকাতা এসেছেন—আর বিশেষ কোথাও যান নি। এ বাড়ি থেকে বারই হন নি। ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে যা বেরিয়েছিলেন তা গুনে দেখলে ত্রিশ দিনের বেশি হবে না বোধ হয়।

শুধু শুয়ে থেকেছেন, ভাল ভাল খাবার খেয়েছেন আর স্ত্রীকে সম্ভোগ করেছেন। এতেই শরীর নষ্ট হয়েছে। ইদানীং কিছুই হজম হ'ত না প্রায়। শেষ পর্যন্ত উদুরীতে দাঁড়িয়ে গেল। তবু কখনও পাঁচ মিনিটের জন্যেও একটু হাঁটতে রাজী হন নি। শেষ আট বছর দোতলা থেকে একতলাতেই নামেন নি। এই নিউ আলিপুরের জমি হৈমর শ্বশুর সত্যবাবু খুব অবহেলাভরেই কিনেছিলেন এক সময়। তখন হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী জমি ডেভেলপমেন্টের ব্যবস্থা শুরু করেছে—নলিনী সরকারের অনুরোধে অনিচ্ছাতেই কিনেছিলেন—কিছু টাকা পড়ে থাকলেও ক্ষতি হবে না এই বোধে—ফেলা থাক, না হয় কিছু লোকসান দিয়েই বেচবেন পরে।

এ জমির অস্তিত্বও স্নেহময় জানতেন না। হৈমই প্রথম আবিষ্কার করেন। তারপর তাঁর ক্রমাগত উৎপীড়ন ও বাক্যযন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে কাশীর দুটো বাড়ি বেচে, হৈমর এক ভগ্নিপতি কনট্রাক্টর—তাকে বাড়ি করার ভার দিয়েছিলেন। সে ভদ্রলোক মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা চুরি ক'রে বাড়িটা ক'রে দিয়েছিলেন তাই হয়েছে, নইলে স্নেহময় কোনদিনই উদ্যোগ ক'রে শেষ করাতে পারতেন না।

সে চুরির জন্যে হৈমর মনে কোন ক্ষোভ নেই। আজ এ বাড়ির যা দাম দাঁড়িয়েছে—তাতে অমন বহু পাঁচ হাজার টাকা উশুল হয়ে যাবে। এ বাড়ির হৈমই মালিক, একেশ্বরী। বছর আষ্টেক আগে একরকম জোর ক'রেই স্বামীকে দিয়ে দানপত্র লিখিয়ে নিয়ে কর্পোরেশনে নিজের নামে খারিজ করিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু স্নেহময়ের এ পরিশ্রমবিমুখতা কেন? এই স্বেচ্ছাবন্দী-দশা?

এ কি শুধুই আলস্য? শুধু আরামপ্রিয়তা?

না স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি—পত্নীপ্রেম?

তাই এক মুহূর্তও তাঁকে চোখের আড়াল করতে মন চাইত না? করেন নি কখনও? তাই কুড়ি বছরে আঠারোটি সন্তান গর্ভে ধরতে হয়েছে তাঁকে। জরায়ু কেটে বাদ দেবার প্রয়োজন হয়েছিল তাই—নইলে বোধ হয় তখনও অব্যাহতি পেতেন না।

না, তিনি জানেন—প্রেম এর কারণ নয়। আর যেদিন থেকে জেনেছেন সেদিন থেকেই স্বামীতে, এইসব সন্তানে, এই ঐশ্বর্যে—অপরিমিত ঘৃণা তাঁর। ঘৃণা—তার সঙ্গে মনের অবচেতনে একটা ক্রূর প্রতিশোধস্পৃহা। সে স্পৃহা একই সঙ্গে দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে নি, নিমেষে বাঘিনী করে তোলে নি—একটু একটু ক'রে পিশাচীতে পরিণত করেছে। বিকচোন্মুখ কৈশোরের যে কোমল নির্মল মন নিয়ে এসেছিলেন, গৃহস্থ ঘরের একটি সাধারণ মেয়ের মন—কৌতূহলে বিস্ময়ে, কল্পনায়-দেখা-আসন্ন-প্রণয়লীলার স্বপ্নমাধুর্যে ভরা—যা সংসার-বাঁধার ও স্বামী-সেবার আগ্রহে অধীর—তাকে একটু একটু ক'রে দানবীর মনে পরিণত করেছেন স্নেহময়।

আসলে অসামান্য রূপসী এই স্ত্রী সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার আশঙ্কার অবধি ছিল না। কি যেন বলে তাঁর বড় ছেলে, কথাটা খুব ব্যবহার করে—ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স—হীনমন্যতা—মানেটা জানেন না, আন্দাজে আন্দাজে বুঝতে পারেন—স্নেহময়েরও এ অকারণ আশঙ্কার মূলে বোধ হয় সেই মনোভাবই ছিল।

হারাবার ভয়, হাত-ছাড়া হবার ভয়।

না, ভুল ধারণা নয় তাঁর। কুটিল সংশয়টা দেখা দেবার পর একটু একটু ক'রে বাজিয়ে দেখেছেন স্বামীকে, নানা আলোচনায় তাঁর মনের কালিমাটা টেনে বার করার চেষ্টা করেছেন। আশঙ্কাটা ব্যাধির মতো পেয়ে বসেছিল স্নেহময়কে, তাই এক মুহূর্তও চোখ-ছাড়া করতে চাইতেন না, এক মাসও অবসর দিতেন না একটি গর্ভ ধারণ থেকে আর একটির মধ্যে। প্রথম দিকে কিছু বন্ধুবান্ধব আসত বাড়িতে, নিজেরাই আসত গরজ ক'রে, তার পর বিরক্ত হয়েই আসা বন্ধ করেছে—তারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বই কিনে দিয়েছে, কেউ কেউ

প্রয়োজনীয় আসবাবও রেখে গেছে বিছানার পাশে। সেসব বই পড়েওছেন স্নেহময়, কিন্তু কাজে লাগান নি, মুখ বিকৃত ক'রে বলেছেন, 'ও আমার ভাল লাগে না।'

হয়ত ভেবেছিলেন এই ভাবে পর পর সন্তান হতে থাকলে দশ-বারোটির পরই বুড়ী হয়ে যাবেন হৈমবতী, অকাল-বার্ধক্যে তাঁর রূপের দীপ্তি লোপ পাবে, আর কারও কামনার কারণ থাকবে না। কিন্তু স্বাস্থ্যবতী হৈমর লাবণ্য তাতেও ক্ষুণ্ণ হয় নি, দেহের বাঁধন থেকেছে অটুট—আর তার ফলে স্নেহময়ের উদ্বেগও কমে নি। সে উদ্বেগের মূল্য যোগাতে হয়েছে হৈমকেই—আরও, আরও সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রে।

সেই প্রায়ান্ধকার খালি ঘরে সহসাই হেসে ওঠেন হৈমবতী, বেশ সরবেই।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই যেন চমকে ওঠেন সে হাসির শব্দে।

এ কার হাসি? কোন প্রেতিনীর? তিনিই হাসলেন নাকি, এই রকম শব্দ ক'রে?

হ্যাঁ, তিনিই। আর তো কেউ নেই এখানে।

এ হাসির কারণ একটা আছে বৈকি। বিজয়-গর্বেরই হাসি বুঝি এটা।

সে-ই প্রথম প্রতিশোধ নেওয়া তাঁর—স্বামীর ওপর।

যেদিন থেকে বুঝলেন, নিঃসংশয়ে জানলেন কেন তাঁকে এই ক্রমাগত সন্তান বহন করতে হচ্ছে গর্ভে,—সেই দিন থেকেই তিনি যেন একটা দিক-দাহকারী রোষে পাগল হয়ে উঠলেন, একসময় পাগলের মতোই কাজ ক'রে বসলেন একটা। যে সতীধর্ম বংশ-পরম্পরায় তাঁর অস্থিতে মজ্জাতে রক্তে মিশে রয়েছে—তার প্রভাব এড়ানো সু-কঠিন, কিন্তু পাগল বলেই তিনি সেটাও করতে পারলেন অনায়াসেই।

সুনীল বনমালীর সন্তান। বনমালীও ব্রাহ্মণ। সুপুরুষ—তখন সু-পুরুষই ছিল—কিন্তু ঈশ্বর জানেন সে জন্যে মনে কোন লালসা জাগে নি হৈমর। একান্ত নিষ্কাম হয়েই কাজটা করেছিলেন—হিসেব মেলাবার মতো ক'রে। তাঁর মতো রূপবতীর (তখনও তাঁর রূপের মোহিনী শক্তি অটুট) একটা সামান্য পাচককে মোহগ্রস্ত করতে একদিনও লাগে নি। ওঁর নিজেকে প্রবোধ

দিতে বরং অনেক সময় প্রয়োজন হয়েছিল। সেই দুঃসহ মানসিক দ্বন্দ্বের ফলেই সম্ভবত—অবিরাম সেই অন্তর্জ্বালার জন্যেই, সুনীল রুগ্ন, দুর্বল, অপুষ্ট-মস্তিষ্ক জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মেছে।

তবে তাঁর যতই কষ্ট হোক, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। স্নেহময় বুঝতেও পারেন নি সুনীল তাঁর সন্তান নয়।

অবশ্য সেটা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি স্নেহময়ের জ্ঞান থাকতে থাকতেই, —নইলে শোধটা পুরো হয় না। মৃত্যুর এই কদিন আগে। ঘরে কেন ওপর-তলাতেও কেউ নেই দেখে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কথা। মেয়েছেলে ব্যভিচার করবে মনে করলে তাকে কেউ আটকাতে পারে না। সিন্দুকে তালা দিয়ে রাখলেও না, ক্রমাগত তাকে গর্ভধারণ বন্দীদশায় আবদ্ধ রাখলেও না। আরও অনেকবার এ কাজ করতে পারতেন তিনি—সে কথাও বলেছেন। মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো দেওর বা ভাইয়েরা অনেকেই মাঝে-মধ্যে এসেছে, দু-একদিন থেকে গেছে। তারা প্রায় সকলেই লোলুপ উৎসুক ছিল তাঁর সম্বন্ধে—কিন্তু হৈমবতীর সে প্রবৃত্তি ছিল না। সদ্বংশে জন্ম, স্বভাব-অসতী নন তিনি, শুধু দুঃসহ অবিচারের চরম প্রতিশোধ তুলতেই তিনি এ কাজ করেছেন। বাড়ির চাকর কি মেথর হলে শোধটা আরও ভাল উঠত, তবে অত নিচে নামতে পারেন নি।···আর এতে একটা উপকারও হয়েছে, ঐ ছেলেটার টানে বনমালী এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না কোন দিনই, পাচক-সমস্যার দায় থেকে নিশ্চিন্ত।

কথাটা সজ্ঞানেই শুনে গেছেন স্নেহময়। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই হৈমবতীর। বৃথাই এতকাল, সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর স্বামীর সঙ্গে বাস করেন নি তিনি, চল্লিশটা বছরের প্রতিদিন প্রতিরাত। একদিনও কাছ-ছাড়া হতে পারেন নি। বাবা-মা মরবার সময়ও ছুটি পান নি। তিনি গেলে স্নেহময়ও সঙ্গে যাবে জানতেন বলে—ঘৃণায় তিনিও যান নি।

সে-ই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিছলেন স্নেহময়। আর একটি কথাও বলেন নি কারও সঙ্গে, কারও কথার উত্তর দেন নি। খানও নি আর কিছু। খাওয়ার

অবস্থাও বিশেষ ছিল না। শেষের দিকে মকরধ্বজ মধু দিয়ে মেড়ে জিভে লাগাতে গেলে মুখ সরিয়ে নিয়েছেন, দু চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে।

প্রতিশোধ বা কলহ একতরফা হলে আশা মেটে না। অপর তরফ থেকে জবাব না পেলে মনের উত্তাপ বরং বেড়েই যায়।

হৈমবতীরও গিয়েছিল।

তিনি সত্যি সত্যিই যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, পিশাচীতে পরিণত হয়েছিলেন। স্বামীকে এই শেষ অবস্থায় এত বড় আঘাত দিয়েও তৃপ্তি পান নি। স্নেহময় এ মর্মান্তিক আঘাতের বেদনা প্রকাশ করতে পারলে, ছটফট করলে, রূঢ় কথা বললে—শান্তি হ'ত তাঁর, প্রতিহিংসার সাধ মিটত।

শেষের দিকে ছেলেরা বড় ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিল; বাড়ির ডাক্তার বলেছিলেন নার্সিং হোমে পাঠাতে। হৈমবতী রাজী হন নি। বামনগাছিতে কে সিদ্ধ তান্ত্রিক আছেন তাঁকেই ডেকেছিলেন, প্রসাদীফুল চরণামৃত তাবিজ কবচ এইসব শুরু হয়েছিল। অবশ্য কম খরচেই। ঠাকুরমশাইকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন তিনি, বেশি দোহন করার চেষ্টা করলে কোন ফল হবে না। যা রয়-সয় তাই যেন করেন। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, ঠাকুরমশাই হৈমবতীকে চিনেছিলেন, বহুদর্শী তন্ত্রব্যবসায়ী হয়ত মনের চেহারাটাও দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর—সেই মতোই চলেছেন। এই তান্ত্রিকের দোহাই দিয়েই বড় ডাক্তার ডাকা বা নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব ঠেকিয়ে ছিলেন। যা করবার ঠাকুরমশাই করবেন। ওঁর শরণ নেওয়া হয়েছে, পূর্ণ বিশ্বাস রাখা দরকার। এখন ডাক্তার হাসপাতালের ব্যবস্থা মানে ওঁর প্রতি অনাস্থা দেখানো। তাতে উনি অসন্তুষ্ট হবেন। বিশেষ তিন দিন তিন রাত্রি উপবাসী থেকে মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ করছেন, তার ফলটা নষ্ট করা ঠিক নয়।

আর নার্সিং হোম বা হাসপাতালে নিয়ে গেলেই যে সেরে উঠবেন উনি এমন নিশ্চয়তা কি দিতে পারে কেউ—এই শেষ অবস্থায়?

তা যখন পারে না, তখন খামোকা আর কেন ব্যস্ত হওয়া? ওঁর চেষ্টার ওপর বিশ্বাস আছে, সেই ব্যবস্থাই ধরে থাকতে চান তিনি।

এর ওপর আর কথা বলবে কে?

শেষ দুদিন অসহ্য কষ্ট পেয়েছেন স্নেহময়, শ্বাসকষ্ট। ছেলেরা ছুটে গিয়ে অক্সিজেন এনেছে, হৈমবতী ব্যবহার করতে দেন নি। কঠিন ও উগ্র হয়ে উঠেছেন। বলেছেন, 'মার চেয়ে ব্যথিনী তারে বলে ডাইনী। গেলে আমারই যাবে, আর কারও কোন ক্ষতি হবে না। বিয়াল্লিশ বছর ঘর করেছি, এর প্রতিটি দিন—দিনরাত একসঙ্গে কাটিয়েছি—আমার স্বামী, তার ভাল-মন্দ আমি বুঝি না, তোরা বুঝিস ?···কষ্ট হচ্ছে, ঠাকুরমশাইকে ফোন কর্, যা করবার তিনি করবেন।'

তারপর একটু থেমে আবার বলেছেন, কতকটা আপন মনেই যেন—'ওসব অস্বাভাবিক জিনিস উনি কোন কালে দেখতে পারতেন না, এখন কথা কইতে পারছেন না বলেই জোর ক'রে চাপাব—তাতে আমি রাজী নই।'

ছেলেরা কেউ কেউ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কড়া কথা বলেছে, উনি গ্রাহ্য করেন নি। যে দুটি ছেলে বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিছল, বড় আর সেজ—তাদের আর স্নেহময়ের ঘরে ঢুকতে দেন নি। বলেছেন, 'তোমরা ওঁর সামনে অশান্তির সৃষ্টি করছ। এই শেষ সময়টা শান্তিতে থাকতে দাও ওঁকে।'

তারা মনে করাতে গেছে, 'এই শেষ সময়টা ছেলেদেরও কিছু কর্তব্য আছে। হিন্দু ব্রাহ্মণের বংশ, ভগবানের নাম শোনানো, গীতা শোনানো, মুখে গঙ্গাজল দেওয়া এসব ছেলেদের কাজ। বিশেষ বড় ছেলের থাকা দরকার।'

হৈমবতী জবাব দিয়েছেন, 'শেষ সময়টা ঠিক কখন—কী ক'রে বুঝছি ? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মাঝখান থেকে যদি বা বাঁচত, কানের কাছে নাম শোনাতে শুরু করলে—তবে বুঝি মরে যাচ্ছি—ভেবে আঁত্‌কে হার্ট-ফেল করবে। এতকাল যা করেছে—পাপই করুক আর পুণ্যই করুক, তারই ফল ভোগ করবে। মরার কালে দুবার হরিনাম শোনালেই যদি স্বর্গে যেত মানুষ, তাহলে আর ভাবনা ছিলা না। জ্যান্তে কখনও ভগবানকে ডাকে নি যে, বাড়িতে পুজো-আচ্চা করতে দেয় নি, মন্তর নেয় নি, তাকে মরবার সময় বিরক্ত না করাই ভাল।'

তারা ঘরে ঢুকতে পারে নি। পারবে না তিনি জানতেন। এত সাহস কারও হবে না যে জোর ক'রে তাঁকে ঠেলে ঢুকবে।

ওঁকে দীক্ষা নিতে দেন নি স্নেহময়—সেও সবাই জানে। কাজেই ওঁর

যুক্তির কাছে চুপ ক'রেই যেতে হয়েছে।

বাইরে থেকেই শ্বাসের শব্দ শুনে বড় ছেলে ছুটে গিয়ে সে-ই ঠাকুরমশাইকে ফোন করেছে, 'বড় কষ্ট পাচ্ছেন বাবা।'

ঠাকুরমশাই উত্তর দিয়েছেন, 'সন্ধ্যের মধ্যেই কমে যাবে, ভয় নেই।'

সন্ধ্যের মধ্যেই কমে গেছে। একেবারেই কমে গেছে।

তখন উনি দরজা ছেড়েছেন। ছেলেদের বলেছেন, 'যা করবার করো এখন। আমার দায়িত্ব শেষ।'

মরার সময় উনিও কাছে ছিলেন না। সে-সময়টায় মুখে জল দিতে, ভগবানের নাম শোনাবার বৃথা চেষ্টা করতে মন চায় নি। যা অবস্থা, জল দিতে গেলে হয়ত নিঃশ্বাস আটকে যাবে। ভগবানের নামও কানে পৌঁছবে না। ও আদিখ্যেতায় আর কাজ নেই।

আসলে সেই কষ্ট, সেই মুখ-বিকৃতি—উনিও সহ্য করতে পারছিলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ বুজে দরজার কাছে বসে ছিলেন, স্বামীর দিকে পিছন ফিরে।

শেষ সময় যে ছেলেদের কাছে যেতে দেন নি, তার কারণ ছিল। তিনি জানতেন, ওরা কেন বাবাকে ঘিরে থাকতে চায়—ওঁকে বাদ দিয়ে। ছেলে মেয়ে সবাই। একই প্রশ্ন সকলের মনে, একই উৎকণ্ঠা।

সেই কুবেরের ঐশ্বর্য। অন্তত সেই রকমই তাদের বিশ্বাস। যার খবর শুধু তাদের বাবাই রাখতেন, কখনও কোন ছেলে-মেয়েকে জানতে দেন নি—তার হিসেব, তার অবস্থা ও অবস্থান। কারও সঙ্গে কোনদিন আলোচনা করেন নি। কোথায় কীভাবে আছে কতটা—সেইটে তাদের জানা দরকার। কোন উইল আছে কিনা, কোন ভাগ ক'রে দিয়ে গেছেন কিনা।

স্নেহময় মরার সময় চেষ্টা করেছেন কথাটা বলতে, কথাবার্তা বন্ধ হবার আগেই চেষ্টা করেছেন। হয়ত যে ছেলেরা অপেক্ষাকৃত কম উপার্জন করে, তাদের জন্যে কিছু নির্দিষ্ট ক'রে দিতে চেয়েছেন। স্ত্রীর অসাক্ষাতেই বলতে চেয়েছেন। স্ত্রীর রুক্ষ নির্মম মনের চেহারাটা নজরে পড়েছে তাঁর অনেকদিনই। সেটা হৈমবতীরও বুঝতে দেরি হয় নি। সেই কারণেই সে-সুযোগ তিনি দেন নি।

কেন ?

ছেলেদের ওপর বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ?

বাপের অপরাধে ছেলেদের শাস্তি দিতে চেয়েছেন ?

না, বাপের ঐ সামান্য শান্তিটুকুও হরণ করতে চেয়েছেন, শেষ ইচ্ছায় বাধা দিয়ে ?…

কে জানে। তিনি নিজেই জানেন না, কেন এই জেদ চেপেছিল তখন মাথায়। তখন কেন, তার পরেও।

শ্মশান থেকে ফিরে এসেই বলতে গেলে—সেই প্রশ্ন তারা করেছে, যা বাবাকে করতে পারে নি, তাঁর জীবদ্দশায়।

কোথায় কী আছে, কে কী পরিমাণ পাবে, তার জন্যে কী করণীয় এখন —উকিল য়্যাটর্নী ব্যাঙ্ক—কোথায় জানানো দরকার, বাবার কাজের জন্যে নগদ কতটা পাওয়া যাবে মায়ের কাছে—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই মোটা তথ্যগুলো জানতে চেয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠেছেন হৈমবতী।

এক রকমের নিরানন্দ ঠাণ্ডা হাসি হেসেছেন।

বিনা উত্তরে উঠে গিয়ে বার করে দিয়েছেন, কাগজপত্র যা ছিল।

ছেলেরা সেগুলো উল্‌টে দেখে হতবাক হয়ে গেছে।

টাকাকড়ি কিছুই নেই আর, উল্লেখযোগ্য কোন অঙ্ক।

সেই অপরিমিত টাকা—তারা যার স্বপ্ন দেখেছে দীর্ঘকাল—তার আর কোন অস্তিত্বই নেই।

শেয়ার বাবা সব বিক্রী ক'রে দিয়েছেন নগদ টাকায়। কোম্পানীর কাগজও। ব্যাঙ্কের আমানত স্ত্রীর নামে ক'রে দিয়েছেন। কারেন্ট য়্যাকাউন্ট যুক্ত নামে আছে। সে বেশি কিছু নয়। এখনও যে-ক'খানা বাড়ি আছে, তা উইল ক'রে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে দিয়ে গেছেন।

ওদের পাবার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

'এত টাকার ওঁর কী দরকার পড়ল, সব তুললেনই বা কেন ?…সে-টাকা কী হ'ল ? কোথায় রেখেছ—?' অতিকষ্টে একজন প্রশ্ন করল।

'সে কৈফিয়ত আমি তোমাদের কাছে দিতে বাধ্য নই বাবা। চিরদিন এ-

সংসার আমিই চালিয়েছি। কোথা থেকে কি আসছে, এত খরচ কে চালাচ্ছে, কই কোন দিন তো খবর নাও নি।'

'সে বাবার সংসার, বাবা চালাচ্ছেন জানতুম। তার মধ্যে নাক গলাতে যাবো কেন?' উত্তপ্ত শুদ্ধোদন উত্তর দিয়েছে।

'কথাটা যে কত বড় মিথ্যে তা তোমরা সবাই জানো। তোমাদের বাবা মধ্যে মধ্যে দরকার মতো দু-একটা সই করেছেন শুধু—আমি যখন বলেছি, যেখানে করতে বলেছি। তাও শুয়ে শুয়েই করেছেন। শেষে একটা বছর তো বাথরুমে পর্যন্ত যেতে পারেন নি। তিনি সংসার চালিয়েছেন! কোনকালেই তিনি চালান নি। বাবা যতদিন ছিলেন, তোমাদের ঠাকুর্দা, তিনিই চালিয়েছেন। তারপর টাকাকড়ির হিসেবটা উনি রেখেছিলেন কিছুদিন, পরে তাও পারেন নি। সংসারে কোথা দিয়ে কি হচ্ছে—রাঁধুনী, চাকর, ঝি, বাজার, রেশন, ধোপা, গয়লা—কোন খবরই জানতেন না। নেনও নি কোনদিন। শুধু খাবার ফরমাশটা করতেন মধ্যে মধ্যে, যখন যা খেতে ইচ্ছে করত। তোমাদের স্কুল-কলেজের খরচ, কাপড় জামা বিছানা, গাড়ি ভাড়া, বিয়ে পৈতে—এসব কে করেছে, কে টাকা বার করেছে জানো না, দ্যাখো নি?'

'তাহলে এখন কী বলতে চাও?' প্রশ্ন করেছে ছেলেরা।

'কিছুই বলতে চাই না। খরচ আমি যা দরকার বুঝব করব, যতদিন পারব। দরকার বুঝলে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করব। তোমরা যে যা দিয়েছ তা যে খরচের তুলনায় কিছুই নয়—আশা করি সে কথা তোমরাও মানবে। এখন টাকার হিসেব চাইতে লজ্জা করছে না?'

কথায় কথা বেড়ে গেছে।

মেয়েরা একসময় বলেছে 'ভাইয়েরা তো তোমার সংসারে না হয় খেয়ে উশুল করেছে, আমরা তো কিছুই পাই নি।'

হৈমবতী বলেছেন, 'দুদিন অপেক্ষা করো, আমি মলে ভাগ নিও ওদের কাছ থেকে। আর তোমাদের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে মা-সকল, বিশ হাজারের কমে কেউ বিদেয় হও নি। কুড়ি বছর আগের বিশ হাজার—এখনকার আশি হাজার, তাই না?'

শেষে, ছেলেমেয়েদের মুখোশ খসে পড়তে তিনিও মুখোশ খুলেছেন।

বলেছেন, 'এক পয়সার হিসেব কি কৈফিয়ত আমি দোব না। তিনি ছেলেদের চিনেছিলেন বলেই সব বেচে কিনে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। টাকা আমার, আমি যা-খুশি করব। বুঝি তেমন কোনদিন, তোমাদের জানিয়ে যাবো কি দিয়ে যাবো। মানে যদি সদ্ভাবে চলো। নইলে কিছুই কোনদিন পাবে না। বাড়ি আমার, টাকা আমার—যা ভাল বুঝব করব। আমার তাঁবে থাকা না পোষায়—দরজা খোলা আছে, পথ দেখতে পারো।'

তারপর বিচিত্র দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে বলেছেন, 'এই টাকার লোভেই বাবা আমাকে একটা অমানুষের হাতে দিয়েছিলেন, অথচ সে-টাকা ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করতে পারি নি। স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারি নি। কেনা-বাঁদীর মতো জীবন কাটিয়েছি—তারও অধম। সারাজীবনই তো গেল একভাবে—কিন্তু আর নয়। এ-টাকাটা যে আমার—যার জন্যে নিজেকে বিক্রী করেছি সেটা হাতে পেয়েছি—এইটে কিছুদিন অন্তত বুঝতে চাই। তোমাদের প্রত্যেককে মানুষ ক'রে দিয়েছি, দাঁড়াতে পেরেছ, আমার কর্তব্য শেষ। টাকায় লোভ থাকে রোজগার ক'রে নাও। আর যদি কেউ বোঝ ঠিক নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার মতো হও নি—এসে থাকো, ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না, বাড়ি-ভাড়া লাগবে না, এমন কি বাড়ির কোন ঝঞ্ঝাটও পোয়াতে হবে না। তবে তার বেশি চেয়ো না।'

সে বন্দোবস্তে রাজী হয় নি কেউ। নিজেদের বঞ্চিত নয়—প্রবঞ্চিত বোধ করেছে। সে-প্রবঞ্চনা কে করেছে তার সঙ্গে কী সম্পর্ক, কেউ ভেবে দেখে নি। পথই দেখেছে তারা। একে একে সবাই চলে গেছে এ-বাড়ি থেকে। রাগ ক'রে, তাঁকে গালাগালি দিয়ে, অভিসম্পাত ক'রে—ভয় দেখিয়ে, শাসিয়ে।

তিনি মা, তাদের মানুষ করেছেন, এতদিন সর্বতোভাবে তাদের কল্যাণ দেখেছেন, তারা যে মানুষ হয়েছে, বিড়ি পাকিয়ে কি মোট বয়ে জীবিকার্জন করতে হয় নি—সেও তাঁরই জন্যে। ওদের বাবা কিছুই করেন নি, করতেন না; তিনি বিচলিতও হতেন না; আর কেউ করবার না থাকলে ওরা উচ্ছন্নয় যেত—সে-কথা যদি ওরা ভুলতে পারে, মা-ছেলের সম্পর্কের থেকে যদি টাকাই বড় হয়—তাহলে উনিই বা ওদের ওপর ভরসা ক'রে টাকা হাতছাড়া করবেন কেন?...অনেক দেখেছেন তিনি জীবনভর, অনেক মা-বাবাকেই দেখেছেন—

ছেলেদের হাতে সব তুলে দিয়ে ভিখিরীর জীবন যাপন করছে, লাঞ্ছনার ভাত খাচ্ছে। সে পথে যেতে উনি রাজী নন। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা, বর্তমান ভবিষ্যৎ, স্বাস্থ্য যৌবন—পরমায়ুর অধিকাংশর বদলে আজ পেয়েছেন ক'টা টাকা—সেটাও ছেড়ে দেবেন ? না, এত সহজে নয়।

দিন শেষ হয়ে গেছে কখন, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, টের পান নি হৈমবতী। চাকর এসে আলোটা জেলে দিতে চমক ভাঙল। দেখলেন ঠিক সেই একভাবে একখানা শূন্য ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। সেজ ছেলের ঘর এটা। সব নিয়ে চলে গেছে, কেবল খাটটা নিতে পারে নি, মানুষের কঙ্কালের মতো ব্যাটম বার ক'রে পড়ে আছে।...

আবার হেসে উঠলেন একবার। তেমনি আগের মতো, হা-হা ক'রে।

আবারও শিউরে উঠলেন সে-হাসির শব্দে। এ কী হাসি।

বিদ্রূপের হাসি হাসতে চেয়েছেন ? কঠিন বিদ্রূপ ? কিন্তু এ-বিদ্রূপ কাকে করছেন তিনি ? নিজেকেই করছেন না তো ?

শোধ উঠেছে, জীবনের দাম বুঝে পেয়েছেন, এবার তো পরিতৃপ্ত হবার কথা।

কিন্তু—

প্রবল একটা 'কিন্তু' কেন মনের মধ্যে এমনভাবে মাথা তুলছে বার বার ?

কেন সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, সজ্ঞান মনের প্রবল বাধা সত্ত্বেও, যে কিছুই শোধ হ'ল না, জীবনের কোন পাওনাই পান নি কোনদিন, আজও পেলেন না। বরং যেটুকু পেতে পারতেন, সেটুকুও হারালেন। সেই লোকটাই জিতল শেষ পর্যন্ত, নিঃশেষে তাঁর জীবনরস শুষে নিয়ে চলে গেল।

তাঁকে আবারও ঠকিয়ে গেল সে, খানিকটা মূল্যহীন সম্পদ দিয়ে ভুলিয়ে রেখে চলে গেল, বাকী জীবনটা যাতে মরুভূমি হয়ে থাকে—তারই ব্যবস্থা ক'রে গেল।

এ-টাকা নিয়ে কি করবেন তিনি, কী কাজে আসবে আর ?

সম্ভোগ ? আর কোন দিকেই তো কিছু ভোগের উপায় নেই। যৌবন, স্বাস্থ্য, অবস্থা—কোনটাই নেই। বিধবা বিগত-যৌবনা আর কি ভোগ

করতে পারে ?

টাকাটা এখন একমাত্র যা কাজে আসতে পারে, তা হচ্ছে তার লোভ দেখিয়ে কতকগুলো লোককে পায়ের নিচে রাখা। ছেলেরা যদি ঐ টাকার মুখ চেয়ে তাঁকে খোশামোদ ক'রে চলত তবুও কিছু স্বাদ পেতেন জীবনে, শক্তির স্বাদ। কিন্তু ওরা চলে গেল ; সেটুকুও পেলেন না। পাবেনও না। উনিই তাদের মানুষ ক'রে দিয়েছেন, ওঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দরকার হবে না।

তবে কী করবেন তিনি ও-টাকা নিয়ে, কী ক্ষতিপূরণ হবে তাঁর ?

এ-উত্তরটা কোনদিনই হয়ত পাবেন না, বাকী সারা জীবনে।

শুধু পরিতাপ। নিরুপায় ক্ষোভ, ব্যর্থ বিদ্বেষে জ্বলে মরবেন এর পর থেকে —যতদিন বাঁচবেন। চোখের জলই সার হবে—যে অবাধ্য চোখের জল এখনই ধারায় ধারায় গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

যজ্ঞি-বাড়ির ফর্দ

আমাদের কেশব ঠাকুরকে কে না চেনে ? কলকাতা শহরের টালা থেকে টালিগঞ্জ নয়—চুঁচড়ো থেকে সোনারপুর, ওদিকে ব্যাণ্ডেল থেকে মেচেদা— অশ্রান্ত যাতায়াত তার। আরও বেশি দূর যে যায় নি তা নয়, রান্না করতে দলবল এবং হাতা বেড়ি খুন্তি নিয়ে একদা মালদা যেতেও দেখেছি, একদিন আসানসোলেও। তবে ওর ভাষায়, 'আমার হুদ্দোটা মোটামুটি ঐ। অবিশ্যি, হ্যাঁ, চুঁচড়ো ব্যাণ্ডেলই বা বলি কেন—ঐ আপনাদের নতুন শহর দুর্গাপুরেও গিছি পাঁচ-ছ'বার। এ ছাড়া, একবার ভিলাইতেও যেতে হয়েছিল, তারা যাতায়াত থাকা সব মিলিয়ে যে পাঁচ দিন, তার পুরো মজুরী দেছ্‌ল, দলবল সকলকারই। এ ছাড়া ধরুন গে ঘুমোবার গাড়ি দেছ্‌ল, ঠায় বসে রাত জেগে থাকতে হয় নি।'

এর কারণ কেশব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, সবিনয়ে হেসে বলবে, 'বাবু, বললে অংকার পেকাশ পায়, আপনার এ নফরের হাতের রান্না একবার যে খেয়েছে, আর কারও রান্না তার মুখে লাগবে না যে। যে য্যাত দূরেই থাক, ঠিক বলবে, আগে ছ্যাখো দিকি—কেশবকে পাও কিনা।'

কিন্তু আমি জানি, এত জনপ্রিয়তা বা বর্তমান কাগজের ভাষায় 'চাহিদা'র কারণ ঠিক রান্না নয়। অর্থাৎ কেশব ঠাকুর ভীমসেন কি দ্রৌপদী নয়। রান্না মোটামুটি ভালই—কিন্তু মানুষ তো, রান্না সব দিন সমান হয় না। কোনদিন খুব উতরে যায়—সেদিন হয়ত সবগুলোই ওতরাল—আবার কোনদিন নিতান্তই চলনসই। তবে এও মানতে বাধ্য—অখাদ্য রান্না কেশব ঠাকুরকে কোনদিন রাঁধতে দেখি নি।

না, রান্না নয়, জনপ্রিয়তার কারণ অন্য। লোকটা ফর্দ করে নিখুঁত। কাঁচামাল বেশিও হয় না, কমও হয় না। আমরা একবার কী একটা কাজে অন্য ঠাকুর এনেছিলাম, সে ফর্দর মসলা প্রায় বছরখানেক লাগল খরচ হতে, দশ কেজি দালদা দোকানীকে ফেরত দিতে হল কিছু গচ্ছা দিয়ে, তেলও প্রায় দু মাস চলল। তবু তরকারিতে এত তেল ঢেলেছিল যে মনে হবে, জল দেওয়াই হয় নি, সবটাই তেলে রান্না।

কেশব ঠাকুর তেল মসলা কম আনায়, কম খরচ করে। আগের দিন রাত্রে এসে থেকে রাত জেগে কুটনো কুটে নেয়—তার জন্যে বেশি পয়সা চায় না। মিষ্টভাষী, নম্র স্বভাবের মানুষ। এইসব কারণেই যাঁরা একবার ওকে কাজে-কর্মে ডাকেন, তাঁরা আর কাউকে ডাকতে চান না, দূর-দূরান্ত থেকেও ওকেই ডেকে পাঠান।

কেশব ঠাকুরের বয়েস হয়েছে অনেক। নিজেই বলে, 'আমার বাড়ির লোকেরা গোলমাল করে ফেলে, কিন্তু আমি বাবু আমার বয়সের হিসেব ঠিক রেখেছি—এই তেরশো ছিয়াশি সালের উনতিরিশে বোশেখ চুয়াত্তর পেরিয়ে পঁচাত্তরে পড়েছি, কিলিয়ার হিসেব।'

যে শোনে, সে-ই অবাক হয় অবশ্য। মাঝারি ধরনের চেহারা—লম্বা চওড়া, দু'দিকেই মাঝারি। রোগা পাকশিটে গড়নও নয়, আবার মোটাও নয়। ঢ্যাঙাও নয়, তাই বলে বেঁটেও বলতে পারবে না কেউ। রংটা এখন তামাটে দাঁড়িয়েছে, তবে সেটা যে একদা ফরসাঘেঁষা ছিল, তা দেখলেই বোঝা যায়। চুলেও বিশেষ পাক ধরে নি, শুধু বুকের চুল, আর দাড়িতে পাক ধরেছে। চুল এখনও অনেক কাঁচা, ঈষৎ কোঁকড়া। টাকও ধরে নি। অর্থাৎ বৃদ্ধের দলে ফেলা যায় না কোনমতেই।

আরও বয়েসের হিসেব শুনে অবাক হতে হয় ওর কর্মশক্তি দেখলে। বিশ্বাস হয় না যে অত বয়েস হয়েছে। বিয়ের মাস পড়লে এক-একবার টানা হয়ত পনেরো-ষোলদিন কাজ ক'রে যায়, দিনে রাতে বিশ্রাম নেয় না। রাত নটা-দশটায় এক বাড়ির পালা শেষ ক'রে, সেই হাতা বেড়ি নিয়েই অন্য বাড়ি চলে যায়, কুটনো শেষ ক'রে হয়ত ঘণ্টাখানেক একটু কোমরটা টান ক'রে নেয়, আবার চারটে বাজতেই উঠে চান সেরে, উনুনে আঁচ দিয়ে শুরু ক'রে দেয় যজ্ঞির রান্না। কোথাও বা বেলা তিনটে থেকে এসে পান্তুয়া দরবেশে হাত দেয়। সারতে সারতে রাত দেড়টা দুটো, তখন কুটনো আছে—কোমর ছাড়ানোরও অবসর পায় না। জল খাওয়ার পাট নেই, দুপুরে শুধু দুটি ভাত পেলেই খুশী, বাকী সমস্ত সময়টাই চা আর বিড়ির ওপর দিয়ে কেটে যায়, তাও খুব একটা বেশি নয়, দু'-তিন ঘণ্টা অন্তর একটু চা, আর ফাঁক পেলে একটা বিড়ি।

ওর সঙ্গী বা শাগরেদ—অল্পবয়সীরাও এত খাটুনি পারে না। টানা তিনটে দিন কাজ করলেই ভেঙে পড়ে, কাজেই অনুচর-ঠাকুর বা যোগাড়ে পাল্‌টাতে হয়, কিন্তু কেশব ঠাকুর ছুটি পায় না। নেহাত কাজ না থাকলে বিশ্রাম। দেশ থেকে স্ত্রী চিঠি পাঠায়, চালে খড় দিতে হবে, জমির ফসল নিয়ে ঝগড়া কিংবা কারও অসুখ। সে চিঠির উত্তর দেয় না। তেমন বুঝলে, বড় ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেয়। দেশ মেদিনীপুর, কিন্তু উড়িষ্যার ধার ঘেঁষে। যেতে আসতে দুটো দিন, সেখানে গিয়ে কি ঝঞ্ঝাটে পড়ে তার ঠিক নেই। মাঝখান থেকে এখানের রোজগারটা মাটি, বাঁধা ঘর ছুটে যাবে হয়ত। এখন পনেরো টাকা রোজ হয়েছে ওর, খুব পুরনো বাবুরা হয়ত কিছু কম দেন, তাও বারোর কম তো নয়। তেমন বাড়িতে কখনও-সখনও নতুন কাপড়ও পাওয়া যায় এক-আধখানা। লগনসার বাজারে দেশে গিয়ে যদি এক মাস আটকে যায়—অন্তত চারশোখানি টাকা লোকসান। সে জায়গায় দেশে যাওয়া মানেই তো খরচা। ও যা পারে ছেলেই করুক। ওদেরই তো দেখতে হবে একদিন, সেদিনেরও বেশি দেরি নেই। এমনিও ছেলেটা এখনকার হাওয়া পেয়েছে, তারপর দুদিন রাত জাগতে হলেই ব্যাটা বলে, 'আমার রেস্ট হচ্ছে না একেবারে, এমন করলে শরীর টিকবে কেন ?'

আরে, এই ক'রেই তো কেশবের এত কাল কাটল। এই কলকাতাতেই এক ভদ্রলোকের অন্নপ্রাশনের রান্না রেঁধেছে, অনন্ত ঠাকুরের শাগরেদ হিসেবে। তাঁর পৈতেতে রেঁধেছে, সেবার সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে, তারপর বিয়েতে, আবার সেদিন তাঁর শ্রাদ্ধে রেঁধে এল। মাত্র পঞ্চাশ বছরে মারা গেলেন ভদ্রলোক। কেশব মনে করে, আর দশ বছর পরে মারা গেলেও ওকেই এই কাজ করতে হত।

অবশ্য হ্যাঁ, একেবারে যে দেশে যায় না তা নয়। সাধারণতঃ ভাদ্র মাসে পনেরো-বিশ দিনের জন্যে যায় ফি বছর—যখন কাজকর্ম বিশেষ থাকে না। তাও ছেলে-ভাইপোকে তালিম দিয়ে রেখে যায়। বলা তো যায় না, কোন পুরনো বাড়িতে যদি শ্রাদ্ধশান্তি কি অন্নপ্রাশন লেগে যায়! বাঁধা বাড়িতে অন্য ঠাকুর ঢোকা মানেই তো লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়া!

এইভাবেই এই দীর্ঘকাল চলে আসছিল। ষাট বছর ধরে এই কাজ ক'রে আসছে কেশব, কখনও কোন অসুবিধা কি ক্লান্তি বোধ করে নি, হঠাৎ আজ এ কী হ'ল তার!

কোথায় যেন কী একটা গণ্ডগোল বেধেছে মাথায়—শরীর আর বৃত্তি দুটোর মিলিত ইঞ্জিনে কোথায় একটা বড় রকমের ভাঙন—একটা কি দু'-তিনটে নাটবলটু ক্ষয়ে আলগা হয়ে কিংবা খসে পড়ে গেছে। গোটা ইঞ্জিনটাই অকেজো হয়ে পড়েছে। বুঝি বা বয়লারটাই ফুটো হয়ে গেছে। শুধু শরীরই ভেঙে পড়তে চাইছে না—মনে হচ্ছে, মাথাতেও কিছু ঢুকছে না আর। শরীর আর মন দুই-ই জবাব দিয়েছে এবার।

এমন অবসাদ, এমন ক্লান্তি তো কখনও অনুভব করে নি। শরীর? শরীরের কথা তো কখনও ভাবারই দরকার হয় নি দীর্ঘ এই কর্মজীবনে। এক-আধ দিন পেটের গোলমাল, কি একটু-আধটু জ্বর—সে কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তার জন্যে হয়ত কালেভদ্রে কোনদিন কাজ বন্ধ গেছে—কিন্তু সত্যি-কারের ভেঙে পড়া যাকে বলে—তা কখনও বোধ করে নি।

ভাবেও নি কখনও। জরা মৃত্যু কোনটার কথাই না। ধরেই নিয়েছিল, এই সাঁড়া খুন্তি হাতা হাতে থাকতেই একদিন জীবনের চাকাটা বন্ধ হয়ে যাবে,

শরীরের কথাটা কোনদিনই ভাবতে হবে না।

কিন্তু আজ যেন সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল!

ছেলেটা অমন হঠাৎ মরে গেল বলে? মরার পর খবর পেল বলে? চোখের দেখাটাও দেখা হ'ল না!

আটচল্লিশ বছরের বড় ছেলেটা!

তবে তাও তো নয়, সে আঘাতটা বোধ করল কই? ব্যাপারটা কি ঘটেছে, ভাল ক'রে বোধহয় বুঝতেও পারে নি।

তা পারলে কি আর অমন কাণ্ডটা ক'রে বসে!

পুত্রশোকের থেকেও বেশি আঘাত, সকলের ওই সহানুভূতির আড়ালে বিদ্রূপের দৃষ্টিটা!

সকলেই তাকে পাগল ধরে নিয়েছে। শোকে পাগল হয়েছে বলে নয়—টাকা টাকা ক'রে দীর্ঘকাল একটানা পরিশ্রমের ফল ধরে নিয়েছে ওরা। কাজ আর টাকা, কাজ আর টাকা—এই ক'রেই কেশব ঠাকুর পাগল হয়ে গেছে—এই কথাই নিশ্চয় বলাবলি করছে ওরা।

শিবুই খবরটা নিয়ে এসেছে দেশ থেকে। কেশবের দূরসম্পর্কের ভাইপো, ছেলে কাশীনাথের খুব বন্ধুও। টানা এতটা পথ এসেছে শুকনো মুখে, উদ্‌ভ্রান্তের মতো। বোধহয় পথে এক ভাঁড় চাও খায় নি।

কেশবের সামনে আছড়ে পড়ে যখন খবরটা ভাঙল—তার আগে থেকেই 'গুম্‌' হয়ে বসেছিল কেশব, সেই সকাল থেকেই। শিবু কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল কেমন ক'রে দুদিনের জ্বর আর পেট ফেঁপে মরে গেছে কাশীনাথ, ভাল ডাক্তার ডাকারও সময় পাওয়া যায় নি। খানিকটা ফ্যালফ্যাল ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেছে, 'তাই তো, ইদিকে তো আর দেরিও নেই। উয্যুগ-সয্যুগ তো আছে। নমো নমো ক'রে সারলেও কোন্ না দেড়শো লোক হবে, গেরামে কেশব ঠাকুরের নাম আছে, তার ছেলে—না, দেড়শোর কমে সারা যাবে না। হরিদাস, কাগজ পেনসিল নাও তো একটা। লেখো—ময়দা ষোল কেজি, ডালডা ঘি আট কেজি, ধোঁকার ডাল—দেড় মটর দেড় ছোলা—মোট তিন কেজি, আলু—'

হরিদাস কিছুই লিখছে না দেখে, বিরক্ত হয়ে মুখ তুলে চাইতেই নজরে

পড়েছে কেশবের সকলের স্তম্ভিত অবস্থা আর বিস্ময় ও ভয়-মেশানো দৃষ্টি। কিছুটা অনুকম্পা, কিছুটা উদ্বেগ—তার আড়ালে ওই—ধিক্কার।

জীবনে রোজগারটাই সব হ'ল!

কাজ কাজ ক'রে লোকটা সত্যিই পাগল হয়ে গেছে!

আহা, বেচারী!

এই ওদের মনের ভাব।

তখন আস্তে আস্তে মাথায় ঢুকেছে ঘটনাটা। এ অপর কারও শ্রাদ্ধের বায়না নয়—এ মৃত্যু ওর ছেলের। বড় ছেলের। ওর বৃদ্ধ বয়সের ভরসা, দেশ পরিবার সকলের ভার যার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এই কাজ নিয়ে আছে। যার ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ওর চোখ বোজার কথা। সেই ছেলেই চলে গেছে।

ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

ও যে কি করেছে—ভীমরতি কেলেঙ্কারি—ভীমরতি ছাড়া কেশবই বা কি বলবে—এটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রবল একটা ঘৃণা আর ধিক্কার ওর গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠেছে। ধিক্কার আর ঘৃণা নিজের ওপরই।

তারপরই, কোন দিকে না চেয়ে, কারও সঙ্গে কথা না বলে, এক রকম ছুটে চলে এসেছে একেবারে গঙ্গার ধারে, এক পাশে কাদার ওপরই বসে পড়ে ভাবছে, সেই থেকেই ভাবছে—এ ওর কি হ'ল! কেন হ'ল!

তাহলে কি ওরা যা ভাবছে, সেইটেই সত্যি?

কাজ আর টাকা—এই ধ্যানজ্ঞান ক'রে ক'রে মাথার মধ্যে আর কিছু নেই, আর কিছু ঢুকছে না! কখনও ছুটি নেয় নি, কখনও অন্য কারও কথা, অন্য কোন কথাই ভাবে নি, তার ফলেই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল—সত্যি সত্যিই পাগল হল ও!

কিন্তু—তাই বা কেন?

এ অবস্থা তো দুদিন আগেও ছিল না। এই পরশু থেকেই—না তার আগের দিন? খড়দার এই বায়না নিতে গিয়েই তো কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। যে মাথাতে রান্না, ফর্দ আর টাকা ছাড়া কিছু ঢুকত না—সেই মাথাতে অন্য একটা ঢেউ, সম্পূর্ণ নতুন, কখনও যে কথা ভাবে নি, সেই ঢেউ

এসে লাগল হঠাৎ। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল।

যাঁর বাড়িতে কাজ, তিনি নাকি মস্ত একজন বড় কারবারী, ক্রোরপতি। বাবা ছিলেন সামান্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, কে এক কুঞ্জ চাটুয্যে—তাঁর কিছুই ছিল না, যা করেছে এই ছেলেই। এক পুরুষে।

এসব পরে শুনেছে কেশব। বাবুটি এসে সেদিন বায়না করে যাবার পর। এক এক লোকের মুখে এক এক কাহিনী।

কলকাতায় মস্ত বড় ফ্ল্যাটবাড়ি, পাটনায় বাড়ি, মালদায়, দিল্লীতে। কোথায় কখন থাকেন, তার ঠিক নেই। সম্প্রতি মার মতো এক পিসীর পীড়াপীড়িতে খড়দার পুরনো ভাঙা বাড়ি সারিয়ে নিয়েছেন—নতুনই করে নিয়েছেন বলতে গেলে, খোল ও নলচে দুই-ই বদলে।

এ হেন অসিত চাটুজ্যে নিজে এসেছিলেন, ঢাউস বড় এক বিলিতী গাড়িতে চেপে। খুঁজে খুঁজে হাটখোলায় সরু গলির এই বস্তির ঘরে।

শেষ গলিটায় সে গাড়ি ঢোকে নি। মোড়ে দাঁড় করিয়ে হাঁকডাক ক'রে জানতে চেয়েছিলেন, 'কেশব ঠাকুর কার নাম ? হালুইকর বামুন ? একটু বয়েস হয়েছে ?'

ভাগ্যক্রমে কেশব ঘরেই ছিল। শশব্যস্তে বাইরে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়েছে।

অশৌচের অবস্থা বাবুর। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গোঁফ, পুরু চশমার মধ্যে দিয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টি হেনে বলেছেন, 'তুমিই কেশব ঠাকুর ? যতটা বয়েস শুনেছিলুম, ততটা তো মনে হচ্ছে না ?'

কে একজন পাশ থেকে বলেছে, 'বাবু, ও বর্ণচোরা আম, কমসে কম আটাত্তর বছর বয়েস হয়েছে।'

'অ। তা ভাল, শোন, সামনের বেস্পতিবার আমার পিসীমার শ্রাদ্ধ। এই পিসীমাই আমার মা, দু বছর বয়েস থেকে মানুষ করেছেন। আমিই শ্রাদ্ধ করব। তিনিই মরবার আগে বলে গেছেন, তোমাকে যেন রান্নার ভার দেওয়া হয়। তা দ্যাখো, পারবে তো ? প্রায় চারশোর মতো লোক !'

সেই লোকটিই বলেছে, 'চারশো লোকের রান্না ওর কাছে কিছু নয়, ছেলেখেলা। ছ-সাতশো লোকের রান্নাও ও অক্লেশে রেঁধে দেবে।'

এবার কেশব প্রশ্ন করে, 'তা নিশ্চয় এর আগে আপনার বাড়ি কাজ করেছি, নইলে আপনার মাঠাকরুন জানবেন কেমন ক'রে ?'

'না, তা মনে হয় না। কি জানি, কী করে জানলেন ? আমার পৈতে বিয়ে সব বিদেশে বিদেশে হয়েছে। পৈতে মালদায় মামার বাড়ি, বিয়ে কাশীতে, তখন আর বাবার আসার অবস্থা ছিল না। ছেলেদের ভাত পইতে সব কলকাতাতেই হয়েছে বটে, তা সে সব ক্যাটারাররাই করেছে। এবারেই পিসীমা বিশেষ ক'রে বললেন, তাই। ঠিক আছে, তুমি চারশো লোকের মতো ফর্দ তৈরী রেখো। ডাল, কুমড়োর ছক্কা, ছানার ডালনা, ধোঁকা, কপি, আলু-বখরার চাটনি। এদিকে দরবেশ, পান্তুয়া। সন্দেশ আমি বড় দোকানে অর্ডার দোব। আগের দিন গিয়ে থাকবে, যোগাড়-যাগাড় সব তোমাকে ক'রে নিতে হবে। মিষ্টি করবে, সে সব ব্যবস্থাও তোমার। দেশ হলে কি হবে, বলতে গেলে আমি এখানে বিদেশী। আমার অবসরও নেই। কাল আমার লোক এসে ফর্দ নিয়ে যাবে এমনি সময়।'

অসিতবাবুর চলে যাওয়ার পর থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে গিছল কেশব। কারও কথাই যেন ভাল ক'রে শুনছে না, পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করলে একটার উত্তর দিচ্ছে।

খড়দা। চাটুজ্যে। এর সঙ্গে কী একটা যোগাযোগ আছে ওর জীবনে ? মস্ত বড় একটা যোগাযোগ।

কী যেন। আবছা আবছা মনে পড়ছে—আর তাতেই, যেন অকারণেই, ভেতরে ভেতরে কী একটা তোলপাড় চলছে।

ভাবতে ভাবতে অনেক রাত্রে মনে পড়েছে।

ঠিক তো। তারাও চাটুজ্যে ছিল। হ্যাঁ, বাবা ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। পুরনো বাড়িতে বাস করতেন।

আর শুয়ে থাকতে পারে নি। নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সরু গলি ছেড়ে, সাহাদের আড়ত বাড়ির ফালিপানা রকে এসে বসেছে।

আসলে ওর তখন এই ঘর, এই জীবন, কোনটার কথাই মাথায় ছিল না।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লেগেছে মনে। এমন বোধহয় এতখানি জীবনে কখনও

বোধ করে নি, বড় জামাইটা মারা যাবার খবরেও না।

ও তখন বহু দিন, বহু বছর পিছিয়ে চলে গেছে।

ওর বয়স তখন—কত? চব্বিশ-পঁচিশ হবে।

ওই খড়দাতেই গিয়েছিল বায়না নিয়ে। কিছু দীর্ঘস্থায়ী বায়না। উপলক্ষটাও মনে পড়েছে—নিশ্চয়ই এ সেই বাড়ি—এই অসিত চাট্‌জ্যেরই মায়ের শ্রাদ্ধ।

কুঞ্জবাবু ডাক্তারের পসার খুব একটা না হলেও, কোনমতে সংসার চলবার মতো আয় ছিল—ছিল না বাড়িতে তেমন কোন আত্মীয়স্বজন। অসিতের মামার বাড়ি মালদায়, দিদিমা অতি বৃদ্ধা, মামীমারাও কেউ আসতে পারেন নি। একজনের সবে বাচ্চা হয়েছে, আর একজনের ছেলের টাইফয়েড। কুঞ্জবাবুরও কেউ ছিল না, প্রায় মেয়ের বয়িসী একটা ছোট বোন ছাড়া।

বোনটিরও থাকার কথা নয়, আগের বছরেই তার বিয়ে হয়ে গিছল, কিন্তু বিয়ের দু মাসের মধ্যেই বিধবা হতে, তাকে আবার দাদার কাছে এসে উঠতে হয়। কুঞ্জবাবুর মা-বাবা কেউ ছিলেন না—অলুক্ষুণে অপয়া মেয়ে বলে বোনের শ্বশুররা গয়না কাপড় রেখে বৌকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সেই কারণেই পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে কুঞ্জবাবু এসে অনন্ত ঠাকুরকে ধরেছিলেন, এমন একটি ঠাকুর চাই, যে বাড়ির লোকের মতো সব দিক দেখেশুনে যোগাড়-যন্তর ক'রে নিতে পারবে। লোকজন বেশি হবে না, এ আনন্দের কাজ নয়—তবু, ঘটা না থাক ল্যাঠা তো আছে! একটু ভিয়েনও করতে হবে। আর, একজন থাকবে, নিয়মভঙ্গর পরও দু-একদিন থাকতে পারবে এমন লোক চাই। তবে বেশি খরচ করতে পারবেন না, শ্রাদ্ধের দুদিন অবশ্য ভাল একজন ঠাকুর চাই—বাকী ক'দিনের জন্যে, যদি ছেলেছোকরা তেমন কাউকে পাওয়া যায়, যার খুব খাঁই হবে না, অথচ টেনে কাজ করবে নিজের মতো ক'রে। উনি একটা বুড়ো লোক ঠিক করেছেন—রান্নার লোক। তবে সে আসবে কাঁথি থেকে। দু-চারদিন দেরি হবে, সে না পৌঁছনো পর্যন্ত এই লোকটি থাকবে।

সব খুলে বলে উৎসুক মুখে চেয়ে ছিলেন অনন্তর মুখের দিকে।

অনন্ত সঙ্গে সঙ্গেই কেশবের নাম করেছিল। বলেছিল, 'ছেলেমানুষ, বেশী

টাকার কামড় করবে না, অথচ রাঁধে ভাল, খাটতেও পিছপা নয়। কমলাকান্ত দু'দিন সঙ্গে থাকবে, তবে সে ভিয়েন আর শ্রাদ্ধর রান্না সেরে চলে আসবে। কেশবকে আপনি অক্লেশে সাত-আট দিন আটকে রাখতে পারবেন।'

সেই মতোই ছিল কেশব।

ডাক্তারের বোন সুধাকে দেখেছে ও সেই প্রথম দিনই। পনেরা-ষোল বছরের মেয়ে, সুন্দরী না হ'লেও সুশ্রী চেহারা, শান্ত আর হাসিখুশী, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। খেতে ভালবাসে, সেটা ভোরে দরবেশ পাকাবার সময়ই টের পেয়েছিল কেশব। অত ভোরেই উঠে ভাইপোকে কোলে ক'রে এসে জামরুল গাছে ঠেস দিয়ে দরবেশ পাকানো দেখছিল, কিছুক্ষণ পরে বলেছিল, 'তোমাদের দরবেশের বেশ খোশবয় বেরিয়েছে বাপু, কী বলব, অন্য বাড়ি তো খেয়েছি, এমন ভাল গন্ধ পাই নি।'

তখন কমলাকান্ত ছিল না, চান করতে গিছল পুকুরে, কেশব আর একজন যোগাড়ে বসে পাকাচ্ছিল, কেশব বলে বসল, 'দুটো খাবে টাটকা? খাও না!'

'না না, ধ্যেৎ। এই সাত সকালে কেউ গেলে না। কী যে বলো—'

লাল হয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু গতিতে তেমন দ্রুততা ছিল না। সেটা লক্ষ্য করেই কেশব জোর করেছিল, 'তাতে কি হয়েছে। খাও না। চেখেও তো দেখতে হয় কাউকে। বেশি নয়, দুটো খেয়ে যাও। কেউ তো এখনও ওঠে নি. দেখতেও পাবে না।'

আরও দু-একবার বলতেই রাজী হয়ে গিছল সুধা।

দুটো নয়, পুরো চারটেই দিয়েছিল কেশব। খেতে খেতে খুশী হয়ে চলে গিছল।

তবু তখনও অত বোঝে নি কেশব।

সুধা যে বিধবা তা বোঝার কথাও নয়। এ বয়েসে তো বিয়েই হয় না আজকাল। কেউ বলেও নি, অত লক্ষ্যও করে নি। বেশ ভাল মেয়েটা, সরল, সপ্রতিভ, কেমন গিন্নীবান্নীর মতো ভাইপোটাকে মানুষ করছে—এইটুকুই চোখে পড়েছিল। ভাল লেগেছিল কেশবের।

ব্যাপারটা জানল নিয়মভঙ্গের দিন।

সেদিন আর কেউ ছিল না। কেশব একাই সব রেঁধেছে। মোট জনাদশেক লোক, এই পাড়ারই ক'জন, তার জন্যে দুজন লোকের দরকারও ছিল না। বাইরের উনুনও জ্বালা হয় নি, রান্নাঘরেই সব হয়েছে। বুড়ো চাকর ছিল একটি বনমালী বলে, সে-ই একটু-আধটু যা যোগাড় দিয়েছে, তাও তার মাথার ওপর বিস্তর বাইরের কাজের ভার ছিল, বাড়ির অন্য কাজ তো আছেই। একটা ঠিকে ঝি রাখা হয়েছিল, সে শুধু বাসন মেজে জল তুলে চলে যায়।

রান্না শেষ করে পুরুষ ক'জনকে খাইয়ে কেশব নবনীবাবুদের পুকুরে চান করতে গিছল। সুধা পুরুষদের সঙ্গে খাবে না, সে তো জানা কথাই। খোকাকে কে দেখবে?

চান সেরে এসে সে তাই সহজভাবেই বলেছিল, 'এবার তুমি বসে যাও। তোমাকে গুছিয়ে দিয়ে আমিও খেয়ে নিই।'

'আমার খাওয়া হয়ে গেছে।'

খচ্ করে কানে বাজে কেশবের। গলার আওয়াজটা যেন কেমন একরকম শোনায়।

'হয়ে গেছে? নিজেই নিয়ে নিলে বুঝি? মাছের কালিয়াটা কেমন হয়েছে? ভাল লাগল? ও আমার ইস্‌পেশাল পাক!'

'গন্ধ তো খুব ভালই বেরিয়েছিল। ও বাড়ির ভজন কাকারাও তো খুব সুখ্যেত ক'রে গেলেন।'

'তার মানে? তুমি খাও নি?'

'আমি যে বিধবা।' আস্তে আস্তে বলে সুধা।

'তুমি—তার মানে? তোমার বিয়ে হয়ে গেছে এরই মধ্যে?'

'ওমা, বিয়ে না হলে আর বিধবা হবো কেমন ক'রে? এই গত বোশেখেই। আষাঢ়ে সব শেষ। আর এরই মধ্যে কি? আমার এখন সতেরো চলছে।'

'তা হলেই বা বিধবা। এই বয়সে—' উত্তেজিত হয়ে ওঠে কেশব, 'ছেলেমানুষ, ক'দিনই বা বরের ঘর করেছ? এই বয়েসে তাই বলে মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবে?'

'আমি যে বামুনের মেয়ে কেশবদা, বামুনের ঘরের বিধবা। আমাদের ঘরে ইস্তিক জাতের মতো বিধবারা কেউ মাছ খায় না—তা যত কম বয়সেই বিধবা

হোক। আমার দাদার কি আর মনে লাগে নি, বলতে গেলে বাপের বয়িসী দাদা, উনিও তো আমার জন্যেই মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছেন। নিহাৎ আজ নিয়মভঙ্গ, মুখে একটু দিতে হয়, তাই একবার বসেছিলেন সবার সঙ্গে।'

হঠাৎ যেন বুকের মধ্যেটা কেমন মুচড়ে উঠল কেশবের। এর আগে কোন বাবুদের বাড়ির মেয়ে ওকে দাদা বলে নি। ওকে কেন, বুড়ো বুড়ো ঠাকুরদেরও বলতে শোনে নি—সেই জন্যেই কি?

সে খপ করে সুধার দুটো হাত চেপে ধরে বললে, 'তা হোক, কেউ কোথাও নেই, কেউ দেখতে আসছে না, তুমি দুখানা মাছ এখেনে দাঁড়িয়ে খেয়ে যাও, আমার মাথার দিব্যি।'

'না না, ছিঃ! ওসব কথা বলতে নেই।'

ক্ষীণ কণ্ঠে বলে সুধা। কিন্তু হাতটা টেনেও নেয় না।

'না, তা হবে না।' চুপিচুপি বলার মধ্যেই গলায় জোর দেয়, 'আমি রাঁধুনী বামুন হলেও ভাল বামুনের ছেলে, তিন সন্ধ্যে গায়িত্রী করি। আমি বলছি—এই পৈতে আমার গলায়—ওতে যদি কোন পাপ হয় আমার হবে। এই নারায়ণের নাম ক'রে বলছি, তোমার কোন পাপ হবে না। খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি, নইলে আমিও আর কোন দিন মাছ মাংস মুখে তুলতে পারব না।'

খেয়েছিল সুধা। এদিক ওদিক চেয়ে পাতায় করে নিয়ে দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুখানা ইলিশ, তিনখানা কালিয়ার মাছ খেয়েছিল।

খাওয়া শেষ ক'রে সকৃতজ্ঞ চোখে কেশবের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বলতেও গিয়েছিল কিন্তু পারে নি, ওর চোখে চোখ পড়তেই কেঁদে ফেলেছিল, দু'চোখের কূল ছাপিয়ে গাল বেয়ে জল ঝরে পড়েছিল সুধার।

ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে।

এর পর আরো পাঁচ-ছদিন থাকতে হয়েছিল কেশবকে। রাতদিনের সে রান্নার লোক না এসে পৌছনো পর্যন্ত কুঞ্জবাবু ছাড়েন নি। এবং এ ক'দিনই দিনে নয়—মাছ ভেজে কি শুখো ঝাল ক'রে লুকিয়ে রেখে দিত কেশব, রাত্রে সবাই ঘুমোলে কাগজে জড়িয়ে নিয়ে বাগানের দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে অন্ধকারে জানলা গলিয়ে দিয়ে আসত।

এ সবটাই স্নেহ আর করুণা, এই ভেবেছিল কেশব। অন্য কোন দূর-প্রসারী ফলের কথা মনে হয় নি। অত জানতও না, এর মধ্যে দোষের কিছু থাকতে পারে তাও মাথায় যায় নি।

ঐটুকু কচি মেয়ে, ফুলের মতো নিষ্পাপ, সরল, এই বয়েসে সব রকম সংসারসুখ থেকে বঞ্চিত হ'ল—একটু মাছও খাবে না!

এ রীতিমতো অবিচার—কেশবের মনে হ'ত। এক রকমের অত্যাচার।

কিন্তু, ও-পক্ষেরও কিছু ভাবার থাকতে পারে, এর জন্যে একটা বিপুল কৃতজ্ঞতা জমা হচ্ছে—সেটা হয়ত ভাবা উচিত ছিল।

যেদিন চলে আসবে, নতুন বুড়ো ঠাকুর পৌঁছে গেছে—তার আগের রাত্রেই সেটা প্রথম বোঝা গেল।

টানা ঘেরা দালান, তারই এক প্রান্তে ভাঁড়ার ঘরের সামনে শুতো কেশব। সামান্য বিছানা, একটা আধময়লা পুরনো মশারি, তবে এমনি বিছানাতেই তো সে অভ্যস্ত।

কিন্তু, তবু কে জানে কেন, সেদিন কেশবের ঘুম আসে নি। মেয়েটার কথাই ভাবছিল। কী জীবন, কত দিন আরও বাঁচবে—এইভাবে সবরকমে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে!

জেগেছিল বলেই প্রায় নিঃশব্দে কেউ দরজা খুললেও সে শব্দ ওর কানে গিছল। তবে, কে খুলল তা উঠে দেখার আগেই সুধা ওর মশারির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আজ আর কোন লজ্জা কি সঙ্কোচ নেই তার, একেবারে ওকে জড়িয়ে ধরে কানে মুখ রেখে বলেছিল, 'তুমি কাল চলে যাবে, আজকের এ মাছ আমি এমনি খাবো না, তুমি মুখে দিয়ে পেসাদ করে দিলে তবে আমি মুখে তুলব!'

কী যেন বলতে গেল কেশব, সুধা ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'কালই তো শেষ, আর হয়ত জীবনে দেখাই হবে না, তোমার পায়ে পড়ি—এই কথাটা রাখো, 'না' ব'লো না। তুমি দেবতা, তোমার পেসাদ খাওয়া আমার পুণ্যি!'

প্রসাদ করে দিতে হয়েছিল বৈকি!

সেই সুধার শ্রাদ্ধে রান্নার বায়না নিল সে।

যে সুধা এই দীর্ঘকাল তাকে মনে করে রেখেছিল।

হয়ত মনে মনে সত্যিই তাকে দেবতার আসনে রেখে পূজো করেছে নিত্য!

প্রায়শ্চিত্ত

আপনাদের মধ্যে অনেকেই দেখেছেন তাকে। বিশেষ যারা কলকাতার দক্ষিণে থাকেন বা যাতায়াত করেন। অবশ্য মহিলাটি কখনও এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না, কিছুদিন দেখেছিলাম গোল পার্কের মোড়ে একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়াতে, কিছুদিন গড়িয়াহাট মার্কেটের সামনের গাড়ি রাখার জায়গায়, একদিন হঠাৎ দেখলাম আলিপুর আদালতে; শিয়ালদা সাউথ স্টেশনেও দেখেছি আগে আগে। শুধু দেখি নি কখনও কালীঘাট মন্দিরে। বোধ হয় ওটা তার আভিজাত্যে বাধে, খুবই নিচে নামা মনে হয়।

হ্যাঁ, আভিজাত্যই।

তাকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সহজে ভুলতে পারবেন না। থান কাপড় পরা—সেটা প্রায়ই ক্ষারে কাচা হয় তা দেখলেই বোঝা যায়—বয়স ষাটের কাছাকাছি, এদিকে বা ওদিকে এক-আধ বছর ধরা যেতে পারে,—মাথায় মাফিকসই ঘোমটা, কেমন একরকমের আবেগগাঢ় কণ্ঠে বলে, 'বাবা দয়া ক'রে আমাকে একটা পয়সা দিয়ে যাবেন!'

একে তো গলাতেই যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং আভিজাত্য, ঠিক এরকমের গলা খুব বড় অভিনেত্রীরা কোন প্রেমের বা চিরবিয়োগের দৃশ্যে কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলেন, তাও সবাই বোধহয় পারেন না; তার ওপর ভিক্ষার ভঙ্গীটা, সে আরও একক, আরও অনন্য। ভিক্ষা তো নয়ই, সাধারণ প্রার্থনা ও আদেশের মাঝামাঝি যদি কোন শব্দ থাকে, (ইংরেজীতে কম্যাণ্ড বললে কি সেটা বোঝায়? না, তাও না) তাই। অনেককে দেখেছি কেমন যেন থতমত খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে পকেট থেকে বা ব্যাগ খুলে পয়সা বার ক'রে দিচ্ছেন। ভিখিরী

কি কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে ঠিক বুঝতে না পেরে।

আমরা, এই দক্ষিণ দিকের লোকেরা—যারা ডায়মণ্ডহারবার তথা লক্ষ্মী-কান্তপুর বা বজবজ ক্যানিং লাইনে যাতায়াত করি, এই ধরনের ভিক্ষা আরও দেখেছি। বিখ্যাত উকীল রাধেশ্যাম সিংহ স্বদেশী ইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে (কসবা চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল, পরবর্তী কালে) ট্রেনে ট্রেনে এক পয়সা ক'রে ভিক্ষা চাইতেন। তার বেশি নিতেন না, কম নিতে আপত্তি করতেন না। অর্থাৎ আধলাও নিতেন হাসি মুখে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, প্রশান্ত অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারো মাস পরনে একটি খদ্দরের খাটো ধুতি ; উড়ুনি গায়ে, খালি পায়ে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতেন। তাঁর ভিক্ষাকেও কেমন যেন মনে হ'ত এটা প্রার্থনা নয়, আদেশ। বড় জোর কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের অনুরোধ বলা যায়।

এ মেয়েছেলেটির ভিক্ষা করাও কতকটা এই রকম। সেইজন্যেই ওকে দেখলে রাধেশ্যামবাবুর কথা মনে পড়ত।

অনেক বারই আমার কাছে চেয়েছে এমনি ভাবে। আর একটি বৈশিষ্ট্য যা চোখে পড়েছে—কখনও কোন মেয়েছেলের কাছে ভিক্ষা চাইতে দেখি নি। অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। একটি গাড়িতে মহিলারা বসে আছেন হয়ত, সেটা এড়িয়ে গিয়ে পাশের গাড়ির ভদ্রলোকের কাছে হাত পেতেছে—এমন বহুবার দেখেছি।

কৌতূহল হ'ত খুবই। কিন্তু স্থান ও কাল সে কৌতূহল নিবারণের পক্ষে অনুকূল নয়। বাজারের সামনে কি পাঁচ রাস্তার মোড় কিংবা কোর্টের সামনে—যখনই দেখেছি তখন চারিদিকে ভিড় ও ব্যস্ততা। আমারও সময়াভাব। সকালে গাড়ি রেখে বাজারে ঢুকেছি কিংবা বাড়ি ফেরার পথে গোলপার্কে খাবার কিনতে গেছি— কোনটাই গল্প করার মতো অবস্থা নয়। সময়ও নেই, আর কোথায়ই বা করব।

একদিন সে সুযোগ মিলে গেল। হঠাৎই।

গাড়ি ছিল না, রাত্রে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাদার্ন এভিনিউ ধরে হাঁটছি, রাত তখন নটা হবে কি আর কিছু বেশি—দেখলাম সে মহিলাটিও (মহিলা ছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে ?) ক্লান্ত অবসন্ন ভাবে আমার

উল্‌টো দিকে হাঁটছেন, অর্থাৎ কালীঘাটের দিকে। খুবই ক্লান্ত, পা যেন অবশ হয়ে আসছে, কোনমতে টেনে টেনে চলছেন, পথের আলোয় যেটুকু দেখলুম—মুখও খুব শুকনো, চোখে বিশ্বের শ্রান্তি।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল—কিছুক্ষণ আগেই আকাশের দিকে চেয়ে একবার মনে পড়েছিল,—আজ একাদশী। শুক্লা একাদশী।

উপোস করেছেন ?

একটু বিস্মিত হয়েই নিজেকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলুম, ভিখিরীরাও কি একাদশী করে ? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, এর তো সবই অদ্ভুত, এর কথা বলার ভঙ্গী, গলার আওয়াজ এবং মাথার ঘোমটা সবটাই সম্ভ্রান্ত ভদ্রবাড়ির মেয়েদের মতো, উপবাসটা এসবের সঙ্গে মানায়।

কেউ কেউ বলেছে এর আগে, আমার আশেপাশে, আমারও যে তা মনে হয় নি প্রথম প্রথম তাও না, 'আজকাল অভিনয় ছাড়া ভিক্ষে চাওয়াও হয় না। তবু, পথ থেকে ভাড়া করা ছেলে এনে যে কান্নার সুর করে না এই ভাল। সে আরও অসহ্য!' এই ধরনের নানারকমের উক্তি। আমারও আগে আগে অভিনয় বলেই মনে হয়েছে—কিন্তু কি জানি কেন, পরে মত বদলেছে। অভিনয় কি এতটা চিরকাল একই রকম থাকতে পারে। কখনও তো চাল-চলনে, আড়াল থেকে অসতর্ক অবস্থায় দেখেও একে সাধারণ ভিখিরী ব'লে মনে হয় নি, অভিনয় করে যারা—কখনও না কখনও তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়েই। 'ছেলেটা মরে যায় বাবা, পাঁচটা নয়া পেলে মুড়ি খাওয়াই' এই ব'লে যে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে, তাকেই কিছু পরে দাঁড়িয়ে বিড়ি খেতে খেতে অন্য ভিখিরীর সঙ্গে গল্প করতে দেখেছি।

এই ভাবে হঠাৎ নির্জনে দেখা হওয়ার আকস্মিকতাটা সামলাতে সামলাতেই মনে পড়ে গেল, এমন সুযোগ আর হবে না, কৌতূহল মেটাতে হয় তো এখনই তার ব্যবস্থা করা দরকার।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে (ততক্ষণে তিনি আমাকে ছাড়িয়ে চলে গেছেন) বললুম, 'মা আজ তো পয়সা চাইলেন না!'

'মা' এবং 'চাইলেন' এই দুটি শব্দে যেন ইলেকট্রিক শ্যকের কাজ করল। চমকে ফিরে চাইলেন মহিলা। তার পর একটু পিছিয়ে, কাছে এসে তেমনি

আবেগঘন গলাতেই (বুঝলুম এইটেই ওঁর স্বাভাবিক স্বর) বললেন, 'না বাবা. ভিক্ষারও স্থান কাল পাত্র আছে বৈকি। তা ছাড়া, যতটা আমার দরকার তা উঠে গেছে, এখন আর মানুষকে বিরক্ত করব কেন ?'

আমি বললাম, 'আজ কি উপোস করেছেন ?'

তিনি ক্লান্ত একটু হেসে বললেন, 'পাপ মুখে আর কি বলি। আজ একাদশী তো। ব্রাহ্মণের মেয়ে—ও সংস্কারটা ছাড়তে পারি নি এখনও।'

অবসর কম, উনিও অপরিসীম ক্লান্ত। যা করতে হবে তা এখনই। এ সুযোগ বার বার মিলবে না। একেবারেই প্রশ্ন করলুম, 'আপনি তো ভদ্র-ঘরের মেয়ে বুঝতেই পারি, কথা শুনে মনে হচ্ছে শিক্ষিতাও—তবে এ কাজ করেন কেন ? কেউ নেই আপনার ? কিংবা অন্য কোন বৃত্তি—মেয়ে পড়ানো-টড়ানো—?'

'আছে বৈকি বাবা, আছে বলেই তো এই ভিক্ষেয় নেমেছি। আর বৃত্তি, তাও ছিল, মেয়েই পড়াতুম। খুব বেশি লেখাপড়া শিখি নি তাই মাইনর ইস্কুলের ওপরে উঠতে পারি নি। তবু তাতে চলে যেত বৈকি। ইচ্ছে ক'রেই সে কাজ ছেড়েছি।'

'আত্মীয় আছে, চাকরিও ছিল, তাহলে—?'

এতটা জেরা করার হয়ত অধিকার নেই। কিন্তু তখন আমার কৌতূহল সামান্য কিছু সমিধ্ পেয়ে আরও দ্বিগুণ মাত্রায় প্রজ্বলিত। প্রশ্নটা আপনিই বেরিয়ে গেল।

তিনি কিন্তু আমার অধিকার নিয়ে তর্ক করলেন না। রাগ করলেন বলেও মনে হ'ল না। শুধু অনেকক্ষণ, প্রায় মিনিট দুই রাস্তার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন, 'বলব। শুনেছি পাপ বা অপরাধ স্বীকার করতে হয়, নইলে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় না। আর বলতে গেলে আপনাকে বলাই ভাল, আপনি আমাকে ভিখিরী জেনেও সম্মান দিয়ে কথা বলেছেন। মা বলেছেন। তাছাড়া, সারাদিন উপবাস ক'রে আছি, মিথ্যা বলব না। এমনিও আমি খুব দরকার না পড়লে মিথ্যা বলি না। ওতে আমার বড় ঘৃণা। তার চেয়েও, অনেক অসুবিধা। একটা মিথ্যা কথা বহু ঝঞ্ঝাট টেনে আনে, বহু মিথ্যাও।'

আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কলকাতার কাছাকাছিই আমাদের বাড়ি, সেখানে এখনও বোধহয় ভিটেটা দাঁড়িয়ে আছে। সব ফেলে চলে এসেছি, আর কোন খবর রাখি নি। কোথায়, তা না-ই বা বললুম। আমার স্বামী যখন মারা যান তখন ছেলের বয়স সাত বছর। লেখাপড়ার মধ্যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া ছিল। আর কোন সঙ্গতি নেই, দেখারও কেউ নেই। যা সামান্য সোনা ছিল—আমার স্বামী ধনী ছিলেন না, বিশেষ কিছু দিতে পারেন নি—সেই সোনা, শেষ পর্যন্ত বাসনকোসন বেচে নিজে একটা পাস ক'রে নিলুম, তারপর লোকের হাতে-পায়ে ধরে ঐ মাস্টারী। তাতেও কুলোত না—পাঁচ টাকা ছ টাকার টিউশানীও করেছি, রাত জেগে ক্যারমবোর্ডের জাল বুনেছি। এ সবই করতে হয়েছে ছেলেকে পড়াবার জন্যে।

'ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল ছিল বাবা। আরও সেই জন্যেই প্রাণপণ করেছি যাতে তার কেরিয়ারটা ভাল হয়। ছেলে নিজের জোরেই মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছিল। স্কলারশিপও ছিল কিছু, বাকীটা আমি ঐভাবে জুগিয়েছি। ভাল ভাবেই এগিয়ে গেছে, প্রতি বছর মেডেল পেয়েছে প্রথম হয়ে। আগে দেশ থেকেই যাতায়াত করছিল, কিন্তু শেষের দু বছর আর চলল না। কলকাতায়, কলেজের কাছে থাকা দরকার। অথচ হোস্টেলে রেখে পড়াবার সাধ্য নেই। তাতেই ঐ ভুলটা ক'রে বসলুম বাবা।'

আবারও একটু চুপ ক'রে রইলেন, বোধহয় স্মৃতির আবেগটা সামলে নিতেই, 'আমার নিজের কেউ নয়। স্কুলের সেক্রেটারী অতি মহানুভব মানুষ ছিলেন, তাঁরই এক বোন থাকতেন পটলডাঙ্গায়—তাঁদের ছোট বাড়ি, ভাড়া করা, বোন ভগ্নিপতি তাঁদের তিনটে ছেলেমেয়ে—তবু তিনিই বলে-কয়ে বোনকে রাজী করালেন, ছেলেটাকে তারা রাখতে রাজী হ'ল। শুধু আশ্রয়ই দিলে না বাবা—খাইখরচাও আমার কাছ থেকে এক পয়সা নেয় নি। দেবার সামর্থ্যও ছিল না আমার—দিতে গেলে ঐ ভিটেটুকু বেচতে হ'ত। তাই, অন্যায় হচ্ছে বুঝেও জোর ক'রে কিছু দিতে যাই নি। এমনিতেই ছেলের অন্য খরচ যোগাতেই তখন প্রাণান্ত হচ্ছে।

'অনেক করেছেন ওঁরা, খাওয়া জলখাবার কম খরচ নয় তো। তাছাড়াও, শেষের দিকে কলেজে যাবার বা কলেজ থেকে ফেরবার সময়ের কোন ঠিক

ছিল না, গেরস্তর পক্ষে সেটা কম অশান্তি নয়। সবই হাসিমুখে সহ্য করেছে। তাও, প্রথমে আমার ছেলেই বলেছিল ওঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েগুলোর পড়াশুনো একটু দেখিয়ে দেবে—কিন্তু তাও পারে নি। সম্ভবও ছিল না। মেয়েটাই বড়, সে তখন বি. এ. পড়ছে, তাকে আর ও কি পড়াতেই বা পারবে।

'আমার সন্দেহ হয়েছিল বাবা, প্রথম থেকেই যে ওরা দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এও স্বাভাবিক, ঘি আর আগুন। তাছাড়া শুনেছি বিলেতটিলেতের দিকে ও তৃষ্ণাটা যখন-তখন যেখানে-সেখানে মেটাবার সুবিধা আছে, এ দেশে অতটা নেই তো। কাছাকাছি যাকে পাবে তাকে দিয়েই সেটা মেটাতে চেষ্টা করে। আমারও বিন্দুমাত্র তাতে আপত্তি ছিল না। ভদ্রলোকের কন্যাদায় উদ্ধার করতে পারলে কিছুটা তবু কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হবে। মেয়েটি দেখতেও খুব খারাপ নয়, শ্যামবর্ণ কিন্তু মুখশ্রীটি খুব ভাল। আর বড় মিষ্টি স্বভাব। ওকে বৌ করতে পারলে আমি খুশীই হতুম, হয়ত সুখীও।

'বাদ সাধল ছেলেই। সে ভেতরে ভেতরে কি করছে তা জানার উপায় ছিল না। কেউ চেষ্টাও করি নি। পরীক্ষায় পাস করার পর কিছুদিন হাসপাতালে কাজ করতে হয়—সে সময়ও ও নিয়মিত এ বাড়ি এসেছে, খেয়েছে, থেকেছেও অবসর মতো। নিজের বাড়ির মতোই হয়ে গেছল।

'কিন্তু হঠাৎই শুনলুম হায়দ্রাবাদে একটা বড় চাকরি পেয়েছে ছেলে, আর ইতিমধ্যে ওর একটি সহপাঠিনী, সেও ঐদিককার মেয়ে, ক্রীশ্চান, তাকে বিয়ে করেছে। সেটা জানলুম, হঠাৎ কর্মস্থানে রওনা হয়ে যাবার পর। চিঠি লিখে জানাল। জানাল যে, আমি চিরদিনই তার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে এসেছি, এটাও যেন করি। সে সুখী হবে, তার কর্মজীবনে সুবিধা হবে—এইটে ভেবেই যেন ক্ষমা করি। পরে একসময় তার স্ত্রীকে নিয়ে সে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবে।

'এই-ই যথেষ্ট আঘাত বাবা। তবু পাষাণে বুক বেঁধেই সহ্য করেছিলুম। কিন্তু আর একটি বড় আঘাতের ব্যবস্থা যে সে ক'রে গেছে, তা তখনও বুঝি নি। সেই মেয়েটা, শ্যামলী নাম, এই খবরে একেবারেই ভেঙে পড়ল। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিনরাত কেবল কাঁদত, কারও সঙ্গে কথা কইত না, কারও

সামনে বেরোত না। তার মা বাবা অনেক বোঝালেন, আমিও গিয়ে যতটা পারলুম সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু মেয়েটা উত্তরও দেয় না, ওঠেও না। কারণটা জানা গেল মাসখানেক পরে যখন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলে। অপঘাত মৃত্যুর পর যে শব কেটে পরীক্ষা হয়—পোস্টমর্টেম না কি বলে—তাতেই জানা গেল শ্যামলীর পেটে ভ্রূণ ছিল, মাস চারেকের একটি বাচ্ছা।

'তার মানে, ওদিকে যখন সেই ক্রীশ্চান মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে, বোধহয় রেজিস্ট্রীও হয়ে গেছে, তখনই এই কাজ করেছে আমার ছেলে। হয়ত আগে থেকেই এ সম্পর্ক ওদের ছিল, ছেলে হয়ত একে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল—তাই খুব সাবধান হবার আর অত দরকার বোঝে নি। নইলে সে ডাক্তার—ও দিকটা কি আর ভাবে নি—কে জানে!

'সেই দিনই বাবা মনের ঘেন্নায় বাড়ি ছেড়েছি। এর পর আর মুখ দেখাব কি ক'রে চেনা লোককে? দেবতার মতো সেক্রেটারী আমাদের—তাঁর অতখানি উপকারের কি প্রতিদানই দিলুম। আর এদের—এদের কী হ'ল বলুন দিকি? লজ্জায় ঘেন্নায় দুঃখে ভদ্রলোক এখানের ভাল চাকরি ছেড়ে, কী একটা অল্প মাইনের চাকরি নিয়ে চলে গেছেন ইন্দোরে—যাতে কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা না হয়।

'আমি আগে ভেবেছিলুম গঙ্গায় গিয়ে গা-ঢালা দোব। তারপর মনে হ'ল —না, তাহলে তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না। ঐ ছেলেকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি, ও বাড়িতে স্থান পাবার—অতটা বিশ্বাসের সঙ্গে আশ্রয় পাবার ব্যবস্থাও আমিই ক'রে দিয়েছি—এর সব দায়িত্বই যে আমার। তাই—এই ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছি। ছেলে নাকি টাকা পাঠিয়েছিল, জানি না—ফেরতই গেছে নিশ্চয়। ইস্কুলের কিছু পাওনা ছিল, পোস্ট আপিসেও কটা টাকা—সব ফেলে চলে এসেছি, ঘরদোর বাসনকোসন সব। ইচ্ছে আছে যদি বাঁচি, বারো বছর ভিক্ষে করার পর গঙ্গার ধারে গিয়ে উপবাস ক'রে মরব, শুনেছি তাতে পাপ হয় না। হাতে কিছু জমেছে বাবা, মিথ্যে বলব না—যদি তাদের কোন ঠিকানা যোগাড় করতে পারি—শ্যামলীর বাবা মার—যাবার আগে বেনামে পাঠিয়ে দিয়ে যাবো।'

আমিও বেশ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলুম।

তারপর বললুম, 'এই যে সব প্রকাশ্য স্থানে ভিক্ষে করেন, আগেকার চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয় না?'

'হয় বৈকি। তবে তারাই আমাকে এড়িয়ে যায় বেশির ভাগ। ভিখিরীর সঙ্গে পরিচয় কি আত্মীয়তা আছে, কে জানাতে চায়। অবশ্য আমার দেশ অন্য দিকে, হাওড়া হয়ে যেতে হয়—সেইজন্যেই আমি এদিকে ভিক্ষে করি বেশির ভাগ।'

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আচ্ছা, চলি বাবা। ভালই হ'ল, এতদিন পরে একজনের কাছে অন্তত মনের বোঝা খানিকটা হালকা করতে পেরে।'

তিনি আবার ক্লান্ত শ্লথ গতিতে কালিঘাটের দিকে চলতে শুরু করলেন।...

বাড়িতে এসে স্ত্রীকে কথাটা বলতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমিও যেমন, তোমাকে বোকা পেয়ে এক আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসল। বোধহয় চেনে যে, তুমি গল্প লেখো। তাই তোমার ওপর টেক্কা নিলে। গ্যাখো গে যাও, ছেলেবৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে হয়ত তাদের বেইজ্জৎ করতেই এখানে এসে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে।'

'তাহলেও তো বলব মহিলা মহীয়সীদের একজন।' আমি উত্তর দিলুম। 'মুখে মুখে এমন গল্প রচনা করা—এক মিনিটের নোটিশে বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। আর তুমি যা বলছ, তাই যদি ঠিক হয়—তাহলে একটা কথা স্বীকার ক'রে নিচ্ছ যে, মহিলা ভদ্রঘরের মেয়ে এবং অসাধারণ তেজ আর মনের জোর। তাহলেও মহীয়সী!'

কিন্তু আমার কেমন আজও বিশ্বাস, ভদ্রমহিলা মিছে কথা বলেন নি!

সুদের সুদ

রমেশ বাহেল যখন মেয়ের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ধার ক'রে মুনেরকার এই ফ্ল্যাটটা কিনেছিলেন তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে সে টাকার সুদ দিতে হবে তাঁকে, আর সে সুদের চেহারাটা এমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে; তেমনি তাঁর মেয়ে বিনোদও কল্পনা করতে পারে নি যে সে সুদেরও একটা মূল্য দিতে হবে একদা এবং সে মূল্য এই ভাবে শোধ হবে।

রমেশ বাহেল বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের অধিবাসী হলেও তাঁদের জীবিকার ব্যবস্থাটা ছিল কাশ্মীরে এবং সেখানেই বছরের মধ্যে ন-দশ মাস কাটত তাঁদের। দেশীয় ভেষজের কারবার, আগে বৈদ্যদের গাছগাছড়া শেকড়-বাকড় সরবরাহ ক'রেই বেশ চলে যেত। কিন্তু এখন বৈদ্যর সংখ্যা গেছে কমে, যাঁরা আছেন তাঁরাও আর ওসব গাছগাছড়ার ঝঞ্চাটে না গিয়ে সোজাসুজি য়্যালাপাথিকে ওষুধ কিনে তাই গুঁড়িয়ে বড়ি করে চালান, তাতে খরচও অনেক কম পড়ে, অথচ কাজও দেয় দ্রুত। তাছাড়া আয়ও বেশি হয়, দশ পয়সা দামের আমাশার বড়ি গুঁড়িয়ে যখন আমহর বটিকায় রূপান্তরিত হয়, তখন রোগীদের কাছ থেকে অনায়াসে পাঁচ আনা এমন কি আট আনাও মূল্য পাওয়া যায় বটিকা প্রতি।

ফলে রমেশের বাবা হরিপ্রসাদের আমলে ব্যবসার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, শেষের দিকে একরকম পুরনো পুঁজি ভেঙে ভেঙেই সংসার চালাতে হত তাঁকে—কারবার থেকে কিছুই আসত না।

রমেশ বুদ্ধিমান লোক। তিনি অন্য নতুন কোন ব্যবসায় যাবার চেষ্টা না ক'রে এরই চেহারাটা দিলেন পালটে। কিছু আয়ুর্বেদীয় পেটেন্ট ওষুধ তৈরী করিয়ে, শিশি ভরে লেবেল এঁটে সোজাসুজি য়্যালোপাথীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লেন। আর ওষুধের জোরেই হোক বা তাঁর প্রচারের জোরেই হোক —দু-একটি ওষুধ বেশ চালুও হয়ে গেল বাজারে।

কিন্তু তাতেই তুষ্ট থাকবার মানুষ তিনি নন। ভাল ডাক্তারকে টাকা দিয়ে কিছু কিছু জোরদার ওষুধের প্রেসক্রিপস্থান করিয়ে নিয়ে—তার সঙ্গে কিছু বা

কবিরাজী ওষুধ বানিয়ে অনেকগুলো ওষুধ পেটেণ্ট ক'রে নিলেন এবং চতুর্দিকের গ্রামে শহরে বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে তার বিজ্ঞাপন লেখাতে লাগালেন। ছাপা পোস্টারের থেকে এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়। কাগজে দিতে গেলে টাকা লাগে, বেশ কিছু টাকা।

হরিপ্রসাদ প্রায় কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, দিল্লীতে সামান্য কিছু জমি ছাড়া। রমেশ সেই জমি বেচে সব টাকাটাই কারবারে লগ্নী করলেন—এবং কিছু পরেই ভুলটা বুঝতে পারলেন।

যদি সত্যিসত্যিই এসব পেটেণ্ট ওষুধ ভালভাবে চালাতে হয়—তাহলে দিল্লীতে একটা ঘাঁটি থাকা দরকার। আর তেমন ঘাঁটি ক'রে কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে গেলে শুধু একটা আপিস ঘর ভাড়া করলেই চলবে না। একটু বাসাও রাখতে হবে।

সেই উদ্দেশ্যেই দিল্লীর এই ফ্ল্যাট কেনা।

ডি. ডি. এ.তে তাঁর এক ভগ্নিপতি ছিলেন পুরণপ্রসাদ বলে, তিনি খুব বড় অফিসার। এমনিও ধনী ব্যক্তি। তাঁকে ধরে এবং কিছু কিঞ্চিৎ 'খরচা' ক'রে এই ফ্ল্যাটটি বরাদ্দ করাতেও দেরি লাগল না।

মুশকিল হ'ল শেষকালটায়—যখন শুনলেন যারা পুরো টাকা নগদ দেবে তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাদের দিয়ে-থুয়ে ফ্ল্যাট বাঁচলে তখন কিস্তির প্রস্তাবকদের কেসটা ভাববেন কর্তারা।

অর্থাৎ সে এখন অগাধ জলের ব্যাপার।

এত কাণ্ড ক'রে—তীরে পৌছে নৌকো ডুববে নাকি। না, তা হবে না। রমেশ শক্ত ক'রে কোমর বাঁধলেন—এ সুযোগ তিনি ছাড়বেন না।

কিন্তু টাকাও অনেক। ফ্ল্যাটের 'শুকো' দরই আটচল্লিশ হাজার টাকা। অর্থাৎ রেজেস্ট্রীর খরচা, জল আলো—এ সব আলাদা। তার মধ্যে রেজেস্ট্রী এখন না করিয়ে নিলেও ক্ষতি নেই, তাছাড়া ডি. ডি. এ'র আটচল্লিশ মাসে বছর—কেউ তাগাদাও দেবে না। কিন্তু জল আলো তো এখনই চাই। তার মানে অন্তত বাহান্ন হাজার দরকার—থোক।

রমেশ গোড়ার দিকে ভেবেছিলেন ধার দেনা করবেন না। ধারের টাকা খটমল বা ছারপোকার মতো বাচ্চা পাড়ে। দেখতে দেখতে সুদ আসল ছাড়িয়ে

চলে যায়। তিনি এমনিই টাকা তোলার চেষ্টা দেখলেন। স্ত্রীর 'জেবর' খুব একটা কিছু ছিল না, মার আর স্ত্রীর গহনা বেশির ভাগই চলে গেছে মেয়ের বিয়েতে —সব বেচেও দশ হাজারের বেশি উঠল না। এ ছাড়া পুরনো কিছু এফ. ডি. ছিল ব্যাঙ্কে, সেও বেশি নয়। শ্রীনগরে এক চিলতে জমি—কিছু দামী পুরনো আসবাব—কিন্তু যতই যা করুন, সব জড়িয়েও ত্রিশের বেশি ওঠানো গেল না।

এবার একটু দমেই গেলেন যেন।

ব্যাঙ্কেও এর মধ্যে গিয়েছিলেন। তাঁরা ঐ পেটেন্ট ওষুধের স্টক-এর ওপর এত টাকা দিতে রাজী নন। ওঁদের পৈতৃক বাড়ি শহরে নয়, গ্রামের দিকে, সেও ব্যাঙ্ক বন্ধক রাখতে রাজী হলেন না।

আর কোথাও কোন উপায় না পেয়েই মেয়ের কাছে গিয়েছিলেন রমেশ।

জামাই সরকারী অফিসে কী সব সাপ্লাই দেয়। তার সঙ্গে একটা ছোট কারখানাও করেছে, মিনি গেজার বা জল গরম করার যন্ত্র তৈরী করছে। সম্প্রতি গাড়ি কিনেছে একটা। মেয়েও কোন্ ইস্কুলে মাস্টারী করে। অর্থাৎ অবস্থা ভালই।

ঠিক জামাইকে বলতে পারেন নি রমেশ, চক্ষুলজ্জায় বেধেছিল, বলেছিলেন মেয়ে বিনোদকেই। এইটেই তাঁর মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল। কারণ জামাইও হয়ত একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করত শ্বশুরের কাছে দলিলের কথা বলতে—মেয়ের তেমন কোন সঙ্কোচের কারণ নেই। সে বলল, 'বাবা, জীবনমরণের কথা তো বলা যায় না, একটা লেখাপড়া করা যাক, সেই সঙ্গে নামমাত্র একটা সুদও ধরে দাও, তা সে যা তোমার মর্জি, সে ফোর পার্সেন্ট—অবশ্য এ সবই জাস্ট একটা ফর্ম, যদি কোন অঘটন না ঘটে তো এর কোন দরকারই পড়বে না, তুমি টাকা দিলে আমি তোমার সামনেই এগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেব। আশা করছি তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে—টাকাটা শোধ দিতেও দেরি হবে না।'

কথাটা একটু খারাপই লাগল কিন্তু তখন আর গত্যন্তর নেই। হাত পেতে নিতেও হ'ল, দলিলেও একটা সই করতে হ'ল। টাকা জমা দেবার দিন কুড়ি বাদে চাবিও পেলেন ডি. ডি. এ. অফিস থেকে।

ঠিক সেই সময় খবর এল, কাশ্মীরে ওঁদের কারখানার কর্মীরা খুব গোল-

মাল করছে। ওঁর ছেলে রাজেশকে গালমন্দ দিয়েছে, একদিন দু-চারটে কিল চড়ও খেতে হয়েছে—তার চেয়েও বড় কথা—তারা অবস্থান ধর্মঘট ক'রে বসে আছে।

তখনই চলে যেতে হল রমেশকে।

তিনি ফ্ল্যাটের চাবি আর হাজার-দুই টাকা জামাইকে দিয়ে জল ও আলোর ব্যবস্থা করতে বলে,—সম্ভব হলে একটা কোলাপ্‌সিবল গেট ও খান তিন চার পাখাও যেন লাগিয়ে নেয়, বেশি যা পড়বে তিনি এসেই শোধ করবেন বার বার সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে—সেই রাত্রের মেলেই রওনা হয়ে গেলেন।

গোলমাল অনেক দূর গড়িয়ে ছিল। ঠিক অতটা আশঙ্কা করেন নি রমেশ। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন ভেবেছিলেন তত তাড়াতাড়ি হয়ে উঠল না। আজ-কাল করতে করতে প্রথম ছাড়া পেলেন যখন তখন মাস ছয়েক গড়িয়ে গেছে, তাও ছেলে ছাড়তে চাইছিল না। তার ভয় বাবুজী চলে গেলেই ওরা আবার নিজ-মূর্তি ধরবে—রমেশই বুঝিয়ে সুঝিয়ে চলে এলেন। বললেন, ব্যবসা বাড়াবার জন্যেই তো এত টাকা ধার ক'রে বাড়ি কেনা। ব্যবসা যত বাড়বে ততই এই ধরনের গোলমালও বাড়তে বাধ্য। এ সবই একদিন তোমাকে একা মোকাবিলা করতে হবে, আমি তো চিরদিন থাকব না। তুমি যদি এত ভয় পাও তো চলবে কি করে?'

ছেলে যে এ কথায় খুব একটা আশ্বস্ত হ'ল তা নয়—নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরেই বা অধিকতর বকুনি খাবার ভয়ে চুপ ক'রে রইল। আর সে তথ্যটা তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে রমেশেরও বুঝতে বাকী রইল না।

ছেলের কথা, এখানের ব্যবসার কথা ভাবতে ভাবতে সারা পথটাই অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তাই একেবারে দিল্লী পৌঁছে প্রশ্নটা প্রথম মনে পড়ল—তিনি এখন কোথায় যাবেন।

খবর যে না রেখেছেন তা নয়। জামাইয়ের কাছে প্রায়ই চিঠি দিয়েছেন তার অপিসের ঠিকানায়। সেও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে। বাড়ির দখল নেওয়া হয়েছে, জল এসেছে, বাতি জ্বলেছে। পাখা আর কোলাপ্‌সিবল-এর ব্যবস্থায়ও কোন ত্রুটি হয় নি।

অর্থাৎ একেবারে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে ওঠারও কোন বাধা নেই। তবে চাবি মেয়ের কাছেই আছে নিশ্চয়। তা ছাড়া এই দীর্ঘ পথ এসেছেন, একটু স্নানাহারের ব্যবস্থারও প্রয়োজন। প্রয়োজন তার পর একটু বিশ্রামেরও। তাই তিনি সোজা অশোক বিহারের পথই ধরলেন, মেয়ে-জামাই ওখানেই থাকে।

ওদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে প্রথম ঘা খেলেন রমেশ বাহেল। দেখলেন একটি মাদ্রাজী পরিবার সেখানে বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে সংসার পেতে বসেছে।

ওঁর বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে তারা পাল্‌টা প্রশ্ন করল, 'আপনি কাকে খুঁজছেন, মিঃ সুদদের ? তাঁরা তো নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে গেছেন। আপনি জানেন না ? আপনি তাঁর ফাদার-ইন-ল বলছেন, তারা ছাড়তেই তো আমরা এ ফ্ল্যাট পেয়ে গেলাম, তাঁদের তিন হাজার টাকা পাগড়ি দিয়ে—'

দারুণ একটা খটকা লাগল রমেশের।

নিজেদের ফ্ল্যাট। সে আবার কি ? মেয়ে ফ্ল্যাট কিনল, বাবা মা জানতে পারল না! এত চিঠি লিখেছে জামাই—সেও তো লিখতে পারত!

তবে কি—!

যে অটোরিক্‌শায় এসেছিলেন তাতেই আবার চড়ে বসে মুনেরকা রওনা দিলেন।

সেখানে পৌঁছে দেখলেন জামাই যে ফর্দ দিয়েছিল কী কী এসেছে সে ফর্দে কোন ভুল নেই, তবে কিছু ছাড় আছে। অর্থাৎ সে সব তো এসেছেই, সে সব ছাড়াও অনেক কিছু এসেছে। মেয়ে-জামাইয়ের সব জিনিসপত্র, পুরো গৃহস্থালীই বলতে গেলে—দুটো ঘর জুড়ে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে বসেছে ওরা, শুধু বাইরের ঘরটাই রমেশের জন্যে খালি রেখেছে, অবশ্য একেবারে খালি নয়, ওঁর সুবিধার জন্যে একটা খাটিয়া, দু-একখানা চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা আছে।

টেলিফোনটাও ঐ ঘরে। তেমনি দরজার সামনের চলনে স্তূপাকার করা জামাইয়ের গেজারের বাক্স, একটা ফ্রীজ। বস্তুত পা বাড়াবার জায়গা নেই কোথাও।

রমেশ ক্রুদ্ধ যত হলেন বিস্মিত হলেন তার চেয়েও বেশি।

বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'এ—এসব কি ?'

মেয়ে বিনোদ বলল, সে তখন স্কুল যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, 'কি আবার,

ওখান থেকে তোমার জামাইয়ের খুব টানাপোড়েন চলছিল, আর নিজেদের বাড়ি থাকতে মিছিমিছি ওখানে ভাড়া গোনারই বা দরকার কি, তাই চলে এলাম!'

'নিজের বাড়ি মানে? এ বাড়ি আমি কিনেছি আমার কারবারের জন্যে—এর মধ্যে তোমরা এসে ঢুকলে চলবে কেন!'

'ঐ তো, তোমার জন্যে বাইরের ঘর রেখে দিয়েছি। থাকবে তো তুমি একা—আপিস ঘর করতে চাও, দু-তিনটে চেয়ার পেতে জনা-দুই লোকের ব্যবস্থাও খুব হয়ে যাবে। তারা তো দিনভর কাজ ক'রে চলে যাবে, রাত্রে তো থাকছে না। বরং টেলিফোনটা রইল, তোমার কাজের তো সুবিধেই হবে!'

রমেশ রাগে প্রায় তোৎলা হয়ে গেলেন।

বললেন, 'শুধু দুটো চেয়ার পেতে দুজন লোক বসালেই যদি চলত তাহলে যথাসর্বস্ব খুইয়ে ফ্ল্যাট কিনতাম না। একখানা ঘর ভাড়া করলেই চলে যেত। বড় ক'রে কারবার ফাঁদব বলেই এখানে আসা। আমার তৈরী মাল এনে রাখতে হবে, কিছু কিছু মাল এখানে তৈরীও করাব—আমার অনেক জায়গার দরকার। এতেই কুলনো মুশকিল!'

বিনোদ বলল, 'মাল রাখার জন্যে ভাবনা নেই, মিঃ সুদ সে ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছেন। আমাদের এই ছাদে কাঠ আর য়্যাশবেশ্‌টাস দিয়ে চালা করিয়ে দেবে, ডি. ডি. এ. অফিসারদের মধ্যে মধ্যে কিছু দিলেই চলে যাবে। সে তোমার এই ফ্ল্যাটের ঘরের থেকে ঢের বেশি জায়গা।'

এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল রমেশের। বললেন, 'তোমাকে এত কর্ত্তাত্তি করতে কে বলেছে শুনি! আমার ফ্ল্যাট আমি যা ভাল বুঝব করব। তোমরা এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না। জাস্ট ক্লিয়ার আউট অফ দিস ফ্ল্যাট!'

শান্ত কঠিন কণ্ঠে বিনোদ বলল, 'আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার অনেক হাঙ্গামা। তুমি তো এখনো আসো নি—তুমিই আর একটা জায়গা খুঁজে নাও। অর্ধেক টাকা তো আমাদের দেওয়াই আছে, বাকী টাকা দিয়ে দিচ্ছি—তুমিই ক্লিয়ার আউট করো।'

'অর্ধেক টাকা মানে! আমি ধার করেছি, সে ধার শোধ করব একদিন না হয় সুদ সুদ্ধই করব। নতুন ফ্ল্যাট খুঁজতে যাবো কেন। আর সেও তো তখন

ঐ টাকাটারই প্রশ্ন উঠবে।'

'ধার করেছ সেটা স্বীকার করছ তো। ধরে নাও এটা মর্টগেজ রেখেছ। আমরা মর্টগেজী-ইন-পজেশনে বলে মনে করো। টাকা শোধ দিলে চলে যাবার কথা চিন্তা করব। এমনিই তো আমার এটা প্রাপ্য। সব বেচে ব্যবসা বাড়াচ্ছ, ছেলেকে এনে বসিয়েছ, সে-ই সব পাবে। আমাদের কি দিলে? ব্যবসা আমার ঠাকুর্দার। তা থেকে আমাদের কি কিছু পাওয়া উচিত নয়।··· হাউ এভার, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে তুমি বিশ্রাম করো, মণিকা স্কুলে গেছে, সে ছুটোর সময় এসে পড়বে। আমাদের মেড্ আছে একটি লতিকা—সে তোমাকে দুটো রুটি ক'রে দিতে পারবে। আচার আছে, ফ্রীজে দহি আছে—খেয়ে নিও।'

এই বলে, আর কোন বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

রমেশ অনেক ঝগড়াঝাঁটি করলেন, কিছু কিছু মিষ্টবাক্যও ব্যবহারের চেষ্টা করলেন। কোন ফল হ'ল না। মেয়ের কাটাকাটা কথা। জামাইকে আড়ালে বুঝিয়ে বলতে গেলেন, তিনি এমনিতেই মিতভাষী, সাহেবদের মতো কাঁধ ঝাকিয়ে নীরবে স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ তার কিছু করারও নেই, কোন বক্তব্যও নেই। যদি কিছু বলতে হয়—মেয়েকেই বলে দেখুন শ্বশুরমশাই।

বেগতিক দেখে স্ত্রীকেও আনিয়ে নিলেন, তিনি অথর্ব মানুষ, বাতে পঙ্গু—তাও বহু কষ্ট ক'রে এলেন। মেয়ের কাছে বিস্তর কান্নাকাটি করলেন, পায়ে মাথা খুঁড়লেন—ফল হ'ল কিন্তু বিপরীত। মেয়েও কড়া কড়া কথা শোনাতে লাগল। সে কিছু অন্যায় করে নি। পৈতৃক সম্পত্তিতে তার অধিকার আছে, তাও তো সে অর্ধেক টাকা দিয়েছে। না দিলে তো এ ফ্ল্যাট বাবা কিনতেই পারতেন না। সে যদি অর্ধেকটা ভোগ করে বাবার কি বলার আছে। বেশ তো, সে লিখে দিচ্ছে যে এই ফ্ল্যাটের অর্ধেক অংশ ওকে ছেড়ে দিলে—অর্ধেক তো তার কেনাই বলতে গেলে—পঁচিশ হাজার টাকা সে দিয়ে রেখেছে—সে আর কোনদিন পৈতৃক সম্পত্তি কি ব্যবসার অংশ দাবী করবে না।

মা রেগে বললেন, 'তাহলে তো আমাদের আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। বাবা মা মেয়ের নামে উচ্ছেদের নালিশ করবে, সেই কি শোভন হবে।

লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবি।'

'কেন পারব না। সম্পত্তির জন্যে যদি বাবা মা মেয়ে জামাইয়ের নামে নালিশ করতে পারে—মেয়ে জামাই তার জবাব দিলেই দোষের হয়ে গেল। জবাবও আমার ভাল তৈরী আছে মা, নেহাৎ রেজেস্ট্রী হয়নি বলে, আর ডি. ডি. এ. ফ্ল্যাট ক বছরের মধ্যে বিক্রী করা যায় না বলেই হ্যাণ্ডনোটের ব্যবস্থা, নইলে অর্ধেক ফ্ল্যাট আমাকে দেবেন এই শর্তেই বাবা টাকাটা নিয়েছিলেন।'

'প্রমাণ করতে পারবি?'

'দেখা যাক।' বিনোদ একটু অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টানল।

এরপর স্ত্রীকে শ্রীনগরে পাঠিয়ে রমেশ কিছুদিন গুম খেয়ে রইলেন। মেয়ের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি অবশ্য বন্ধ করতে পারলেন না। এক বাড়িতে, বিশেষ এক ফ্ল্যাটে থেকে সেটা সম্ভব হয় কি ক'রে—কিন্তু আর কোন সম্পর্ক রইল না, নিজে বাইরে খেতে লাগলেন, এমন কি চা পর্যন্ত একটা হিটার আনিয়ে নিয়ে নিজে ক'রে খেতে লাগলেন। বিনোদের একটি অল্পবয়সী ঝি ছিল লতিকা বলে। সে দু-একদিন চা নিয়ে এসেছিল কিন্তু রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে আর পীড়াপীড়ি করতে সাহস করে নি। অল্পবয়সী, প্রায় বিনোদের মেয়ে মণিকার সমবয়সী বলেই বোধ হয় অত অল্পে অব্যাহতি পেল। বিনোদ নিয়ে এলে হয়ত তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতেন।

প্রথম দিকে দু-একদিন কিছু কিছু ঘোরাঘুরি করেছিলেন তবু, বিনোদের বিশ্বাস উকিলের বাড়ি যাচ্ছেন। তার স্বামীর বিশ্বাস কে এক পুলিস অফিসার বন্ধু হয়ে আছেন রমেশের—তার কাছে যাচ্ছেন এদের জব্দ করার পরামর্শ চাইতে। কিন্তু দিন কতক পর থেকে একেবারে গৃহগত হয়ে পড়লেন বলতে গেলে। কোথাও যান না, কাউকে ফোনও করেন না। ওঁর কাছেও কেউ আসে না। সর্দারজীর হোটেলে বন্দোবস্ত করেছেন সেখান থেকে দুবেলা খাবার আসে, তারাই আবার এসে বর্তন নিয়ে যায়। উনি শুধু চা করেন, সে কাপ ডিস নিজেই ধুয়ে নেন।

এইবার বিনোদ যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। সে বাপের জ্যেষ্ঠ সন্তান। বাবাকে বিলক্ষণ চেনে। অতীব জেদী লোক। তার চেয়েও বড় কথা—সে

জিদ বজায় রাখতেও জানেন। তা নইলে ঠাকুর্দার মরা ব্যবসাকে এমনভাবে বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন না। মেয়ের কাছে এই পরাজয়—বিশেষ এমন ভাবে বোকা বনে যাওয়া যে উনি কখনো মেনে নেবেন না—সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। আরও তার ভয় হ'ল—যেদিন আড়াল থেকে দেখল—আজকাল সুযোগ পেলেই আড়াল থেকে লক্ষ্য করে সে—শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খাটিয়ায় উঠে বসলেন রমেশ, আর তাঁর চোখ দুটোর রঙ পাল্‌টে বিড়ালের চোখের মতো দেখাতে লাগল। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ছোট বেলা থেকেই লক্ষ্য করেছে বিনোদ। কি ক'রে হয় তা সে জানে না, ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা ক'রেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। তাঁরা বলেন ন্যাচারাল ফেনোমেনন। এ ওঁর সাংঘাতিক কোন সঙ্কল্পের চিহ্ন। ওঁর মা, ওদের নানা বলেছেন কতবার—'বেড়ালের চোখ জ্বললে আর রক্ষা নেই।' বিনোদ এবার বাবার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে তৎপর হ'ল।

একদিন সকালে সবে ঘুম থেকে উঠে বসেছেন রমেশ, নাতনী মণিকা এক গ্লাস গরম চা আর ট্রেতে তিন-চার রকমের বিস্কুট চানাচুর নিয়ে ঢুকল। মণিকা চৌদ্দ-পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে। এ-দেশীয় হিসেবেও আশ্চর্য সুন্দরী সে, শ্বেতপদ্মের মতো রং, মুখ চোখ কপাল দেখলে নূরজাহানের ছবির কথা মনে পড়ে। শান্ত স্বভাবের মেয়ে। গলার আওয়াজটিও ভারী মিষ্টি।

মণিকা এক রকমের লজ্জা-মিনতি মাখা ভঙ্গীতে সামনে এসে দাঁড়িয়ে খুব আস্তে, ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলল, 'বাবাজী, আমার হাতেও চা খাবেন না? আমি নিজে বানিয়েছি।'

এতেই বরফ গলল। ওর মুখের ওপর আর রমেশ 'না' বলতে পারলেন না।

চা থেকে খাবার। অবশ্য লতিকাই তৈরী করে, মণিকা হাতে ক'রে দিয়ে যায় ঘরে। ক্রমে ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে এল। সোজাসুজি লতিকাই দুপুরের খাবারটা দিয়ে যেতে লাগল। কারণ মণিকা সব দিন খাওয়ার সময় থাকতে পারে না। তার স্কুল আটটা থেকে সাড়ে বারটা। যাওয়ার সময় তার বাবা স্কুটারে পৌঁছে দেয়। ফেরার সময় সাধারণ বাস-এ আসতে হয়। ফলে এক-একদিন খুব দেরি হয়ে যায়। দুটোও বেজে যায় কোন কোন দিন। সে সব দিনে লতিকাই খাবার দিয়ে যায়। উনিও কোন বাহানা না ক'রে খেয়ে নেন।

এর পর মেয়ে-জামাই সম্বন্ধে মনোভাব কোমল না হলেও নাতনীর সঙ্গে খুব ভাব জমে উঠল। ওঁর কোন পৌত্রী নেই, এ-ই একমাত্র নাতনী। সুন্দরী মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে, ভদ্র, শান্ত। রমেশ এতকাল ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পান নি, কাজেকর্মে এসেছেন হয়ত। এক-আধবেলা থেকে চলে যেতেন। তখনও ভাল লাগত—কিন্তু এখন একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই এটা-ওটা উপহার আসতে লাগল নাতনীর জন্য। আরও দু-চারদিন পরে সে উপহারেব বস্তু মহার্ঘ্য হয়ে উঠল। বিলিতী কলম, রোলেক্স ঘড়ি, ভাল রেশমের সালোয়ার-কামিজ। নানা রঙের দোপাট্টা, তার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে জুতো ও সানগ্লাস। দস্তুর মতো ধনী কন্যার বেশেই সাজিয়ে তুলতে লাগলেন মণিকাকে। এমন কি মা-বাবার অনুমতি আনিয়ে এক-আধ-দিন ভাল ভাল দু-একটা 'পিকচার'ও দেখিয়ে আনলেন।

বিনোদ শুধু নিশ্চিন্ত নয়, খুশীও হ'ল। ওর স্বামী—বিনোদের ভাষায় মিঃ সুদ—নিজেই উদ্যোগী হয়ে কর্তাদের কিছু-কিঞ্চিৎ সুরাপানের ব্যবস্থা ক'রে ছাদে সেই প্রতিশ্রুত চালাও তুলে দিল।

এবার আরও সহজ হলেন রমেশ বাহেল। ভাগ্যকে তিনি মেনেই নিলেন। ওখানে পুত্র পুত্রবধূ এখানে মেয়ে জামাই। এ বোধহয় ভালই হ'ল। বরং মনে মনে মিলিয়ে দেখলেন, ওখানে পুত্রবধূর থেকে এখানে মেয়ে-জামাই বেশি করছে। তিনি বিস্তর মাল আনিয়ে গুদামজাত করলেন। কাঁচামাল এখান থেকেই কিনলেন—তিন-চারটি লোক আনিয়ে নিজে বসে থেকে এখানেও কিছু কিছু ওষুধ তৈরী করাতে লাগলেন। এখানে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুবিধা কম, সুতরাং কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন, খবরের কাগজের হকার দের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দৈনিক কাগজের ভাঁজে হ্যাণ্ডবিল বিলি করার ব্যবস্থাও ক'রে নিলেন। এর ফলে বেশ কিছু অর্ডার আসতে শুরু হ'ল। সে জন্যে চিঠি-চাপাটি করা দরকার। এত চিঠি হাতে লেখা যায় না, আর তাতে ইজ্জৎও থাকে না। তা ছাড়া রমেশ ভাল ইংরেজী জানেনও না। অনেক ভেবে-চিন্তে কিস্তিতে একটা টাইপ রাইটার কিনলেন। ও সৌরভ হর্শ নামে একটি ছোকরা মুন্সী বা সেক্রেটারীও নিযুক্ত করলেন।

সৌরভ ছেলেটিও কাশ্মীরী, বয়স তেইশ-চব্বিশ, বি. কম. পাস। টাইপ

করতে জানে, ইংরেজী চিঠি খুব ভাল লিখতে না পারলেও কাজ চালিয়ে নিতে পারে। দেখতে অতিশয় সুশ্রী এবং এখনকার ধরনে খুব স্মার্ট।

ঠিক হ'ল রমেশ ওকে আপাতত আড়াইশো টাকা মাইনে দেবেন। ওঁর সঙ্গেই থাকবে, তবে খাওয়ার ব্যবস্থাটা কোন হোটেলে ক'রে নিতে হবে, সে দায়িত্ব উনি নেবেন না। তবে সন্ধ্যার পর যদি সৌরভ চায়—এক-আধটা টিউশ্যানী করতে পারে। কিংবা কোন পার্টটাইম চাকরি। তাতে রমেশের কোন আপত্তি নেই।

সৌরভকে বাড়তি উপার্জনের জন্যে তেমন ব্যস্ত দেখা গেল না। বরং এক রকম যেচে সেধেই মিঃ সুদের চিঠিপত্র টাইপ ক'রে দিতে লাগল। সন্ধ্যার সময় মিঃ বাহেলকে আজকাল এদিক-ওদিক যেতে হয়, ব্যবসার কাজেই বেশির ভাগ, যেদিন এক-আধটু অবসর মেলে একটু বেড়িয়ে বেড়ান নয় তো পার্কে গিয়ে বসেন। সৌরভ কোথাও বেড়াতেও যায় না, সেই সময়টা বসে বসে মিঃ সুদের চিঠি ও বিল টাইপ ক'রে দেয়, অনেক সময় চিঠির মুসাবিদাও করতে হয়।

সে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বিনোদ ওকেও সকালে চা-নাস্তা দেয়, সন্ধ্যার পরও একাধিক বার চা বা কফি যোগায়। কোনদিন ক্লান্তির অজুহাতে হোটেলে যেতে না চাইলে রমেশের খাবারের সঙ্গে লতিকা ওর জন্যেও রুটি সবজি নিয়ে আসে, সেই সঙ্গে এক গ্লাস দুধও।

মিঃ সুদ ওকে এর আগে কিছু পারিশ্রমিক দিতে গিছলেন, সে দু হাত জোড় ক'রে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং চক্ষুলজ্জার জন্যেই এটুকু করতে হয়। মিঃ সুদ পুরো খাওয়ার ভারটাই নিতে চেয়েছিলেন, বিনোদ অত দায়িত্ব নিতে রাজী হয় নি··।

এই ভাবে মাস পাঁচেক কাটবার পর সহসাই কি একটা টেলিগ্রাম পেয়ে সৌরভকে দেশে চলে যেতে হ'ল।

তার কদিন পর থেকেই বিনোদ লক্ষ্য করতে লাগল মণিকার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। চোখের কোলে কালি, দৃষ্টিতে ক্লান্তির সঙ্গে এক ধরনের বিষণ্নতা—একটু যেন ভয়-ভয় ভাবও।

আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল বিনোদের। কিন্তু তার স্কুলে নানা রকমের

ঝামেলা চলছে গত কয়েক মাস ধরে, তাছাড়া তার স্বামীর ব্যবসাতেও কিছু কিছু সাহায্য করতে হয়—নিজেই, গাড়ি নয় স্কুটার চালিয়ে মাল ডেলিভারী দিয়ে আসে।'সময় কম, তা ছাড়া বাবা আছেন, তিনি মণিকাকে ভালও বাসেন এই ভেবেই আরও নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকা গেল না। আরও কয়েক দিন পর থেকেই বমি করতে আরম্ভ করল। যখন-তখন বমি, কিছু খেলেই উল্‌টি আসে। ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে উঠে দাঁড়াতেই পারে না, স্কুল যাওয়া তো দূরের কথা, এঘর ওঘর করতেই অসুবিধা হয়।

বিনোদ ভয় পেয়ে একেবারে এক বিখ্যাত মহিলা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

তবু তখনও সর্বনাশের পরিমাণ সম্বন্ধে ওর কোন ধারণা ছিল না। সন্তান সম্বন্ধে মায়েদের দুর্বলতা, বিপদের দিকটা দেখতে দেয় না।

ডাক্তার দেখিয়ে যখন ফিরে এল বিনোদ—তার মুখ বজ্রগর্ভ মেঘের মতো, মণিকা গাড়ির কোণে মাথা রেখে কাঁদছে।

বাবার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই প্রায় বোমার মতো ফেটে পড়ল বিনোদ, 'এ তোমার কারসাজি! এই ভাবে আমাদের সর্বনাশ করলে। তুমি কি মানুষ! সাপের চেয়ে সাংঘাতিক তুমি! উঃ কী পিশাচ তুমি! স্বার্থে মানুষ এমন রাক্ষস হয়ে যায়, নিজের সন্তানের সর্বনাশ করে। ভেবেচিন্তে হিসেব ক'রে!'

'ইস্ কা মতলব!'

রমেশ বাহেল আকাশ থেকে পড়লেন একেবারে। তার পর সব শুনে বললেন, 'তোমরাই তো ফোকটিয়া কাজ করাবার জন্যে তাকে একেবারে আত্মীয় ক'রে নিয়েছিলে। এক খুবসুরৎ লেড়কী আর এক নওজোয়ান লেড়কা দিনরাত কাছাকাছি থাকলে কি হয় জানো না! তোমরা তো অনপঢ় গাঁওয়ার লোক নও। তবে আমি তাকে ছাড়ব না। এখনই থানায় যাচ্ছি। তার নামে হুলিয়া বার ক'রে দোব কাগজে কাগজে, ছবি ছাপিয়ে দেব বিজ্ঞাপন দিয়ে—যাতে কেউ না তাকে আশ্রয় দেয় আর।'

'থাক থাক। আর অত উপকার তোমাকে করতে হবে না, ঢের করেছ।

ভাল ক'রে চুনকালি না মাখালে বুঝি আর চলছে না আমাদের গালে। এ হুঁশ এখনও হয়নি যে এ অপমান শুধু আমাদের নয়,—এ তোমারও।'

'তা হোক! সে আমি মেনে নেবো। তাই বলে এত বড় অন্যায় আমি সহ্য করব না। এ তো দস্তুরমাফিক পাপ! হোক মকদ্দমা, কাগজে কাগজে যে খবর বেরোক—মানুষ কত বেইমান নিমকহারাম হতে পারে দেখুক লোকে!'

'না, খবরদার! এসব করতে পাবে না।' চাপা গর্জন ক'রে ওঠে বিনোদ।

'উঁহু, সে তুমি যাই বলো, এ বেইমানি আমি কিছুতেই সহ্য করব না। এর পর ঐ মেয়েটার মুখের দিকে চাইব কি ক'রে। না, সে হবে না। পুলিস কিছু না করে আমি পয়সা খরচ ক'রে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেব—'

'অত কিছু করতে হবে না মিঃ বাহেল—তোমাকে বাবা বলতে আমার লজ্জা করছে। এরপর ও পরিচয় দিতেই অপমান বোধ হবে—আমরা এখানে আর থাকব না, বলেই যাচ্ছি। এখানে থেকে তোমার মুখ দেখলে খুন করতে ইচ্ছে করবে আমাদের, হয়ত কোন দিন ক'রেই ফেলব।...তবে, আমরা চলে যাবো ঠিকই, কিন্তু ছাড়বও না সহজে, যে ফ্ল্যাটের জন্যে এ কাজ করলে সে ফ্ল্যাট তোমাকে ভোগ করতে দোব না, টাকার জন্যে নালিশ করে এ আমি নিলামে তুলিয়ে ছাড়ব।'

'বেশ তো, ক'রে দ্যাখো না নালিশ,' এবার বেশ শান্ত কণ্ঠে বলেন রমেশ, 'তুমিই তো বললে সাপের চেয়ে সাংঘাতিক—সেই পরিচয়টাই তাহলে পুরো-পুরি দিয়ে দেব।'

আবারও চোখ দুটো বেড়ালের মতো জ্বলে উঠল রমেশ বাহেলের।

আত্মজ

অনেকদিন পরে দেশে ফিরেছি, স্টেশনের ধারের সেই নর্দমার ওপর বাঁশ-পাতা চায়ের স্টলগুলো থেকে শুরু ক'রে পচা নয়ানজুলিটা পর্যন্ত ভাল লাগছে। তবু চোখটা খুঁজে বেড়াচ্ছে পরিচিত মানুষের মুখই। কিন্তু নতুন উদ্বাস্তু সমাগমের কল্যাণে স্টেশন থেকে বেরিয়ে চারু ডাক্তারের ডিসপেনসারী

পর্যন্ত চওড়া রাস্তাটা নরমুণ্ড-স্রোতে ঢেকে গেলেও, আমাকে যারা চেনে এবং আমি যাদের চিনি—এমন একজনকেও দেখতে পেলুম না।

একেবারে দেখা মিলল ডিসপেন্সারী ছাড়িয়ে এসে লাইব্রেরীর ধারে পড়তে, দেখি মুরারি হাতে কী একটা ছোট্ট কাগজের বাক্স নিয়ে হনহন ক'রে হাঁটছে।

প্রাণপণে চিৎকার ক'রে ডাকলুম। দেখে খুশী হলুম যে আমাকে দেখে ওরও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একরকম ছুটেই কাছে এল—কিন্তু আমার কোন কুশল জিজ্ঞাসা করল না বা নিজের খবরও দিল না, ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কবে এলি রে?···যাক্—পরে দেখা হবে, আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি—এইটে নিয়ে গেলে তবে ইঞ্জেক্‌শ্যন হবে—'

সে গতি থামায় নি একবারও, শুধু কমিয়ে এনেছিল মাত্র, এখন আবার আগের মতোই হনহন ক'রে চলতে শুরু করল।

ব্যাপার যে গুরুতর তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুতরাং আমি ওকে থামাবার চেষ্টা করলুম না, নিজের বাড়ির রাস্তা ছেড়ে ওর সঙ্গেই চলতে লাগলুম।

'হাসপাতাল কেন রে?' ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করলুম, 'কার অসুখ?'

'ও, তুই জানিস না বুঝি? কী ক'রেই বা জানবি, তুই তো দেশে এলি এতদিন পরে—বিমলদা রে আমাদের—বিমল চাটুয্যে—মনে নেই তোর?—বিমলদার যে খুব অসুখ!'

'বিমলদা! মানে দক্ষিণ পাড়ার বিমলদা! সে কি! কী হয়েছে তাঁর?'

'হয়েছে অনেক রকম। হেপাটাইটিস্—তা থেকে কিডনি ফেল করেছে—ডায়াবেটিস তো ছিলই। নানানখানা যাকে বলে!'

'বাবা—এমন সাংঘাতিক অবস্থা? তা এখানে কেন? এখানের হাসপাতালে এসব রোগের চিকিৎসা হবে?'

'যা হয় তাই হবে। উপায় কি বলো? কে অত কাণ্ড ক'রে কলকাতায় নিয়ে যায়, তাছাড়া কলকাতায় হাসপাতালে ঢোকানো তো আর আজকাল চাট্টিখানি কথা নয়—বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়।'

'তা বলে এই হাসপাতালে! নিদেন কলকাতা থেকে একটা বড় ডাক্তার এনে—'

মুরারি বেগ কমাল না—তবে এবার আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বললে, 'খরচা কে দেবে? ওদের পার্টি থেকে তো যা দেয় তাতে নুনভাতই জোটে না। এই যা চিকিৎসা—তাও সবই তো চলছে চ্যারিটিতে। পাঁচজনের দয়ায়—পাঁচজনের চাঁদায়। এই তো বলতে গেলে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে ক'রে টাকা তুলে এই ইঞ্জেকশ্যন নিয়ে যাচ্ছি—গেলে তবে ফোঁড়া হবে। এর ওপর আবার বড় ডাক্তার—হুঁঃ।'

'সে কী? কী বলেছিস রে তুই? বিমলদা—? মানে আমাদের কংগ্রেস জ্যাঠাইমার ছেলে?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। সেই বিমলদা।'

ইতিমধ্যেই হাসপাতালে এসে গিয়েছিলুম। মুরারি আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে চলে গেল, আমি আর তখনই ঢুকলুম না। সংবাদটার ধাক্কা সামলাতে বেশ একটু সময় লাগল।

অনেকদিন দেশছাড়া সত্যি কথা—তাই বলে দেশের যারা পুরনো বাসিন্দা, আজন্ম যাদের দেখে আসছি, তাদের কাউকেই ভুলে যাই নি। বিমলদার মা চাটুয্যে গিন্নিকে লোকে টাকার কুমীর বলত। জমি-জমা টাকা-কড়ি সবই অবশ্য জ্যাঠাইমার—বিমলদার পৈতৃক নয়। কথাটা শোনায় অদ্ভুত—কিন্তু সত্য। ওঁর বাবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত পাত্রে। তাঁরও অবস্থা তখন ঐরকমই, কী সব ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। কোনমতে দিন চলত এই মাত্র। পরে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেন ভদ্রলোক, প্রচুর টাকা রোজগার করেন এবং মরবার সময় নগদ একলাখ টাকা দিয়ে যান তাঁর আদরিণী বড় মেয়েটিকে।

চাটুয্যে জ্যাঠাইমা তখন বিধবা, বিধবার হাতে টাকা এসে পড়লে টিকটিকি মাকড়সা পর্যন্ত তা খাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু উনি একটি পয়সাও বাজে খরচ হতে দেন নি। প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিলেন বরং। ভাল ভাল জমি বাগান কিনেছেন, বন্ধকী কারবার করেছেন, কিছু কিছু জমি কেনা-বেচাও করেছেন। যা করেছেন তাতেই লাভ হয়েছে। ফলে সে এক লাখ টাকা দু লাখ আড়াই লাখে পরিণত হতে দেরি হয়নি। বেশ শক্ত মেয়েমানুষ ছিলেন জ্যাঠাইমা; ব্যাঙ্ক, পোস্টঅপিসেই সব টাকা রাখতেন। দরকার মতো ওঠাতেন

বা জমা দিতেন নিজেই, হিসেব-নিকেশও বেশ বুঝতেন।

কিন্তু তাই বলে কৃপণ ছিলেন না একেবারেই। বহু লোককে সাহায্য করেছেন, বহু লোককে গোপনে মাসোহারা পাঠিয়েছেন। আর সব চেয়ে মুক্ত-হস্ত ছিলেন তিনি একটি ব্যাপারে—স্বদেশী আন্দোলনে। তবে স্বদেশী বলতে সন্ত্রাসবাদীদের পছন্দ করতেন না আদৌ, তাঁর অচলা ভক্তি ছিল গান্ধীজীর ওপর—সেই কারণেই কংগ্রেসীদের ওপরও। তাঁরই আনুকূল্যে এখানে কংগ্রেসে অফিস হয়েছে সেই ত্রিশ সাল থেকে, বরাবর এই আন্দোলনে টাকা যুগিয়ে-ছেন তিনি। বরাবরই অহিংসবাদী, চিরকাল, অন্তত আমি যতদিন পর্যন্ত দেখেছি—চরকা কেটেছেন, খদ্দর পরেছেন। কিন্তু উনিশশ' বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদীদেরও সাহায্য করেছেন—এ আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছি। এই জন্যেই একসময় কখন চাটুয্যে-গিন্নী বা চাটুয্যে-জ্যাঠাইমা গ্রামসুদ্ধ সকলের কাছে 'কংগ্রেস জ্যাঠাইমা' নামে অভিহিত হ'তে শুরু করেছিলেন তা কেউই অত টের পায় নি। সকলে যখন অবহিত হ'ল এ বিষয়ে—তখন নামটা বেশ চাউর হয়ে গেছে। জ্যাঠাইমা নিজেও তা শুনেছিলেন, জানতেন কিন্তু রাগ করেন নি, বরং যেন একটু গর্বই অনুভব করতেন। বলতেন এক এক সময়, 'তোরা আমাকে তার চেয়ে কংগ্রেসের মা বলে ডাকিস। বিমলের মা শোনার চাইতে ঐ ডাক আমায় মিষ্টি লাগবে।'

এ হেন জ্যাঠাইমার একমাত্র ছেলের পয়সা অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না—এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? না, ইতিমধ্যে জ্যাঠাইমাই কোন স্পেকুলেশ্যনে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে গেছেন। বিমলদা যে এক ছেলে, ওঁকে কোলে নিয়েই ভদ্রমহিলা বিধবা হয়েছিলেন। সেই ছেলের চিকিৎসা হবে না, ওঁর হাতে টাকা থাকতেও—কেমন ক'রে বিশ্বাস করা যায় এ কথা!

কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল একটু পরেই অবশ্য, মুরারি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যখন আবার বাড়ির পথ ধরল। সে-ই খুলে বলল কথাটা।

বিমলদা চিরদিনই মা'র আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, অতি অল্প বয়সে জেল খেটেছেন মার খেয়েছেন—ত্রিশ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনে। মদের

দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন—পুলিস ওর বয়স দেখে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে যায়, থানা পর্যন্ত নিয়ে যায় নি। ভারত ছাড় আন্দোলনেও গ্রেপ্তার হয়ে তিন বছর জেলে বন্ধ ছিলেন। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল বিয়ে করার পর। জানাশুনোর বিয়ে—মন্দ লোক বলে ওদের পার্টি থেকে মেয়েটিকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল—মুরারি হেসে বলে, 'ওটাকে বলে push and pull, আগে ঠেলে দেয়, বেশ মাখামাখি হয়ে যখন জড়িয়ে যায়, মানে বঁড়শি গভীরে গেঁথে যায়, তখন টেনে তোলে—সেই প্রোসেস আর কি!'

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'তাতে লাভ? বিমলদা এমন কি ভাল পাত্র? কলেজে-টলেজে তো বিশেষ পড়ে নি!'

'বাঃ, ভাল পাত্র নয়? একমাত্র উত্তরাধিকার টু দি মিলিয়ন্‌স্‌!'

'সে তো ঘোর ক্যাপিটালিস্টএর ব্যাপার, জমি-জমা তেজারতি। সে টাকায় তো ওদের ঘৃণা হওয়া উচিত্‌।'

'উঁহু, ঘৃণা করে ওরা ক্যাপিটালিস্টকে তাই বলে ক্যাপিটালকে ঘৃণা করবে কেন? বিশেষ ক'রে যদি সে ক্যাপিটালকে সৎ-কাজে বা ওদের পার্টির কাজে লাগানো যায়। তাছাড়া—ওদের দলের দিকে তাকিয়ে দেখিস না, যত বড় বড় চাঁই, সব জমিদারের ছেলে!'

'তারপর—ওদের কী হ'ল তাই বল।' প্রশ্ন করি।

'হ'ল আর কী। ওর শালাটি যে ঐ দলের চাঁই—জ্যাঠাইমা জানতেন না অত। তাহলে বিয়ের সময়ই বেঁকে দাঁড়াতেন। জানলেন যখন তখন ছেলেটি পুরোপুরি ও দলে চলে গিয়েছে—কোমর বেঁধে কাজে লেগে গিয়েছে পার্টির। কিন্তু জ্যাঠাইমাও এমন মানুষ নন যে এক ছেলের মায়ায় নিজের এতদিনের আদর্শকে বিসর্জন দেবেন। তিনি বিমলদাকে আলটিমেটাম দিলেন যে হয় ঐ দল ছাড়ো, নয় তো বাড়ি ছাড়ো। বিমলদা এতদিনের এত পরিচয় সত্ত্বেও মাকে চিনতে পারেন নি। তিনি মনে করলেন যে যতই হোক মায়ের প্রাণ, এক ছেলে তার ওপর—ক'দিন আর ছেড়ে থাকবে। কিংবা ওরাই ভুল বুঝিয়ে ছিল—মানে ওর শালারা। তিনি মোজজ দেখিয়ে চৌধুরীদের একখানা ঘর ভাড়া ক'রে এসে উঠলেন। ব্যাস, সম্পর্ক ঐখানেই চুকে গেল চিরদিনের

মতো। আজ অব্দি একটা পয়সা আদায় হয় নি ওখান থেকে। শালারা পরামর্শ দিয়েছিল মার নামে কেস করো—কিন্তু উকীলরা সবাই বারণ করলে, একমাত্র ভদ্রাসনটা ছাড়া আর কিছুই বিমলদার পৈতৃক নয়—জ্যাঠাইমারই পৈতৃক। মকদ্দমা করলে বড় জোর সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে পারবেন—কিন্তু বাড়ি কামড়ে পেট ভরবে না, মিছিমিছি কেলেঙ্কারীর শেষ! তা অবশ্য মামলা করতেও হ'ল না। জ্যাঠাইমা নিজেই মল্লিকদের বাড়ি কিনে নিয়ে উঠে চলে গেলেন, চাকরকে দিয়ে নিজেদের বাড়ির চাবিটা পাঠিয়ে দিলেন ছেলের কাছে।'

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে বোধ হয় দম নেবার জন্যই থামল মুরারি। কিন্তু আমার তখন কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠেছে, আমি বেশীক্ষণ থামতে দিলাম না।

অবশ্য বেশী কিছু আর বলবার ছিলও না।

বাড়িতে ফিরে যায় নি বিমলদা আর। কিছু কিছু যা আসবাব ছিল বিক্রী ক'রে বাড়িটা ভাড়া দিয়েছেন। উদ্বাস্তু সমাগমের ফলে আজকাল এসব অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে লোকে, ট্রেনে দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পৌঁছনো যায় যখন তখন নেবে না-ই বা কেন। কিন্তু পুরনো বাড়ি সেকেলে ধরনের, ভাড়া খুব বেশি পান নি উনি, চল্লিশটি টাকা মাত্র। এছাড়া পার্টি থেকেও কিছু দেয়—কিন্তু সব জড়িয়ে একশোটি টাকা হয় কিনা সন্দেহ। তাতে দুটো লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ হওয়া খুবই শক্ত আজকালকার দিনে। তার ওপর আবার সম্প্রতি বছর দুই আগে একটি বাচ্চাও হয়েছিল। তবে সে বাঁচে নি বেশিদিন—স্রেফ্ অপুষ্টিতেই মারা গেছে—মাস তিনেকের মধ্যে।'

'তা যতই হোক নিজের নাতি তো, তাও জ্যাঠাইমা তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না?'

'দেখতেই আসেন নি একদিন, তায় বাঁচাবার চেষ্টা!'

'বলিস কী রে! এ যে অমানুষিক।'

'ঠিক তাই। আমরা সবাই গিয়ে বলেছিলাম—আমাদেরও আদর্শের সঙ্গে মতের সঙ্গে মেলে না—তবু গ্রামের ছেলে তো, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, দাদা বলি—এ গ্রামে যত ঘর ব্রাহ্মণ আছে সকলকার সঙ্গেই কোন-না-কোন

সূত্রে আত্মীয়তা বেরোবে—চুপ ক'রে থাকিই বা কী ক'রে। আমরা বলেছিলাম, ও যা করেছে করেছে—ওর বৌ ছেলের মুখ চেয়ে কিছু একটা করুন। তা বলে কি জানিস? বলে, ছেলে যদি মরে তাহলে বৌ আর নাতিকে দেখব বৈকি, নিশ্চয়ই দেখব কিন্তু ও বেঁচে থাকতে এক আধলাও দেব না। তাতে প্রকারান্তরে ওদেরই সাহায্য করা হবে।...তবু আমরা বোঝাতে চেষ্টা করলুম, ধরুন, আপনি মারা গেলে ওরই তো সব, তখন আর ঠেকাবেন কী করে? তা বলে, কে বললে ওরাই সব! সে তো আমি সেই দিনই উইল ক'রে রেজেস্ট্রী ক'রে আমার অ্যাটর্নীর আপিসে রেখে দিয়েছি। এক পয়সা পাবে না ও। তবে যদি আমি বেঁচে থাকতে থাকতে ও মরে তখন উইল পালটে বৌটাকে কিছু দিয়ে যাব—যাতে যাবজ্জীবন খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে তার বেশি নয় অবিশ্যি!'

বিশ্বাস করার কথা নয়, বিশ্বাস হ'লও না। অথচ মুরারির কথাবার্তা এবং যেটুকু দেখলুম নিজের চোখে—অবিশ্বাস করাও শক্ত। বিশেষত বাড়িতে পৌঁছে কাকীমার মুখেও যেটুকু শুনলুম তাতে মুরারির কথাই সমর্থিত হ'ল।

তবু খাওয়াদাওয়া ক'রে ঘুমিয়ে উঠে বেলা চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম জ্যাঠাইমার বাড়ির দিকেই। মল্লিকদের বাড়িটা কোন দিকে সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কিছুটা সেই স্মৃতির ওপর নির্ভর ক'রে এবং কিছুটা লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে—এক সময় গিয়ে পৌঁছলুমও।

মাঝারি সাইজের বাড়ি—একা বাস করার পক্ষে অনেক বড়। অবশ্য দেখলুম একা বাস করছেনও না খুব। দুটি-তিনটি আশ্রিতা বিধবা এসে জুটেছে, তারাই বোধহয় রান্নাবান্না করে। চাকর কিষেণ গোয়ালা মিলে সেও তিন-চার-জন—সুতরং বাড়ি তেমন নির্জন নিস্তব্ধ নয় যেমন মনে করেছিলুম।

জ্যাঠাইমা দেখলুম আমাকে চিনতে পারলেন, আমার মার খবর নিলেন, বিয়ে করেছি কিনা সে খবর জিজ্ঞাসা করলেন। ঘরের দুধে তৈরী মিষ্টি খেতে দিলেন, আন্তরিকতা ও আত্মীয়তার কিছু অভাব ঘটল না।

তবু এসব সত্ত্বেও—কেমন যেন অন্যমনস্ক কেমন যেন চিন্তাক্লিষ্ট মনে হ'ল জ্যাঠাইমাকে। বেশ একটু ভেঙেই পড়েছেন যেন। এমন কি, এতদিনে এত

ঝড় ঝঞ্ঝাতেও ওঁর চেহারার বাঁধুনি নষ্ট হ'তে দেখি নি—এবার দেখলুম তাও টসকেছে। বয়সের চিহ্ন সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

এর কারণটাও অনুমান করা কঠিন হ'ল না। জমি প্রস্তুত দেখে আমি কথাটা পাড়লুম একটু ফাঁক পেতেই, 'এটা কি করছেন জ্যাঠাইমা, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি? গ্রামের লোকে যে যা-তা বলছে।'

হাসলেন জ্যাঠাইমা। নিরানন্দ নীরস হাসি। বললেন, 'কত গেল রথারথী, শ্যাওড়া গাছে চক্রবর্তী। তুই বুঝি ভাবলি এতদিন পরে ফিরেছিস বলেই তোর দাম বেড়ে গেছে। গ্রামসুদ্ধ লোক ভেজাতে পারলে না আমাকে—তুই ভেজাবি?'

'কিন্তু আপনারই বা এত জেদ কেন? হাজার হোক সে আপনার ছেলে তো?' বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে ফেললুম।

'হাজার হোক সে আমার ছেলে তো? আমার চেয়ে তার ঐ দলই বড় হল।' সে যদি আমার কথা বিবেচনা না করে, আমি কেন করব। যেদিন সে আমার আশ্রয় ছেড়ে চলে গেছে সেদিনই জেনেছি আমার ছেলে আর নেই, সে মরে গেছে।'

নানা রকমে বোঝাতে বা জ্যাঠাইমার নিজের ভাষায় ভেজাতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু জ্যাঠাইমা অচল অটল। দেখলাম স্বাভাবিক দুর্বলতাগুলো কেমন ক'রে যেন ওঁর নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে।

শেষে আর কোন যুক্তি না পেয়ে বললুম, 'আপনি তো কত দানধ্যানও করেন—মনে করুন না ভিক্ষে দিচ্ছেন। গ্রামসুদ্ধ লোক আপনার ছেলেকে সাহায্য করছে তবে তার চিকিচ্ছে চলছে এও তো আপনার একটা অপমান।'

'কিছু না কিছু না। অপমান কিসের। ছেলে বড় হয়েছে, এখন তো প্রায় প্রৌঢ় হ'তে চলল, তারই তো বুড়ো মাকে দেখবার কথা, রোজগার করে খাওয়াবার কথা। সে যদি নিজের কর্তব্য পালন না করলেও তুষ্য না হয়—আমারই বা কী এমন দায় পড়ল তার প্রতি কর্তব্য করতে। আমার কর্তব্যটাই বা কি। বুড়ো বিধবা মায়ের টাকায় বসে খাওয়াও যা, গ্রামের লোকের কাছে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও তাই। তাতে যদি তার অপমান না হয় আমার হবে

কেন। আর ভিক্ষে? ভিক্ষেও পাত্র বুঝে দিতে হয়, নইলে মা লক্ষ্মী রাগ করেন।'...

কিছুতেই কিছু হ'ল না। যেমন শূন্য হাতে গিয়েছিলাম তেমনি শূন্য হাতেই ফিরতে হ'ল। রাগও হ'ল একটু জ্যেঠাইমার ওপর। এমন রাক্ষসী মা তো কোথাও দেখি নি—হাতে পয়সা হ'লে কি এমনি পাষাণ হয়ে যায় মেয়েমানুষও?

তখনকার মতো প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে এ বাড়িতে আর আসব না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখা গেল না। হাসপাতালে এসে বিমলদাকে দেখে চমকে উঠলুম। রাজনৈতিক মতামত ওর যাই হোক না কেন—মানুষটা তো সেই একই আছে। এককালে আমাদের দলের পাণ্ডাগোছের ছিলেন, নেতার মতোই মান্য করেছি চিরকাল, হয়তো কিছুটা ভালও বেসেছি, মায়া একটা থাকবে বৈকি! বিমলদার দিকে তাকিয়ে যেন চোখে জল এসে গেল, অমন বলিষ্ঠ কান্তিমান মানুষটার এই হাল হয়েছে! এ যেন সেই রূপকথার কোন রাক্ষসী এসে ওর দেহের শেষ বিন্দু রক্তও শুষে নিয়েছে—

তাছাড়া যতদূর যা দেখলুম; বাঁচবার কোন আশা তো নেই-ই, শেষেরও বিশেষ দেরি নেই আর। মনে হ'ল আজ রাতটা কাটবে কিনা সন্দেহ।

আবার ছুটলুম জ্যাঠাইমার কাছে। মুরারির নিষেধ না শুনেই। মুরারি বললে, 'ওরে পাগল, মিছিমিছি ছুটছিস, সে চীজ সে নয়।'

'তবু, চুপ ক'রেই বা থাকি কী ক'রে। আমার কাজ তো আমি করি।' জবাব দিলুম তাকে।

জ্যাঠাইমাকে গিয়ে বললুম, 'দোহাই জ্যাঠাইমা, এই, শেষ মুহূর্তে ক্ষমা করুন তাকে। একবারটি চলুন। একেবারেই শেষ হয়ে এসেছে, আজকের রাত কাটে কিনা সন্দেহ।'

মনে হ'ল—হ্যারিকেনের আলোতে যতটুকু যা নজরে পড়ল—মুহূর্তের জন্য একটা কালো ছায়া পড়ল জ্যাঠাইমার মুখে, একটা আকুলতাও জাগল দৃষ্টিতে, কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যই। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে শুধু বললেন, 'তেমন যদি কিছু হয়, বৌটাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যাস।'

ঠিক এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না একটুও। যেন দারুণ একটা আঘাত পেলাম। কঠিন হয়ে উঠল আমার ভেতরটাও। একটু ব্যঙ্গের সুরেই জবাব দিলুম, 'সেও তো ঐ দলের মেয়ে, ঐ ঝাড়েরই বাঁশ, তাকে এনে ঢোকাবেন কি করে তাহলে ?'

'যে দলের মেয়ে সে দলের সঙ্গে সে তো বেইমানি করে নি, যে ঝাড়ের বাঁশ সেই ঝাড়েই আছে। তাকে আমার ঘেন্নাও নেই, ভয়ও নেই।'

'আপনার না থাক, তার ঘেন্না থাকতে পারে। যে অন্ন কণামাত্র পেলে তার স্বামীর জীবনটা রক্ষা হ'ত—সে অন্ন যদি তার মুখে না রোচে ?'

'সে তার অভিরুচি !···হরিবোল, হরিবোল।'

একান্ত নিস্পৃহতার সঙ্গে কথাগুলো বলে জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘরে চলে গেলেন।

বিমলদা মারা গেলেন পরের দিন সকাল আটটার সময়।

আর কেউ নেই। ওঁর শালারাও পার্টির কাজে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মুরারির ভাষায় বেগতিক দেখে গা-ঢাকা দিয়েছে। বিমলদার এই অবস্থা হবার পর থেকেই—যখন বুঝেছে ওকে দিয়ে বুড়ির কাছ থেকে এক পয়সাও আদায়ের সম্ভাবনা নেই, তখন থেকেই নাকি তারা এড়িয়ে চলে। বৌদিও সেটা বুঝেছে, দাদাদের কথা উঠলেই জ্বলে ওঠে একেবারে, বলে ওরা আমার জীবনটা নষ্ট ক'রে দিলে। ওঁকে এদিকে টেনে না আনলে তো আর এমনভাবে মানুষটা যেত না।'

আমি বললুম, 'তা বিমলদাও তো এ দল ছাড়তে পারতেন।'

'তবেই তুমি ও ঝাড় চিনেছ। ঐ মায়েরই তো ছেলে। ওরই কি জেদ কম ! ছাড়তে চেয়েছিলেন বরং বৌদিই, বিমলদার জন্যেই পারেন নি। তবুও তো বৌদি গিয়ে কেঁদে পড়েছিলেন এক দিন গোপনে—বলতে গিয়েছিলেন আপনার সন্তান আপনি ক্ষমা না করলে কে করবে ? বুড়ি জবাব দিয়েছিল সন্তান যখন পর হয় তখন তার থেকে পর আর কেউ হয় না মা। তাছাড়া—ও ছেলে দেশের শত্রু, জাতের শত্রু, ওকে নিয়ে আমি করব কি, ওকে বাঁচানো মানে তো কালসাপ পোষা, ও যত তাড়াতাড়ি যায় ততই মঙ্গল। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিলেন বৌদি।

সুতরাং—অনাবশ্যক বোধেই আর জ্যেঠাইমাকে খবর দিইনি কেউ।

যেভাবে চাঁদা তুলে ভিক্ষে ক'রে চিকিৎসা হচ্ছিল, সেই ভাবেই সৎকারের ব্যবস্থাও করা হ'ল একটা।

কিন্তু টাকা যোগাড় ক'রে শব তুলতে তুলতে বেলা দশটা বেজে গেল।

সবে আমরা মড়া নিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছি—কোথা থেকে হাহাকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে জ্যাঠাইমা এসে পড়লেন, 'ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে, ওরে—একবার দেখা দেখা—। কতকাল দেখিনি ও মুখ !'

অগত্যা নামাতে হ'ল।

জ্যেঠাইমা একেবারে আছড়ে পড়লেন। মৃত সন্তানকে বুকে তুলে নিয়ে চুমো খেয়ে আদর ক'রে পাগলের মতো কাণ্ড করতে লাগলেন। আশ্রিতাদের মধ্যে দুচার জন সঙ্গেই এসেছিলেন। তাঁরা বললেন, খবর শুনেই নাকি জ্যোঠাইমা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন—এই একটু আগে অতিকষ্টে জ্ঞান হয়েছে।

একজন তার মধ্যে—আমিও চিনি তাঁকে—ননীমাসী বললেন, 'আর অজ্ঞান হবে না! ওরই বা শরীরে কি আছে ? যেদিন থেকে ছেলে ভেন্ন হয়েছে সেদিন থেকে কোন ভাল জিনিস মুখে তোলে নি! দিনান্তে এক মুঠো ভাত শুধু—তাও না খেলে ছেলের অকল্যাণ হবে বলেই খেত। আবার যখন থেকে শুনেছে ছেলে খেতে পাচ্ছে না—ছেলে বৌ একবেলা খাচ্ছে তো দুবেলা খাচ্ছে না, তখন থেকে তো শুধু পাখীর আহার ধরেছিল। ঘুমোত না—বলতে গেলে সারারাত বসে বসে নিঃশ্বাস ফেলত আর কাঁদত !'

ঘণ্টাখানেক প্রায় আমাদের সেই রাস্তাতেই কেটে গেল। না পারি জ্যেঠাইমার কোল থেকে মড়া বার করতে, না পারি খাট কাঁধে তুলতে। শেষ পর্যন্ত বৌদিই বাঁচালেন, আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে 'মা' বলে ডাকতেই জ্যেঠাইমা ছেলে ছেড়ে দিয়ে 'মা মাগো, এ তোর কী মূর্তি আমি দেখলুম মা।' বলে বৌদির গলা জড়িয়ে আবারও অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ননীমাসীর সাহায্যে জ্যেঠাইমাকে একটা গাছতলায় এনে শুইয়ে দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি খাট তুলে নিয়ে রওনা দিলুম।

তারপর থেকে শুনছি ঐ একটা রোগই দাঁড়িয়ে গেছে জ্যেঠাইমার,

ঘনঘন মূর্ছা হচ্ছে। ভাগ্যে তবু বৌদির সেবাটা পাচ্ছেন। তবে বেশী দিন আর বাঁচবেন বলে মনে হচ্ছে না ?

একটা সুরাহা, শুনছি এরই মধ্যে উইলটা পাল্টে বৌদির নামে নতুন কেনা বাড়িটা আর কিছু জমিজমা লিখে দিয়েছেন। নগদ টাকা দেন নি বলেছেন, 'তাহলে ওর ভায়েরা সবই ঠকিয়ে খাবে।'

যমের অরুচি

উদয়চাঁদ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার ক'রে বসল যে—জীবনটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এটাকে রক্ষা করার জন্যে এত কাণ্ড করবার মানে হয় না—এমন কি বেঁচে থাকবারই কোন মানে হয় না।

কারণ ?

না, কারণ এমন কিছু ছিল না। এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যাতে ওর এতটা বৈরাগ্য জন্মাতে পারে।

সাধারণ গেরস্ত ঘরের ছেলে সে, বাপের নিজস্ব বাড়ি এবং সামান্য কিছু কোম্পানীর কাগজ ছিল পৈতৃক। তিনি কী একটা চাকরীও করতেন। এক ছেলে উদয়—ভালভাবেই মানুষ হয়েছিল। অর্থাৎ জীবনের ওপর মায়া পড়বারই কথা ওর।

ভালভাবে মানুষ হলেও সে বখাটে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায় নি বরং বলা চলে সে ভালছেলেদেরই মাঝারি স্তরের মধ্যে ছিল। কখনও স্কলারশিপ না পেলেও সসম্মানেই দুটো পরীক্ষা পাশ করেছিল। বি. এস-সিতেও অনার্স ছিল, সেটাও হয়ত নির্বিঘ্নেই পেয়ে যেত যদি না ইতিমধ্যেই হঠাৎ ওর মা মারা যেতেন।

সংসারে মা মারা যাওয়াটা এমন কিছু একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়—এমন অনেকেরই গিয়ে থাকেন। তা নিয়ে দু'চার দিন সকলেই শোক করে—তারপর আবার যথানিয়মেই সামলে নেয়। জগৎ এবং সংসার সম্বন্ধে এর জন্য কারুরই স্থায়ী কোন বৈরাগ্য দেখা যায় না।

কিন্তু উদয়ের কি হ'ল—শ্রাদ্ধ শান্তির পর সেই যে ঘরের কোণে ঢুকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল, আর নড়ল না।

বাবা প্রথম প্রথম হু'চার দিন কিছু বলেন নি, 'আহা শোকটা পেয়েছে খুব, একটু সামলে নিক !'—বোধ করি এই ছিল তাঁর মনের ভাব। শোকটা তাঁরও কম লাগে নি, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী বিয়োগ—বরং তাঁরই বেশি লাগবার কথা। তাই সেদিন তিনি ছেলের এই শোকবিহ্বলতাতে তার প্রতি একটা বিশেষ সহানুভূতিই অনুভব করেছিলেন।

তবে সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে—আর সে কথাটা প্রৌঢ় বিজয়চাঁদ কারুর চেয়ে কম বুঝতেন না।

হু'চারদিনটা যখন হু'চার সপ্তাহে পরিণত হ'ত তখন তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

'বাবা উদো, ক'দিন আর এমন করে থাকবে ? মিছিমিছি কলেজ কামাই ক'রে লাভ নেই ! বরং কাজে-কর্মে থাকলেই মনটা হাল্কা থাকবে—'

উদয় জানলা দিয়ে যত্নু মল্লিকের নোনাধরা পাঁচিলটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে ছিল, সেই ভাবে থেকেই সংক্ষেপে উত্তর দিলে, 'ওসব আর ভাল লাগছে না বাবা !'

বিজয়বাবু হাসলেন। ম্লান হাসি হেসে ছেলেকে গুটিকতক মূল্যবান উপদেশ দিলেন। সংসারের অনিত্যতা এবং ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ তথ্য ও উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে সংসারে কারুর জন্য কিছুই আটকায় না। অতএব এ জাড্য পরিত্যাগ করাই সমীচীন।

উদয় কোন উত্তর দিলে না।

উত্তরও যেমন দিলে না—তেমনি কথাগুলোয় কর্ণপাত করেছে বলেও মনে হ'ল না।

কারণ সে যেমন বসেছিল তেমনিই বসে রইল। খায়-দায় বসে থাকে চুপচাপ। রাত্রে ঘুমেরও কোন ব্যাঘাত হয় বলে বোঝা যায় না। শুধু বাড়ি থেকে কিছুতেই নড়ানো যায় না তাকে।

শুধু কেবল যে কলেজ যেতে চায় না তাই নয়—বাজার-হাটেও যেতে চায় না। বললেই বলে, 'ওসব আমার ভাল লাগছে না।'

ক্রমশ বিজয়চাঁদ রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠলেন।

মাত্রাটা যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবার।

তিনি বুড়ো মানুষ, এক হাতে বাজার-হাট করবেন, রান্না করবেন (পর-গোত্রে এতকাল খান নি, বুড়ো বয়সে ব্রাহ্মণ-নাম-ধারী ইত্তিকজাতের হাতে খেতে রাজী নন তিনি কিছুতেই), আবার অফিস করবেন আর অত বড় দামড়া ছেলে বসে থাকবে চুপচাপ—এ আবার কি কথা ? শোক কি তাঁরও লাগে নি ?···তা ছাড়া কই বাপু, শোকের জন্মে তো তোমার খাওয়া বন্ধ নেই !

অনুযোগ, অভিযোগ, ক্রমে তিরস্কার শুরু করলেন ; কিন্তু উদয়কে তবু নড়ানো গেল না। খুব বাড়াবাড়ি হ'তে সে নতুন পথ নিলে। সকাল বেলা উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরেই বেরিয়ে পড়তে লাগল। তবে বেশীদূর নয়, রায়েদের পুকুর পাড় পর্যন্ত গিয়ে বুড়ো সিঁদুরে-আমগাছটায় ঠেস দিয়ে বসে থাকত চুপ-চাপ—যতক্ষণ না বিব্রত বিজয়বাবু আবার সাধ্য-সাধনা ক'রে ডেকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। তাঁকে অফিসে যেতে হবে—ডেলি-প্যাসেঞ্জারের অফিস, একটু আগেই বেরোতে হয়—চাবি দিয়েও যেতে পারেন না। যা ছেলে, হয়ত খাবেই না সারাদিন। রাতদিনের ঝি-চাকরও নেই যে ডেকে খাওয়াবে। নিচে ভাড়াটেরা আছে বটে—তবে তারা নিজেদের নিয়েই যথেষ্ট বিব্রত। আজ-কালকার দিনে পরের জন্ম কে আর কতটুকু করতে পারে।

বিজয়বাবুর শুধু যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম হ'তে লাগল তাই নয়—একমাত্র ছেলের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তাঁর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার শেষ রইল না। তিনি ভেবে ভেবেই বলতে গেলে ভেতরে জীর্ণ এবং বাইরে কঙ্কালসার হয়ে উঠলেন।

লেখাপড়া আর করবে না—এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যেদিন, সেদিন থেকেই বিজয়বাবু উঠে পড়ে লাগলেন ছেলের চাকরির জন্মে। অনেক দুঃখে ও অনেক কষ্টে একটা চাকরি যোগাড়ও করলেন ; কিন্তু হাসি-হাসি মুখে যেদিন সেই একান্ত শুভ-সংবাদটা দিতে এলেন ছেলের কাছে, সেদিন সে তেমনি যদু মল্লিকের ছ্যাৎলাধরা দেওয়ালটার দিকে চেয়ে উত্তর দিলে, 'ও আমার ভাল লাগে না। চাকরি-বাকরি করতে আমি পারব না।'

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল বিজয়বাবুর। বাঙালীর ছেলে, চাকরি ভাল লাগে না—এ আবার কি কথা ?

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে ওঠবারই কথা—তবু কষ্টে আত্মসম্বরণ করলেন তিনি।

বললেন, 'তা বললে তো চলবে না বাপু। কিছু তো একটা করে খেতে হবে। পেট তো মানবে না। আমি আর ক'দিন তোমাকে খাওয়াতে পারব? আমারও তো পেন্‌সনের সময় হয়ে এল।'

'পেনসন পেলে আপনার পেটটা চলবে তো?...আমার ভাবনা আপনি আর ভাববেন না বাবা। যেদিন অসুবিধে হবে বলবেন—আমি আমার পথ দেখব।'

শোন কথা! এ তো উন্মাদের কথা-বার্তা।

এরপর বিজয়বাবুর উন্মাদ হয়ে ওঠবার কথা। কিন্তু তাঁর যে সে অবসরও নেই ছাই। একমাত্র ছেলে এমন কথা বললে তিনি চুপ ক'রে বসে থাকতে পারেন কই! গৃহিণীর জন্যে এতদিন তিনি শোকই অনুভব করতেন—এখন রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বে-আক্কেলে মেয়ে মানুষ, তাঁকে কী বিপদেই ফেলে গেল দেখ দিকি! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের পরকালটি মাটি ক'রে নিজে দিব্যি সরে পড়ল। এখন মর্‌ ব্যাটা তুই...

যাই হোক্‌, এবার আর বিজয়বাবু চুপ করে থাকতে পারলেন না।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, চিকিৎসকের কাছেও গেলেন।

ডাক্তার বেশ নাম-করা লোক। পাড়ায় খুব ভাল প্র্যাকটিস। তিনি সব শুনে বললেন, 'তাই তো! ঘুম হয় বলছেন, খিদেও আছে—অথচ আর যা সব বলেছেন এ তো পাগলেরই লক্ষণ! যাই হোক, রক্তটা একবার পরীক্ষা করান। আপনার কোন—মানে ইয়ে রোগ টোগ ছিল না তো?'

বিজয়বাবু রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টটা নিয়ে বিজয়গর্বে ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার বললেন, 'তাই তো! তবু, মেণ্টাল হাসপাতালে নিয়ে যান একবার। লুম্বিনীতে যেতে পারেন—।'

'আর কোন উপায় নেই?'

'আর উপায়?' হেসে বললেন ডাক্তার, 'বিয়ে দিয়ে দেখতে পারেন। তবে সে বড় রিস্‌কী, পরের মেয়ের জীবনটা নিয়ে ছেলে খেলা।'...

বন্ধুবান্ধবরা সকলে কিন্তু এই পরামর্শটাই সমর্থন করলেন।

এর মধ্যে কোন ঝুঁকি আছে তা তারা মানতে রাজী নন। আর থাকলেও

পরের মেয়ের ভাবনায় নিজের ছেলের বিবাহ দিতে কবে আবার কোন্ বাঙালী ইতস্তত করেছে?

সাব্যস্ত হ'ল বিয়েই দেওয়া হবে।

একটি বাড়ি, কিছু কোম্পানীর কাগজ এবং বাপের চাকরি আছে—ছেলেও—মূর্খ নয় একেবারে। সুতরাং মেয়ের অভাব হ'ল না। পাত্রী দেখা ও পছন্দ করা শেষ হ'লে এল পাত্র দেখবার পালা।

এতদিন উদয় কিছুই জানত না। এবার তাকে জানাতে হ'ল।

সে তেমনি উদাসীন ভাবেই বললে, 'ওসব চেষ্টা মিছিমিছি করবেন না বাবা, বিয়ে আমি করতে পারব না।'

এবার কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়লেন না বিজয়বাবু। তিনি তখন মরীয়া হয়ে উঠেছেনে। তিনি বললেন, 'কামিয়ে চান ক'রে পরিষ্কার হয়ে থাকো গে একটু। যা বলছি তা শোন। আমি তোমার বাপ, গুরুজন। তুমি শুধুই তোমার মর্জিমতো চলবে, আমার কথা শুনবে না—এ সম্ভব নয়। আমি আর কতকাল হাত পুড়িয়ে খাবো এমন ভাবে তাই শুনি? বলতে লজ্জাও করল না তোর—তাই ভাবি!···যাক্ গে যাক্। সে ভদ্রলোকদের আমি কথা দিয়েছি, তাঁরা আজ বিকেলে দেখতে আসবেন। তুমি যদি দেখা না দাও, অপমানের শেষ থাকবে না!···তা'হলে হয় তোমার পায়ে বেড়ি দিয়ে আমাকে পাগলা-গারদে পাঠাতে হবে, নয়ত তোমার সামনে মাথা খুঁড়ে মরতে হবে। এছাড়া তো কোন পথ আর দেখতে পাচ্ছি না!'

তাঁর কথার ভাবেই বোঝা গেল যে তিনি এবার সহজে ছাড়বেন না।

সেদিন যাই হোক, শেষ পর্যন্ত উদয় বেশ সুবোধ বালকের মতোই ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় পরে পাত্রীপক্ষের সামনে গিয়ে বসল। বিজয়বাবু আশ্বস্ত হলেন খানিকটা, ভাবলেন, বিয়ের নামেই ওষুধ দুই-ই বুঝি নির্ণীত হ'ল।

কিন্তু ছেলেকে তিনি তখনও চেনেন নি।

উদয় জানে সে পাগলও নয়—রোগগ্রস্তও নয়। আসলে সে দার্শনিক। জীবনের একটা বড় রহস্য জেনে ফেলেছে সে। জীবনে যখন এতই ক্ষণস্থায়ী তখন মিছিমিছি এ জীবন নিয়ে এত হাঙ্গামা করার কী আছে?

তার বাপের যথেষ্ট পয়সা আছে, সে তাঁর এক ছেলে। এই সমস্ত কিছু

ভবিষ্যতে সে-ই পাবে। যে বস্তুটা শেষ পর্যন্ত সে-ই ভোগ করবে সে-বস্তুটা যদি সে এখন থেকে ভোগ করতে চায় তো আপত্তির কি আছে? যে অল্প কটা দিন এখানে তার মেয়াদ সে কটা দিন সে চুপচাপ থাকতে চায় একটু। তার প্রয়োজন খুবই অল্প। সামান্য একটু খাদ্য এবং লজ্জা নিবারণের মতো একটু বস্ত্র, সেইটেই শুধু বিনা আয়াসে সে লাভ করতে চায়।

এতে এদের এত আপত্তি কেন?

তা-ও এতদিন যা-ও বা চলছিল, এবার যেন বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেল। হয় বিবাহ, নয় পাগলা-গারদ। হয় সংসারের বেড়ি, নয় লোহার বেড়ি—কেন রে বাপু। সংসারে গিয়ে পাগল হ'তে চায় না বলেই কি সে এদের কাছে পাগল প্রতিপন্ন হচ্ছে।

বড়ই উত্যক্ত বোধ করে উদয়, বড় বেশি জবরদস্তি বলে মনে হয়।

'প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত'—বহুদিন আগের শোনা কথাটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করে সে।

কিন্তু তাই যদি হয় তো এত কাণ্ড করে প্রাণ রাখারই বা প্রয়োজনটা কি?

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ উদয় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়।

কোন প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ অর্থহীন এই বেঁচে থাকাটা।

যতদিন এই দেহটা আছে ততদিনই আহার এবং আশ্রয়ের প্রশ্ন। আর এদের এই অবিরাম উৎপীড়ন। দেহটা না থাকলে কেউই আর কিছু করতে পারবেন না! কোনও অসুবিধাই নেই—সংসারকে একটি সুবৃহৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের।

কথাটা মাথায় ঢোকার পর থেকেই চিন্তাটা অবিরাম ঐ পথ ধরে চলল।

তিনদিন এবং দুটি রাত ক্রমাগত ভাবলে সে।

এই সিদ্ধান্তটাই মোটামুটি পছন্দ হ'ল ওর। সব দিক খুঁটিয়েই দেখলে সে—লাভ এবং লোকসান, pros এবং cons—দুই-ই। চুপি চুপি এ পৃথিবী থেকে সরে পড়াই ভাল। সামান্য এই ক'দিনের জীবন নিয়ে এত ধ্বস্তাধ্বস্তির প্রয়োজন বা সার্থকতা কিছুই নেই।

উপায়?

উপায়ের অভাব কি ? একটু ভাবভেই চমৎকার একটা উপায় মনে এসে গেল।

কোন হাঙ্গামা নেই, অর্থ ব্যয় নেই—এক মিনিটের মধ্যেই সব ফরসা।

ট্রেনের চাকায় গলাটা দেওয়াই সব চেয়ে সুবিধে।···কোন যন্ত্রণা টের পাবার আগেই তার অনুভূতি লোপ পাবে।···স্থানটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে এসে গেল—মুখুজ্জেদের আম-বাগানের কাছে রেল লাইনের বাঁকের মুখ, ঐ-খানটাই সব চেয়ে নির্জন—

যেমন ভাবা তেমন কাজ। কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবেই—যেন বাইরে একটু বেড়াতে যাচ্ছে এই ভাবে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। বিজয়বাবু তখন সবে অফিস থেকে ফিরেছেন, তিনি লক্ষ্যও করলেন, কিন্তু এটাকেও শুভ লক্ষণ এবং বিবাহের প্রস্তাবের আশু ফল অনুমান করে পুলকিত হ'লেন।···তবু বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তো!

ক'মাস যাতায়াত না করলেও উদয়ের গাড়ির সময় সব মনে ছিল। এইটে এক্সপ্রেস যাবার সময়। সব গাড়ি ওদের এ স্টেশনে থামে না, সুতরাং ওকে দেখলেও থামাতে পারবে না! ড্রাইভার কোনরকম ব্রেক কষবার আগেই কাজ খতম হয়ে যাবে।

সে লাইনের ধারে প্রস্তুত হয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু বিধি বাম। একটু বেশি আগে গিয়ে পড়েছিল। মুখুজ্জেদের মেজকর্তা নিরাপদবাবু ঐ সময় ঐখান দিয়েই আসছিলেন। আম-বাগানের প্রান্তে সাদা মতো কী একটা দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন লাইনের দিকে—

আর দৈবক্রমে ইঞ্জিনের ড্রাইভারও এদিকে চেয়ে ছিল। ক'দিন আগেই নৈহাটি লাইনে তারই গাড়িতে এই রকম কেস হয়ে গেছে। গাছের ঘন ছায়ায় সাদা কাপড়টা চোখে পড়তে সেও গতি কমিয়ে দিয়েছিল আগে থাকতেই। গরুও হতে পারে—কিন্তু মানুষ হওয়াও বিচিত্র নয়। এই সব জায়গাই তো আত্মহত্যার জায়গা।

সুতরাং ইঞ্জিনটা কাছাকাছি এসে পড়তে উদয়চাঁদ যেমন তাঁর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে অমনি ঝপ্ করে নিরাপদবাবু পেছন থেকে কনুইটি ধরে ফেলেলেন এবং ড্রাইভারও দিলে সুকৌশলে গাড়িটা থামিয়ে।

তারপর ?

তারপর মহা হৈ-চৈ। তিরস্কার—প্রশ্ন—বিদ্রূপের বন্যা বয়ে গেলে। গাড়ি থেকে প্যাসেঞ্জাররা নেমে এলেন। পাড়া থেকেও বহু লোক ছুটে এল। উদোর যে মাথাই খারাপ হয়ে গেছে সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ রইল না। নইলে আজ বাদে কাল যার পাকাদেখা সে যায় রেলে মাথা দিতে ? দু'চার ঘা চাঁটিও এসে পড়ল। ড্রাইভার এসে মারলে কষে এক চড়। রাগ তার হ'তেই পারে। ...পাড়ার লোকেরা ওঁদের নিরস্ত ক'রে—ধরে নিয়ে গেলেন ওর বাপের কাছে —'করছ কি ভটচায, ছেলের চিকিচ্ছে করাও। ছেলের রোগ যে ক্রমাগতই বাড়ছে।'

বিজয়চাঁদবাবু মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। উদয়ও পড়ল ফাঁপরে।

বিজয়বাবুর মাথায় হাত দেওয়ার কারণ অজস্র। শুধু যে ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা তাই নয়। বিয়েটাও বোধ করি ভেঙ্গে গেল। পাড়ার কোন দরদী বন্ধু পয়সা খরচ করে খবরটা পৌঁছে দিয়ে এসেছে কন্যাপক্ষকে। তাঁরা খুব অপমান করে চিঠি দিলেন। অমন প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি জেনে শুনে তাঁদের মেয়ের সর্বনাশ করতে বসেছিলেন। বদ্ধ-পাগল ছেলেকে গছিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁদের ঘাড়ে।

রাগে দুঃখে অপমানে বিজয়বাবু আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। তিনিও বেশ জোরে জোরেই ঘা-কতক চড় লাগিয়ে দিলেন অতবড় ছেলের গালে। হতভাগা বাঁদর। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে একেবারে।

হোক্ এক ছেলে। এমন ছেলে হওয়ার চেয়ে না হওয়াই ঢের ভাল ছিল।

গত জন্মে তিনি ঐ মাগীর কি সর্বনাশ করেছিলেন, তাই এ জন্মে একটা পাগল রেখে চলে গেল সে।...মৃতা স্ত্রীকে উদ্দেশ করে প্রাণের ঝাল মিটিয়ে গালাগাল দিলেন তিনি।

দু'দিন অফিস বেরোলেন না বিজয়বাবু। মধ্যম-নারায়ণ তেল এনে মাখালেন। ব্রোমাইড মিক্স্চার খাওয়ালেন। চোখে চোখে রাখলেন। উদয় কোন প্রতিবাদই করল না। সে জানত যে এ অবস্থায় প্রতিবাদটাই পাগলামির লক্ষণ বলে গণ্য হবে। তাকে নির্বিবাদে সব কথা শুনতে এবং সব ব্যবস্থা মেনে

নিতে দেখে বিজয়বাবুও অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। তাছাড়া অনন্তকাল তো অফিস কামাই করা যায় না ; পেনসনের সময় হয়ে গেছে, এখন অত কামাই করলে এক্‌টেনসনের আশা কমে যাবে। তিনি তৃতীয় দিনে দোতালার সিঁড়ির দোরে কুলুপ লাগিয়ে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে অফিসে রওনা হয়ে গেলেন।

উদয় হাসল মনে মনে।

ইচ্ছা থাকলে উপায়ের অভাব হয় না—সবাই জানে। তারই কি হবে ?

ব্রোমাইড মিক্‌স্‌চার আর মধ্যম-নারায়ণের ফলে লম্বা দিবা নিদ্রা দিয়ে যখন উঠল তখন পাঁচটা বাজে। আর দেরি করা ঠিক নয়। একটু পরেই বাবা এসে পড়বেন।

যাই হোক্, তেমনি খুব তাড়াও নেই। সে ধীরে-সুস্থে উঠল। একখানা চিঠি লিখলে, 'এতদর্থে খোস-মেজাজে বহালতবিয়তে অন্যের বিনানুরোধে' সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে এই মর্মের একটা চিঠি। চিঠিখানা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে বিছানার চাদরটা নিয়ে পাকিয়ে ফাঁস করলে। ওঘর থেকে বড় টুলটা নিয়ে এসে কড়ির সঙ্গে বাঁধল ভাল ক'রে—তারপর কোঁচার কাপড়টা বেশ ক'রে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে টুলের উপড় দাঁড়িয়ে ফাঁসটা গলায় লাগিয়ে পায়ে করেই টুলটা ঠেলে দিলে। ছেলেবেলায় তার এক মাসীমার গলায় দড়ি দেওয়ার গল্প সে শুনেছিল—তথ্যগুলো ভাল ক'রেই মনে ছিল তার।

তারপর ?

তারপর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখে জ্ঞান লোপ পাবার কথা। অন্তত তাই সে অনুমান করেছিল। কিন্তু হ'ল অন্যরকম।

পুরনো শালের কড়ি, দীর্ঘদিনের। ঘুণ ধরে ভেতরটা যে অত অন্তঃসার-শূন্য হয়ে এসেছিল—মোটা রংয়ের প্রলেপে তা বোঝা যায় নি। উদয়ের ভার খুব বেশি নয় কিন্তু তাইতেই হঠাৎ কড়িটা মড়মড় ক'রে ভেঙে পড়ল এবং তার সঙ্গে কিছু টালি বরগা ইত্যাদি খসে পড়ল ধরাশায়ী উদয়ের ঘাড়ে। অর্থাৎ জ্ঞান লোপ হ'ল ঠিকই কিন্তু সেটি মৃত্যুর ভূমিকা হিসাবে নয়। মাথায় চোট লেগে সাময়িক ভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

নিচে থেকে ভাড়াটেরা সেই প্রচণ্ড শব্দ পেয়ে ছুটে এল। মল্লিক এবং মজুমদার-বাড়ি থেকেও কেউ কেউ এলেন। দোরে তালা বন্ধ—তালা ভাঙাটা

যুক্তিযুক্ত হবে কিনা চিন্তা করতে করতে স্বয়ং বিজয়বাবু এসে পড়লেন। সেদিন কী একটা কারণে কয়েক মিনিট আগেই অফিস থেকে বেরোতে পেরেছিলেন তাই বাজার ক'রেও পাঁচটা পঁচিশের ট্রেন পেয়েছেন।

দোরের সামনে জটলা দেখেই তাঁর প্রাণ উড়ে গিয়েছিল, দোর খুলে কাণ্ড দেখে আবারও মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন।

এবার সকলেই পরামর্শ দিলেন যে আর কোনমতেই দেরী করা ঠিক নয় —কোন মেণ্ট্যাল হাসপাতালে পাঠানোই বিধেয়। উদয়ের এক মামা ভর্তি করার ভার নিয়ে এখান-ওখান ছুটোছুটি করতে লাগল। আর বিজয়বাবু আবারও অফিস কামাই ক'রে ছেলেকে পাহারা দিতে লাগলেন। ছেলে যে এমন শত্রু হয় মানুষের তা কেউ বোধ হয় কোনদিন শোনে নি। তাঁর চাকরিটি না খেয়ে ছাড়বে না—এ তো দিব্যি পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে।

এইবার কিন্তু উদয় প্রমাদ গণল।

মিছিমিছি অনর্থক টানা-হেঁচড়া এবং কতকগুলো ওষুধ খাওয়া।

তার উপর চিরকালের মতো একটা ছাপ। পাগলের মতো দুর্নাম মানুষের আর হ'তে পারে না, তা সে ভাল রকমই জানে। একবার সে সন্দেহ হ'লে অত্যন্ত সহজ কথাও মানুষ বাতুলের প্রলাপ বলে মনে করে—

অনেক ভেবেচিন্তে একদিন সে বাবাকে ডেকে বললে, 'আপনি আমার একটা চাকরীই দেখুন বাবা।···আর বসে বসে ভাল লাগছে না। কোন অফিসে তাড়াতাড়ি সুবিধা না হয় তো কোন কারখানা-টারখানাতেই নয় তো ঢুকি।'

বিজয়বাবু যেন নিজের কাণকেই বিশ্বাস করতে পারেন না।

বার বার জেরা ক'রেও যখন দেখলেন উদো বেশ সহজ প্রকৃতিস্থ ভাবেই কথা বলছে, তখন ছুটে গিয়ে পাঁচ আনার বাতাসা কিনে এনে হরির লুট দিলেন।

কিন্তু উদয় ঐখানেই থামল না। পরের দিন সে স্বেচ্ছায় বাপের সঙ্গে বাজারে গেল এবং আলু পটল বেছে বেছে আগেকার দিনের মতোই বাজার করল—বয়েও নিয়ে এল। পাড়ার আত্মীয়-বন্ধুরাও খুশি হলেন, 'ও যে পাগল

হয়ে গিয়েছিল, এখন সুস্থ হয়েছে আর তাই দেখে তাঁরা যৎপরোনাস্তি সুখী হয়েছেন' এই কথাটিই প্রাণপণে গোপন করার চেষ্টা করতে করতে প্রায় সকলেই জানিয়ে দিয়ে গেলেন।

উদয় হাসল। অভিনয় সে-ও করতে জানে বৈকি।

সে রান্নার সময়ও বাবার কাছে গিয়ে বসল। বলল, 'আপনি আর অনর্থক অফিস কামাই করবেন না বাবা। বিশ্বাস না হয় তো বলুন, আমি আপনার সঙ্গে বেরিয়ে আপনার অফিসে গিয়েই বসি!'

আনন্দে বিজয়বাবুর চোখে জল এসে গেল। ঈশ্বর বুঝি এবার মুখ তুলে চাইলেন।

তিনি বললেন, 'তার চেয়ে চল্ না দু'জনেই তোর মাসীর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আজ এমনিতেই অফিসের গাড়ি ধরতে পারব না, আর আজ অবধি ছুটি নেওয়াই আছে যখন—৷···অনেকদিন তোর মাসীর বাড়ি যাওয়াও হয় নি।'

উদয় তাতেও রাজী হয়ে গেল।

সে দিনটাও ভালয় ভালয় কাটতে পরের দিন বিজয়বাবু নিশ্চিন্ত হয়ে অফিস গেলেন। সেই চাকরিটা গেছে, তা যাক্—এখন আর একটা খোঁজ করতে হবে। হয়ত কিছু একটা হয়েও যাবে ভগবানের কৃপায়—ইত্যাদি নানারকম আশা ও আশ্বাস দিয়ে গেলেন যাওয়ার আগে।

উদয় আবারও হাসল। তার মন স্থির করাই আছে। এত দিগ্দারী তার পোষাবে না, তা সে জানে।

দুপুর নাগাদ উদয়ও বেরিয়ে পড়ল তালা দিয়ে। ভাড়াটে গিন্নী সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ বাবা?'

'দেখি মাসীমা—কলকাতাটাই একটু ঘুরে আসি বরং। বসে বসে আর ভাল লাগছে না।'

'দেখো বাবা—আবার যেন কোন কাণ্ড ক'রে বসো না।' একটু ভয়ে ভয়েই বলেন তিনি।

'না, না সে ভয় নেই।'

অপ্রতিভের হাসি হাসে উদয়। সে হাসি দেখে মাসীমা আশ্বস্তই হন।

কলকাতা থেকে এক ভরি আফিং সংগ্রহ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু শুধু আফিংই নয়, বাবা রাব্ড়ি ভালবাসেন, রাব্ড়ি, নতুন বেগুন —এমনি সব শৌখীন জিনিস কিনে সে বাড়ি ফিরল বিকেল থাকতেই—। বিজয়বাবু ফিরে এসে এই সব দেখে আরও খুশী হলেন। তিনিও রান্নার যোগাড় করলেন—বেছে বেছে ছেলেটা ভালবাসে সেই সব জিনিসই। মহা-আনন্দে অনেকদিন পরে গল্প করতে করতে বাপ-বেটায় বসে খেলেন। খাওয়ার পর উদয় নিজে তামাক ধরেয়ে এনে দিলে।·····বিজয়বাবু যে তার জন্য একটা চাকরি প্রায় একদিনেই যোগাড় করে এনেছেন—সেই মহামূল্য খবরটিও এই ফাঁকে দিয়ে দিলেন। খুব ভাল একটা কিছু নয়, তবে ঘরে বসে থাকার চেয়ে তো ভাল!

উদয় জানত অনেক কিছুই। বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনে শুনে অনেক কথা শিখেছিল।

আফিং নাকি সর্ষের তেলে গুলে খেলে অব্যর্থ মৃত্যু—কোন ডাক্তারই বাঁচাতে পারে না। সে এসেই একটা বাটিতে গুলে তৈরি ক'রে রেখে দিয়ে-ছিল লুকিয়ে। শোবার আগে বাবাকে লুকিয়ে এক ফাঁকে সেটি খেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শুল।

যাক, এবার আর কোন ভয় নেই। বার বার তিন বার। এবারে নিশ্চিন্ত। ···এখন শুধু ভয়, যন্ত্রণায় না বাবাকে উঠিয়ে ফেলে। আবার একটা হৈ-চৈ গোলমাল—আর সে দেখতে চায় না।

বার বার তিনবার!

কিন্তু এ কি?

এ যে বাবাই তাকে ডাকছেন!

'উদো ওঠ্ বাবা! চা হয়ে গেছে। মুখ ধুয়ে নে।'

তবে কি, তবে কি সে বেঁচেই আছে! না কি মৃত্যুর পরের জগৎ এটা?

আরও একটু পরে আর ভ্রম হবার কোন কারণ রইল না। সে বেঁচেই আছে। তেলে-গোলা-আফিমও বৃথা হ'ল তার অদৃষ্টে।

চা খেতে খেতে মনে পড়ল তার, অনেকদিন আগে খবরের কাগজে এমনি একটা ঘটনা বেরিয়েছিল। আফিং-এও নাকি ভেজাল দেওয়া হচ্ছে।

আফিং-এর বদলে খয়ের দেয়। এক ভরি খয়ের খেলে আর কীই বা হবে?

বার বার তিনবার।

উদয় এবার কথাটা নতুন ক'রে ভাবতে বসল।

যাকে বলে যমের অরুচি—দেখা যাচ্ছে সে তা-ই।

এখন মৃত্যু তার অদৃষ্টে নেই। তাকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে হয়ত ভগবানেরও কোন একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। বড় একটা কোন কাজ তাকে দিয়ে করাতে চান তিনি।

উদয় এবার সোজাসুজি জীবনের দিকেই মুখ ফেরাল।

চাকরি তার বাবা একটা শীগ্‌গিরই জোগাড় করে দিলেন। নতুন ক'রে বিয়েরও চেষ্টা চলতে লাগল। সে কথাটাও যে কানে এল না তা নয়—কিন্তু তাতেও উদয় এবার আর বিচলিত বোধ করল না। বাঁচতে যদি হয় তো জীবনের সব ধর্মই পালন করতে হবে। আপত্তি ক'রে লাভ কি?

শুধু তাই নয়। দেহটা যেদিন থেকে রাখা স্থির করল সেদিন থেকে তার পরিচর্যাতেও লাগল উঠে-পড়ে। রাখতে যদি হয় তো ভাল করেই রাখবে সে।

সে নিয়মিত দু-বেলা ব্যায়াম করতে শুরু করলে, আর সেই ফাঁকে বেশি করে দুধ ও বাদাম খেতে।

দেখতে দেখতে তার দেহ সুপুষ্ট সুন্দর হয়ে উঠল।

সেদিকে চাইলে বিজয়বাবুর চোখ জুড়িয়ে যায়।

তিনি ছেলের বিয়ের জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন।

পাঁচটা দেখতে দেখতে এক জায়গায় মেয়ে একটি পছন্দও হ'ল তাঁদের। একার মতে চলেন নি বিয়জবাবু, ছেলের মামা মেসো সবাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই ঠিক করলেন।

মেয়ে-দেখা ছেলে-দেখা শেষ হ'তে পাকা দেখার দিনও একটা ধার্য হ'ল।

কে কে আসবে, বৌকে কী কী দেবেন, বিজয়বাবু ফর্দ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ঠিক হ'ল পাকা দেখার আগের দিন থেকে উদয়ের মাসীমা এসে থাকবেন। বাকী সকলে আসবে বিয়ের আগে। ওর মায়ের কতক গয়না ভেঙে গয়না

গড়তে দিলেন বিজয়বাবু।

আর মোটে দুটি দিন বাকী আছে—সকালে উঠে উদয় বললে, 'আমার কপালটা একটু দেখুন তো বাবা।'

'কেন রে, জ্বর হ'ল নাকি ?' বিজয়বাবু উদ্বিগ্ন হয়ে এসে হাতের উল্‌টো পিঠ ক'রে তাপ নেন ছেলের।

'ইস্ তাইতো, এ যে বেশ জ্বর!—কী হবে ? ডাক্তারবাবুর কাছে যাব নাকি একবার ?'

'কী যে বলেন বাবা। সামান্য একটু সর্দিজ্বর—ডাক্তার ডাকতে হবে!—ভাতটা আর নেবেন না—পাঁউরুটি-টুটি খাবো যা হয়।'

বিজয়বাবু কিন্তু বেশ একটু চিন্তিতই হন। 'কাল বাদ পরশু আশীর্বাদ, এখন আবার জ্বর বাধিয়ে বসলি!'

'ও কিছু নয়, বিকেলের দিকেই ছেড়ে যাবে।'

কিন্তু সে জ্বর বিকেলের দিকে ছাড়ল না। বিজয়বাবু অফিস থেকে ফিরে টেম্পারেচার নিলেন—১০২°।

বললেন, 'তুই আর একটু একা থাক। আমি ডাক্তারের কাছে যাই একবার।'

উদয় রাগ করল, 'আপনার সবতাইতে বাড়াবাড়ি। আজকের দিনটা দেখলে হ'ত।'

কিন্তু বিজয়বাবু সে কথায় কান দিলেন না। জামা কাপড় না ছেড়েই ছুটলেন।

ডাক্তার এসে বললে, 'না—এধারে তো কোন গোলযোগ নেই। ইনফ্লুয়েঞ্জাই হবে হয় তো, ম্যালেরিয়া হওয়াও আশ্চর্য নয়। দু'-একটা কেস হাতে আসছে ম্যালেরিয়ার—। যাই হোক, মিকস্‌চার একটা চলুক আজ। কাল কেমন থাকে দেখে যা হয় করা যাবে।'

বিজয়বাবু ওর বার্লির ব্যবস্থা করলেন।

উদয় প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'কী হয়েছে তার ঠিক নেই, আপনি খাওয়া বন্ধ করলেন। খিদেতে আমি এদিকে মরে যাচ্ছি। নিদেন একটু হালুয়া করুন। নইলে বেরিয়ে গিয়ে বাজারের খাবার খেয়ে আসব হয়ত—শেষ পর্যন্ত।'

বিজয়বাবু ইতস্তত করে মাঝামাঝি একটা রফা করলেন—ছধ-সুজি।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে অবশেষে ওর তন্দ্রা আসতে শুতে গেলেন। ঠিকই বলেছে উদো, বিশেষ কিছু নয়। কারণ তাপটা তখনই অনেক কমে গেছে। কপালটায় এখনই একটু একটু ঘাম দেখা দিয়েছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে বিজয়বাবুর মনে হ'ল যে, তাঁকে যেন কে ডাকছে।

উদো কি? উদোর গলা? 'বাবা' বলেই তো ডাকছে। কিন্তু যেন বহু—বহু দূর থেকে।

স্বপ্নের মধ্যেই ব্যাকুল হয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন বিজয়বাবু। ছেলের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন। না, অঘোরে ঘুমুচ্ছে উদয়—একটু একটু নাকও ডাকছে।

বিজয়বাবু আশ্বস্ত হলেন। সবটাই তাঁর স্বপ্ন।

ফিরেই আসছিলেন—কী মনে ক'রে সন্তর্পণে ছেলের গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন একবার।

এ কী—এ যে একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা।

না—ঘাম তো নেই।

'উদয়, বাবা উদয়চাঁদ!' বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন বিজয়বাবু। ঐ তো নিঃশ্বাসের আওয়াজ হচ্ছে। একটু ঘড় ঘড় করে যেন নাকও ডাকছে।

তবু কেমন যেন বোধ হ'ল বিজয়বাবুর। তিনি ছুটে গিয়ে নিচের ভাড়াটেদের ডেকে আনলেন। ভাড়াটে ভদ্রলোক বহুদর্শী। তিনি এসে মুহূর্তে কয়েক দাঁড়িয়েই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন ডাক্তার ডাকতে।

তাঁর গৃহিণী চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, 'গঙ্গাজল আছে ঘরে?'

ডাক্তার এসে পৌঁছবার আগেই ঘড়ঘড়ানি শব্দটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

বিপিনবাবু বেঁচে থাকতেই যে কস্তুরোকে একদিন এ বাড়ি থেকে সাধারণ বরখাস্ত-করা ঝিয়ের মতো পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে—তা কস্তুরোও কোন দিন ভাবে নি, বিপিনবাবুও না।

অথচ তাই তো হ'ল!

এবং সেইদিনই বিপিনবাবু প্রথম অনুভব করলেন যে, স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁর আবার বিয়ে করাই উচিত ছিল। কস্তুরো যদি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী হ'ত তাহ'লে আজ অরুণ তাকে এমন করে বার ক'রে দিতে পারত না—হয়ত অরুণকেই সস্ত্রীক এখান থেকে পাত্‌তাড়ি গুটোতে হ'ত।

আজ যে বিপিনবাবু বাধা দিতে পারলেন না—এমন কি কিছু বলতেও পারলেন না, সে কি এখন আর তিনি উপার্জন করেন না ব'লে? না, তা নয়। চাকরি না থাক, প্রচুর সম্পত্তি আছে তাঁর—এখনও তিনি নিজের বিষয়ের আয় থেকেই খান—ছেলের গলগ্রহ নন।

শুধু একটা অনুষ্ঠানের অভাবেই এতবড় কাণ্ডটা হ'তে পারল তাঁর জীবনে।

সন্তান, পুত্রসন্তান কামনা করে লোকে অনেক আশা ক'রে—বৃদ্ধবয়সের জন্য। তিনিও একদা করেছিলেন বৈ কি! হায় রে! এই তো সব ছেলে, বাপের কথাটা একবারও ভাবল না, তাঁর প্রয়োজনের কথাটা চিন্তা করল না।

অথচ বিপিনবাবুর যখন স্ত্রীবিয়োগ হয়, তখন ওঁর কীই বা বয়স, মাত্র চুয়াল্লিশ। পূর্ণ স্বাস্থ্য তখনও, পশ্চিমের জল-হাওয়ায় নিটোল শরীর—কোথাও তাতে একটুকু বার্ধক্যের শিথিলতা দেখা দেয় নি। আর আর্থিক দিক থেকে—একটা কেন, একাধিক বিবাহ করলেও ভরণপোষণের কথা চিন্তা করতে হ'ত না।

যদি তখন একটা বিয়ে করতেন!

ছেলের ওপর যোগ্য শোধ নেওয়া হ'ত তাঁর। নিমক-হারাম, স্বার্থপর ছেলে!

কিন্তু সেদিন সে প্রয়োজনটাই বোঝেন নি যে!

কস্তুরোই বুঝতে দেয় নি তাঁকে।

মরবার আগে সুরবালা প্রায় বৎসরখানেক ভুগেছিলেন। সেই সময়ই কস্তুরো কাজ করতে আসে এ বাড়িতে। আঠারো-উনিশ বছরের আদিবাসী মেয়ে, পরিপূর্ণ যৌবনে ও স্বাস্থ্যে টলমল করছে। ঝি হয়েই এসেছিল, কিন্তু ঠিক ঝি হয়ে থাকে নি সে—কিন্তু সে কি শুধুই ওঁর জন্য?

না। যা পেয়েছে, যে মর্যাদা পেয়েছে কস্তুরো—সে ওর নিজেরই গুণে অর্জন করেছে সে।

এই গাঁয়েই ওদের বাড়ি। ওর বাপ-মা ওঁর ক্ষেতে জনমজুরী করেছে চিরকাল। ছেলেবেলা থেকেই চেনেন ওকে। মাঝখানে বছর কতক ছিল না, বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিল। তারপর কি একটা গোলমাল হয়—সে সম্পর্ক চুকিয়ে ফিরে আসে কিছুকাল পরেই।

সে সুরবালার মৃত্যুরও বছর দুই আগেকার কথা। তখন এতবড় সরকারী কারখানা হয় নি এখানে, মেয়েদের কাজ অত সস্তা ছিল না। মাঠে ঘাটে দিনমজুরি খাটতো কস্তুরো। পেশকারবাবুর বাড়ি খোরপোশের কাজ পেয়ে বেঁচে গেল সে। খাওয়া, পরা, আবার মাসিক দু'টাকা মাইনে—ওর বাবা-মাও আপত্তি করে নি।

কস্তুরোর যেমন স্বাস্থ্য ছিল—তেমনি খাটতেও পারত সে। বিপিনবাবুর সংসারে কাজ কম ছিল না। তিনটে ছেলেমেয়ে গোরু বাছুর, মুরগী, হাঁস—ধান-চাল, জমি-জমা, পুকুর, কিছুরই অভাব ছিল না বিপিনবাবুর, আজও নেই। এসব আছে বলেই হতভাগা ছেলে খেতে পাচ্ছে। নইলে সরকারী ইঞ্জিনের কারখানায় লোহা পিটিয়ে যত টাকাই পাক সংসার চালাতে হ'ত না ওকে।

তখনকার দিনে স্থানীয় আদালতের পেশকার। ঘুষের 'মা-বাপ' ছিল না। অনেক কিছুই করেছিলেন তিনি। ছেলেটা যদি সামান্য একটুও লেখাপড়া শিখত, তাহ'লে তিনি এই লাইনেই ঢুকিয়ে দিতেন চেষ্টাচরিত্র করে। কিন্তু কিছুই শিখল না যে! ওর মা নিজে ম'ল—ছেলেটিরও পরকাল ঝরঝরে ক'রে রেখে গেল—অতিরিক্ত আদর দিয়ে দিয়ে। আর ঐ কস্তুরো! ও-ই কি কম আদর দিয়েছে?

নিজের অপরিসীম কর্মদক্ষতায় সুরবালা বেঁচে থাকতে থাকতেই কস্তুরো এ বাড়ির আধা-গৃহিণী হয়ে উঠেছিল ; তিনি চোখ বুজতে পুরোপুরিভাবেই সেই পদ অধিকার করলে। ভাঁড়ারের চাবি আগেই আঁচলে উঠেছিল—এইবার বিপিনবাবুর আলমারীর চাবিও উঠল। আলমারী কেন—পরবর্তী জীবনে লোহার সিন্দুকের চাবিও ওর হাতে দিয়েছিলেন তিনি এবং সেজন্য একদিনের জন্যও অনুতপ্ত হবার কোন কারণ ঘটে নি। তাঁর পয়সা নিজের বুকের রক্তবিন্দুর মতোই সযত্নে বাঁচিয়েছে সে। সুরবালা বরং সংসার খরচের টাকা সরিয়ে নিজের গহনা গড়াতেন—কস্তুরো কখনও তা করে নি। সামান্য যা দু-চারখানা রূপোর গহনা তিনি করিয়ে দিয়েছিলেন তাতেই সে খুশি ছিল। বরং গৃহিণী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক মাহিনা নেওয়াটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যার হাতে সব, সে সামান্য ঝিয়ের মতে মাইনে নেয় কেমন ক'রে ?

পরিপূর্ণ সুখে এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতেই কটা বছর কেটেছে তাঁর।

রান্নাবাড়া, জল তোলা, বাসন মাজা, ধান-চালের পাট, গোরু-বাছুর সামলানো—একা এক-হাতে করেছে কস্তুরো। একটি দিনের জন্যেও সংসারের ভাবনা আর তাঁকে ভাবতে হয় নি, সে আসার পর। তার ওপর করেছে সে তাঁর দৈহিক সেবা—যেটা সুরবালার আমলে কোনদিন পান নি তিনি। এমন যে হয়—তা-ই তো ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে। প্রতিদিন সে তাঁকে সকালে তেল মাখিয়ে দিয়েছে। রাত্রে পা টিপে দিয়েছে, চা-তামাক জুগিয়েছে মুহু-র্মুহুঃ। বুড়ো বয়সে বাত আশ্রয় করাতে কদর্য ও দুর্গন্ধ তেল দিয়ে মালিশ করেছে, সেঁক দিয়েছে—শয্যাগত হয়ে থাকলে মেথরের কাজও করেছে সে।

কী দিয়েছিলেন তিনি তার বদলে ?

এক টাকা মাইনে নয়, ভবিষ্যতের কোন সংস্থান নয়। ওসব কথা মাথাতেই যায় নি তখন। চিরকালের মতোই এ সংসারের সঙ্গে যে জড়িয়ে গেছে—তার আবার ভবিষ্যতের ভাবনা কি ? এর ভবিষ্যতেই তারও ভবিষ্যৎ। বরং পান থেকে চুন খসলে খিঁচিয়েছেন তাকে তিনি—অনায়াসে। যেন সব কাজ নিখুঁত ক'রে করতেই সে বাধ্য।

আর করতও সে। ঈশ্বর যেন কোন ক্লান্তি দেন নি ওকে, দেন নি কোন

রোগ। কোনদিন তার এতটুকু জ্বর হয় নি, মাথা ধরে নি। চিরকাল শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—এই একই খাটুনি খেটেছে সে, সংসারের এই দুঃসহ ঘানিগাছে নিয়ত ও নিত্য আবর্তিত হয়েছে—একই ভাবে।

সব চেয়ে, পরের ছোট ছেলেমেয়ে সামলানো—বিশেষতঃ যার নিজের সন্তান হয় নি তার পক্ষে—বড়ই বিরক্তিকর। কিন্তু তাও হাসি মুখে করেছে সে। নিজের মায়ের মতো তো বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত তারও বেশি। কোন সাধারণ বিমাতা এত যত্ন করত না ওদের, তা তিনি ভাল রকমই জানেন। হয়ত সেজন্যও কতকটা—বিয়ে করার কথা আদৌ ভাবেন নি তিনি।

ছেলেমেয়েরা অবশ্য প্রথম দিকে তাকে মার মতোই দেখত, তেমনিই ভালবাসত। বিপিনবাবু কস্তুরো ব'লে ডাকতেন, সেই শুনে ওরাও প্রথম প্রথম শুধু নাম ধরত। তারপর উনিই শিখিয়ে দিয়েছিলেন মা বলতে ; শেষে সেটা দাঁড়িয়েছিল—'কস্তুরো-মা'।

প্রথম সেই নিররচ্ছিন্ন সুখ-শান্তিতে ছেদ পড়ল বড় মেয়ে রেণুকণার বিয়ের সময়।

বিয়ের সব ঠিক-ঠাক, উদ্যোগ আয়োজন, বাজার হাট সব প্রস্তুত—কস্তুরো আনন্দে আটখানা হয়ে যেন দশ হাতে কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে, জামাই আসবে, এ ওর জীবনে এক অভাবনীয় ঘটনা। বিপিনবাবু সাধারণ কিছু উদ্বেগ বোধ করলেও, বেশ আনন্দেই ছিলেন। হঠাৎ এক সময় অরুণ এসে ওঁকে বাইরের বাগানে ডেকে নিয়ে গেল, 'বাবা শুনুন—'

স্বর গম্ভীর, ললাটে ভ্রূকুটি। বিপিনবাবু একটু ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। তবু তখনই কথাটা বলতে পারে নি অরুণ। তখনও এতটা চক্ষুলজ্জাহীন হয় নি বোধ হয়।

মাথাটাথা চুলকে, অনেক ইতস্তত করে বললে, 'একটা কথা বলছিলুম বাবা, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। নেহাৎ না বললে নয় বলেই—'

'কি রে ? কি কথা ?' বিপিনবাবু আরও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

'না—মানে,—এসব সাঁওতালদের দেশে এ রকম চলে হয়ত হামেসা, কিন্তু রেণুর তো বাংলা দেশে বিয়ে হচ্ছে, জামাই এর পর আসা-যাওয়া করবে, সে কি ভাববে ? ও পাড়ার চন্দর পিসেমশাই-ই আমাকে ডেকে বললেন কথাটা

চুপি চুপি—তাই বলছিলাম—কস্তুরো-মা যে আপনার ঘরেই থাকে, এটা আর ভাল দেখায় না। অন্ততঃ লোক-দেখানো একটা আলাদা ঘরও ওর থাকা দরকার।'

চব্বিশ বছরে ছেলে, এসব কথা বলবার বয়স যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু কথাটা বলতে বলতে তার মুখ সেদিন সিঁদুরের মতোই লাল হয়ে উঠেছিল, প্রথম হেমন্তের হিমার্দ্র প্রভাতেও ঘেমে উঠেছিল বেচারা।

বিপিনবাবু কিন্তু রেগেই উঠেছিলেন প্রথমটায়। 'চন্দর পিসেমশাই' সম্পর্কে ঘোরতর একটা অশ্লীল কটূক্তি ক'রে ছেলেকেও খুব ধমক দিয়েছিলেন।

'আমাকে যেন কেউ ভাল মন্দ উচিত অনুচিত শেখাতে না আসে। কোন শালার এক পয়সা ধারি না আমি, কারও তোয়াক্কা রাখি না। যা খুশি আমার তাই করব।...জামাইকে ভয় করব নাকি?...তার খারাপ লাগে সে না হয় এরপর আর আসবে না এখানে—এই তো? চার হাজার টাকা খরচ ক'রে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি, আবার অত তোয়াজ করা—আমার দ্বারা পোষাবে না বাপু। এই সাফ্ বলে দিলুম।'

অরুণ মুখ চুন ক'রে চলে গিয়েছিল—কিন্তু কস্তুরোর চোখ এড়ায় নি ঘটনাটা। অত রাগারাগি কি নিয়ে হচ্ছিল, সে সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়াটাও স্বাভাবিক। সে বিপিনবাবুকে আড়ালে ডেকে দু-চারটে জেরা করতেই কথাটা বেরিয়ে এল। জিভ-টিভ কেটে সে বললে, 'তুমি কি পাগল হয়েছ বাবু, খোকা হক্ কথাই বলেছে। এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সত্যিই তো —লোকে কি বলবে?'

আগে সাধারণ সাঁওতালদের মতো বাবুকে 'তুই' বলত কস্তুরো—এখন অনেকটা বাঙালী ঘেঁষা হয়ে 'তুমি' বলতে শিখেছে।

বিপিনবাবু তখনও প্রবল আপত্তি করেছিলেন, চেঁচামেচিও করেছিলেন খানিকটা। 'নেই দেঙ্গে, লেড়কীকো সাদী হাম নেহি দেঙ্গে—' ইত্যাদি। কিন্তু এক কথায় কস্তুরো তাকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে। আলাদা একটা ব্যবস্থা থাকবে এই মাত্র, যে দু-একদিন জামাই থাকবে—সে না হয় আলাদাই শোবে —তাতে তাঁর সেবার ব্যাঘাত হবে এমন আশঙ্কা বিপিনবাবু করছেন কেন?

কোলের মেয়েটা যখন খুব ছোট ছিল—তাকে নিয়ে ওঘরেই তো থাকত কস্তুরো, তাতে তাঁর পা টিপে দেওয়ার কোন ত্রুটি হয়েছে, না ভোর চারটেয় উঠে চা-তামাক পান নি ?

বিপিনবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।

সেইদিনই—কর্মবাড়ির ব্যস্ততার মধ্যেই কস্তুরো তার পৃথক ব্যবস্থা করে নিলে। পাশের একটা ছোট ঘরে কোদাল-লাঙল প্রভৃতি চাষের আসবাবপত্র থাকত, সেগুলো গোয়ালের একপাশে স্থানান্তরিত ক'রে সেইখানে নিজের খাটিয়া পাতলে। তারপর ঘরের ভেতরই হুকে হুকে একটা দড়ি টাঙিয়ে কাপড় রাখার আলনা বানানো হ'ল। কাপড়চোপড় তো বটেই—মায় একটা আলাদা শিশিতে মাথার তেল, সাবানের বাক্স, চুলের দড়ি-কাঁটা প্রভৃতি নিজের যাবতীয় জিনিস (ইদানীং বাঙালী মেয়েদের মতোই প্রসাধন অভ্যাস করেছিল সে, জামাও গায়ে দিত এদের দেখাদেখি) এনে এ ঘরের কুলুঙ্গিতে সাজিয়ে নতুন ক'রে সংসার পাতলে।

ঘর গোছানো শেষ হ'লে মুচকি হেসে বললে, 'নাও গো বাবু—এবার আমার সংসার আলাদা হয়ে গেল। কম্‌পিলিট্! বেশ ভাল হ'ল না ?'

দাঁতে দাঁত চেপে বিপিনবাবু শুধু বললেন, 'হুঁ !'

সেই শুরু—কিন্তু, বলা বাহুল্য যে সে-ই শেষ নয়।

আলাদা ঘরে হ'লেও সে ঘর নির্বাসন দেওয়ার প্রয়োজন হ'ত কখনও-সখনও, জামাইরা এলেই। অবশ্য জামাইরা বলতে শুধু তো দু'জন জামাই-ই নয়—তাদের আত্মীয়-স্বজন অনেকেই আসত যখন-তখন। সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্যকর স্থানে কুটুমের বাড়ি হ'লে অনেকেরই কুটুম্বিতা গাঢ় করার ইচ্ছা হয়। বিশেষত একথাটা যখন জানা-ই যে, এ পক্ষ কলকাতায় গেলে যদি বা জামাইবাড়ি ওঠেন, জামাইয়ের আত্মীয়বাড়ি গিয়ে উঠবেন না।

তাই সতর্ক হয়ে চলবার সময়গুলো একটু বেশি ঘন ঘন আসতে লাগল আজকাল। ছোট মেয়ের বিয়ের পর রীতিমত অসুবিধা ভোগ করতে লাগলেন বিপিনবাবু। অনুকণার শ্বশুরদের বৃহৎ গুষ্টি, আত্মীয়দের আসার যেন বিরাম রইল না।

আর কস্তুরোরও একটু বাড়াবাড়ি আছে।

সে এই সময়গুলো তাঁর ধারে-কাছেও আসতে চাইত না। বাতের তেল মালিশ করতে হ'লেও সকলের সামনে বসে ক'রে দিত। বিপিনবাবু রাগারাগি করলে বলত, 'কী দরকার বাবু, কটা দিন বৈ তো নয়। মিছিমিছি আমার জন্যে যদি মেয়েগুলোকে বাঁকা কথা শুনতে হয় শ্বশুরবাড়িতে, তো সে বড়ই লজ্জার কথা হবে। তার চেয়ে চেপেচুপে থাক একটু।'

তবুও যা হোক চলছিল—অরুণের বিয়ের কথাতেই আকাশ ভেঙ্গে পড়ল বিপিনবাবুর মাথায়। অথচ প্রসঙ্গটা যতই এড়িয়ে এড়িয়ে যান তিনি—আত্মীয় স্বজনরা অনবরত সেটাকে সামনে হাজির করে। যারা কেউ কখনও খবর নিত না, সুরবালার মৃত্যুর পর তাঁর যে সব আত্মীয়রা একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে নি—পাছে অনাথ ছেলে-মেয়ের ভার কাঁধে এসে পড়ে এই ভয়ে—তারা সবাই এখন ছেলেটাকে 'থিতু' করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। কারণ সকলকারই আত্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে।

অবশেষে কস্তুরোও উঠে-পড়ে লাগল।

'কিগো বাবু, ছেলেটাকে ঘরবাসী করতে হবে—না হবে না? নাকি তোমার মতো সাঁওতাল নিয়ে জীবন কাটাবে? ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখছ আজকাল? এবার সোজাসুজি কোনদিন গিয়ে ঐ পাড়ায় উঠবে।'

'হুঁ। উঠবে উঠুক। তা আমি করব কি? বিয়ে করে খাওয়াবে কি? ঐ তো মুরোদ! ক'টা টাকা মাইনে পায় তাই শুনি? আমার তো চাকরি গেল। এখন আয় বলতে রইল কি?'

'তা বললে কি চলে? তোমার এত বিষয় খাবে কে? ও-ই তো পাবে আর চিরকাল কি তোমার এই ঝি নিয়ে চলবে? ব্যাটার বউ আসবে, নাতি-নাতনি হবে—তবে তো সংসার।'

'দেখ্ কস্তুরো, মেলাই ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নি বলে দিলুম।'

যতই বলুন, শেষ পর্যন্ত তোড়জোড় করতেই হয়। পাত্রী দেখতেও যেতে হয় এখানে-ওখানে। এবং একসময় এক জায়গায় পাত্রী পছন্দ হয়েছে—একথাও স্বীকার করতে হয়।

ভবানীপুরে বাড়ি ওদের, ক্লাস টেন অবধি পড়েছে। গান বাজনা সেলাই

জানে। দেখতেও সুশ্রী। এমন মেয়ে যে তারা তাঁর গোমূর্খ মিস্ত্রী ছেলেকে দিতে চাইছে এ-ই ঢের। অবশ্য দিচ্ছে তাঁর ছাপ্পান্ন বিঘে ধান-জমি, বাগান, পুকুর এবং এতবড় বাড়ি দেখেই—তা তিনি জানেন—তবু এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ আশা করাই অন্যায়।

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। পাকাদেখা, বিয়ে—সবই নির্বিঘ্নে চুকে গেল।

কস্তুরোর আনন্দের সীমা রইল না। তার খোকার বউ—এমন মেমেদের মতো হার্মোনিয়াম টিপে গান গাইতে পারবে, এ ছিল তার ধারণার অতীত। সবাইকে সগর্বে সে বার বার তার 'বৌমা'র অত্যাশ্চর্য কৃতিত্ব দেখাতে লাগল।

প্রথম ঝড়ের সঙ্কেত পাওয়া গেল অরুণের বৌ হেনা ঘরবসত করতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই।

শাশুড়ীর পদমর্যাদায় কস্তুরোকে অধিষ্ঠিত দেখতে সে রাজী নয় আদৌ। পরিষ্কার এ কথা একদিন অরুণকে বুঝিয়ে দিল সে এবং স্বামী শ্বশুরকে দেখিয়ে দেখিয়ে কস্তুরোর হুকুমের ওপর হুকুম চালিয়ে, তার উপদেশ-নির্দেশ অবহেলা ক'রে দেখিয়ে দিতে লাগল যে, সে-ই এ বাড়ির কর্ত্রী এবং সে কথাটা কস্তুরোর ভোলা উচিত নয়।

কস্তুরোর দারুণ আঘাত লাগল। ঝগড়া করার কথা নয়, সে ইচ্ছাও হ'ল না তার। দারুণ অভিমানে সে শুধু নিজেকে যথাসম্ভব গুটিয়ে আনলে। কিন্তু হেনা অল্পে থামবার মেয়ে নয়।

সে শ্বশুরকে শুনিয়েই একদিন অরুণকে বললে, 'যখন কেউ ছিল না তখন যা হয়েছে হয়েছে—এখন আমি থাকতে আলমারী সিন্দুক ভাঁড়ারের চাবি থাকবে ঝিয়ের কাছে, আর আমার একটা পয়সার কখনও দরকার হ'লে তাঁর কাছে দরবার করতে হবে—সে আমার সইবে না। আমার বাপ ভদ্দরলোক জেনেই বিয়ে দিয়েছিলেন, সাঁওতালের ঘর জানলে দিতেন না।'

অরুণ কোন কথা বলবার আগে বা ক্রুদ্ধ দিশেহারা বিপিনবাবু বাধা দেবার আগেই কস্তুরো চাবির গোছাটা আঁচল থেকে খুলে হেনার সামনে ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে চলে গেল। হেনাও তা বিনা বাক্যব্যয়ে তুলে বাঁধলে নিজের আঁচলে।

বিপিনবাবু আড়ালে কস্তুরোকে যথেষ্ট তিরস্কার করলেন, 'কেন দিলি তুই ? কার হুকুমে দিলি ?'

'একদিন তো দিতেই হ'ত বাবু। ওর জিনিস—সহমানেই ওকে ফিরিয়ে দেওয়া ভাল, নইলে হয়ত চোর দুর্নাম কিনতে হ'ত।'

'কে বলেছে ওর জিনিস। কে তোকে বলেছে। ওর কাছ থেকে পেয়েছিলি তুই ? আমার জিনিস, আমি তোকে দিয়েছি—রাখতে না পারিস আমাকে বুঝিয়ে দিবি।'

'ছি বাবু। এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা গরম ক'রো না। হাজার হোক আমি ঝি, আর ও তোমার ব্যাটার বউ। ওরই তো জোর।'

কিন্তু গোলমালটা এইখানেই থামল না। কস্তুরো যতই নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করুক, সহ্যের একটা সীমা আছে। অভ্যাস স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। দীর্ঘদিন এ সংসারে কর্তৃত্ব করেছে সে, নিপুণভাবেই করেছে। হেনার সাধ আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই। নিপুণতা তো নেই-ই। সংসারের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাই সে বারে বারেই কস্তুরোর কাছে অপদস্থ হয়। আর যত অপদস্থ হয় তত চটে যায়—ওকে অপমান করে নিজের লজ্জার শোধ তুলতে চায়।

আজকাল প্রায়ই বলে, আমার সংসার—লাভ হয়, লোকসান হয়, অপচয় হয়—আমি বুঝব। তুমি সব তাইতে নাক নাড়তে আস কেন ? ঝি, ঝিয়ের মতো থাকবে।'

অরুণ এখনও বলে 'কস্তুরো-মা'—হেনাও প্রথম প্রথম তাই বলত, এখন ডাকে শুধু 'কস্তুরো' বলে।

শেষ পর্যন্ত একদিন কস্তুরোর সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। বললে, 'কোথায় ছিলি তুই ? এই সংসার এক হাতে করেছি। তোর বরকেই বা মানুষ করলে কে রে ? আজ যে গিন্নি হ'তে এসেছিস ?'

'বেশ তো, শ্বশুর মশাই নিজে যেমন সাঁওতাল গিন্নী কেড়েছিলেন—আধা সাঁওতাল ছেলেরও তেমনি একটি কেড়ে দিলেই তো পারতেন। ভদ্দরঘরের মেয়ে আনবার সাধ কেন ?'

হঠাৎ কস্তুরোর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'হ্যাঁ, ভদ্দরঘরের মেয়ে আনবার সাধ হয়েছিল কিন্তু সে সাধ তো মিটল না। এখন দেখছি সাঁওতাল মেয়ে

একটা ধরে আনলেই ভাল হ'ত। তবে এও ঠিক—তোর মতো হ'ত না তাতেও, তোর মতো ছোটলোক আমাদের ঘরে পাওয়া যায় না।'

এর পরই বিষম কাণ্ড বেধে গেল।

হেনা কেঁদে-কেটে, চেঁচিয়ে মাথা খুঁড়ে অনর্থ কাণ্ড করল। সে চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক ছুটে এল; এখানে বাড়িগুলো বেশ একটু ছড়ানো—দূরে দূরে। তবু বাঙালীরই পাড়া, যারা ছুটে এল বেশির ভাগই পরিচিত, ভদ্র বাঙালী। তাদের সামনে হেনা পাগলের মতো এমন কাণ্ড করতে লাগল যে, বিপিনবাবু গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পথ পেলেন না। তার কাপড়চোপড় আলুথালু হয়ে গিয়েছে। ততক্ষণে কপাল ফুলে ঢিবি, এক জায়গা—বোধ করি হাতের গহনা লেগেই—কেটেও গেছে। সেই অবস্থায় সে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তুড়িলাফ খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে আর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে কস্তুরোকে—যদিচ ভাষার গুণে সে গালি প্রায় সবটাই গিয়ে লাগছে তার শ্বশুরের গায়ে।

কোন মতে তাকে ঠাণ্ডা ক'রে একটা ঘরে পুরে কপাটটা বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দিলে অরুণ। তারপর মুখ অন্ধকার ক'রে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কথাটা বলে ফেলে এমনিতেই যথেষ্ট অপ্রতিভ হয়েছিল কস্তুরো, তবু ঠিক এতখানি প্রতিক্রিয়া আশঙ্কা করে নি। হেনার এই বীভৎস কাণ্ডকারখানায় মরমে মরে গেল। কোথায় মুখ লুকোবে ভেবে না পেয়ে রান্নাঘরেই ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, অরুণ যখন গিয়ে দাঁড়াল তখন সে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

অরুণ ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে—যেন কোন মতে বলে ফেলল কথাটা, 'এমন করলে তো তোকে আর রাখতে পারি না! তুই তাহ'লে অন্য কোথাও কাজের জোগাড় ক'রে নে! নইলে, নইলে—আমাকেই চলে যেতে হয়!'

'রাখতে পারি না' এবং 'কাজের যোগাড় করে নে'—এই দুই অব্যর্থ বাণ যথাস্থানে গিয়েই বিঁধেছে। কস্তুরোর নিকষ কালো মুখও বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। জবাব দেবার অবশ্যই চেষ্টা করল বটে কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বরই বেরুল না, প্রাণপণ চেষ্টায় শুধু ঠোঁট দুটোই কাঁপল বার কয়েক—থর থর করে।

অরুণও উত্তরটা শোনার জন্য দাঁড়ায় নি। এতটুকু চক্ষুলজ্জা এবং খানিকটা ভয় তার তখনও ছিল।

তবু ব্যাপারটা যে অত তাড়াতাড়ি আসন্ন হয়ে উঠবে, তা বিপিনবাবু ভাবেন নি।

হেনা মুখে জল দিল না। ঠায় উপবাস ক'রে পড়ে রইল। বললে, 'এখানে থেকে তেরাত্তির উপোস ক'রে, শ্বশুরের ভিটের কল্যাণ ক'রে বেরুব তবে—আর বেরুবই বা কোথা, ওঁরই পুকুরে ডুবব। ওঁর নামটা আরও উজ্জ্বল ক'রে যাব।'

সন্ধ্যাবেলা কস্তুরো ওর দুটো হাত ধরতে গেল, 'আমার অপরাধ হয়ে গেছে বৌ, আমি সকলের সামনে মাপ চাইছি, তুই মুখে একটু জল দে।'

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে হেনা বললে, 'বাড়ির ঝিয়ের কাছে গালাগালি খেয়ে আবার তার হাতেই জল খাব—এমন বাপে আমাকে জন্ম দেয় নি। ও হারামজাদী এ ভিটে থেকে না বেরুলে মুখে জল দেব না, দেব না, দেব না!'

কস্তুরো বিপিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তার মুখ শুকনো, চোখ দুটো লাল। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হেসে বললে, 'এ বাড়ি থেকে অন্ন উঠল বাবু। বিদেয় দাও এবার!'

বিপিনবাবু প্রথমটা চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'কোথায় যাবি তুই? কিসের জন্যে যাবি? বাড়ি আমার, সম্পত্তি আমার—যেতে হয় ওরা যাক।··· তেরাত্তির করবে! তেরাত্তির করা বার করছি। জল না খায়, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেব।'

কস্তুরো বললে. 'চুপ কর। তোমার এক কথা। লোকের কাছে কি বলবে? ব্যাটার বৌকে তাড়াবে ঝিয়ের জন্যে? এক ছেলে না তোমার?'

কথাটা খাঁটি সত্য। একমাত্র ছেলে তাঁর। তারই বৌ। আবার—সম্প্রতি সে কথাটা শুনেছেন—তার গর্ভে তাঁরই ভাবী বংশধর। তাদের তাড়িয়ে একটা রক্ষিতা নিয়ে থাকলে পরিচিত অপরিচিত সবাই গায়ে থুতু দেবে যে!

ছেলেটাও তেমন নয়। সামান্য রোজগার করে। আলাদা বাসা ক'রে সংসার চালাতে পারবে—এমন শক্তি নেই। সে ক্ষেত্রে তাঁরই নাতি হয়ত না

খেয়ে মারা যাবে। তাই কি তিনি সহ্য করতে পারবেন ?

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন বিপিনবাবু। কি বলবেন, কি করবেন—কি করা উচিত, যেন কিছুই ভেবে পেলেন না।

খানিক পরে কেমন একটা অসহায়ভাবে বললেন, 'আমি—আমি একবার গিয়ে বুঝিয়ে ব'লে দেখব বৌমাকে ? নাকি অরুণকেই ডেকে বলব ? বৌমা যদি খায় কিছু ?'

মুখে যতই বলুক, কোথায় যেন তখনও একটা ভরসা ছিল কস্তুরোর। হয়ত আর একটু জোর সে আশা করেছিল বিপিনবাবুর তরফ থেকে। আর একটু হাঁকডাক, একটুখানি ধমক-ধামক ! এটুকুও কি করা যেত না !

অকস্মাৎ কী এক অকারণ অভিমানে কস্তুরোর দু চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে এল। সে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'না না, কিছু দরকার নেই। তুমি কেন ছোট হ'তে যাবে মিছিমিছি। আমি যাই।'

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন বিপিনবাবু। 'সে কি ? এখন এই রাত্তিরে কোথা যাবি। তোর তো ঘর-বাড়ি কবে পড়ে গেছে। মা-বাপও নেই—। তাছাড়া য়্যাদ্দিন পরে—সে একটা কেলেঙ্কারি। কাল সকালে লোকজন ডেকে—।'

'কোথাও একটা জায়গা পাবই। আর কেলেঙ্কারি—মানে অপমান ? সে তো হ'তে হবেই। তোমাকে কিছু করতে হবে না বাবু। এখনও গতর আছে, কাজ-কর্ম কোথাও একটা পাবই। শুনেছি কারখানাতেও মেয়েছেলে নিচ্ছে।'

সে আর সত্যিই দাঁড়াল না। নিজের ঘরে ঢুকে আলনা থেকে এক ঝটকায় নিজের কাপড়-জামাগুলো পেড়ে বিছানায় ফেলে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা পুঁটলি-মতো ক'রে নিয়ে নিঃশব্দে এবং দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল—তার এতকালের আশ্রয় এই বাড়ি থেকে চিরকালের মতো।

এরপর কিছুকাল কাটল বিপিনবাবুর অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্য দিয়ে। মানসিক কষ্ট তো আছেই—দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যও কম নয়। বহু বদ্ধমূল অভ্যাস তাঁকে ছাড়তে হ'ল। স্ত্রীর আমল থেকেই ভোরবেলা চা পেতে অভ্যস্ত তিনি, সেই চা পান একেবারে আটটায়। কস্তুরো এই সময়ের মধ্যে অন্তত তিন-বার চা দিত। হেনা স্পষ্টই শুনিয়ে দিয়েছে যে এটা শহরের রেস্টুরেন্ট নয়,

সে-ও মাইনে-করা বাবুর্চি নয়—অত চা সে দিতে পারবে না। ছ'বেলা ছ'কাপ, এর বেশি উনি যেন আশা না করেন। বিকেলের চাও পেতে পেতে এক-একদিন রাত হয়ে যায়। তাই কি চায়ের মতো চা, কোনদিন কড়া তেতো ক'রে ফেলে, কোনদিন জল। অথচ উপায়ই বা কি!

চা-টা তবু মেলে, তামাক নিজেকে সেজে খেতে হয়।

বহুদিন হ'ল ও পাট নেই, ভুলেই গিয়েছেন যেন তামাক সাজতে। তার ওপর বুড়ো মানুষ, চোখে দেখতে পান না। রাত্রিবেলা টিকে ধরাতে গিয়ে হাতই পুড়িয়ে ফেললেন ছ-তিনদিন।

রান্না আজকাল এক বেলাই করা হচ্ছে। হেনা ছ'বেলা আগুন-তাতে যেতে পারবে না এই অবস্থায়—অরুণ সেটা শুনিয়ে দিয়েছে। হাড়ের মতো শুকনো বাসি রুটি, রাত্রে খেতে গিয়ে কান্না পায় বিপিনবাবুর, কোন মতে ছুধে ডুবিয়ে খান, সব দিন ছুধটাও গরম পান না। তাও—যা অবস্থা, গোরুই হয়ত বিলিয়ে দিতে হবে।

তবু হেনা গজগজ করে। যখন কস্তুরোকে তাড়িয়েছিল তখন সে আশা করেছিল, আর একজন লোক রাখা হবে সে জায়গায়—দিন-রাতের লোক। যে হেনাকেই গৃহিণী বলে জানবে এবং সমীহ করবে কিন্তু বিপিনবাবুর সে অবস্থা নয়। চাকরি গেছে, তার সঙ্গে ঘুষও। আছে পেনসন, নিতান্তই হাস্যকর অঙ্কের কয়েকটি টাকা আর ঐ জমি-জমা। তার আয় সব বছর সমান হয় না। ছেলে অরুণ খুবই কম মাইনে পায়। আজকাল কারখানার কৃপায় এসব দেশেও খাওয়া-পরা পনেরো টাকার কম এত কাজ করবার লোক পাওয়া যায় না। ছ'জন ঠিকে লোক যোগাড় ক'রে এনেছে অরুণ, একজন গোরু দেখে আর একজন জলতোলা, বাসন মাজা এই সব করে—তাতেই কুড়ি টাকা পড়ে যায় মাসে।

তার বেশি যে বিপিনবাবুর সাধ্য নেই তা হেনা বিশ্বাস করে না। যেমন বিশ্বাস করে না যে কস্তুরো এতকাল বিনে মাইনেতে কাজ করেছে। সে ভাবে কস্তুরোকে তাড়িয়েছে ব'লে শ্বশুর তাকে জব্দ করার জন্যেই দিন-রাতের লোক রাখেন না। তাই সে-ও শ্বশুরকে জব্দ করার চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত।

এর মধ্যে একদিনও বিপিনবাবু সাঁওতাল পাড়ার দিকে যেতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ দুর্নিবার লজ্জা। কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবেন ওর সামনে? এতকাল বাবুর গৃহিণী হয়ে থাকার পর একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় আত্মীয়দের কাছে এসে দাঁড়াতে কতখানি লজ্জা ও অপমান বোধ হয়েছে কস্তুরোর তা তিনি অনুমান করতে পারেন। সেইজন্য আরও অপরাধী মনে হয় নিজেকে, ওর আত্মীয়স্বজনরাই বা কি ভাবছে, তারাই কি ছেড়ে কথা কইবে ওঁকে?

যান না—কিন্তু খবর পান বৈকি!

এর ভেতর কয়েকদিন মাঠে মজুরি ক'রে এসেছে। কারখানায় গিয়েছিল, বয়স বেশি হয়েছে বলে কাজ পায় নি। দুরবস্থার শেষ নেই। এক কাকী আশ্রয় দিয়েছে। তারই ফসল নিয়ে নাকি হাটে বেচতে গিয়েছিল দু'তিন দিন, এমনি ক'রেই দিন কাটছে।

এর ভেতর—যে লোকটা গোরু বাছুর দেখে ও'দের, সেও কস্তুরোদেরই আত্মীয় হয় কি রকম—রতু তার নাম—তাকে দিয়ে বিপিনবাবু প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন যে, বাপের ভিটের ওপর কস্তুরো ঘর তুলে নিক, খরচ যা পড়ে তিনি দিতে রাজি আছেন। কিন্তু কস্তুরো ব'লে পাঠিয়েছে, 'যদি কোনদিন ক্ষমতা হয় তো সে নিজেই ঘর তুলে নেবে। কারুর ভিক্ষেতে দরকার নেই! আর ঘরের ওপরেই বা বাবুর অত ঝোঁক কেন? ওঁর সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে আসার সুবিধে হয় বুঝি? বাবুকে বলিস, কস্তুরো বাজারের মেয়েমানুষ নয়। যতদিন গতর আছে খেটে খাবে। নইলে ভিক্ষে করবে।'

এরপর আর কোন রকম সাহায্যের প্রস্তাব করতে সাহসে কুলোয় নি তাঁর।

এরই মধ্যে একদিন খবর পেলেন ও পাড়ার ননী চক্রবর্তীর বাড়িতে দিনরাতের কাজ নিয়েছে সে। ননী চক্রবর্তী খুব বড় ঠিকাদার। বিশেষতঃ কারখানা হবার ফলে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন, ও-শহরের অর্ধেক বাড়িই তাঁর তৈরি। সরকারী কাজ তদ্বিরের জন্যে শহরেও একটা কোয়ার্টার পেয়েছেন। আজকাল বেশির ভাগ সময়ই সেখানে থাকেন। এখানে গোরুবাছুর, চাষের বলদ, মুরগী এই সব আছে, বাগান তো আছেই। এই সব তদ্বির তদারক করার জন্য বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলেন—কস্তুরোকে পেয়ে নাকি বেঁচে গেছেন।

ঠিক হয়েছে কস্তুরো বাড়ি আগলে থাকবে, হাঁস মুরগী গোরু দেখবে, বাগানের তদারক করবে এবং ছু'বেলা ছুধ আর সম্ভবমতো ফলপাকুড় কী আনাজ—ছু' মাইল পথ হেঁটে গিয়ে কারখানা এলাকাতে ননীবাবুর বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। নিজে রেঁধে খাবে সে। এ তরফ থেকে শুধু একটা ঘর পাবে আর শুকো ত্রিশ টাকা মাইনে। খেয়েদেয়ে বিশেষ কিছু বাঁচবে না—কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে স্বাধীনভাবে থাকতে পাবে বলে নাকি কস্তুরো রাজী হয়ে গেছে।

বিপিনবাবু আর একটা শক্ত আঘাত পেলেন।

ননী চক্রবর্তী এককালে দেশে কী একটা কাণ্ড ক'রে ফেলে, বলতে গেলে এক বস্ত্রে এখানে পালিয়ে আসেন। তখন বিপিনবাবুর কাছে জোড়হাতে থাকতেন সর্বদা। বিপিনবাবু অনেক সাহায্য করেছেন তাঁকে। তারপর ছু'-পয়সা হ'তে ইদানীং যেন আর চিনতেই পারেন না তাঁকে, দেখা হ'লে মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। লোকটাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেন তিনি। সেই ননী চক্রবর্তীর কাছে সামান্য ত্রিশ টাকা মাইনেতে কাজ করতে গেল কস্তুরো—শুধু পেটের দায়ে? তিনি কিছুই করতে পারলেন না!

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সারারাত বসে বসে—আজকাল এক ঘণ্টাও ঘুম হয় না তাঁর। চিন্তা তো আছেই, বাতের যন্ত্রণাও কম নয়। গা-হাত-পা টিপে দেওয়া বা মালিশ করা তো দূরের কথা, একটু রসুনের তেল তৈরী ক'রে দেবে এমন লোকও কেউ নেই। রসুনের গন্ধে হেনার বমি হয়—ওসব সে পারবে না। তেল পেলেও না হয় নিজে নিজে মালিশ করবার চেষ্টা করতেন—নিজে তিনি করতে পারেন না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর অভিসম্পাত দেন ছেলেকে।

নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেন।

হাতী-জোব্‌ড়ার পুলের পাশ দিয়ে নতুন শহরে যাবার রাস্তা।

ঐখান দিয়েই ছু'বেলা যাতায়াত করে নিশ্চয় কস্তুরো। জায়গাটা একটু নির্জনমতোও বটে।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়ে একদিন বিকেলে বেরিয়ে পড়লেন বিপিনবাবু। পথে আজকাল বেরোন না। পাছে কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়।

মনে হয় সকলের চোখেই যেন বিদ্রূপের হাসি। তা ছাড়া কারও সঙ্গে কথা কইতেও আর ভাল লাগে না। আজও তাই যথাসাধ্য চেনা লোক এড়িয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে ঘুরে এক সময় হাতী-জোব্ড়ার খালের কাছে পৌঁছলেন। সৌভাগ্যক্রমে পথটা এখানে খুবই নির্জন। বিপিনবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটা মহুয়া গাছের তলায় বসলেন—নিজের ছাতিটি পেতে।

অনেকক্ষণ বসতে হ'ল তাঁকে। একেবারে সন্ধ্যার মুখে দেখলেন—দূর থেকেই অনায়াসে চিনতে পারলেন, এই আবছা আঁধারেও—শহর থেকে ফিরছে কস্তুরো। দুধ দিয়েই ফিরছে বোধ হয়, হাতে একটা য়্যালুমিনিয়ামের পাত্র।

বুকটা চম্‌কে কেঁপে উঠল তাঁর—বিপিনবাবুর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। এমন অদ্ভুত দৌর্বল্য তিনি কখনও অনুভব করেন নি—এমন বিচিত্র মনের ও দেহের অবস্থা।

কস্তুরোও তাঁকে দেখেছিল, হয়ত বহুদিন ধরেই এই পথে এইখানে আশা করেছিল সে তাঁকে—কিন্তু তার আচরণে সেটা বোঝা গেল না। সে মহুয়া গাছটার দিকে ফিরল না একবারও—বরং এখানটা যেন একটু জোরে জোরেই পার হয়ে গেল।

অনেকটা এগিয়ে যাবার পর গলার স্বর খুঁজে পেলেন বিপিনবাবু, কেমন একরকম আর্ত চিৎকারে ডেকে উঠলেন, 'কস্তুরো—শোন্!'

তবুও এগিয়ে গেল খানিকটা সে—বেশ হনহন ক'রেই।

আর একবার ডাকলেন বিপিনবাবু। এবার কণ্ঠস্বর স্খলিত, ভগ্ন হয়ে এসেছে—আগের ডাক যদি না পৌঁছে থাকে তো এ ডাকও পৌঁছবার কথা নয়।

কিন্তু এবার কস্তুরো থমকে দাঁড়াল।

যেন অনিচ্ছাতেই পা-পা ক'রে ফিরে এল।

কাছে এসে একটু বিরক্তভাবেই বললে, 'কি গো বাবু, কি বলছ!'

'কস্তুরো!' বলে আর একবার ডেকে উঠে একেবারে কেঁদে ফেললেন বিপিনবাবু। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কোমর ও পায়ের ব্যথায় হুম্‌ড়ে বেঁকে পড়ে গেলেন তিনি।

কস্তুরো দুধের পাত্রটা ফেলে দিয়ে ছুটে এসে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে।

'অত তাড়াতাড়ি উঠতে আছে ? পা-টা যদি মচ্‌কে যেত !'

তেমনি সস্নেহ স্পর্শ। তেমনি কোমল উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

বিপিনবাবু ওর হাত দুটো চেপে ধরে নীরবে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। শুক্লপক্ষের চাঁদ এবং অস্তসূর্যের আলো মিশে—খানিকটা আলো-আঁধারি-মতো রচনা করেছিল, তবু তাঁর সেই সজল এবং বিহ্বল দৃষ্টি কস্তুরোর চোখ এড়াল না।

তারও দুই চোখ জ্বালা ক'রে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। সে কোনমতে ভগ্নকণ্ঠে বললে, 'বোস বোস। এইখানেই বোস দিকি। তোমার পা কাঁপছে !'

বিপিনবাবু ওর হাতে ভর দিয়ে একটু এগিয়ে এসে পুলের ধারের বাঁধানো জায়গাটায় বসে পড়লেন। কস্তুরো—যেন অভ্যাসবশতঃই—পায়ের কাছটিতে বসে ওঁর হাঁটু দুটো টিপতে লাগল।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে বসে।

দু'জনেরই কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ ; ভাষারও অভাব দু'জনেরই।

শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বর সহজ ক'রে কস্তুরো বললে, 'বড় রোগা হয়ে গিয়েছ বাবু, বুড়োও হয়ে গিয়েছ অনেকখানি !'

'একদিনও—বুঝলি কস্তুরো—একদিনও রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না বাতের যন্ত্রণায়। তুই আসবার পর আর একবারও মালিশ হয় নি। আর আমি বাঁচব না রে।'

দুই চোখ দিয়ে আবারও জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর।

খানিকটা নিঃশব্দে বসে পা টিপল কস্তুরো। তারপর কেমন একরকম নিচু গলায়, প্রায় চুপি চুপি বললে, 'এখন তো ননীবাবুর বাড়িতে কেউ নেই—আমি একাই থাকি। এই সময় আমি রোজ ফিরি। যেদিন ইচ্ছে হবে এস চুপি চুপি—মালিশ করে দেব। রসুন তেল কাল আমি দুপুরেই ক'রে রাখব। বুঝেছ ?'

বিপিনবাবু তার হাত দুটো আর একবার চেপে ধরলেন শুধু।

প্রতিকৃতি

মানুষের নয়, মা কালীর। কাগজ-কলমেও আঁকা নয়, অথবা রঙ-তুলিতে—কার্পেটের ওপর রঙিন পশম দিয়ে ফোটানো। শিল্পীও বিজাতীয়া, করেছিলেন মিসেস ওকোনার নামে এক আইরিশ মেম।

ছবিটির বিবরণ এই পর্যন্ত।

আমার সঙ্গে ওর পরিচয় খুবই অল্প।

সেদিন কালীকিঙ্করবাবুর বাড়ি বসে আছি—একটা কলহের শব্দ কানে গেল। প্রায়ই যেতাম ভদ্রলোকের বাড়ি। প্রথমত শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়; ওঁর স্ত্রী কী এক সুবাদে মাস-শাশুড়ী হতেন আমার, দ্বিতীয়ত নির্বিরোধ ভদ্র প্রতিবেশী, তৃতীয়ত ভদ্রলোক বড় ভাল চা ব্যবহার করতেন বরাবরই। উৎকৃষ্ট দার্জিলিঙ চা পানের লোভটা যে খুব অকিঞ্চিৎকর ছিল না তা অকপটেই স্বীকার করছি। সে যাই হোক—কলহটা ওঁদের বাড়িতে এমনই এক আশ্চর্য ঘটনা যে, বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। একটু কান পেতে শুনলাম, ঝগড়াটা স্বামী-স্ত্রীতেই হচ্ছে।

কৌতূহল বোধ করলাম, তা বলাই বাহুল্য।

তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হ'ল না—সশব্দে ও স-পদদাপে পর্দা সরিয়ে এ-ঘরে প্রবেশ করলেন মাসিমা, হাতে মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো একটি কার্পেটের ছবি। ছবিটা ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম, মা-কালীরই। তবে সাধারণ কার্পেটের ছবি যেমন হয়, অর্থাৎ বলে না দিলে কিম্বা নিচে লিখে না দিলে বোঝবার উপায় নেই ছবিটা কুকুরের না পদ্মফুলের, বিলিতি গির্জের না এদেশী মন্দিরের—সে রকম নয় এটা। হাতের কাজ নিখুঁত। মা-কালীকে মা-কালী বলেই চেনা যাচ্ছে।

'দেখ দিকি বাবা, মা'র আদরের জিনিস—তাঁর ছেলেরা বাইরে একটা কোণে রেখে দিয়েছিল, আমি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি, এটা এমন কি গর্হিত কাজ হয়েছে যে উনি আমাকে এই রকম যাচ্ছেতাই করছেন।'

চেয়ে দেখলাম, মাসিমার চোখ জলে ভরে এসেছে। সামান্য মাত্র সহানুভূতি

পেলেই ঝরে পড়বে এখুনি !

তবু একটু হাসলাম, চেষ্টা ক'রেই !

'যাচ্ছেতাই করছেন একেবারে !···কী এমন বললেন মেসোমশাই ?'

'এক্‌খুনি নাকি যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে, নইলে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে। হুকুম ! এত দিন বিয়ে হয়েছে—এখনও কি আমার এ-বাড়িতে এটুকু অধিকার হ'ল না—একটা ছবিও এনে রাখতে পারব না আমি ? পুরুষজাতই এমনি, বাবাও এই ছবির জন্যে কি না বলেছেন মাকে ! এই তো, মরে গেল মানুষটা। তার আর কি হ'ল, তোমারই কটু কথাটা রয়ে গেল চিরকালের মতো।'

এবার সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেললেন মাসিমা। এতক্ষণের বাঁধ আর বাধা দিতে পারল না সে জলস্রোতকে।

আমি অবশ্য যথারীতি যা বলবার সবই বললাম, 'ও কি—ছি ছি, কি যে সব ছেলেমানুষী করেন—সামান্য একটা কথায়—দেখুন তো···চুপ করুন চুপ করুন। মেসোমশায় কি বলেছেন আর আপনি কি বুঝেছেন ! সত্যি, আপনি বড় অবুঝ মাসিমা !'

'হ্যাঁ বাবা, তা তো বলবেই। তুমিও যে ঐ জাতেরই মানুষ। তোমাকে বলতে আসাই আমার অন্যায় হয়েছে। আজ বাইশ বছর ঘর করছি ঐ মানুষের সঙ্গে, এতদিন পরে ভুল বুঝব বৈকি !···তবে এও বলে রাখছি তোমাকে বাবা নন্দ, এ ছবি যদি বার ক'রে দিতে হয় তো, সেই সঙ্গে আমিও বেরিয়ে যাব। দুই-ই একসঙ্গে বেরুবে। ঢের হয়েছে। সংসার করার সাধ আমার মিটে গেছে একেবারে।'

এইবার খোদ কালীকিঙ্করবাবু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখ-ভাব হতাশ এবং করুণ—কতকটা ভাগ্যের কাছে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হওয়ার মতো অবস্থা তাঁর।

লজ্জিতও বটে—যতই আত্মীয় এবং প্রতিবেশী হই—এমন একটা ঘটনা পরের সামনে ঘটাটা লজ্জাকর বৈকি !

একটু ক্লান্ত সুরেই বললেন মাসিমাকে, 'আমার অপরাধ হয়েছে মেজ বৌ, ঘাট হয়েছে, এখন চুপ কর। তোমার বাবাই যখন তোমার মাকে বোঝাতে

পারেন নি তখন আমার চেষ্টা করাই ভুল হয়েছে। থাক ও ছবি! মেমের আঁকা ছবি ঠাকুরঘরে রেখে ধুনো-গঙ্গাজল দিয়ে পূজো করো, আমি কিছু বলব না।'

'মেমের আঁকা ছবি তাতে কী হয়েছে। এই তো মেজদার ছাপাখানায় মুসলমান জমাদার, ওখান থেকে রাশি রাশি ঠাকুর-দেবতার ছবি ছাপা হয় না? সে ছবি লোকে বাঁধিয়ে ঠাকুরঘরে রাখে না?'

চোখের জল ভেদ করেই অকাট্য বিজয়গর্ব ফুটে ওঠে মাসিমার চোখে।

'বলেছি তো, আমার ঘাট হয়েছে। এখন তুমি ক্ষ্যামা দাও, ঠাকুরকে বল নন্দকে এক কাপ চা ক'রে দিতে।'

'ঠাকুরের চা আবার নন্দ কবে খায় তাই শুনি? এ দাসী-বাঁদী যতদিন আছে—খেতে হবেই বা কেন? আমিই দিচ্ছি।'

অর্থাৎ সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়ে গেল।

ছবি নিয়ে মাসিমা অন্তরালে, বোধ হয় ঠাকুরঘরের দিকেই চলে গেলেন। কালীকিঙ্করবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমার সামনের চৌকীখানাতে ধপ্ ক'রে বসে পড়লেন।

'ব্যাপারটা কী বলুন তো?' কৌতূহল যথেষ্টই ছিল, মাসিমা বেরিয়ে যেতেই সাগ্রহে প্রশ্ন করি।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে মেসোমশাই যা বললেন, সংক্ষেপে তা এই :—

ছবিখানির একটি ইতিহাস আছে। ওকোনার দম্পতি চুনারে থাকতেন; কিসের যেন ব্যবসা ছিল তাঁদের। ঐখানে থাকতে থাকতেই যক্ষ্মা হয়, তিনি হাওয়া বদল করতে দেওঘরে আসেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় আমার এই মাসিমার বড় মাসিমার সঙ্গে; তাঁরা দেওঘরেই বারো মাস থাকতেন। মিসেস ওকোনার ওখানে গিয়ে একটু ভাল হয়ে উঠেছিলেন, তাই কাজকর্ম না থাকায় তাঁর শখ হয় কার্পেটে ফুল তোলবার। তিনি সত্যিকারের শিল্পী ছিলেন, প্যাটার্ন বই দেখে ঘর গুণে গুণে অক্ষম অনুকরণ করার লোক ছিলেন না। কী আঁকবেন ভাবতে ভাবতে বড় দিদিমার ঘরে কালীর ছবির দিকে নজর পড়ে এবং সম্ভবত ঐ বীভৎস মূর্তির জন্যই শখ হয় ঐ ছবি তোলবার।

দিদিমা বারণ করেন, বলেন, 'তোমরা ক্রীশ্চান, এসব ছবি তোমার না তোলাই ভাল।' কিন্তু মিসেস ওকোনার সে কথায় কর্ণপাত করেন না, বলেন, 'ছবি ছবিই। কত জাতের লোক ছবি আঁকে, ছবি ছাপে—তাতে যদি দোষ না হয় তো আমি কার্পেটে তুললেই বা দোষ হবে কেন?'

ছবি বেশ মন দিয়ে ভাল ক'রেই তুললেন মিসেস ওকোনার; এমন ছবি হ'ল যে কার্পেটের কাজ বলে মনেই হয় না—মনে হয় নিপুণ হাতে তুলি দিয়ে আঁকা।

ছবি যেদিন শেষ হ'ল সেই দিনই কিন্তু মিসেস ওকোনারের আর একটা প্রবল আক্রমণ হ'ল রোগের। হুড়হুড় ক'রে রক্ত পড়তে লাগল মুখ দিয়ে। এমন অবস্থা হ'ল যে চিকিৎসারও সময় পাওয়া গেল না আর, এমন কি স্বামীর সঙ্গে শেষ দেখাও হ'ল না। তাঁকে ব্যবসার জন্য চুনারেই থাকতে হত—মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করতেন। এই আক্রমণের তিনদিনের দিনই সব শেষ হয়ে গেল।

ওকোনার সাহেব এসে স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থাদি ক'রে চলে গেলেন। হঠাৎ স্ত্রীর ঘরে এই হিন্দু পৌত্তলিকতার বীভৎস নিদর্শন কী ক'রে আর কেন এল বুঝতেও পারলেন না তিনি, বোঝবার চেষ্টাও করলেন না। ছবিখানা টান মেরে বাইরের বাগানে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। মা কালীর মূর্তির এই দুর্দশা বড় দিদিমার সহ্য হল না, তিনি সেখানি কুড়িয়ে নিয়ে এসে সযত্নে ঠাকুরঘরে রাখলেন। এর কিছুদিন পরেই রান্না করতে গিয়ে শাড়িতে আগুন লেগে বড় দিদিমা পুড়ে মারা গেলেন। দাদামশাইয়ের বৃদ্ধ বয়সে এত বড় শোক, এমনিতেই ভেঙে পড়বার কথা; এতদিনের সঙ্গী-সাথী তাঁর, তাঁকে ফেলে চলে গেল। বুড়ো বয়সে যখন সেবার সবচেয়ে প্রয়োজন তখনই অসহায় হয়ে পড়লেন—তার ওপর পাড়ায় ও আত্মীয় সমাজে কানাঘুষো উঠল যে বুড়োর অত্যাচার সইতে না পেরে বুড়ী আত্মহত্যা করেছেন। বুড়ো নাকি এই বয়সেই সাঁওতাল মেয়ে ধরে টানাটানি করতেন।

কথাটা ভেসে ভেসে তাঁর কানেও এসে পৌছল। বুড়োর যাকে বলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।···মনের ঘেন্নায় তিনি সকলকে ত্যাগ ক'রে একা সেই বাড়িতে পড়ে রইলেন। এমনই একা থাকতেন যে কিছুদিন পরে যখন

মারা গেলেন তখন দু'দিন পর্যন্ত সে খবরটাও কেউ পায় নি। স্থানীয় যে ঠিকে চাকরটি দু'বেলা কাজ ক'রে দিয়ে যেত সে লোকটা কাঠ-বোকা, দরজা বন্ধ দেখে দু'বেলাই ফিরে গিয়েছে—তবু তার মনে হয় নি যে বিপদের কোন কারণ থাকতে পারে। নিদ্রাই ভেবেছে, চিরনিদ্রার কথা মনে পড়ে নি।

তখন তাঁর একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ বিলেতে। অগত্যা আমার এই মাসিমার মাকেই যেতে হয়েছিল সেখানে। এক ছেলেকে সঙ্গে ক'রে গিয়ে ঘর দোরের বিলি-ব্যবস্থা ক'রে, জিনিসপত্র কতক বেচে কতক বিলিয়ে কতক তালা বন্ধ করে রেখে এলেন। শুধু নিয়ে এলেন এই ছবিখানি। ছবিটা নাকি তাঁর বড়ই পছন্দ হয়েছিল। তাঁর ইষ্টও নাকি ছিলেন এই মূর্তিই।

তাঁর স্বামী অর্থাৎ কালীকিঙ্করবাবুর শ্বশুর ছবি দেখে আদৌ খুশি হ'তে পারেন নি। পর পর তিনটি ঘটনার বিবরণ শুনে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ছবিটা অপয়া। কিন্তু পাছে স্ত্রী বড় বেশি ভয় পেয়ে যান, তাই তাঁর আশঙ্কার কারণটা খুলে বলতে পারেন নি, এমনিই বিরক্তি জানিয়েছিলেন,—তবে বলা বাহুল্য, তাতে কোন ফল হয় নি।

এই ঘটনার মাসখানেক পরেই ভদ্রমহিলা সিঁড়ির শেষ তিন ধাপ থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙলেন এবং যথেষ্ট ভুগে প্রায় মাস-ছয়েক শয্যাশায়ী থেকে শেষ পর্যন্ত ক্যান্সার রোগ ধরিয়ে মারা গেলেন।

এর পর কালীকিঙ্করবাবুর শ্বশুরও বেশিদিন বাঁচেন নি, সামান্য একটা কি অসুখ হয়ে মারা গিয়েছিলেন।

অবশ্য সে হ'লও নাকি আজ বছর দুয়েকের কথা। এর ভেতর শোকার্তা মাসিমা আর বড় একটা ও-বাড়ি যান নি। কাল গিয়ে দেখেছেন একতলায় সিঁড়ির নিচে জঞ্জালের গাদায় পড়ে আছে ছবিখানা—আশ্চর্য এই যে, এখনও সে ছবি তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি অম্লান, নতুনের মতো। পোকায় কাটা তো চুলোয় যাক, একটু ময়লা অবধি লাগে নি। তাই আসবার সময় নিয়ে এসেছেন। ইচ্ছা—ঠাকুরঘরে রাখেন।

কালীকিঙ্করবাবু এই সমস্ত ইতিহাসটুকু বিবৃত ক'রে থামলেন। তখনও তাঁর মুখ গম্ভীর ও অপ্রসন্ন। বুঝলাম যে ভয়টা এখনও যায় নি। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আপনি তো সায়েন্সের ছাত্র, কলেজে পড়ানও তাই—এই

ধরনের কুসংস্কার কি আপনার সাজে! এ সব যা বললেন এ তো কতকটা কাকতালীয় মতো। তাছাড়া যদি এতই সাংঘাতিক অপয়া হবে, আপনার শালাদেরও তো অনিষ্ট করতে পারত!'

'তা বটে, তবে কী জানো, ঠাকুরঘরে বসিয়ে পূজো করাটাই হয়ত ওঁর সয় না, পাঁদাড়ে ফেলে রাখলে ঠিক থাকেন। কী জানি, বুঝি না কিছু!'

'ওসব ভেবে আর মন খারাপ করবেন না, মনে জোর আনুন!'

বলে সান্ত্বনা দিয়ে চলে এলাম।

এর পর দুটো-তিনটে দিন আর যেতে পারি নি। তিনদিনের দিন সকালে হঠাৎ ওঁর ছেলে এসে হাজির। মুখ শুকনো, শীতের দিনেও ঘেমে উঠেছে বেচারী—সম্ভবত ছুটেই এসেছে।

'কী রে শঙ্কু, ব্যাপার কি?' প্রশ্ন করি।

'আপনি একবার শীগগির আসুন। মার খুব অসুখ।'

ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যটা। আমিও প্রায় ছুটতে ছুটতেই গেলাম। গিয়ে দেখি ইতিমধ্যেই দু'জন ডাক্তার এসে গেছেন—বাড়ি লোকারণ্য।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে মাসিমার ঘরে গেলাম। কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'এসেছ বাবা, ছাখো কী কাণ্ড! পরশু সন্ধ্যা থেকে জ্বর, সামান্য জ্বর ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কালকে জ্বর বাড়ল, আজ পুরো মেনিন্‌জাইটিসের লক্ষণ। এঁরা বলছেন, রোগী র‍্যাপিডলি সিন্‌ক্ করছে আর কোন আশাই নেই। দেখলে তো, সেদিন তো আমাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিলে!' দুঃখের মধ্যেও কোথায় একটা বিজয়ের সুর তাঁর কণ্ঠে।

বুঝলাম আমার চিন্তা ও ওঁর চিন্তা এক খাতেই বইছে। কিছু বললাম না। আত্মীয় স্বজন সকলেই বিহ্বল, সকলেই শোকার্ত। ওঁর ছেলেমেয়েরা এর মধ্যেই কাঁদতে শুরু ক'রে দিয়েছে। বহু আত্মীয় এসেছেন, দেখতে দেখতে আমার খাস শ্বশুর-শাশুড়ীরা পর্যন্ত এসে পড়লেন। সকলেই রোগীকে ঘিরে বসে। ডাক্তারদেরও চেষ্টার ত্রুটি নেই। তবু ক্রমে ক্রমে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে এল যে, এতগুলি লোকের ইচ্ছাশক্তি বা ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা ও কর্মশক্তি কিছুই আর মাসিমাকে ধরে রাখতে পারবে না।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম রোগিণীর ঘর থেকে। সকলের অলক্ষিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ওপরের চিলকুঠ্‌রী—অর্থাৎ ঠাকুরঘরে।

দোর ভেজানোই ছিল, ঠেলতেই নজরে পড়ল ডানদিকে একটি নতুন জল-চৌকীর ওপর ছবিটি প্রতিষ্ঠিত, ছবির তলায় কতকগুলো আধ-শুকনো জবাফুল। বুঝলাম কাল পর্যন্ত কেউ ফুল বেলপাতা দিয়েছে, আজ আর কারও মনে পড়ে নি।

মুহূর্তখানেক ইতস্তত করলাম। তারপর ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে ছবিটি উঠিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে আবার নেমে এলাম নিচে। তখন সকলেই ও-ঘরে ব্যস্ত; মায় চাকরবাকররাও কেউ এদিকে ছিল না, কাজেই আমার এই তস্করগতি কারও চোখে পড়ল না, চৌর্যবৃত্তিও পড়ল না ধরা। সবার অলক্ষ্যে বাইরে বেরিয়ে সটান একটা রিক্সায় চেপে পড়লাম।

গঙ্গা চলো। গঙ্গা। জলদি।

এ রোগী যদি না-ও বাঁচে—বাঁচবেই না সম্ভব—তবু ভবিষ্যতের অনেক সর্বনাশ তো বন্ধ হবে!

আমার নিজের?

না, সেকথা তখন ততটা মনে হয় নি। মনে হ'লে বোধ হয় পারতাম না। পরের অনিষ্ট চিন্তা ক'রে, কে আর নিজের অনিষ্ট সাধ ক'রে ঘাড় পেতে নেয়?

অতঃপর সেই 'কার্পেট কালী'কে গঙ্গায় ভাসিয়ে কালীঘাটে পুজো দিয়ে যখন ফিরলাম, তখন হয়ত মনের অবচেতনে কান্নার সুরই আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু তা পেলাম না। বরং বাড়িতে ঢুকতে কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'এই যে নন্দ, বাড়ি গিছলে বুঝি?'

সে প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'এখন খবর কিরকম?'

'একটু, মানে মন্দের ভাল মনে হচ্ছে। সে শ্বাসের লক্ষণটা কমেছে।'

মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আর নিজের বুদ্ধিকেও।

সন্ধ্যের দিকে রোগিণীর অবস্থা অনেক ভাল মনে হ'ল।

পরের দিন সন্ধ্যাতে বেশ সুস্থই হয়ে উঠলেন।

আশ্চর্য এই যে, সে কালীর কথাটা তাঁর একেবারেই মনে পড়ল না। ভয়ঙ্কর রোগ তাঁর স্মৃতি থেকে সে ছবির সমস্ত চিহ্ন বোধকরি মুছে দিয়ে গিয়েছিল। মনে পড়েছিল মেসোমশায়ের, তিনি দু'-একবার 'কোথায় গেল' 'কোথায় গেল' করেছিলেন—কিন্তু অবাঞ্ছিত বস্তুর অন্তর্ধান নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন বোধ করেন নি।

তাঁকে কথাটা অবশ্য বলেছিলাম, মাসিমা সুস্থ হয়ে হয়ে ওঠার অনেক পরে। তিনি আবেগে আমার ডান হাতটা দু' হাতে চেপে ধরেছিলেন—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পান নি। কিন্তু কেন এমন হচ্ছিল, অথবা সত্যিই হচ্ছিল কিনা—আমাদেরই মনের ভ্রম—তা আজ পর্যন্ত না মেসোমশাই না আমি—কেউই ঠিক করতে পারি নি।

নিক্তির তৌল

একে তো সেই বেলা তিনকে থেকে স্টেশনে বসে আছি, তিনটের পর প্রথম গাড়ি এই রাত সাড়ে ন'টায় ; পাঁচ মিনিটের কাজ ছিল এখানে—তার জন্যে পুরো ছ'ঘণ্টা সময় নষ্ট, তার ওপর যদি বা এ ট্রেন ঠিক সময়ে এল, আপ ট্রেনের দেখা নেই ; সুতরাং যন্ত্রণার অবসান ঘটল না। আপ ডাউন দুটো গাড়িই এখানে মেলবার কথা। শুনলাম আপ ট্রেন আধ ঘণ্টা লেট। অতএব তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। শীতের রাত। পাঁচটা না বাজতে বাজতে সন্ধ্যা নেমেছে। তখন থেকে অন্ধকারে বসে বসে মশা তাড়াচ্ছি। যখনকার কথা বলছি তখন স্বাধীনতা এসে গেছে কিন্তু তখনও স্টেশনে স্টেশনে এত বিজলী আলোর ঘটা হয় নি। তেলের আলো—গাড়ি আসার মিনিট কতক আগে জ্বালানো হ'ত—বাকী সময়টা জোনাকি ভরসা। গাড়িতে উঠে বসে থাকতেও ভাল লাগল না—ভীড় যে খুব একটা বেশী ছিল তা নয়, কিন্তু বন্ধ কামরার মধ্যে মুড়িসুড়ি দেওয়া মানুষগুলোর তেলচিটে গায়ের কাপড় আর বিড়ির মিলিত গন্ধে ভেতরের বাতাস এমন ভারী হয়ে আছে, ঢুকলেই যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। কাজেই যতটা পারা যায় বাইরে থাকার চেষ্টায় গাড়ির সামনেই

পায়চারি শুরু করলুম।

যাত্রী যারা—তারা সবাই প্রায় ভেতরে উঠে পড়েছে। দুটি চা-ওলা ছোকরা ও অদ্বিতীয় খাবারওলাটি এতক্ষণ ঘুরছিল ; তারাও নিজেদের কোটরে গিয়ে ঢুকেছে। প্ল্যাটফর্ম জনবিরল। তার মধ্যেই—পায়চারি করতে করতে নজরে পড়ল, আমার মতো আরও একটি প্রাণী ভেতরে না ঢুকে প্ল্যাটফর্মেই অপেক্ষা করছে। তবে তার বোধ করি পায়চারি করার ইচ্ছা বা শক্তি নেই, একটা কামরার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; সম্ভবত কিছু মালপত্র আছে সেখানে—নড়া সম্ভব নয়।

অলস কৌতূহল, তবু আর কোন কাজ না থাকাতেই—কে মানুষটা দেখবার জন্যে পাশ দিয়ে বার দুই যাতায়াত করলুম, কিন্তু অন্ধকারে মুখচোখ কিছুই ঠাহর হ'ল না, শুধু বুঝলুম যে যিনি দাড়িয়ে আছেন তিনি মহিলা, এবং সম্ভবত কিছু বয়স্কা। কারণ তাঁর পরিধানে সাদা কাপড়, পাড় আছে কি না বোঝা গেল না ঠিক, তবে থাকলেও চওড়া কিছু নয়।

ইতিমধ্যে আমাদের দুঃসহ প্রতীক্ষার অবসান আসন্ন হয়ে এসেছে। দূর দিগন্তে আলোর আভাস আপ ট্রেনের আবির্ভাব ঘোষণা করছে। চা-ওলা ছেলে দুটি উনুনের পাশে কেৎলি রেখে আগুন পোয়াচ্ছিল, তারা আবার ভাঁড়ের বাল্‌তি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল, খাবারওলাও কাঁধে খাবারের বাক্স ও জলের বালতি গুছিয়ে তুলে নিল।

তাড়া নেই কিছু, যে গাড়ি পরে আসছে সে গাড়ি আগে ছাড়বে। তার পর আমাদের পালা। অলসভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি দূরের আলোক বিন্দুটি ক্রমশ কেমন বড় হতে হতে কাছে ছুটে আসছে। গাড়ি দেখা যাচ্ছে না, শুধুই চোখ-ধাঁধানো একটা আলো। আরও কাছে আসতে আর চেয়ে থাকা গেল না, চোখটা বাঁচাতেই ফিরে দাঁড়ালুম আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল—সেই উজ্জ্বল আলো মহিলাটির মুখে এসে পড়েছে—দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের রাণী বৌদি।

একই সঙ্গে দুজনে দুজনকে চিনতে পারলুম।

রাণী বৌদি বোধহয় আগেই চিনেছেন—তবু আলো-আঁধারিতে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি। আর মুখ দিয়ে 'রাণী বৌদি' কথাটা বেরিয়ে আসার

সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও বলে উঠলেন, 'সুব্রত !'

'আপনি এখানে ! কোথায় এসেছিলেন ? কোথায় থাকেন এখন ?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করি। আর কোন প্রশ্ন খুঁজে না পেয়েই—অথবা কোন্‌টা করা উচিত বুঝতে না পেরে। সহস্র প্রশ্ন করা চলত। কিন্তু অসংখ্য প্রশ্ন গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছে বলেই বোধহয় কোনটা করতে পারলুম না।

তিনি কিন্তু খুব সহজভাবেই নিলেন কথাটা। স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলেন, 'আমি এখানের মেয়েস্কুলে চাকরি করি।···তুমি কোথায় এসেছিলে ?'

'আশ্চর্য ! আমিও এখানের ছেলেদের ইস্কুলে এসেছিলুম—একটু কাজে।'

ইতিমধ্যে ও গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টাও পড়ে গেছে ছাড়ার। এবার এ গাড়ি ছাড়ার পালা। বললুম, 'যাই এখন, গাড়ি বোধহয় এবার ছাড়বে। আপনি থাকেন কোথায়—মানে কোথায় যাচ্ছেন ?'

'আমি থাকি একটা স্টেশন পরেই। গাড়ি নেই বলে প্রতিদিনই এত রাত হয়। আর রাত অবধি যখন থাকতে হয়—একটা কোচিং ক্লাস সেরে নিই। ওখান থেকেই যাতায়াত করি রোজ।···তা তুমি কোথায় যাবে, এখানেই ওঠো না। মেয়ে-কামরা বটে, তবে কেউ নেই আজ। আমার একটু ভয়-ভয়ই করছিল। তুমি উঠলে তো ভালই হয়। তুমি নিশ্চয় কলকাতা যাবে ?'

'না, আজ কাটোয়ায় নামব একবার। তা চলুন, এখানেই ওঠা যাক।'

উঠে সামনা-সামনি বসলুম। গাড়িও ছাড়ল কিন্তু তখনই কেউ কোন কথা বলতে পারলুম না। দীর্ঘ দিন পরে দেখা, এতকাল কোন খবরই রাখি না কেউ কারও। শেষ যে দেখা—বহু বছর আগে—তারও স্মৃতিটা আদৌ রুচিকর বা আলোচনাযোগ্য নয়।

রাণাবৌদি আমার এক দূর-সম্পর্কের মাসতুতো ভাইয়ের স্ত্রী ! সম্পর্কটা খুবই দূরের, আর দেখাশুনোও এত অল্প দিনের যে—কোন স্মৃতিই কোন পক্ষের মনে থাকার কথা নয়। তবু যে মনে আছে তার কারণ ঐ বিশ্রী ঘটনাটা।

আমার দাদাটি পাড়াগাঁয়ের ছেলে, লেখাপড়ার বালাই বিশেষ ছিল না তাঁর। তেমনি—পুরুষ মানুষের যে আবার চরিত্র বাঁচিয়ে চলতে হয় এমন

কোন কুসংস্কারও ছিল না। বেশ কিছু জমিজমা ছিল ওদের। সচ্ছল সংসার, সুখেই দিন কাটত—বদখেয়ালি করার অবসরও ছিল প্রচুর।

রাণীবৌদি শহরের মেয়ে, বিশেষ পশ্চিমে মানুষ। বাবা ছিলেন মীরাটের সরকারী চাকুরে। হঠাৎ অসময়ে মারা যেতে কলকাতায় এসে মামার গলগ্রহ হয়ে পড়েছিলেন। সে মামার নিজের তিনটি মেয়ে, তার ওপর এই ভাগ্নী এসে জোটায় দিশাহারা হয়ে গেলেন। বলতে গেলে সামনে যে পাত্র ছিল তার সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিলেন। তবে একটা কথা, নিজের মেয়েদের আগেই ভাগ্নীকে পাত্রস্থ করেছিলেন। ভাল ঘরের সচ্ছল অবস্থার সুশ্রী ছেলে, খুব খারাপ বিয়ে দিয়েছিলেন—তাও কেউ বলতে পারবে না।...

এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ ছিল না। বিয়ের পর কী একটা উপলক্ষে যোগেশদার মা বৌ নিয়ে আমাদের বাড়ি এসে দিনকতক ছিলেন। আমার মায়ের খুব পছন্দ হয়েছিল বৌকে। সম্ভবত বৌয়েরও। এর মাসকতক পরে হঠাৎ একদিন রাণীবৌদি একা এসে হাজির। না, অশ্রুমুখী নন—বরং জ্বালামুখী বলাই উচিত। আমার তখন বয়স অল্প, কিন্তু তবু তাঁর দৃষ্টিতে যে বহ্নি দেখেছিলুম তা আজও মনে আছে। রাণীবৌদি নাকি এসে মার পা জড়িয়ে ধরে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন। সেই প্রথম শুনলুম যোগেশদা ঘোর অসচ্চরিত্র এবং তার কী সব খারাপ অসুখ আছে। এই পিতার সন্তানকে বৌদি রাখতে চান না, এ সন্তান ঐ বীজ আর ঐ স্বভাবই ছড়িয়ে বেড়াবে, তাই তিনি চান সে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট করতে। মা শিউরে উঠে অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলেন, কিন্তু রাণীবৌদির শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন নিতে এল তখনও পাঠালেন না। বললেন, 'ওখানে গেলে পাগলী কি ক'রে বসবে তার ঠিক কি, তাছাড়া ওর শরীরও ভাল না। এখানেই থাক। কানা কানি যা হোক একটা হয়ে গেলে নিয়ে যাস। তদ্দিনে মাথাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

কিন্তু দেখা গেল মেয়েটিকে আমার মা চিনতে পারেন নি। মাস তিনেক সবসুদ্ধ ছিলেন বৌদি, এমনি তাঁর আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় নি। ছেলে হওয়ার পরও কয়েকদিন কাটিয়ে যখন দেশে যান—যোগেশদার ছোট ভাই এসেছিল নিতে, তাকে সতর্ক ক'রে দেবার কথাও মনে পড়ে নি

মায়ের। সেও তখন ছেলেমানুষ, কোনরকম উদ্ভট সম্ভাবনা ভেবে নিয়ে হুঁশিয়ার হবে—এতটাও আশা করা যায় না। রাণীবৌদি সেই সুযোগ নিয়েই এক অঘটন ঘটিয়ে বসলেন। যেতে যেতে গাড়ির জানলা গলিয়ে সকলের সামনে বাচ্ছাটাকে দিলেন ফেলে। এবং তারপর বেশ সহজ প্রশান্তমুখেই নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।…

তারপর যথারীতি হৈচৈ,—থানা পুলিস। বহুকালের কথা—কিন্তু কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির যে তরঙ্গ উঠেছিল, লজ্জা ও ধিক্কারের যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল ঘরে-বাইরে—সে কথাটা আজও মনে আছে। মা ছড়া বেঁধে গালাগাল দিলেন মেয়েটাকে, কারণ সে লজ্জা ও অপমান তাঁকেও রেহাই দেয় নি, তাঁকেও সাক্ষী দিতে যেতে হয়েছিল। পাড়ায় শুধু নয়, আত্মীয় মহলেও ঢিঢিক্কার পড়ে গিয়েছিল—মুখ দেখানো কঠিন হয়ে পড়েছিল আমাদের। গালাগাল দিয়েছিলেন নিজেকেও—নির্বোধ ও মূর্খ বলে, সর্বনাশী মেয়েটাকে চিনতে পারেন নি বলে। তবে তখন আর আপসোস ক'রে লাভ কি, কেলেঙ্কারীর কিছুই আর বাকী রইল না, শুধু বাংলাদেশেই নয়, খবরের কাগজের কল্যাণে ভারতের সর্বত্রই বোধহয় ছড়িয়ে গেল সংবাদটা।

রাণীবৌদি কিন্তু নির্বিকার। কোনরকম অনুতপ্ত হতেও দেখা যায় নি নাকি। আদালতেও ঐ কথাই তিনি বললেন, এমন লোকের সন্তান রাখা মানে দেশের মধ্যে অসৎ লোকের বংশ বিস্তার করা, কুৎসিত ব্যাধির বীজ ছড়ানো। এ যুক্তিতে আইন এড়ানো যায় না, এড়াতে পারলেনও না, শেষ পর্যন্ত জেলেও যেতে হ'ল। তবে হাকিম ওঁর তেজস্বিতা, সত্য ও স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে যতটা সম্ভব লঘু ক'রে দিয়েছিলেন দণ্ডটা, যে মানসিক অবস্থায় মা হয়েও নিজের সন্তানকে নষ্ট করতে পেরেছেন—রায় দেবার সময় সেই অবস্থাটার প্রতিই জোর দিয়েছিলেন বার বার।

এর পর স্বভাবতই আমরা আর কোন খবর রাখি নি। কোন আত্মীয়ই রাখে নি। তবে খবর কিছু কিছু এসে পৌঁচেছে। জেল থেকে বেরিয়ে নাকি কোন্ মিশনারীদের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তারা নাকি ওঁকে পড়িয়ে বি. এ. পর্যন্ত পাস করিয়েছিল। তার পর কোন্ ইস্কুলেও নাকি তারাই চাকরি ক'রে দিয়েছিল। না, ক্রীশ্চান হয়েছিলেন কি না তা জানা যায় নি, তবে

তাতে যে রাণীবৌদির কোন আপত্তি থাকবে—তাও মনে হয় নি কারও। আর হ'লেই বা কি, আমাদের সমাজে, আমাদের আত্মীয়মহলে তো ওঁর মৃত্যুই হয়ে গেছে। ওঁর মামারাও কোন সম্পর্কে রাখেন নি আর। যোগেশদার খবর আরও সংক্ষিপ্ত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আর একটা বিয়ে করেছিলেন, ইতি-মধ্যে গুটি কতক সন্তানও হয়ে গেছে—সব কটিই চিররুগ্ন প্রায়—যোগেশদা নিজেও মারা গেছেন এই বিবাহের বছর ছয়-সাতের মধ্যেই।

প্রায় অন্ধকার রেলের কামরা, বন্ধ জানলার মধ্যে দিয়ে যতদূর দেখা যায় —বাইরেটা অন্ধকারে ও কুয়াশায় একাকার হয়ে গেছে, ভেতরে ততোধিক। ট্রেনটা যে গতিতে চলছে, মনের মধ্যে দিয়ে স্মৃতির ছবিটা তার চেয়ে অনেক বেশী দ্রুত গতিতে সরে সরে গেল। বুঝলুম ওঁরও তাই। তুজনেই একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। অথচ কীই বা করা যায়, কোন্ প্রসঙ্গ তোলা যায়, তাও যেন হঠাৎ মনে পড়ল না।

শেষে আবারও একটা মামুলি প্রশ্নই ক'রে বসলুম। আসলে তখন যে-কোন উপায়ে হোক্ এই অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙা দরকার। বললুম, 'তার-পর?...তা এত দেশ থাকতে এইখানে চাকরি করতে এলেন? আর ওখানেই বা থাকেন কোথায়? এখানে হোস্টেল নেই? কিম্বা কোন বাসাটাসা? রোজ এই এত রাত্রে একা একা ফেরেন—'

হাসলেন রাণীবৌদি। চোখে সে আগুন জ্বলে কিনা জানি না—দেখলাম হাসিটা তাঁর আজও তেমনি মিষ্টি আছে। বললেন, 'আমাকে আর কোন্ বড় ইস্কুলে কে চাকরি দেবে বলো। তাও সাধারণ গ্র্যাজুয়েট—বি. টি. ডিগ্রিও নেই। তাছাড়া সহায় সম্বল তো কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা তুর্নাম। এখানে এটা মিশনারীদের ইস্কুল ছিল বলেই কাজটা পেয়েছিলুম।'

'তা এখানেই থাকেন না কেন? এখানে হোস্টেল নেই?'

'আছে। কিন্তু এখানে থাকলে চলে না। আমার ওখানকার সংসার দেখে কে?'

'সংসার!' চমকে উঠলুম। সে বিস্ময় কণ্ঠে বা মুখভাবে চাপাও রইল না, 'আ—আপনি আবার বিয়ে করেছেন নাকি?'

'দূর পাগল! আমাকে আবার কে বিয়ে করবে—জেলখাটা দাগী আসামী,

তায় বিধবা। কেন, বিয়ে না করলে কি আর সংসার থাকতে নেই? এক গাদা ছেলেমেয়ে আমার।'

এবার আর অনাবশ্যক বোধেই প্রশ্ন করলুম না। নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম শুধু।

বোধহয় অনুক্ত প্রশ্নটা আমার চোখ দেখেই অনুমান ক'রে নিলেন রাণী-বৌদি, বললেন, 'না না, অবৈধ কিছু নয়, দস্তুরমতো স্বামীদেবতা মশাইয়ের বিবাহিতা ধর্মপত্নীর সন্তান, তোমারই ভাইপো ভাইঝি তারা। তোমার যোগেশ-দার ছেলেমেয়ে।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়েই থাকি তাঁর মুখের দিকে। আজ বুঝি বিস্ময়ের ও হেঁয়ালির শেষ হবে না।

'যোগেশদার ছেলেমেয়ে? তাঁর ছেলেমেয়ে আপনি মানুষ করছেন? সে কি ক'রে হবে?'

'হবে কি—হচ্ছে তো!' এবার একটু যেন অপ্রতিভের হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। যেন কোন গর্হিত কাজ ক'রে ফেলেছেন এমনি একটা লজ্জা, বললেন, 'তোমার যোগেশদা এই বিয়ে করার পরই পৃথক হয়েছিলেন, পৈতৃক সম্পত্তি যা পেয়েছিলেন তা মরবার আগেই দুহাতে উড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। মরবার পর সমস্ত পরিবারটা পথে বসেছিল প্রায়। এইখানে তোমার নতুন বৌদির—মানে আমার সতীনের বাপের বাড়ি, অগত্যা এখানে এসেই উঠে-ছিলেন তাঁরা—কিন্তু অবর্ণনীয় দুর্গতিতে দিন কাটছিল। ওঁদের অবস্থাও তো ভাল ছিল না, নইলে অমন পাত্রে মেয়ে দেবেন কেন?···আমি এখানে চাকরি করতে এসে এই ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লুম আর কি!···কানে শুনে—একের পর এক লোক এসে যখন বলতে থাকে—পেটে ভাত নেই পরনে কাপড় নেই—পড়াশুনো তো কল্পনাতীত—তখন আর চুপ ক'রে থাকতে পারি কই? হাজার হোক শ্বশুরের বংশধর। যা-ই করে থাকি, ডিভোর্স তো হয় নি—ধর্মান্তরও হয় নি।···আমি এখন ওখানেই থাকি, রাঁধা ভাতটা পাই দুবেলা। লাভ ঐটুকু আর কি!'

গল্প করতে করতে কখন মাঝের স্টেশন পার হয়ে গেছে—লক্ষ্য করি নি। এবার রাণীবৌদির স্টেশন কাছে আসছে। তিনি তৈরী হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে

তেমনি একটু লাজুক লাজুক ভাবে হেসে বললেন, 'মনে মনে খুব হাসছ—না ? একেই বোধহয় প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে—না কি ঈশ্বরের বিচার—কী বলবে ? বিচার হলে খুবই সূক্ষ্মবিচার বলতে হবে, নিক্তির তৌলে মাপা !'

তারপর নামতে নামতে আর একটু হেসে বললেন, 'ছোটটা আবার এমন ন্যাওটো হয়েছে, যত রাত্রেই যাই, জেগে বসে থাকে।…আচ্ছা চলি, যদি কখনও এদিকে এসো তো একবার ঘুরে যেও, আচার্যিদের বাড়ি বললেই দেখিয়ে দেবে সবাই।…আমার কেউ না হ'লেও—তোমার আত্মীয় তো !'

দায়িত্ব

ওর জীবনে যে আবার এমন দিন আসবে—তা ভাবে নি নীহারকণা। উৎসব-মণ্ডপ আলো-ঝলমল করছে, দেউড়িতে সানাই বাজছে, আগাগোড়া সমস্ত বাড়িটায় পুষ্পসজ্জা—মূল্যবান দানসামগ্রী দিয়ে সাজানো বিবাহ আসরে তার স্বামী—হ্যাঁ, সে স্বামীই বলবে, সে তো আর অন্য কাউকে বিয়ে করে নি—বসে কন্যা সম্প্রদান করছেন, আত্মীয়-স্বজন চারিদিকে গিসগিস করছে, উভয় দিকেরই আত্মীয়-স্বজন—এ যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে তার।

প্রচুর পয়সাও খরচ করেছে ও। ভাড়াকরা বাড়ি, শুধু বিয়ের বা অন্য উৎসবের জন্যে এক একটা বাড়ি ভাড়া দেওয়া যেমন রেওয়াজ হয়েছে আজ-কাল, তবু তাকেই যা সাজিয়েছে—কেবল ডেকোরেটারই নিয়েছে আড়াই হাজার টাকা—বাড়িটা অন্যরকম দেখাচ্ছে, নতুন বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। সানাইও, অনেকে বলেছিল সানাইয়ের রেকর্ড বাজাতে—নীহারকণার পছন্দ হয় নি, পুরো ছ'শো টাকা দিয়ে চার ঘণ্টার কড়ারে নামকরা বাজিয়ে আনিয়েছে। এর প্রায় সবটাই ওর টাকা, কিছু ধার করতেও হয়েছে—তবে সেসব দুঃখ ওর চলে গেছে, স্বামী দিব্যেন্দু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চার হাজার টাকা দিতে।

সত্যি, এ যেন মনে হচ্ছে সেই আগেকার দিনগুলো।

সেই ওর স্বামী, সেই শ্বশুরবাড়ির সবাই—ননদ, নন্দাই, দেওর, জা, ভাগ্নে, ভাগ্নেবৌ—এরা কেউ খারাপ নয়, কেউ কোনদিন অসদ্ব্যবহার করে নি তার

সঙ্গে। এই ব্যাপারটা হয়ে যেতেই তারা আসা-যাওয়া বন্ধ করেছিল—নীহারও লজ্জায় কখনও দেখা করত না; যার সম্পর্কে সম্পর্ক, সে-ই যদি তা ঘুচিয়ে দেয় তো কোন্ সূত্র ধরে তাদের কাছে যাবে। কোন্ আত্মীয়তার দাবীতে?

এই আনন্দের দিনে নীহারকণা সেই শত্রুকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় যাকে সতীন বলা চলে—সেই পুতুলকেও। বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে যখন দিব্যেন্দুকে ডাকতেই হ'ল—আর দিব্যেন্দুও সাগ্রহে শশব্যস্তে এল যেটুকু সাধ্য তার সাহায্য করতে—তখন আর দিব্যেন্দুর স্ত্রী পুতুলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারল না। তা ছাড়া ছেলেমেয়ের জন্যে দিব্যেন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক একবারে তুলে দিতে পারে নি, তাদের আসা-যাওয়াতেই একটা যোগসূত্র বজায় ছিল বরাবর। দরকার-মতো চিঠি লেখাও চলত। খবরাখবর উভয় পক্ষই রাখত। সেক্ষেত্রে সে বাড়ির গৃহিণীকে নিমন্ত্রণ না ক'রে উপায় কি? সে অবশ্য নিজে যায় নি—ঐটুকু আত্মসম্মানবোধ ছাড়তে পারে নি সে, কিন্তু আপু বা অপরাজিতা নিজে গিয়ে বলে এসেছে তার নতুন মাকে, নীহারকণাও চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল সব বিতৃষ্ণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। পুতুলও এসেছিল একবার, তিনটে বা চারটের সময়, দিনকাল খারাপ—বাড়ি আগলাতে হবে, এই অজুহাতে চলে গেছে প্রায় তখনই। সে না গেলে নাকি দিব্যেন্দু আসতে পারবে না। যে পুরনো চাকরটি বাড়িতে থাকে, সে দেশে গেছে—বড় ননদের মতে ইচ্ছা ক'রেই ছুটি দিয়েছে তাকে, এই অজুহাত সৃষ্টি করেছে। শাড়ি, গয়না দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে আপুকে চুমু খেয়ে নীহারকণার কাছে হাত জোড় ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে চলে গেছে।

এটুকু বিবেচনার কাজ করেছে বলে তার কাছে কৃতজ্ঞই হয়েছে নীহারকণা। পুতুলকে একেবারে বাদ দিলে একটা মালিন্যের ছায়া পড়ত এই উৎসবের সমারোহে—সামান্য ছায়া হয়ত, তবু তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—সে কারণ রইল না, অথচ তার উপস্থিতিতে যে অস্বস্তিটা বোধ করত সবাই, সেটা থেকেও রেহাই মিলল।

না, সবদিক দিয়েই শুভ কাজটা সার্থক সফল হতে চলেছে, তবে ভগবান নাকি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বা সুখ কাউকে দেন না—একটা বড় কাঁটাই বিঁধে

আছে নীহারকণার মনে। সে ওর ছেলে, জয়ন্ত।

এই বিয়েতে যার দায়িত্ব সর্বাধিক, সকলের আগে সব কাজে যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, খাটবে সবচেয়ে বেশী—সেই জয়ন্তই নেই। নেই মানে কোথাও কোন কাজে কি বিদেশে যায় নি, এইখানেই এই শহরেই আছে—তার অত আদরের রাজপুত্রের মতো ছেলে ভিখিরীদের সঙ্গে ভিখিরীর জীবন কাটাচ্ছে; চালের চোরাকারবারীদের আধখাওয়া বিড়ি টানে—ওর চাকর রঘু স্বচক্ষে দেখেছে। বিয়ের খবর সে রাখে, আজ তার দিদির বিয়ে তাও জানে—কিন্তু সে সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহ কি দায়িত্ববোধ নেই। এইটেই বেশী আঘাত করছে নীহারকণাকে, একমাত্র ছেলে অমানুষ হয়ে গেল বলে। যেটুকু সংশয় ছিল, অথবা আশা ছিল—কোন একদিন শুধরে যাবে, মানুষ হয়ে উঠবে—সেটুকুও আর রইল না। এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল ছিল। প্রতিদিন—নিজের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই চিন্তা থেকে যাবে—না জানি কি দুর্গতির কথা শুনতে হয় ওর, কী অধঃপতন দেখতে হয়; লোকের কাছে কতখানি মাথা হেঁট হয়। আশা তো কিছু রইলই না, আশঙ্কা রইল যোল আনার ওপর আঠারো আনা। দুর্গতি দেখাটা যোল আনা, অপমানিত হওয়াটা তার ওপর—আরও বেশী। অন্তত আজ যদি একবারও আসত, এসে এই সন্ধ্যেটুকুও একটু দাঁড়াত ভাল কাপড় জামা পরে—তাহলে মুখটা রক্ষে হত, জনে জনে প্রত্যেকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত না ছেলে কোথায়। আর, আর বোধহয় আশাও থাকত একটু।

এখনও যদি আসে।

জানে কোন সম্ভাবনা নেই—তবুও মনে মনে ভগবানকে ডাকছে নীহার-কণা, সেই সন্ধ্যে থেকেই ডেকে যাচ্ছে—যদি একটুখানি অন্তত সুমতি হয়, একবারের জন্যেও যদি আসে।…

হঠাৎ একসময় খেয়াল হ'ল নীহারকণার যে, একাধিক ব্যক্তি একাধিক ব্যাপারে তাকে নানা প্রশ্ন করছে।

কেটারার বলছেন, 'এখনও যদি ফাস্ট ব্যাচ না বসানো যায় তাহলে কিন্তু সব চুকতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। মোটে পঁয়ষট্টিটা সীট—ছাদে ব্যবস্থা

করতে বলেছিলুম ঐ জন্যেই, তাহলে পুরো একশো লোক বসানো যেত একবারে—আপনার তো তিনশোর মতো প্রায় গেস্ট, পাঁচটা ব্যাচ ধরুন, পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে ধরলেও কত হয় দেখুন না হিসেব ক'রে…'

'তা এখনই বসাচ্ছেন না কেন? আমি কি না বলেছি?'

ক্লান্ত নীহারকণা একটু বিরক্তভাবেই বলে।

'আমি তো সব সাজিয়ে বসে আছি। কেউ যে যাচ্ছে না। কাকে বললে ঠিক য়্যারেঞ্জ ক'রে বসিয়ে দিতে পারেন—আমাকে যদি একটু বলে দেন…'

'ঐ যে গরদের পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছেন ঐ থামটার পাশে, আমার বড় নন্দাই…ওঁকে বলুন, উনিই পারবেন।'

'নন্দাই' শব্দটা যেন অনেকক্ষণ ধরে উচ্চারণ করে, তারিফ ক'রে খাওয়ার মতো শব্দটা যেন উপভোগ করে। এতদিন কেউ কোথাও ছিল না, বিশেষ শ্বশুরবাড়ি জিনিসটাই ঘুচে গেছল,…সে যেন লজ্জা ও অপমানের শেষ ছিল না। কোন অপরাধ না ক'রেও নির্বাসিতের জীবনযাপন করছিল এতদিন। আত্মীয় যে আছে…শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কের আত্মীয়, তারা ওকে যে ত্যাগ করে নি, তারা এসেছে…এ যে কতখানি গর্বের আনন্দের আশ্বাসের কথা…এর আগে এমন ক'রে বোঝে নি কোনদিন।

বড় ননদ নীলিমার শাশুড়ী এসে বলেন, 'কী লো বৌ, স্ত্রী-আচারের কি হবে? বলি তুই তো বরণ করবি? শাশুড়ীকেই তো ঐ সব সুতোটুতো খেতে হয়!'

অকস্মাৎ দু' চোখ জলে ভরে আসে নীহারকণার, বলে, 'কিন্তু আমার যে সবই উল্টো মাঐমা, বিধাতা আমার জন্যে যে নির্জনে বসে লিখেছেন ভাগ্যের কথাটা—স্বামী বেঁচে আছেন, তিনিই মেয়েকে সম্প্রদান করছেন… তবু আমি কি ঠিক সধবা? আমাকে দিয়ে কি এয়োর কাজ চলবে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। জানিও না।'

'তা বটে।' একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন নীলিমার শাশুড়ী, 'আমিও তো বলতে পারছি না। এমন তো এর আগে…। তা তাহ'লে না হয় থাক, মেয়েটার কল্যেণ অকল্যেণের ব্যাপার…। তবে নির্জনে বসে কপালের লেখন লিখেছে বিধাতা, সেটা মনে করিস নি, এ তো আজকাল আকছার, ঘর ঘর।'

দুঃখ আঘাত অপমান···আশঙ্কা সব ছাপিয়েও তৃপ্তি আছে বৈকি একটা।

জোর ক'রে মনকে ফিরিয়ে আনে এদিকে।

বিবাহ-বাসরের দিকে।

কি সুন্দর দেখাচ্ছে রমাকে। লজ্জা আর আনন্দ মিলিয়ে কি রঙের খেলাই না চলেছে ওর মুখে। আনন্দের কারণও আছে। বেছে বেছে জামাই এনেছে নীহারকণা। রূপসী মেয়ে, অল্প বয়স···তার উপযুক্ত বরই খুঁজে এনেছে। সুন্দর দেখতে, বিদ্বান, ডি. ফিল. পাওয়া ছেলে, বড় সরকারী চাকরি করছে··· সব দিক দিয়েই পরিচয় দেবার মতো জামাই।

ওরা কিছু নিচ্ছে না, কিন্তু নীহারকণা ঢেলে দিয়েছে। ফ্রীজ, রেডিও, রেকর্ডপ্লেয়ার ; খাট, বিছানা, আলমারী, ড্রেসিং টেবল, ডাইনিং টেবল সেট, দু' প্রস্থ বাসন, মায় পূজোর বাসন, দু'খানা পাপোশ সুদ্ধ্ দিতে ভুল হয় নি। টয়লেটের তো কথাই নেই। ভাল দোকান থেকে বাছাই করা জিনিস কিনেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদে সহজ সম্মতির মূল্য হিসেবে যে টাকাটা দিয়েছিল দিব্যেন্দু, তার একটা পয়সাও খরচ করে নি এতদিন···সুদে আসলে যা ছিল, সব এতেই খরচ করেছে।

স্বামীবেচা টাকা? তাই বলবে হয়ত অনেকে। কিন্তু নীহারকণা তা মনে করে না। সে পুতুলকে স্বামী দানই করেছে। এটা সেই বদান্যতার, মহত্ত্বের প্রণামী। এ টাকা তো সে চায় নি, এমন কোন শর্তও হয় নি—তবে বিক্রি বলে ধরবে কেন?

ওদের কোন লাভম্যারেজ হয় নি। ভালবাসার পর বিয়ে নয়—বিয়ের পর ভালবাসা। কিন্তু তাতে সুখী হয়েছিল ওরা, অন্তত নীহারকথা হয়েছিল। হয়ত তাতেই সুখী হয়েছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে অপরিচিতকে পাবার অনাস্বাদিত বিস্ময় উপভোগ ক'রে। সেদিন মনে হয় দিব্যেন্দুও সুখী ছিল। এই সময় ওদের জীবনে এল পুতুল। সম্পর্কে দিব্যেন্দুর মামাতো বোন। এইখানেই কলকাতায় এক ওআর্কিং গার্লস হোস্টেলে থেকে চাকরি করত কোন্ অফিসে। আগে যে আসা-যাওয়া ছিল না তা নয়—তবে সে অন্তরঙ্গতা কখনও স্বাভাবিক গণ্ডী পার হয় নি। অকস্মাৎ সরকার থেকে সে বাড়িটা রিকুইজিশান্ করায় হোস্টেল গেল উঠে। দাঁড়াবার

জায়গা নেই, দেশ বহু দূর, সেই বেথুয়াডহরী থেকেও ছ মাইল ভেতরে— হোটেলে থাকলে থাকা খাওয়ার খরচেই মাইনের সব টাকা বেরিয়ে যাবে, হাত খরচ চলবে না—এই অবস্থা দেখে নীহারকণাই বলেছিল, 'যত দিন না অন্য ব্যবস্থা হয় এখানেই থাকো না। খুব সঙ্কোচ বোধ করো ষাট সত্তরটা টাকা দিও মাসে। তাতে আর দোষ কি?'

দোষ যে কী সেটা ক্রমে বোঝা গেল।

নতুন কোন ব্যবস্থার জন্যে তাড়া দেখা গেল না পুতুলের। এক্ষেত্রে সে তাড়া দেখানো দিব্যেন্দু নীহারের পক্ষে অশোভন। ক্রমে দেখা গেল তাড়া নেই শুধু নয়—যাওয়ার ইচ্ছাও নেই পুতুলের। দিব্যেন্দুরও যেতে দেবার ইচ্ছা নেই।

আরও কিছু দিন পরে দেখা গেল আফিস থেকে ফিরতে দুজনেরই অস্বাভাবিক দেরি হচ্ছে আজকাল। ঠিক একসঙ্গে ঢোকে না দুজন, কিন্তু বেশী তফাৎও থাকে না—পাঁচ থেকে দশ মিনিট।···তার পর আর ওদের মনোভাবটা চাপা রইল না কারও কাছেই।

আত্মীয় স্বজন অনেক দিন ধরে অনেক কথা শোনাচ্ছিল। বলছিল শক্ত হ'তে। কিন্তু নীহারের তা ভাল লাগল না। দিব্যেন্দুকে সে ভালবেসেছিল —এত যে বেসেছিল আগে বোঝে নি। অন্য কেউ বিশ্বাস করবে না ওর মনোভাবটা, বুঝতে পারবে না,—কিন্তু নীহারকণার সেদিন সত্যিই মনে হয়েছিল যে, দিব্যেন্দুর বড় কষ্ট হচ্ছে, অন্তরের এই দ্বন্দ্বে শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এমন চলতে থাকলে শীগগিরই অকালে বুড়ো হয়ে যাবে। তার চেয়ে ও যাতে সুখী হয়, শান্তি পায় তাই করুক। ওর মনে আর স্থান নেই নীহারকণার সেটা তো স্পষ্ট, মিছিমিছি দেহটাকে ধরে রাখার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। তাতে দেহটাই যাবে মাঝখান থেকে। নিজের অপমান তো বটেই! নীহার নিজেই একদিন বলল দিব্যেন্দুকে, 'মিছিমিছি টানাপোড়েনে লাভ নেই। নিজের ঘরে নিজে চোর হয়ে থাকা, তার চেয়ে ডিভোর্সের একটা চেষ্টা ছাখো। আমি একটা ছোট ফ্ল্যাট পেয়েছি, চাকরিও একটা পেয়ে যাবো মনে হচ্ছে— আমি সামনের সপ্তাহেই সেখানে চলে যাবো, নতুন ফ্ল্যাটে।'

দিব্যেন্দু একটা কথাও বলতে পারল না। যাকে বেকুব হয়ে যাওয়া বলে

তাই হয়ে গেল। লোক-দেখানো 'না-না, এসব বলছ কেন' তাও বলতে পারল না। শুধু অনেক কষ্টে বলল, 'তা তুমিই বরং এখানে—আমি না হয় অন্য কোথাও—'

দৃঢ় ভাবে ঘাড় নেড়েছিল নীহারকণা, 'না, এ আমার কাছে এখন শ্মশান। তোমাকে হারিয়ে এখানে থাকতে পারব না। তা ছাড়া এত বড় বাড়ি মেন-টেন করতেও তো পারব না—নতুন চাকরি, সামান্য আয়।'

বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় ঠিক হয়েছিল ছেলেমেয়ে নীহারের কাছেই থাকবে। ছেলে বেশী প্রিয় বাপের, দিব্যেন্দুই অনুনয় ক'রে বলেছিল, 'ছেলে তোমারই থাক—কোন দাবী আমি করছি না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কিছু দিন ক'রে যদি আমার কাছে এসে থাকতে দাও আমার বলবার কোন মুখ নেই, জাস্ট ভিক্ষা একটা।'

স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল নীহারকণা, 'সৎমার বিষ-দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারবে?'

মাথা হেঁট ক'রে জবাব দিয়েছিল দিব্যেন্দু, 'ঠিক সৎমা যাকে বলে এ তো তা নয়। আগেও জানত, তাছাড়া এমনি তো ভালবাসে বলেই মনে হয়। বেশ, যদি তেমন দেখি—আর নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করবো না। ছেলেও থাকতে চাইবে না, তোমার কাছে আমার কাছে মিলিয়ে থাকবে তো, ভাল না লাগলে সে-ই বেঁকে দাঁড়াবে। এ তো আর নিরুপায়ের থাকা নয়।'

নীহারকণা তবু সাবধান ক'রে দিয়েছিল, 'ছেলে মানুষ করা কিন্তু শুধুই আদর দেওয়া নয়—এ একটা বড় দায়িত্ব—আশা করি মনে রাখবে সেটা।'

'নিশ্চয়, কী মনে করো তুমি। আর, তুমি তো রইলেই!'

প্রথম প্রথম তিন মাস অন্তর বাসা বদল হ'তে লাগল ছেলের।

গোড়া থেকেই এটা ভাল লাগে নি নীহারকণার। কোথাও মূল বিস্তার লাভ করছে না, চরিত্র গড়ে ওঠার পক্ষে ক্ষতিকর এটা। তাছাড়া মা আর বাবার এই বিচ্ছেদের যে প্রধান কারণ সে সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া ভাল নয়। কিন্তু দিব্যেন্দুর করুণ মুখের দিকে চেয়েই আর 'না' বলতে পারে নি। মেয়েকে

যে একদিনও যেতে দেয় নি, এই একটা বিষয়ে প্রথম থেকেই সে অনমনায়। মেয়েদের জীবন অন্য রকম. সে সম্বন্ধে বেশী সতর্কতা দরকার বাপ-মায়ের।

ছেলে সম্বন্ধেও যদি সে এমনি কঠিন হ'ত।

ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে নীহারকণার ধারণাটা খুব স্পষ্ট। অকারণ রূঢ়তা যেমন কাম্য নয়, তেমনি অতিরিক্ত স্নেহও বর্জনীয়—এ জ্ঞান তার কতকটা সহজাত। এ-সম্বন্ধে সে অনেক পড়াশুনোও করেছে, তবে তার চেয়ে বেশী আস্থা রাখে সে মা-ঠাকুমার মুখে শোনা উপদেশ নির্দেশের ওপর। সেই আদর্শেই ওর ধারণাগুলো গড়ে উঠেছে। তাই পড়াশুনোয় নয়—প্রতিদিনের জীবনযাত্রাতেও সে নিয়মানুবর্তিতার, শৃঙ্খলার পক্ষপাতী।

খোকা—মানে জয়ন্ত—বরাবরই একটু অলস, খেয়ালী স্বভাব, একটু বেশী আরামপ্রিয়। সে অভ্যাসগুলো অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চায় নীহারকণা, দিব্যেন্দু তাকে স্নেহরসে পুষ্ট ক'রে তোলে।

এখন এই দ্বিধাবিভক্ত জীবনে দুটো মনোভাবের তফাতটা বড় বেশী করে চোখে পড়তে লাগল। জয়ন্তর বালকের মন এর কারণ বুঝবে, মা তার কল্যাণের জন্যেই কঠোর হ'তে চান একথা বুঝবে—তা আশা করাই ভুল। জয়ন্তর মনে হ'তে লাগল মার আশ্রয় মার সঙ্গ বড় বেশী কঠোর, বড় বেশী অবসরহীন। বড় বেশী নিরানন্দ। মার স্বভাবের রুক্ষতায় ও উত্তাপে তার মানসমুকুলের কোমল পল্লবগুলি শুকিয়ে ঝরে যাবে। বিকশিত হবার সুযোগ পাবে না।

মার কাছে যে তিন মাস থাকে না, আদরে, আবদার-পূরণে, প্রশ্রয় দানে মধুর থেকে মধুরতর ক'রে তোলে দিব্যেন্দু। তারপরই নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে এসে পড়তে হয়। সে বিরসতা তো আছেই, পড়াশুনোর জন্যে নিত্য বকাবকি আরও অসহ্য বোধ হয়। নির্মম লাগে তিরস্কারগুলো। পাছে সৎমার কোন দুর্নাম তাকে লাগে—এই ভয়ে পুতুলও অত্যধিক আদর দেয় ওখানে—লোক-দেখানো। আপন মায়ের পক্ষে সে বাড়াবাড়ি দৃষ্টিকটু, অভাবনীয়ও। যেখানে সত্যের জোর আছে সেখানে মিথ্যার মুখোশ অপ্রয়োজন। অকৃত্রিমতার অহংকারও একটা আছে।

শেষে একদিন জয়ন্ত—নীহারকণা যে আশা ও দিব্যেন্দু যে আশঙ্কা

করেছিল তাকে সম্পূর্ণ অমূলক ক'রে দিয়ে—বলে বসল, সে বাবার কাছেই থাকবে। মায়ের কাছে দিদি থাক, দিদিকেই মা বেশী ভালবাসে, জয়ন্তকে দুচক্ষে দেখতে পারে না—ইত্যাদি।

নীহারকণা বোঝাবার চেষ্টা করেছে বৈকি। সেই সঙ্গে—মিথ্যে বলবে না নীহার—দিব্যেন্দুও অনেক চেষ্টা করেছে ওর এই অশোভন খেয়াল থেকে ওকে প্রতিনিবৃত্ত করার। কিন্তু জয়ন্ত একবগ্‌গা ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে থেকেছে—সে মার কাছে থাকবে না, থাকবে না।

অগত্যা হাল ছেড়েই দিতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। জয়ন্ত পুরোপুরি বাবার কাছেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না জয়ন্ত। যৎপরোনাস্তি ফাঁকি দিয়েও বছরের শেষে দিব্যি প্রমোশন পেয়ে উঠে যেত। মাস্টার মশাইরা কেবল "হায় হায়" করতেন, 'একটুও যদি বাড়িতে পড়ে জয়ন্ত তাহলে ফার্স্ট সেকেণ্ড হ'তে পারে—এত ভাল মাথা। ফাইন্যালে স্কলারশিপও একটা বাঁধা থাকে।'

কিন্তু সেইটেই করানো যেত না। তার নিজের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই করানো যেত না তাকে দিয়ে।

যত দিন যেতে লাগল—তার জেদ, খামখেয়াল, ঔদ্ধত্য, প্রকট হয়ে উঠল। ছোটবেলায় যেটাকে অনায়াসে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, এমন কি প্রশ্রয় দিতেও ভাল লাগে—বড় হ'লে সেটাই অপ্রীতিকর, ক্রমে অসহ্য হয়ে ওঠে। শাসন করতে গেলে বিপরীত ফল হয় তখন। অভ্যাস ততদিনে স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়—তাকে আর তখন সংশোধন সম্ভব নয়।

পুতুলের আরও বেশী অসহ্য হয়ে ওঠে। তার কারণ—তার ছেলেমেয়ে হয় না। তা ছাড়া আগে মনে হ'ত দুদিনের জন্যে এসেছে, একটু অসুবিধা হ'লেও লোক দেখানো আদর দিতে আটকাত না। এখন যত মনে হয়—এই অসভ্য অভব্য বদমেজাজী ছেলেটা চিরদিনের মতো ঘাড়ে চেপে রইল, এর আবদার আর দুর্বিনীত স্বভাবের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই—ততই তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নিজের তো হ'লই না—পরের এই ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে চাপল! স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে এই ছেলেটার ওপর দিয়ে শোধ তুলল নীহারকণা। জীবন বিষাক্ত ক'রে দেবে সে।

পুতুল বিরক্ত হয়, সে বিরক্তি প্রকাশও করে। ওর মনে হয় জয়ন্তর যথেচ্ছাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এবার সেও শাসন করে, সে শাসন আপন মায়ের থেকে ঢের বেশী রূঢ়, কর্কশ হয়ে ওঠে।···দিব্যেন্দুরও ভাল লাগে না—তবে সে যতটা বিরক্ত হয়, বিপন্ন বোধ করে তার ঢের বেশী। নীহারকণার সতর্কবাণীর মূল্য বুঝতে পারে কিন্তু তখন আর ভুল শুধরে নেবার সময় থাকে না।

ফলে জয়ন্ত আরও বিগড়ে যায়। যে একাধিপত্য, যে সস্নেহ প্রশ্রয় সে এত কাল নির্বিচারে পেয়ে এসেছে—তার অভাব, বাবা ও নতুন মার পক্ষে রীতিমতো বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়। বয়স্ক লোক হলে অভিমান আত্ম-সম্মানের প্রশ্ন উঠত—জয়ন্ত রাগারাগি করে, ঝগড়া করে, জোর ক'রে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। তার ফলে আরও তিক্ততা আর বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এবার দিব্যেন্দুও কঠিন হতে বাধ্য হয়—কিন্তু রোগ তখন চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। সংশোধন ঘটে না, ঘটে আরও অধঃপতন।

নীহারকণা বলেছিল বৈকি—এখানে এসে থাকার কথা। কিন্তু সেটাও অপমানকর মনে হয় জয়ন্তর। বরং আগে সে মধ্যে মধ্যে এসে দু চার ঘণ্টা কাটিয়ে যেত, প্রধান আকর্ষণ দিদিই অবশ্য, এখন একেবারেই আসা বন্ধ ক'রে দিলে। ওখানে অনাদৃত হয়ে, উপায় নেই বলেই এখানে এসেছে—একথা কেউ ভাববে, সে চিন্তাও অসহ্য।

পুতুলের ওপর একটা চাপা ঘৃণার ভাব অনেক দিন ধরেই মনের মধ্যে আকার নিচ্ছিল, এবার সেটা মনের বাইরে চলে এল। তবু তার আচরণ তার কথা অসহনীয় নয়, কারণ সে সৎমা, সে তো প্রীতির চোখে দেখতে পারবেই না। তার কাছে আশাও করে না কেউই। কিন্তু বাবা! বাবার ওপরেই ভরসা বেশী ছিল, বাবার জন্যে মাকে ত্যাগ করেছে সে। সেখান থেকে আঘাতটা আসতেই বেশী লাগে। প্রথমে একটা দুর্জয় অভিমান—পরে সেটা বিদ্বেষে ও আক্রোশে পরিণত হয়। সে আক্রোশ, দুরন্ত ক্রোধ বাবাকে দিয়ে মেটাবে সে উপায় নেই। বাবা ওর আয়ত্তের বাইরে। তাই এক সময় ঠিক করে নিজের ওপর দিয়েই বাবার ওপর শোধ তুলবে। নিজে খারাপ হয়ে গিয়ে, বিগড়ে গিয়ে, চোর ডাকাত বাটপাড় হয়ে গিয়ে বাবার মুখ ডোবাবে, তাহলেই

যথেষ্ট জব্দ করা হবে তাকে।

ঠিক এই ভাবে, এতটা যে হিসেব ক'রে ঠিক করে তা নয়—এই ধরণের একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে সে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করে।

ছেলেমানুষ বা পাগল না হ'লে কেউ এমন ভাবে না।

জয়ন্ত দুই-ই।

অল্প বয়স—মাতৃস্নেহ মাতৃসাহচর্যে বঞ্চিত কিশোর তার অভিমানে হতাশায় বিদ্বেষে পাগল হয়ে উঠেছে। এই সময় যদি দিব্যেন্দু ভালবেসে ভালবাসা দিয়ে ফেরাবার চেষ্টা করত তাহ'লে কী হ'ত কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এতদিনের বহু উৎপাতে ক্লান্ত বিরক্ত দিব্যেন্দু—নীহারকণার সতর্কবাণী না শুনে ক্ষতিগ্রস্ত আর সেই কারণেই অনুতপ্ত ও লজ্জিত দিব্যেন্দু—আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। কঠিন ভাবে শাসন করতে চেষ্টা করে। ফলে আরো দূরেই সরে যায় ছেলে। ব্যবধান আরও বিস্তৃত হয়।

লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, বিড়ি সিগারেট খেতে শেখে। তার জন্যে দিব্যেন্দুর পকেট থেকে, পুতুলের ব্যাগ থেকে পয়সা চুরি করতে হয়; ইস্কুলের মাইনে জমা না দিয়ে সেই টাকায় পথের ধারে লটারি খেলে ধরা পড়ে নির্মম মার খায়। এইভাবে ক'মাস চলার পর সম্প্রতি বাড়িই ছেড়ে দিয়েছে সে, কদাচিৎ বাড়ি আসে—বেলা দুটো তিনটেয় হয়ত, পুতুল তখন আপিসে—চাকরের কাছ থেকে জোর ক'রে হয়ত খায় কিছু। জামা কাপড় নেয়, আবার সরে পড়ে। কাছাকাছি রেল স্টেশনগুলোয় যারা সব চালের চোরা-কারবার করে, তাদের সঙ্গে মিশে গেছে। এর মধ্যে দু-একজন দেখেছে, তাদের সঙ্গে—বিশেষ দক্ষিণের নিরক্ষর ঐ সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে বিড়ি খাচ্ছে, গল্প করছে, যারা স্টেশনের ধারে কাঠের গুঁড়ো জ্বেলে ইটের উনুনে ভাত রেঁধে খায়—তাদের সঙ্গে বসে সেই ভাত খাচ্ছে। রুক্ষ চুল, ময়লা জামা কাপড়, গায়ে ময়লা জমে গেছে। জামায় চায়ের দাগ, তরকারির দাগ—পেঁচি মাতালের মতো। এক কথায় ভদ্রলোকের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলেছে সে, পোশাকে পরিচ্ছদে, আচারে-আচরণে, কথায় বার্তায়।

এয়োর কাজ শুরু হয়েছে। বরযাত্রীরা ভীড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাদের সরিয়ে কন্যাপক্ষের মেয়েরা কাছে এগোতে পারছে না। নীহার নিজে গিয়ে মিষ্টি কথায়, হাত জোড় ক'রে দুদিকে সরিয়ে দুভাগ ক'রে দিল। এক দিকে মেয়ে, আর এক দিকে পুরুষ। বরযাত্রীদের অগ্রাধিকার—কিন্তু এ-দলে মেয়ে কম। অন্তত মেয়েদের দিকে কন্যাপক্ষ কিছুটা সুবিধা পাক।

সাত পাক ঘোরা শেষ হয়েছে, নীহারকণার মামী-শাশুড়ী প্রধান এয়োর কাজ করছেন, তিনি বরের হাত বেঁধে হাজার টাকার দাবি করছেন—সেই কৌতুকোচ্ছল মুহূর্তে চাকর রঘু এসে পিছন থেকে ডাকল, 'মা শুনছেন ?'

চোখটা ওদিক থেকে যতদূর সম্ভব না তুলে, এদিকে মুখ ফিরিয়ে নীহারকণা প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে ?'

রঘু আরও চুপি চুপি বলার চেষ্টা করল, 'থানা থেকে একজন পুলিশের লোক এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

থানা থেকে !

নীহারকণার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। থানা থেকে পুলিশের লোক !

পুলিশের না এনফোর্সমেণ্ট ব্র্যাঞ্চের লোক ?

এত লোক খাওয়ানো হচ্ছে বলেই কি ?

কিন্তু এ বাড়ি তো এমনিধারা উৎসবের জন্যেই ভাড়া দেওয়া হয়। প্রতি বিয়ের দিনই তো ভাড়া থাকে। লোকও কেউ কম খাওয়ায় না। বিয়ে ছাড়াও—পৈতে, অন্নপ্রাশন—বোধ হয় এক দিনও খালি থাকে না বাড়িটা। বেছে বেছে তার মেয়ের বিয়েতেই পুলিশ আসবে ?

অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল।

কাকে বলা যায় ওর সঙ্গে দেখা করতে—ইংরেজীতে যাকে বলে 'ফেস' করতে।

বড় নন্দাই পাকা লোক, তিনি এসব ভাল বোঝেন। ঘুষঘাষ দিয়ে হাত করতে হলে ওঁকে পাঠানোই ভাল।

রঘু বোধ হয় ওর ভীত আশ্রয়প্রার্থী দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে মনের ভাবটা বুঝল। বলল, 'উনি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চাইছেন। বলেছেন—পাঁচ কান করার দরকার নেই বিশেষ। বিয়ে বাড়িতে বেশী জানাজানি না করাই ভাল, কি হবে নানান জবাবদিহিতে ?'

বুকের মধ্যেটা গুরগুর ক'রে উঠল অকারণেই।

ওর সঙ্গেই দেখা করতে চাইছে? তার মানে? তার মানে কি? কী বলতে চান ভদ্রলোক, সোজাসুজিই ঘুষ চান নাকি? তাই এত সহানুভূতি, পাঁচ কান না হয় যাতে—এত উদ্বেগ?

আশ্বস্তও হ'ল একটু।

পা-পা ক'রে পিছু হটে বাইরের দিকে এল। চারিদিকে আলো, দেখতে কোন অসুবিধা নেই। পুলিশের পোশাক পরা লোক দূর থেকেও দেখা যায়—যদিও ভদ্রলোক যতটা সম্ভব একটু আবছায়ার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেছেন।

এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু নির্জন জায়গা খুঁজল নীহারকণা। বিরাট উঠানের একদিকে বিয়ে হচ্ছে, অন্যদিকে অতিথিদের বসার জায়গা। লোকে লোকারণ্য। অসহায় ভাবে চাইছে, পুলিশ ভদ্রলোকই এগিয়ে এলেন—তাঁর মাথা স্বভাবতই এসব ব্যাপারে সাফ—বললেন, 'বরাসন পড়েছিল যে ঘরে সেটা তো এখন নিশ্চয়ই খালি। সেখানে বসা যায় না?'

আঁধারে কুল পেল নীহার। সেই ঘরেই নিয়ে গেল ওঁকে, সম্পূর্ণ ই খালি সেটা, কেবল একটা কাদের বাচ্ছা ছেলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে জাজিমের ওপর। নীহার ওঁর দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে নিজে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?...আমারই মেয়ের বিয়ে—বুঝতেই পারছেন, খুব ব্যস্ত আছি—'

'তা জানি। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এখন না আসতে হলে আমরাও বেঁচে যেতাম। আমি চট ক'রেই সেরে নিচ্ছি কথাটা। জগন্নাথ ইনষ্টিটিউশনের ক্লাস টেন-এর ছাত্র—জয়ন্তশঙ্কর মিত্রকে চেনেন? আপনার ছেলে?'

বুকের মধ্যে ছাঁৎ ক'রে উঠল।

তবে কি, তবে কি তার কোনো য়্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে এসটা অস্পষ্ট স্বস্তির ভাবও জাগে সে দুশ্চিন্তা ছাপিয়ে—আসলে সেই জন্যেই হয়ত আসতে পারে নি। নইলে দিদির বিয়ে, দিদিকে ভালবাসে— নিশ্চয়ই আসত একবার।

একটা মন এই আকাশকুসুম রচনা করে, আর একটা মন প্রশ্ন করে, 'কেন বলুন তো? তার—তার কি হয়েছে? দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে —কোন য়্যাকসিডেন্ট হয় নি তো? ট্রেন চাপা পড়ে নি?'

'না না, ওসব কিছু নয়। দৈহিক ভালই আছে।'

আরও বিবর্ণ হয়ে ওঠে নীহারকণা।

'কোন খারাপ কাজ করেছে নাকি? চুরি-টুরি? পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছে?'

প্রায় চুপি চুপি, স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

সে কথার উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাকে বিব্রত করার ইচ্ছে আমার একদম ছিল না। ওঁর বাবা তো দিব্যেন্দু মিত্র? স্টেট ব্যাঙ্ক-এর অফিসার? তাঁর সন্ধানে গেছলুম, শুনলুম তিনি এখানে এসেছেন। এখানে এসেও ধরতে পারলুম না; কন্যা সম্প্রদানে বসেছেন—সেই জন্যেই আরও আপনাকে—'

অস্থির হয়ে উঠে প্রায় আর্তনাদের মতো প্রশ্ন করে নীহার, 'কিন্তু কি হয়েছে সেইটেই তো বলছেন না। প্লীজ, এমন ভাবে আর দগ্ধে মারবেন না।'

তিনি বললেন শেষ পর্যন্ত। পুলিশের লোক হ'লেও লজ্জা ও ভদ্রতাবোধ যায় নি। অনেক ইতস্তত ক'রে ভাষায় অনেক আবরণ দিয়ে জানালেন মর্মান্তিক সত্যটি।

দুপুরবেলা স্টেশনের প্লাটফর্ম অনেকটা জনহীন ছিল। থাকার মধ্যে সকালে যারা চাল বেচতে এসেছিল তারা কেউ কেউ বেচা-কেনা সেরে স্টেশনে এসে, ট্রেনের দেরি আছে দেখে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাদের মধ্যে একটি অল্প-বয়সী মেয়ে জেগে ছিল। ওরই মধ্যে একটু চিকচিকে দেখতে—তাকে খাবার না কি দিয়ে জয়ন্ত ভুলিয়ে নিয়ে গেছে মেয়েদের ওয়েটিং রুমে। সেখানে কেউ যায় না কোন দিনই, কেউই বসে না—সেজন্য কোন ঝি বা আয়ার বন্দোবস্ত নেই, শুধু দুটো কাঠের বেঞ্চি পাতা আছে। বেশীর ভাগই মেয়ে পুরুষ যাত্রী সেখানে ঢোকে নিরিবিলি আড়ালে প্রাকৃতিক কাজ সারতে। ফলে সেটা যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধ।

সেখানে কি করেছে তা আর বলতে পারলেন না ভদ্রলোক। ভদ্রমহিলার

সামনে বলা যায় না। শুধু বললেন, মেয়েটার অবস্থা খারাপ। কারণ শুধু লজ্জাজনক আচরণই করে নি, মেয়েটা বাধা দিয়েছিল বলে মারধোরও করেছে। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। মা উঠে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে—দেখতে পায় নি। শেষে ঘণ্টাখানেক পরে, খুব কান্নাকাটি করছে দেখে জয়ন্তই এসে দেখিয়ে দিয়েছে।

তারপর স্টেশন মাস্টার এসেছেন; পুলিশ ডেকেছেন। জয়ন্ত পালাতে পারত কিন্তু পালায় নি। চুপ ক'রে নিরীহের মতো এক দিকে বসে ছিল। পুলিশ এলে শান্তভাবেই ধরা দিয়েছে।

নির্বিবাদে ধরা দিয়েছে কিন্তু পরিচয় দেয় নি। সেই জন্যেই এত দেরি হ'ল। অন্য লোকে বলেছে। তাও পুরো পরিচয় দিতে পারে নি তারা। তবু সেই সূত্র ধরেই পরিচয় খুঁজে বার করেছেন এঁরা। শিয়ালদায় রেল-পুলিশের লক-আপে আছে ছেলে, ওঁদের কর্তব্যবোধে ওঁরা জানিয়ে গেলেন।

তার পরে কি হয়েছে, কী বলেছে নীহার তাঁকে, তিনিই বা বিদায় নেবার সময় কী বলে গেছেন—তা কিছুই ওর মনে নেই। একটা ঘোরের মধ্যেই সমস্তটা ঘটে গেছে।

শুধু এইটুকু হুঁশ ছিল যে, বিহ্বল হলে, ভেঙে পড়লে চলবে না। এ সংবাদ অন্তত আজ কুটুমদের কানে না পৌছয় কোনমতেই। মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ী জামাই এরা তো জানবেই, কিন্তু তাদের কুটুমরা জানলে তারা মুখ দেখাতে পারবে না। আর সে জন্যে ওর মেয়েটাকেই দায়ী করবে, বিদ্বেষের চোখে দেখবে।

মনকে শক্ত করতে, সংযত করতে একবার আরম্ভ ক'রে দিতে পারলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে আসে। বুকটা ভেঙে মুচড়ে পড়ছে ঠিকই—তবু এই ক'বছরের জীবনে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে সহ্যশক্তিও বেড়েছে। সুতরাং মুখের প্রশান্তিই শুধু ফিরে এল না, প্রয়োজন মতো সে মুখে হাসিও ফুটল।

কিন্তু দিব্যেন্দু বুঝতে পারে নীহারের মুখের দিকে চেয়ে যে, কোথাও একটা বড় রকমের অঘটন ঘটেছে। এতদিন পরেও স্ত্রীর কপালের রেখাগুলোর অর্থ মনে পড়ে যায় ওর, বিবাহের পর্ব চুকলে, মেয়ে জামাই বাসরঘরে উঠে গেলে

মাসিমা যখন শরবতের গ্লাস এনে ধরলেন তখন সে গ্লাস হাতে ক'রেই ভূতপূর্বা স্ত্রীকে খুঁজে বার করল দিব্যেন্দু। কোন বৃথা ভূমিকা না ক'রে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে?'

তার গলায় ব্যস্ততা উদ্বেগ ফুটে উঠলেও নীহারের কণ্ঠস্বরে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না। শান্ত, অথচ একধরনের শাণিত কণ্ঠেই ঘটনাটা বিবৃত করল। অভিযোগটা শব্দে উচ্চারিত হ'ল না। বলার ভঙ্গীতে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সংবাদ জানানো শেষ হ'লে নীহার শুধু বলল, 'তুমি স্বেচ্ছায় ছেলের দায়িত্ব নিয়েছিলে, তা পালন করো নি। তারই পরিণাম এটা। এবার যা করা দরকার—আশা করছি সেটুকুর জন্যেও তুমিই এগিয়ে যাবে, আমাকে টানবে না।'

শরবতের গ্লাস অস্পর্শিত তখনও···দিব্যেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আমি এখুনি যাচ্ছি···'

'না, শোন।' দৃঢ় আদেশের সুরে বলে ওঠে নীহার, 'এখন গিয়ে কোন লাভ হবে না। অথচ এখানে অজস্র জবাবদিহি। শুনছি তো কাল ভোরেই এঁরা বৌ নিয়ে চলে যাবেন, তখনই যেয়ো, এখানকার আশীর্বাদের পালা চুকিয়ে। বাকী যা দায়িত্ব থাকবে, এ বাড়ি খালি করার—সেটা আমি পারব।'

মুখে বললেও কাজে তা পারে না।

মেয়ে-জামাই রওনা হতে বড় নন্দাইকে ডেকে তাঁর হাত ধরে অনুনয় ক'রে এখানের ভারটা দিয়ে যায়। সেইসঙ্গে ফুলশয্যার তত্ত্বর যা কেনাকাটা বাকী আছে—সে ভারও। তারপর ট্যাক্সি এলে দিব্যেন্দুর সঙ্গে সেও চড়ে বসে।

দিব্যেন্দুকে এখন একা ছাড়া উচিত নয়—এটা ও বুঝেছে।

কাল থেকে সে যেন একটা জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে। ছেলে তারই অবহেলায় অকর্মণ্যতায় অমানুষ হয়ে গেল, সে তার স্বেচ্ছাবৃত ভার ঠিকমতো বহন করতে পারে নি—এ অক্ষমতার গ্লানি তো আছেই কিন্তু সেই অবহেলার পরিণাম যেটা দাঁড়িয়েছে এতটার জন্যেও সে-ই দায়ী—এটা কিছুতেই বিশ্বাস

করতে, মেনে নিতে পারছে না। এমন কত হয়—কত ছেলে তো সংসার কাছে যথেষ্ট অনাদরে কষ্টে মানুষ হয়—তাদের তো সবাই এ ধরনের ক্রিমিনাল হয়ে ওঠে না ?...

আসলে এই ঘৃণ্য কাজটার লজ্জা আর অপমানই তাকে যেন বিহ্বল ক'রে দিয়েছে। এই তথ্যটার সঙ্গে—বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে মেলাতে পারছে না সে। এ কী হ'ল! এ কী হ'ল! এখন সে কি করবে!

বিহ্বল হয়ে ভাল-মন্দ সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনা শক্তি হারিয়েছে বলেই অদ্ভুত একটা কথা বলে বসল সে।

বড় দারোগা বা ও. সি.ই দেখা করলেন ওদের সঙ্গে। তাঁকে বলল, 'আমি যদি এই অপরাধটা নিজে করেছি বলে মেনে নিই, আপনারা ওকে ছেড়ে দেবেন তো ?'

নীহারকণা ব্যাকুল হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, ইন্‌স্‌পেক্টার ভদ্রলোক ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন, বললেন, 'ছি! একটা অপমান থেকে অব্যাহতি পেতে আরও ঢের বড় অপমান মাথায় তুলে নেবেন ? তাতেই কি ও সমাজে মাথা উঁচু ক'রে চলতে পারবে ? কার ছেলে বলে পরিচয় দেবে ? আর আপনি জেলে বসে থাকলে এ ছেলেকে শুধরে মানুষই বা করবে কে ?...না না, অত ব্যস্ত হবেন না, অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবুন! ঐ মেয়েটার মাকে কিছু টাকা অফার করুন—ওরা এখনই কেস উইথড্র করবে। এ ওদের কাছে এমন একটা কিছু ভয়ানক ব্যাপার নয়। তা ছাড়া, আপনার ছেলে যদি এখনও সবটা ঝেড়ে অস্বীকার করে, ওদের প্রমাণ করা খুব শক্ত হবে। চাক্ষুষ সাক্ষী তো কেউ নেই। আসামী সাফ কবুল করেছে বলে আনন্দে নাচতে নাচতে আসার ফলে শ্রীমানরা আর কেউ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখে নি।...না, না, আপনি বলুন ওদের, ওরাও কিছু পেয়ে যাক, অভিযোগই যদি না থাকে মামলা কিসের ? কিংবা ওদের দিয়েই বলিয়ে দেব পাড়ার কোনো লোকের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে জয়ন্তকে ফাঁসাবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছিল।'

'কিন্তু...কিন্তু এ ছেলে নিয়েই বা কি করব বলুন।' ভগ্ন স্খলিত কণ্ঠে বলল দিব্যেন্দু, 'তার চেয়ে অল্প বয়স তো, এ তো জেল হবে না, রিফরমেটারীতে দেবে ...যদি শুধরে আসতে পারে ?'

'ক্ষেপেছেন? ওখানে কেউ রিফর্মড্ হয়! ছেলেমেয়েদের বেস্ট্ রিফর-মেটারী হ'ল মার আশ্রয় আর শিক্ষা। কিছু মনে করবেন না মিঃ মিত্র, যা শুনছি···আপনি নিজের কাছে ওকে রাখার চেষ্টা ক'রে ভাল করেন নি। আপনি যদি একা থাকতেন তাহলেও অন্য কথা—যদি কোন বিবাদ বিসম্বাদ ক'রে আপনারা সেপারেটেড হতেন—আপনাদের প্রেম নষ্ট না হ'ত। মাফ করবেন, এটা হয়তো আমার খুব অনধিকার চর্চা হ'ল—এসব কথা বলা। তবে ছেলেটার সত্যি কথা বলার সাহস দেখে আমি ইম্প্রেস্ড্ হয়েছি, আপনাদের ব্যাকুলতাও টাচ করেছে—তাই আমি আত্মীয়ের মতোই কথাগুলি বললুম, কিছু মনে করবেন না।'

তারপর একটু থেমে নীহারকণার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যান, আপনার কাছে রেখে চরিত্রের মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করুন, ঠিক কাজ হবে। ছেলে আপনাদের স্পিরিটেড—আমার তো মনে হয় বাবার প্রতি গভীর অভিমানের বশেই এ কাজ করেছে। নইলে পালাবার অজস্র পথ ছিল, তাছাড়া এ অপরাধ ঘাড় পেতে নেবারও তো দরকার ছিল না। ছেলে একেবারে খারাপ নয় মিঃ মিত্র!'

নীহারকণা বলল, 'তাই করব। আমার কাছেই রাখব, যদি প্রয়োজন হয় কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো। এখানে এই স্মৃতি—এই অপমানের আর ঐসব লোকগুলোর সঙ্গে মিশে ঐভাবে থাকার···ওকে অবিরত লজ্জা দেবে। নতুন কোন জায়গায় গিয়ে নতুনভাবে পড়াশুনো আরম্ভ করলে ও পাস করবে এ বিশ্বাস আমার আছে। ভাল ভাবেই এগিয়ে যাবে। আমি বাইরে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে নিতে পারব না!'

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে শেষের কথাগুলো বললে নীহারকণা। দিব্যেন্দু চিরদিনই আবেগপ্রবণ, সে জোর গলায় বললে, 'যতদিন না পারো, তোমাদের খরচ আমিই চালাব যেমন ক'রে হোক। উপবাস ক'রে থাকতে হলে তাও থাকব। তাতেই বরং আমার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

দারোগাবাবুর কল্যাণে মেয়েটাকে খুঁজে বার করা কিছু কঠিন হ'ল না। কিন্তু সেখানে আর এক বিস্ময়।

মেয়েটার নাম সরমা। বছর চোদ্দ-পনেরোর মেয়ে, দেখতে মোটামুটি সুশ্রী, যদিও রং বেশ ময়লা।

সে মায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া লাগিয়েছে নাকি আগেই ; এ মামলার মধ্যে সে নেই ; সে আদালতে গিয়ে এসব কথা বলতে রাজী নয়, ছেলেটার নামে কোন নালিশ সে করবে না।

এরা যখন গিয়ে পড়ল তখন এই উপলক্ষ ক'রেই সরমার মা তাকে খিস্তি ক'রে গাল পাড়ছে। মামলা না চলুক, এই মোচড় দিয়ে ছেলেটার মা বাপের কাছ থেকে কিছু আদায় হবে, এটা তাকে অনেকেই বুঝিয়েছে। কিন্তু আসল যে বাদী সে-ই যদি বেঁকে দাঁড়ায়,···সে আদায়টা হবে কোথা থেকে ?

নীহার অবস্থাটা বুঝে নিয়ে সরমার মাকে একেবারেই একশো টাকা বার ক'রে দিল। ওরা রাজী থাকলে সে ওর মেয়ের সমস্ত ভার নিতে পারে তাও জানাল। যদিচ দেখা গেল সে প্রস্তাবে সরমার মা খুব খুশী নয়, তবে একশোটা টাকা পেয়ে আপাতত এদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

অতঃপর ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে সই-সাবুদ করাতে বিশেষ দেরি হল না। ইনস্‌পেক্টর ভদ্রলোক আইনের যতগুলো বাধা ছিল সব সরিয়ে জিনিসটা অনেক সহজ ক'রে দিলেন। শুধু জানালেন যে সেদিন আর ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়, পরের দিন আদালতে নিয়ে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একবার হাজির করতেই হবে, তবে বেলা বারোটার মধ্যেই ছেলেকে নিয়ে যাতে ওরা চলে যেতে পারে সে ব্যবস্থা তিনি ক'রে দেবেন।

কিন্তু শেষ অবধি সে ব্যবস্থা করা গেল না।

সকালে দেখা গেল হাজতের মধ্যেই, সকলে যখন ঘুমিয়েছে, গায়ের জামা ছিঁড়ে দড়ি পাকিয়ে আত্মহত্যা করেছে জয়ন্ত।

বিগত-যৌবন

ম্যাকফার্‌সন কোম্পানীর বড়বাবু যখন সুকুমারকে হঠাৎ জবাব দিলেন, তখন অফিসসুদ্ধ লোকের সঙ্গে বড়বাবু নিজেও বড় কম বিচলিত হন নাই। কারণ

বৎসর দেড়েক পূর্বে সুকুমারের চাকুরি প্রাপ্তিও অল্প বিস্ময়কর ঘটনা নহে। কিন্তু তাহার ইতিহাসটা আগে আপনাদের শোনানো দরকার।

অফিসে যে পদটি খালি হইয়াছিল তাহা টাইপিস্টের এবং সেজন্য বিনা বিজ্ঞাপনেই প্রার্থী হইয়াছিল অন্তত তিনশোজন। সুকুমারও সংবাদটি কোথা হইতে সংগ্রহ করে, আর সেই সঙ্গে বড়বাবুর নাম ও তাঁহার প্রতাপের কাহিনীও শোনে এবং যেদিন ইন্টারভিউর সময় ধার্য হইয়াছিল সেদিন সহসা আসিয়া বড়বাবুকে ধরে যে চাকরীটি তাহাকে করিয়া দিতে হইবে।

বড়বাবু তখন নবীনবাবুর সহিত একটা কিসের স্টেটমেন্ট লইয়া বচসা করিতেছিলেন ; এই আকস্মিক উৎপাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মুখ তুলিতেই বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলেন। সে বিস্ময় শুধু সুকুমারের চেহারার দিকে চাহিয়া। উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী এবং সর্বোপরি প্রথম যৌবনের কমনীয়তার পরিপূর্ণ ছাপ তাহার সর্বদেহে। সেদিকে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়াই সহসা বড়বাবুর দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিল ; অপেক্ষাকৃত নরম সুরে কহিলেন, তা আমার কাছে কেন ? ইন্টারভিউ ত সাহেব নিজে দেবেন !

সুকুমার বিনীতভাবে কহিল, আজ্ঞে আমি দরখাস্ত করি নি ; ইন্টারভিউ আমার নেই।

অধিকতর বিস্মিত হইয়া বড়বাবু কহিলেন, দরখাস্ত করনি ? তবে—?

—আজ্ঞে দরখাস্ত করে কোনও ফল নেই আমি জানি। আপনিই চাকরির মালিক ; সেই জন্যে সোজাসুজি আপনার কাছে এসেছি।

নবীনবাবু মুখ টিপিয়া হাসিলেন। বড়বাবু কহিলেন, আমার কথা আবার কে বলে দিলে ?

সুকুমার মাথা নাড়িয়া কহিল—আজ্ঞে তা বলতে পারব না। নিষেধ আছে !

বড়বাবুর দৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখ অপ্রসন্ন করিয়াই কহিলেন, নিশ্চয়ই আমার আফিসের কোনও গুণধর! লেলিয়ে দিয়ে বসে রইল, তারপর মর্ বেটা তুই ! · হুঁ, তা টাইপ করতে জান ত ?

প্রশান্তভাবেই সুকুমার জবাব দিল, আজ্ঞে না। জানি না।

—তার মানে ?

নবীনবাবু, লোকটা বাতুল ভাবিয়া, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। বড়বাবুরও কিছুকাল বাক্যস্ফূর্তি হইল না। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন—তবে আর কি করব ? চাই যে টাইপিস্‌ট !

সুকুমার দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, কিন্তু আপনাকে কিছু করতেই হবে, নইলে আমি কোথায় যাব বলুন ?

বড়বাবু ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর শুধু কহিলেন, 'ঐ বাইরে গিয়ে একটু বোসগে—'

নবীনবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; এমন কি স্টেটমেণ্টটার বড়রকমের গোলটাই যে এখনও ঠিক করিতে বাকি আছে—সে কথাও আর তাঁহার মনে রহিল না। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন সুধীরবাবু ও জীবনবাবুকে এই অভূতপূর্ব ঘটনার কাহিনীটা শোনাইতে।

বড়বাবু বিনয়কে ডাকাইয়া আনিলেন। কহিলেন, 'বিনয় তুমি টাইপ্‌-রাইটিং শিখ্‌ছিলে না ?

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মাস দুই হ'ল শিখছি।

বড়বাবু বলিলেন, 'আমাদের এই পোস্টটা যদি তোমায় দেওয়া যায়, কাজ চালাতে পারবে বলে মনে করো ?'

বিনয় বার দুই মাথা চুলকাইয়া কহিল, 'যদি বলেন তাহলে রাত জেগে আর একটু প্র্যাকটিস্ ক'রে নিই—'

'তাই নাও। আর হয়ত চান্স পাবেই না। হঠাৎ তোমার কথাটা মনে হ'ল—'

বিনয় কৃতার্থ হইয়া চলিয়া গেল এবং বড়বাবুও উঠিয়া সাহেবের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ইহার পরের ইতিহাসটা কাহারও অবশ্য জানা নাই ; তবে পরের দিন শোনা গেল যে বিনয়ই দশ টাকা বেশী মাহিনাতে টাইপিস্টের কাজে বাহাল হইয়াছে এবং বিনয়ের জায়গায় কাজ পাইয়াছে মাকালফলের মতো রূপসর্বস্ব এক ছোকরা—সুকুমার !

নবীনবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'ছোকরা মোসাহেবিটে শিখেছিল বটে ! দিনকে রাত ক'রে দিলে বাবা !'

কিন্তু সে যাহাই হউক, সেই হইতে সুকুমার ঐ পদেই বাহাল ছিল এবং অপ্রতিহত প্রভাবে চাকরী করিয়া আসিতেছিল। মাহিনা তাহার যে কোথা দিয়া চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ হইতে ষাটে পৌঁছিল তাহা বোধ হয় শুধু বড়বাবু আর তাঁহার অন্তর্যামীই জানেন; তবে নবীনবাবুর দল সুকুমারের প্রতি বড়বাবুর পক্ষপাতটা অচিরেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা কাজে লাগাইতেও দেরি করেন নাই। ইদানীং তাঁহাদের আবেদন নিবেদন তাঁহারা সুকুমারকেই জানাইতেন।

কিন্তু সহসা সুকুমারের ভাগ্যলক্ষ্মী একদিন অপ্রসন্ন হইলেন। সেটা মাঘ মাসের মাঝামাঝি, অফিসে কাজ-কর্মের ভিড় সে সময়টায় একটু কম। সুকুমার বড়বাবুর কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, 'সামনের মাসে আমাকে হপ্তা দুই-এর ছুটি দিতে হবে বোধ হয়!'

বড়বাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'কেন বল দেখি?'

মাথার পিছনটা বার দুই চুলকাইয়া লইয়া সুকুমার জবাব দিল, 'আজ্ঞে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে—আমার অবিশ্যি ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মা বড্ড পেড়াপীড়ি করছেন, আর এড়ানো যাচ্ছে না।'

বড়বাবুর ভ্রূকুটি যেন সহসা গভীর হইয়া উঠিল; তিনি কিছুকাল স্থির ভাবে সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'বয়স কত হ'ল তোমার?'

'আজ্ঞে একুশ পুরো হয়ে বাইশে পড়েছি।'

'তবে বিয়ের অত তাড়া কেন? এই অল্প বয়স—এখনও যথেষ্ট উপায় করতে পার না, এরই মধ্যে বিয়ে ক'রে হ্যানজারি হওয়া কি ভাল?'

সুকুমার এদিক-ওদিক চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, 'আজ্ঞে, মা কিছুতেই ছাড়ছেন না যে!'

'মাকে গিয়ে বল যে সাহেব এখন ছুটি দেবেন না।

সুকুমার কথাটা আর সেদিন বেশি বাড়াইল না, তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল, কিন্তু কেন যে বড়বাবু তাহার বিবাহে বিরূপ, সে কথাটা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

বড়বাবু দিনকতকের মধ্যেই কথাটা ভুলিয়া গেলেন ; তাই ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি যখন সহসা পেটের অসুখ ও জ্বরের কথা জানাইয়া সুকুমার মাত্র পাঁচদিনের ছুটি চাহিল, তখন তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সাহেবকে দিয়া মঞ্জুর করাইয়া দিলেন।

কিন্তু কথাটা তিনি ভুলিয়া গেলেও নবীনবাবু ভোলেন নাই। পাঁচটার পর অফিস জনবিরল হইয়া গেলে তিনি ধীরে ধীরে মুখে একটা পান দিয়া বড়-বাবুর টেবিলের ধারে উপস্থিত হইলেন। বড়বাবু মাথা হেঁট করিয়া কাগজ-পত্রের মধ্যে কী একটা হিসাব খুঁজিতেছিলেন ; মাথা না তুলিয়াই কহিলেন, 'কি, বাড়ি চললেন ?'

নবীনবাবু কহিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ. এরিয়ার কাজ যা ছিল সবই সেরে ফেলেছি, আজ একটু সকাল ক'রে বাড়ি যাব।...আমাদের সুকুমারের কেলেঙ্কারিটা শুনেছেন।'

বড়বাবু চমকিয়া ঘাড় তুলিয়া কহিলেন, 'না তো! কেলেঙ্কারি ?'

নবীনবাবু কহিলেন, আজ যে তার বিয়ে!...পরশু বৌভাত!...আমাদের বললে না, জানালে না—নেমন্তন্ন তো চুলোয় যাক! আপনাকে বলেছে ?

বড়বাবুর চোখ দুইটা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি পরক্ষণেই ঘাড় নামাইয়া কহিলেন,—হ্যাঁ, কি একটা বলছিল বটে, আমি অতটা কান দিই নি।'

নবীনবাবু কহিলেন, 'তবু ভাল, যে এটুকু কর্তব্যবোধ আছে। আচ্ছা নমস্কার।'

নবীনবাবু চলিয়া গেলেন, কিন্তু বড়বাবুর সেই অতি বড় দরকারী হিসাবটাতেও মন বসিল না। মনের মধ্যে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত বৃত্তি যেন এক সঙ্গে কোলাহল করিতেছিল। রাগ—প্রচণ্ড রাগ, কিন্তু ঠিক যে কি জন্য তাহার তিনি নিজেই হদিশ পাইতেছিলেন না। অনেকক্ষণ বিমূঢ় ভাবে বসিয়া থাকিয়া চাপরাশীকে কাগজগুলি গুছাইয়া রাখিতে বলিয়া ডেস্কে চাবি দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

ট্রামের টিকিট পকেটেই ছিল, কিন্তু ট্রামে চড়িতে সেদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল না ; সোজা বৌবাজারের পথ ধরিয়া হাঁটিয়াই চলিলেন।

বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে মনের এলোমেলো ভাব কাটিতে প্রথমেই তাঁহার ক্রোধ স্থকুমারের অকৃতজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া বিশেষ আকার ধারণ করিল। মনে মনে তিনি যেন গজরাইয়া উঠিলেন—ওরে অকৃতজ্ঞ, ওরে বেইমান—রাস্তার কুকুরকে আনিয়া সিংহাসনে বসাইলাম, এই কি তাহার পরিণাম? যে লোকটা এত উপকার করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, তাহার কথার এতটুকু মর্যাদাও দেওয়া চলিল না? নিজের প্রবৃত্তি এতই বড় হইয়া উঠিল যে আর কয়েকটা মাসও অপেক্ষা করিতে পারিলি না? ··

ক্রোধের প্রথম বেগটা কমিয়া আসিতেই মনের অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থায় মনটা কিন্তু নিজের একুশ বছর বয়সে ফিরিয়া গেল। মনে পড়িল—তাঁহার বাবা প্রথম যেদিন বিবাহের কথা পাড়িয়াছিলেন তাহার পর দুই-তিন রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। স্থকুমার? হাঁ, ও বয়সে তিনি অত সুন্দর না হউক, অতটাই জোয়ান ছিলেন! মনে পড়ে প্রতি শনিবার প্রকাশ্যে এবং সপ্তাহে প্রায় পাঁচদিন গোপনে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা। কলেজ পালাইয়া দুপুরে ও বন্ধুর বাড়ি পড়িতে যাওয়ার অছিলায় সন্ধ্যাবেলা।

যৌবনের ধর্মই এই। অনর্থক রাগ করিয়া ফল নাই।

বড়বাবুর মনের রাগ সব যেন অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গেল। শুধু তাই নয়—যৌবনের কথা ভাবিতে গিয়া নিজের যৌবন সঙ্গিনীর কথাও মনে পড়িল। স্ত্রীর কথা মনে পড়িতে হঠাৎ কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে মনে পড়িল তিনি সেকালে বড় ফুল ভালবাসিতেন। জল-খাবারের পয়সা বাঁচাইয়া ফুল কিনিতে হইত। উনি স্মিত প্রসন্ন মুখে কলেজ স্কোয়ারের মোড় হইতে এক গাছা বেলফুলের মালা কিনিয়া হাতে জড়াইলেন; তাহার পর বহুদিন পরে গুন্‌গুন্ করিরা ছেলেবেলাকার গাওয়া একটা গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে আরও জোরে পা হাঁকাইলেন।

যে পথটা আসিতে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় পনেরা-কুড়ি মিনিট লাগা উচিত, সেই পথটা অনায়াসে দশ মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করিয়া নিজের বাড়িতে পৌছিলেন। কিন্তু দ্বারে পা দিতেই সমস্ত স্বপ্ন সহসা যেন রূঢ়ভাবে ভাঙ্গিয়া গেল। গৃহিণী তাঁহার মোটা ভাঙা গলায় বিকট চীৎকার করিতেছেন,

মুখে আগুন তোমার! একটি কাজ যদি তোমার দ্বারা হবার যো আছে! এক-একসের দুধ, দিলে পা লাগিয়ে সবটা ফেলে? কি হাড়-হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে এনেছি গো! কর্তা আসুন, তোমার বাপের বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে তবে আমার নাম!

বুঝিলেন যে পুত্রবধূর সঙ্গে আবার বাধিয়াছে। প্রত্যহই বাধে, কিন্তু আজিকার এই কলহের মতো নিষ্ঠুরতা বোধ হয় আর কিছু নাই! উঁহার মনে পড়িল—ত্রিশ বছর আগে এই রমণীরই মিষ্ট কণ্ঠের মধু-গুঞ্জন অহরহ কানে বাজিত বলিয়া বি-এ পাশ করা আর তাঁহার ঘটিয়া ওঠে নাই। মনটা খিঁচড়াইয়া গেল—তবুও তিনি মুখে প্রসন্নতা আনিয়া ভিতরে পা দিয়া কহিলেন—আবার ভর সন্ধ্যেবেলা তোমার কি হ'ল গো!

গৃহিণী মুখের কাছে আসিয়া বিশ্রী-ভাবে হাত-পা নাড়িয়া কহিলেন, 'কি হবে আবার! গুণবতী বৌ তোমার দিলেন একসের দুধ পা লাগিয়ে ফেলে। লক্ষ্মীমন্ত ঘরের মেয়ে এসেছেন, এইবার ধন-দৌলত উছলে পড়বে!'

বধূ আড়ষ্ট হইয়া দূরে নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সেদিকে চাহিয়া বড়বাবু কহিলেন, 'যাক্‌গে, ছেলেমানুষ অসাবধানে ক'রে ফেলেছে, তার জন্যে সন্ধ্যে-বেলা বকাবকি ক'রে আর কি হবে? এস এস—ওপরে এস—'

অকস্মাৎ যেন খণ্ড-প্রলয় বাধিয়া গেল। বার কতক লাফাইয়া, নাচিয়া, চেঁচামেচি করিয়া গৃহিণী সত্যই কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিলেন। স্থূল-দেহ, প্রকাণ্ড মুখ—বলিরেখায় ও দন্তহীনতায় কুৎসিত, বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে; গাত্রচর্ম লোল ও কুঞ্চিত, তাহার উপর ঐ জঘন্য ভঙ্গী; সেদিকে চাহিয়া যেন তাঁহার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। পিছনে গৃহিণীর আস্ফালন তখনও থামে নাই—'বুড়ো হয়ে মর্‌তে চললেন, অস্থি-দন্তসার, শকুনি উড়ছে মাথার ওপর, এখনও আক্কেল হ'ল না? আমার মুখের সামনে বৌকে আস্কারা দেওয়া? আবার বুড়ো বয়সে বেলফুলের মালা জড়ানো হয়েছে হাতে! ছোঁড়া সাজবার শখ হয়েছে, না?'...

না, যৌবন আর নাই। তাহাকে বহুদূরে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। সে কবেকার কথা এখন যেন মনেও পড়ে না! দেহে নানারকমের রোগ জন্মার

উপস্থিতি ঘোষণা করিতেছে। এখন আর সত্যই বেলফুলের মালা হাতে জড়ানো যায় না!

নিজের ঘরে না ঢুকিয়া কী কারণে যে বড় ছেলের ঘরে আসিয়া আয়না বসানো আলমারীটার সম্মুখে দাঁড়াইলেন তাহা কে জানে! বাহিরের আলো তখন পাণ্ডুর হইয়া আসিয়াছে; দাঁতের অর্ধেক বাঁধানো, তাহাতে গাল ও ঠোঁটের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিয়াছে, গায়ের চামড়া গোসাপের পিঠের মতো; স্থূল বেডৌল দেহ; এইটুকু উঠিয়া আসিয়াই হাঁপাইতেছেন!

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল সুকুমারের যৌবনপুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারাটা; তাহার সর্বাঙ্গে যৌবনের সেই আবেশময় উচ্ছলতা। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনায় একটি সুন্দরী কিশোরীর আবেগময় প্রেম-নিবেদনও যেন তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন; যৌবন ও কৈশোরের সেই বিহ্বল মিলন তাঁহার বুকের মধ্যে যেন একটা আগুন জ্বালিয়া, সারা বুক পুড়াইয়া প্রচণ্ড একটা হাহাকার তুলিয়া গেল। ঈর্ষার তীব্র বিষে তাঁহার শরীর মূর্ছাতুর হইয়া উঠিল। তিনি টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া মালাটা ছিঁড়িয়া ফুলগুলি দলিয়া ডেলা পাকাইয়া ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর অফিসের পোশাক না ছাড়িয়াই একখানা পোস্টকার্ড বাহির করিয়া সুকুমারকে চিঠি লিখিতে বসিলেন।

যাহা লিখিলেন তাহার মর্মার্থ এই: সুকুমারের অতঃপর আর অফিসে আসিবার প্রয়োজন নাই; তাহার এই কয়দিনের মাহিনা নোটিসের এক মাসের মাহিনাসুদ্ধ মনিঅর্ডারযোগে তাহাকে যথাসময়ে পাঠানো হইবে। তাহার চাকুরী আর নাই।

চাকরকে ডাকিয়া চিঠিখানি ডাকে পাঠাইয়া দিয়া ধীর হস্তে পায়ের জুতা গায়ের জামা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নিচে গৃহিণীর চিৎকার তখনও থামে নাই।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। গঙ্গার উপরে প্রথম শীতের ধোঁয়াটে কুয়াশা জমিয়া সামনেটা আগাগোড়া যেন একটা আবছায়ায় ঢাকিয়া

রাখিয়াছে, ওপারের 'বাস'-এর আড্ডাটা পর্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু অত সকালেই সর্বেশ্বর দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া দেখিল কাশীনাথ তাহার উনানটায় ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে।

খেয়াঘাটের উপর সর্বেশ্বরের পরোটার দোকান এ অঞ্চলে বিখ্যাত। দুই এক প্রকার মিষ্টান্ন এবং চায়ের উপকরণও যদিচ সর্বদা মজুত থাকিত তথাপি পরোটাই তাহার দোকানের সর্বপ্রধান পণ্য। অদূরে স্টেশন এবং বাসের আড্ডা, ওপারেও তিন-চারিটি লাইনের বাস আসিয়া জমা হয়, এপারের রেল লাইনের যাত্রীদের নিজ-গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। সুতরাং খাবারের চাহিদা বেশী বলিয়া সর্বেশ্বর একটু সকাল করিয়াই দোকান খুলিত, ওধারেও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাকে দোকান খুলিয়া রাখিতে হইত। দোকান আরও কয়েকটি আছে—খাবার, মনোহারী, পানবিড়ি, মুড়ি-বাতাসা অভাব কিছুরই নাই। কিন্তু খদ্দের সর্বেশ্বরেরই এখনও পর্যন্ত বেশি, আর সেইজন্যই তাহাকে ভোর থাকিতে দোকান খুলিতে হয়।

কিন্তু কাশীনাথকে অত ভোরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সর্বেশ্বর একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। সে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিল, 'ব্যাপার কি হে কাশীনাথ, এত ভোরেই উঠেছ যে?'

বাসী উনান নিভিয়া গেলেও তখনও তাহার উষ্ণতা সম্পূর্ণ যায় নাই, তাহাতেই ঠেস দিয়া আরামে কাশীনাথের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সে চমকিয়া চোখ মেলিয়া সর্বেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর প্রচণ্ড একটা হাই তুলিয়া কহিল, 'তাড়াতাড়ি উনুনটা ধরাও দেখি, একটু চা পেটে না পড়া পর্যন্ত শরীরটা জুৎ লাগছে না। কাল রাত্রে খাই নি কিছু, দেহ যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

বিস্মিত হইয়া সর্বেশ্বর কহিল, 'কেন, কাল কিছু খাও নি কেন?'

ঈষৎ লজ্জিতভাবে হাসিয়া কাশীনাথ জবাব দিল, 'কাল সুভাষবাবু 'বন্দী-মুক্তি দিবস' বলে হরতাল পালন করতে বলেছিলেন, সে কথাটা মনে ছিল না। যেমন বেরুই অন্যদিন, কালও বেরিয়েছিলুম। হঠাৎ দুপুর বেলা মনে পড়ল। তাই কাল আর কিছু খেলুম না।'

সর্বেশ্বর আর প্রশ্ন করিল না। কারণ কাশীনাথের এ পাগলামির কথা

এখানকার সকলেই জানিত। জঙ্গীপুরের দিকে কোথাও কাশীনাথের বাড়ি এবং সে ভদ্রসন্তান—একথা কেমন করিয়া এখানে প্রচারিত হয় তাহা জানা নাই, তবে এখানে সে একদিন সহসাই আসিয়াছিল। শোনা যায় তাহার পিতা এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার অবস্থাও খুব খারাপ নয়। তিনি কী একটা সরকারী চাকরি করিতেন, সেই সূত্রেই কোন স্বদেশী মকদ্দমায় তাঁহাকে কয়েকটি ছেলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সেই ক্ষোভে কাশীনাথ বাড়ি ছাড়িয়া আসে, আর ফিরিয়া যায় নাই। এখানে সে নানা প্রকারের পণ্য ফেরি করিয়া বেড়ায়। সকালে স্টেশনে খবরের কাগজ ফেরি করে, দ্বিপ্রহরে কোনদিন কাঁচের চুড়ি, কোনদিন বা আম ক'প ইত্যাদি সময়োচিত ফসল লইয়া গ্রামের মধ্যে ফেরি করিতে যায়। যেদিন আর কিছু না পায় সেদিন সাড়ে বত্রিশ ভাজা তৈয়ারি করিয়া ফেরি করে।

লেখাপড়া ভাল জানিত না সত্য—কিন্তু খবরের কাগজটি সে প্রত্যহ মন দিয়া পড়িত এবং গ্রাম হইতে ফিরিয়া প্রত্যহ বহু রাত্রি পর্যন্ত সর্বেশ্বরের দোকানে বসিয়া কংগ্রেস ও দেশের খবর লইয়া আলোচনা করিত। অন্য দোকানদাররা কেহ বা সে সব কথা বুঝিত, কেহ বা বুঝিত না, কেহ হয়ত বিদ্রূপও করিত। কিন্তু কাশীনাথের উৎসাহ তাহাতে কিছুমাত্র কমিত না।

সেদিনও সে দমিল না, সর্বেশ্বরকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়া চলিল, 'কথাটা তো সোজা নয়, এতগুলো লোকের জীবন-মরণের কথা, ওঁরা যা বলবেন আমরা যদি তা অক্ষরে অক্ষরে না মানি—তাহলে ওঁদের কথায় কাজ হবে কেন? সরকার ওঁদের কথা শুনবেন কেন?'

সর্বেশ্বর তখন উনানে আগুন দিতে ব্যস্ত, সে কথার জবাব দিল না। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কাশীনাথ আবারও বলিল, 'দেশের পরিস্থিতিটা কি রকম দাঁড়িয়েছে একবার ভাব দিকি সর্বেশ্বরদা, না না, দেশ তো শুধু আমাদের এইটুকু নয়, সারা ভারতের কথা আমাদের ভাবতে হচ্ছে যে!'

'পরিস্থিতি' কথাটা সে সম্প্রতি খবরের কাগজ হইতে শিখিয়াছে, প্রায়ই ব্যবহার করে। কিন্তু ইহাতেও সর্বেশ্বরের নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কাশীনাথ অবশ্য উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্তও ছিল না; সে একটু দম লইয়া আরও কিছু বলিবার যোগাড় করিতেছে, এমন সময় বিড়িওয়ালা

দাশু আসিয়া পড়িল। সেও কাশীনাথকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল, কহিল, 'আরে কাশীদা যে, এত ভোরে?'

সর্বেশ্বর মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'কাল কিসের হরতাল ছিল, সে কথা ভুলে গিয়ে গাঁয়ে বেরিয়েছিলেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে উনি কাল সারারাত উপোস দিয়েছেন।'

সাধারণত কাশীনাথকে কেহ ঘাঁটায় না; কিন্তু সেদিন দাশুর কি দুর্মতি হইল, সে সহসা বলিয়া ফেলিল, 'আচ্ছা কাশীদা, ভুল হয়েছিল ভুলই হয়েছিল, লোকে কথায় বলে অজান্তে সাপের বিষ খেলেও দোষ হয় না, তার জন্যে সারারাত উপোস দিয়ে কি লাভটা হল শুনি? তোমার উপোসেই ভারত স্বাধীন হবে কি?'

দেখিতে দেখিতে কাশীনাথের মুখের চেহারা ভীষণ হইয়া উঠিল। সে খানিকটা আগাইয়া গিয়া কহিল, 'ত্যাখ্ দেশো, এই রকম বুদ্ধি না হলে কি চিরজীবন বিড়ি পাকাতে হয়? ভুল! ভুল হয় কেন? কই খেতে তো ভুল হয় না, ঘুমোতেও ভুল হয় না! এ কত বড় পাপ জানিস? এত বড় একটা দেশের কাজে ভুল হওয়া যা, মাতৃশ্রাদ্ধে ভুল হওয়াও তাই। তোদের আর কি, পেট পুরে খালি খেতেই শিখেছিস—অমন একটা দিন গেল কাল, তা একদিনের জন্যে, এক বেলার জন্যেও দোকান বন্ধ দিতে পারলি না! তোদের মুখ দেখতে আছে! জানিস তারা আজ ক'দিন উপোস ক'রে আছে? ছিঃ ছিঃ, তোদের সংসর্গ মহাপাপ।'

কাশীনাথ কথা কহিতে কহিতে যেন আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল. সে অকস্মাৎ তর তর করিয়া গঙ্গার পাড় বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল। সর্বেশ্বর পিছন হইতে ডাকিয়া কহিল, 'কাশীনাথ, চললে কোথায়, চায়ের জল বসাচ্ছি যে, খেয়ে যাও—'

পিছন না ফিরিয়াই কাশীনাথ জবাব দিল, 'আমার চায়ের দরকার নেই।' এবং পরক্ষণেই গায়ের র‍্যাপারটা চড়ায় খুলিয়া রাখিয়া একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িল গঙ্গার জলে।

সর্বেশ্বর দাশুকে বকিতে লাগিল, 'জানিস তো অমনি আস্ত পাগল ও, খামকা কেন ঘাঁটাতে গেলি? একে কাল সারারাত উপোস ক'রে আছে,

আবার ভোর বেলাই নামল ঠাণ্ডা জলে,—অসুক-বিসুক ক'রে না পড়ে!'

দাশু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'সামান্য একটা কথাতেই যে অত ক্ষেপে যাবে কেমন ক'রে জানব বলো!'

কাশীনাথ স্নান করিয়া ভিজা গায়ে ভিজা কাপড়েই গায়ের কাপড়টা হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিল। স্টেশনের পোর্টার নন্দ বৈরাগীর বাড়ির বাহিরের চালাটায় সে থাকে, এবং দুই বেলা নন্দর বাড়িতে খায়। এই বাবদ কোনদিন সে দশ পয়সা, কোনদিন বা তিন আনা নগদ খরচা দেয়। নন্দ বৈরাগীর স্ত্রী প্রথম প্রথম ভদ্রসন্তানকে ভাত রাঁধিয়া দিতে রাজী হয় নাই, কিন্তু কাশীনাথের জেদে নন্দ শেষ পর্যন্ত তাহাকে রাজী করাইয়াছিল। নিয়মিত খরচা ছাড়াও নন্দ মধ্যে মধ্যে ধার বলিয়া কাশীনাথের নিকট হইতে কিছু কিছু পয়সা লইত কিন্তু সে কথাটা কাশীনাথের পরের দিন পর্যন্ত কখনই মনে থাকিত না এবং নন্দও তাহা মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিত না।

কাশীনাথ যখন বাড়ি ফিরিল তখন নন্দর স্ত্রী পারুল উঠান লেপিতেছিল, আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ছোটবাবু এত ভোরেই নেয়ে এলে যে?'

কাশীনাথ পারুলকে 'বৌ' বলিয়া ডাকিত, পারুল বলিত 'ছোটবাবু'। উভয়েই প্রায় সমবয়সী বলিয়া পারুল তাহার সহিত কথা কহিত, হাসিঠাট্টাও করিত। কাশীনাথের কাছ হইতে জবাব না পাইয়া পারুল পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, 'ব্যাপার কি ছোটবাবু, এই শীতে ভোর বেলাতেই নেয়ে এলে?'

কাশীনাথের ততক্ষণ মাথা অনেক ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে; সে মাথা চুলকাইয়া জবাব দিল, 'এমনিই। দেশোর সঙ্গে রাগারাগি ক'রে গঙ্গায় নেমে গেলুম।'

পারুল হাসিয়া কহিল, 'দাশুর সঙ্গে রাগারাগিটা আবার কিসের? গান্ধী, না সুভাষ বোস?'

কাশীনাথের কৃপায় এ নামগুলি ইহাদের সকলেরই প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কাশীনাথ রাগ করিয়া কহিল, 'ছাখো বৌ, খবরদার ওদের নাম নিয়ে ঠাট্টা ক'রো না বলে দিলুম। জিভ খসে পড়বে।'

সে মাথাটা আর ভাল করিয়া না মুছিয়াই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিছানায়

শুইয়া পড়িল। পারুল তাহার ভাবগতিক দেখিয়া আপন মনে মুখ টিপিয়া হাসিল, তারপর বালতির জলে হাতটা ধুইয়া আঁচলে মুছিতে মুছিতে কাশীনাথের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া কহিল, 'কাল থেকে তো দাঁতে দাঁত দিয়ে রয়েছ, তা সকালে বাইরে গিয়ে খেয়েছিলে কিছু, না শুধু ঝগড়াই ক'রে এলে ?'

কাশীনাথ মুখ ভার করিয়া শুইয়া রহিল, কথার জবাব দিল না। তখন পারুলই আবার কথা কহিল, 'ও কর্ম হয় নি—যা বুঝছি। তা এখন এক কাজ করো না, বাইরের প'ড়ো-উনুনটা জ্বেলে নিজেই একটু চা তৈরী ক'রে খাও না। হাঁড়ির মধ্যে চারটি মুড়কিও আছে বোধ হয়—'

কাশীনাথ মুখ ভার করিয়া কহিল, 'আমার দরকার নেই মুড়কি খাবার।'

পারুল হাসিয়া বলিল, 'আছে আছে। ওঠ দিকি নি, আমার ঘাট হয়েছিল গান্ধীর নাম করায়। এই নাক কান মলছি—'

অগত্যা কাশীনাথ উঠিল, কিন্তু তখনই উনান ধরাইতে গেল না, দাওয়ায় দাঁড়াইয়া কহিল, 'কোথায় পাতা, কোথায় কি, ওসব বড় ঝঞ্ঝাট, থাক না বৌ—'

পারুল ততক্ষণে নারিকেল পাতা আনিয়া হাজির করিয়াছে। সে কহিল, 'ঝঞ্ঝাট তো আমি সেরেই দিলুম, শুধু কলসী থেকে একটু জল ঢেলে নিয়ে চাপিয়ে দেবে, তাতেই এত ?'

তাহার পর মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'ওইজন্যেই তো বলি, ঝঞ্ঝাট পোয়াবার লোক একটা যোগাড় ক'রে ফেল। তা তো শুনবে না ; এমন অনিয়ম অনাচারে ক'দিন শরীর টিকবে—তাই শুনি ?'

কাশীনাথ তখন দেশলাইয়ের আগুনে পাতা ধরাইতেছিল, জবাব দিল না। তা ছাড়া এ কথাটাও বহু পুরাতন, বিবাহের বিরুদ্ধে যত ভাল ভাল যুক্তি ছিল কাশীনাথ সবই শেষ করিয়াছে কিন্তু ফল হয় নাই।

পারুলও অবশ্য কোন জবাব আশা করে নাই, সে তাড়াতাড়ি উঠানের বাকী কাজটুকু সারিয়া, গোরুর ডাবায় চারটি খড় ঢালিয়া দিয়া তাহার উপর সামান্য একটু খইলের জল ছিটাইয়া দিল, তাহার পর বাঁশের আল্‌না হইতে গামছাটা টানিয়া লইয়া গঙ্গায় চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কাশীনাথ কলাইয়ের বাটিতে চা ও

কাপড়ের খুঁটে মুড়কি ঢালিয়া লইয়া খাইতে বসিয়াছে। সে কহিল, 'তোমার গাড়ির যে পাখা পড়েছে ছোটবাবু, কাগজ আনতে যেতে হবে না?'

কাশীনাথ নিরাসক্তভাবে মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'যাবই এখন। না হয় মাস্টার কাগজের বাণ্ডিলটা ঘরে তুলে রাখবে—মানুষের দেহ তো, বারো মাস সমান বয় কি?'

পারুল আর কথা কহিল না, গুন্‌গুন্ করিয়া কি একটা স্তব গাহিতে গাহিতে ঘরে কাপড় ছাড়িতে ঢুকিল। কাশীনাথ বাহির হইতে হাঁকিয়া কহিল, 'বৌ, তোমার জন্যেও এক বাটি চা ক'রে গরম উনুনের ওপরে বসিয়ে রেখেছি, কাপড়টা ছেড়ে মুখে দিয়ে ফ্যালো—'

'মাইরি!'

বলিয়া ফেলিয়াই পারুল বোধ করি লজ্জিত হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'ঐ জন্যেই তো বৈরিগীকে বলি যে মনের মানুষ তো আমার ছোটবাবু, এমন মন বুঝে কাজ আর কেউ করে না। শীতে কাঁপতে কাঁপতে চায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলুম ছোটবাবু—'

কাশীনাথ জবাব দিল না, অন্যমনস্ক ভাবে কি একটা ভাবিতে লাগিল। পারুল কাপড় ছাড়িয়া ভিজা চুলটা পিঠে ছড়াইয়া উনানের ধারেই চা খাইতে বসিল। দুই-এক চুমুক দিয়া কহিল, 'ছোটবাবু, আমার একটা কথা রাখবে?'

কাশীনাথ এই শ্রেণীর অনুরোধে কোনদিনই খুশী হইত না, সেদিনও ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'কি কথা?'

পারুল বলিল, 'বাব্‌বা, যেন তেড়ে মারতে এল!···যাও, তোমাকে কোন কথা শুনতে হবে না।'

কাশীনাথ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'না না, বলো না কি। আমি এমনি কি একটা কথা ভাবছিলুম।'

পারুল কহিল, 'আমার এক সই থাকে মনোহরপুরে, অনেকদিন তাকে দেখি নি, আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে চল না—'

কাশীনাথ প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'আমি ও কারুর বাড়ি-টাড়ি যাওয়া পছন্দ করি না।'

পারুল কহিল, 'আহা, তুমি তাদের বাইরের দাওয়াতেই বসে থেকো না হয়, আর আমিও না হয় তাদের বারণ ক'রে দেব যাতে কেউ না তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসে। তাহলেই হ'ল তো?···আমি যাচ্ছি তাদের সঙ্গে দেখা করতে, তুমি শুধু সঙ্গে যাবে, তাতে কি আর কারুর বাড়ি যাওয়া বোঝায়?'

কাশীনাথ কহিল, 'না না, সে ভারি বিশ্রী ব্যাপার, হয়ত খেতে বলবে, কিংবা জলখাবার দিতে আসবে, সে ভারি ইয়ে হবে—'

পারুল হাসিয়া কহিল, 'না গো না, কিচ্ছু ইয়ে হবে না। না হয় ভোর-বেলা রওনা হবার আগেই তোমাকে এখান থেকে চারটি খাইয়ে নিয়ে যাবো এখন, আবার ফিরে এসে খাবে। তা ছাড়া তারা সব ভদ্দরলোক, তোমার সজাত, কায়েত। আমার সই বটে, কিন্তু আমাদের মতো নয়। আমার বাপের দেশের মেয়ে, একসঙ্গে পাঠশালায় পড়তুম, খুব ভাব ছিল। নিয়ে চল না লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি—'

কাশীনাথ নরম হইল বটে কিন্তু মুখ ভার করিয়া কহিল, 'ভদ্দরলোক তো কি হয়েছে? আমার কাছে জাত-টাত নেই, সব ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।'

কোনমতে হাসি চাপিয়া পারুল কহিল, 'তা বটেই তো, কিন্তু আমাদের ঐ কেমন, ভুল ঘোচে না কিছুতেই—'

এবার রীতিমতো নরম হইয়া কাশীনাথ কহিল, 'কবে যাবে?'

পারুল কহিল, 'ধরো পরশু—?'

কাশীনাথ জবাব দিল, 'উহুঁ, পরশু সদরে মিটিং আছে, আমাকে যেতেই হবে। বরং তার পরের দিন না হয়—'

পারুল কহিল, 'সেই ভাল। তাহলে তাই ঠিক রইল, কেমন?'

আটটার গাড়ি পাশ করাইয়া মাস্টারের বাড়ি জল যোগান দিয়া নন্দ বাড়ি ফিরিল বেলায়।

পারুল তাহাকে চা ও মুড়ি খাইতে দিয়া একেবারে সোজাসুজি কথাটা পাড়িল, 'হ্যাঁ ভাখো, তোমার সেই গো-গাড়িওলা রহিম শেখ মনোহরপুর যাবে

আজকালের মধ্যে ?'

নন্দ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কেন ?'

মাটির দিকে চাহিয়া পারুল জবাব দিল, 'বুধবার দিন ছোটবাবুকে নিয়ে মনোহরপুর যাব। সইয়ের বাড়ি ও যদি খবরটা দিত তো ভাল হ'ত। কোথাও না চলে-টলে যায়—'

নন্দ বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, 'হঠাৎ এতদিন পরে সইকে মনে পড়ল যে ?'

পারুল জবাব দিল, 'সইয়ের মেয়েটি বেশ ফুটফুটে হয়েছে ; ওরা গরীব হ'লে কি হয়, জাতে কায়েত তো, টাকা নইলে ওদের ঘরে বিয়ে হয় না—মেয়েটার গতি করতে পারছে না বলে সই সেবার বড় কান্নাকাটি করেছিল। তাই ভাবছি যে, কোনরকমে যদি ছোটবাবুর চোখে-টোখে পড়ে যায় তাহলে ওরও একটা গতি হয়, আর ছোটবাবুও যা হোক ঘরবাসী হয়।'

নন্দ কিন্তু কথাটায় মোটেই সুখী হইল না, বিরসকণ্ঠে কহিল, 'তোর এ নিয়ে অত মাথা-ব্যথা কেন ?'

পারুল কহিল, 'মাথা-ব্যথা আবার আমার কিসের, তবে মানুষ মানুষের জন্যে কি কিছু করে না ?'

নন্দ রূঢ়কণ্ঠে কহিল, 'না না, ও সব মতলব ছাড়্। ও ছোঁড়া তবু এখানে আছে অনেকটা আমাদের সাশ্রয় হচ্ছে, বিয়ে দিয়ে নিজের ক্ষতি করি কেন ? ও যেমন আছে তেমনি থাক্—'

পারুল মুহূর্তকাল স্তম্ভিতভাবে স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, 'আহা তোমার যা বুদ্ধি। বিয়ে হলেই বা ও যাবে কোথায় শুনি ? এইখানেই থাকবে এখন। ও সব কথা তুমি ভেব না কিছু, বুধবার আমি যাবই—'

নন্দ অস্ফুটস্বরে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি সম্বন্ধে একটা কটূক্তি করিয়া আবার বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও মুখে কিছু বলিল না, কারণ পারুলকে সে একটু সমীহ করিয়াই চলিত। একে পারুল পাঠশালায় পড়া মেয়ে, তাহার উপর তাহার মা সৈরভীর হাতে দু'পয়সা আছে বলিয়াই শোনা যায় এবং বলাই বাহুল্য, নন্দ একদিন সে পয়সা পাইবার আশা রাখে।

কাশীনাথ অবশ্য এসব কোন খবরই রাখিত না, এমন কি মনোহরপুর যাইবার কথাটাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। পারুল বুধবার ভোরবেলা উঠিয়া

কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে অগত্যা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। বেলা নাগাদ জামার উপরেই কাঁধে একটা গামছা ফেলিয়া খালি পায়ে উঠানে নামিয়া কহিল, 'চল বৌ—'

পারুল কহিল, 'ও কি ছোটলোকের মতো যাওয়া—'

তাহাকে বাধা দিয়া বজ্রকণ্ঠে কাশীনাথ কহিল, 'বৌ, আবার?'

অপ্রতিভ হইয়া পারুল কহিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, মানলুম না হয় ছোটলোক কেউ নেই, তবু কাঁধে একটা চাদর আর পায়ে এক জোড়া জুতো দিতে কি দোষটা হয় শুনতে পাই ঠাকুর?'

নাটকীয় ভাবে কাশীনাথ কহিল, 'তুমি জান বৌ, আমাদের দেশের কত লোকের গায়ে একটা গেঞ্জি পর্যন্ত জোটে না? জানলে তুমি এমন কথা বলতে না—'

অসহিষ্ণুভাবে পারুল জবাব দিল, 'উঃ কি জ্বালায় পড়েছি গো, দোহাই তোমার, ঘাট মানছি আমি। তুমি দয়া ক'রে জুতোটা পায়ে গলাও—'

কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তুমি যাচ্ছ সইয়ের বাড়ি, খামকা আমাকে জুতো পরাবার জন্য অত জেদ কেন?'

'না হয় পরলেই! একটা কথা শুনতে কি হয়েছে?' পারুল জেদ করিতে থাকে।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত কাশীনাথকে জুতা পরিতেই হইল।

দুজনে যখন মনোহরপুরে পৌঁছিল তখন দ্বিপ্রহরের আর বেশী বিলম্ব নাই। কাশীনাথ ক্লান্তভাবে বাহিরের দাওয়াটাতেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'চট্‌পট্‌ সেরে নাও বৌ, বেশী দেরি করলে সন্ধ্যার আগে পৌছনো যাবে না। আমি এইখানেই রইলুম।'

পারুল প্রতিবাদ না করিয়াই ভিতরে চলিয়া গেল। কাশীনাথও গামছাটা বিছাইয়া দাওয়াটার উপর শুইয়া পড়িল এবং মিনিট-খানেকের মধ্যেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। সহসা ঘুম ভাঙ্গিল তাহার একটি অত্যন্ত মিষ্টি কণ্ঠস্বরে, 'শুনছেন? একবার উঠুন না, মাদুরটা পেতে দিই—'

কাশীনাথ চোখ মেলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিল, একটি বছর-চৌদ্দ বয়সের

সুশ্রী মেয়ে মাদুর হাতে করিয়া তাহাকেই ডাকাডাকি করিতেছে। এইসব ব্যাপারের ভয়েই সে আসিতে চাহে নাই, অত্যন্ত বিরক্ত মুখে কহিল, 'না, আমি বেশ আছি।'

মেয়েটিও ছাড়িবার পাত্রী নয়। সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'মাদুরটা পেতে দিলেই কি খারাপ থাকবেন?'

কাশীনাথ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'না, না, ওসব আমি ভালবাসি না—'

মেয়েটি মাদুরটা বিছাইতে বিছাইতে ফোড়ন কাটিয়া কহিল, 'তা হোক—তবু সব মানুষই তো আমাদের ভাই-বোন, আমাদেরও তো উচিত তাদের যত্ন করা। আমরা চুপ ক'রে থাকি কি ক'রে বলুন?'

তাহার নিজেরই বুলি ওই এক ফোঁটা মেয়ের মুখে শুনিয়া কাশীনাথ এত বিস্মিত হইল যে আর কথাই কহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে মাদুরটা টানিয়া লইয়া তাহার উপরই বসিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি আবার একবার আসিয়া দাওয়ায় সিঁড়ির উপর গাড়ু, গামছা রাখিয়া যাইতে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার পর যখন আবার এক থালা মিষ্টান্ন আর এক গ্লাস জল লইয়া সেই মেয়েটিরই আবির্ভাব হইল, তখন সে একেবারে লাফ দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, 'বৌয়ের সব চালাকি! ঐ জন্যই তো আমি আসতে চাইনি। চললুম আমি এখনই ফিরে—'

পারুল বোধ করি নিকটেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া কহিল, 'তুমি কি পাগল হ'লে ছোটবাবু? মাথা খাও, ফিরে এসে বসো—। মানুষ মানুষকে যদি একটু যত্ন করে, তাতে তোমার অত লজ্জা কেন। সবাই তো তোমার ভাইবোন গো!'

কাশীনাথের মনে হইল যেন মেয়েটা কোথা হইতে তাহাদের কথা শুনিতেছে। সে রাগ করিয়া কহিল, 'যাও, তুমি ভারি ইয়ে—'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিয়া জলখাবারের সামনেই বসিতে হইল।

জলখাবারের পর মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা। কাশীনাথ কিন্তু এবার আর বেশী কিছু আপত্তি করিল না, বরং সেই টগর মেয়েটিই কেমন সুনিপুণ হস্তে ঠাঁই করা, পরিবেশন করা, মায় পান জল দেওয়ার কাজ পর্যন্ত অতিশয়

সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া গেল, তাহাই সে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। এমন কি, সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যখন তাহারা বাড়ি ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন সে আরও গোটা-কতক পান টগরের হাত হইতে বেশ সহজ ভাবেই গ্রহণ করিল।

ফিরিবার পথে শীঘ্রই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। নির্জন পথের দু'পাশে বড় বড় আমগাছগুলার দিকে তাকাইয়া এক সময় পারুল কহিল, 'ইস্—আঁধারের মধ্যে গাছগুলোর দিকে চাইলেই যেন ভয় করে—উঃ, বাব্‌বা—'

কাশীনাথ একটু অন্যমনস্ক ছিল, চমকিত হইয়া কহিল, 'কি হ'ল বৌ?'

পারুল কহিল, 'যা অন্ধকার, হোঁচট খেয়ে পা-ই কেটে গেল খানিকটা—'

কাশীনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'তাই তো! অনেকখানি কাটল নাকি? তা-হলে তুমি বরং আমার হাতটা ধরো, আমি ঠিক সাবধানে নিয়ে যাচ্ছি—'

পারুল যেন বাঁচিয়া গেল। হাতটা বাড়াইয়া কাশীনাথের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'বাঁচলুম, যা ভয় হচ্ছিল আমার!'

কাশীনাথ অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করিয়া কহিল, 'ভয় কি! আমরা তো কোন অনিষ্ট করি নি কারুর, আমাদেরই বা অনিষ্ট লোকে কেন করবে? ও সব তোমাদের মনের ভুল বৌ।'

পারুল একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'গত বছরে বৈরিগীর সঙ্গে একবার এসেছিলুম, সে-ও অমনি সন্ধ্যে হয়ে গেল। বৈরিগীর কি ভয়! যেতেই চায় না, শেষে আমি কোনমতে জোর ক'রে নিয়ে এলুম। তাও কিন্তু সারাপথ আমার পেছনে রইল—'

কাশীনাথ কি একটা কথা ভাবিতেছিল, কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে পথ চলিবার পর কাশীনাথ কহিল, 'তোমরা 'আমাকে যতটা বোকা ভাবো বৌ ততটা বোকা আমি নই, বুঝলে! আজ আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসার মতলবটা কেন করেছিলে, তা আমি বুঝেছি।'

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পারুল কহিল, 'কি বুঝলে শুনি—'

কাশীনাথ কহিল, 'ঐ মেয়েটাকে দেখাবার মতলবই আসল, ঠিক কিনা বলো!'

পারুল জবাব দিল, 'বাঃ এই তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি! এর বেলা তো

ঠিক মাথা খেলেছে—'

কাশীনাথ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'ওসব করতে নেই, ছিঃ!'

পারুল কহিল, 'কেন, দোষটা কি?'

কাশীনাথ জবাব দিল, 'দোষ নেই! মিথ্যে ওদের একটা—না না, কাজটা ভাল কর নি বৌ—'

পারুল কৃত্রিম উষ্ণতার সহিত কহিল, 'করবে না তো কি করবে। চিরকাল কি এই পাগলামি ক'রে বেড়াতে হবে নাকি? এমনি ক'রেই চলবে বরাবর, না? অসময়ে কে মুখে ভাত-জল দেবে, রোগ হলে কে সেবা করবে শুনি!'

কাশীনাথ উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, 'দেশের সেবা ক'রে বেড়াতে হবে আমাদের, পরিবারের সেবা নেবার ফুরসুৎ কখন? তুমি কি মনে কর যে এমনি এক জায়গায় আমি চিরদিন বসে থাকব?'

সহসা যেন পারুল চমকিয়া উঠিল, কহিল, কোথা যাবে আবার—

কাশীনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'সে কি আমি বলতে পারি? এখন কোন কাজ নেই, তাই বসে আছি এক জায়গায়, কাগজ বেচে খাচ্ছি। যদি কোন কাজ আসে, পণ্ডিতজী কি সুভাষবাবু যদি ডাকেন, তা হলেই চলে যাবো—'

পারুল যেন কতকটা জোর দিয়াই কহিল, 'আচ্ছা, তা না হয় গেলে, কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্যে? আবার ফিরবে তো। ঘরে পরিবার থাকলে ফিরে এসে সাজানো ঘর পাবে, সেই তো ভাল—'

কাশীনাথ উদাস কণ্ঠে কহিল, 'এখানেই যে ফিরব তার কি মানে? না বৌ, বাঁধন আমার সইবে না।'

মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পারুল কহিল, 'এখানে কি তোমার কোন বাঁধন নেই?'

কাশীনাথ যেন একটু বিস্মিত হইয়া জবাব দিল, 'এখানে? এখানে আর কে আছে? থাকবার মধ্যে যা একটু তোমার সঙ্গেই ভাব আছে, তা-ও কতটুকুই বা তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সারাদিনের মধ্যে ভাত খাবার সময় ছাড়া তো দেখাই হয় না।'

পারুল আর কথা কহিল না।

দিন-তিনেক পরে ভাত খাইতে বসিয়া কিন্তু কাশীনাথই সহসা কথাটা পাড়িল। কহিল, 'তোমার সইয়ের বাড়ি খবর দিয়েছ বৌ?'

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া পারুল কহিল, 'কি খবর?'

কাশীনাথ অকারণে লাল হইয়া উঠিল, কহিল, 'না—এই তারা মিছিমিছি হয়ত আশা ক'রে থাকবে—তাদের জানানো দরকার তো যে আশা নেই—'

চক্ষের পলকে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া পারুল মুখখানাকে বিষণ্ণ করিয়া কহিল, 'আমি তো জবাবই দিয়েছি ছোটবাবু, তারা ছাড়ে কই? বড্ড যে কান্নাকাটি করছে—'

কাশীনাথ তখনই কোন জবাব দিল না। তিন-চার গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া কহিল, 'কি আছে আমার? না চাল, না চুলো, একটা হতভাগাকে ধরে মেয়ে না দিলে বুঝি তাদের আর দায় উদ্ধার হচ্ছে না?'

পারুল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'কিন্তু তুমি তো সত্যিই হতভাগা নও। তুমি ইচ্ছে করলে সব করতে পারো তা তারা জানে। তুমি যা রোজগার কর, তাতে তোমার বৌকে তুমি ভাত দিতে পারো না?'

কাশীনাথ সহসা তাতিয়া উঠিয়া কহিল, 'ভাত? জান বৌ, আমি যদি তেমন চেষ্টা করি তো টাকার আঁজলার ওপর বসে থাকতে পারি! তবে আমার সে মন নেই, তাই যা-হোক দুটো ভাতের সংস্থান ক'রে ছেড়ে দিই—দেশের কাজ তো দেখতে হবে! পয়সা পয়সা ক'রে যারা উন্মাদ, তাদের দ্বারা দেশের কোন কাজ হয় না।'

পারুল কহিল, 'বিয়ে করলে কি আর দেশের কাজ হয় না ছোটবাবু?'

কাশীনাথ কহিল, 'খুব কঠিন। এই একটা সহজ কথাই ধরো না, কাল যদি আমি সত্যাগ্রহ করে জেলে যাই তো বৌ থাকবে কোথায়, তাকে দেখবে কে, এই ভাবনায় অস্থির হতে হবে তো? তারপর ধরো না, ছেলেপুলে হ'লে হয় তো মায়া বসে যাবে এমন যে বাড়ি আর ছাড়তেই পারব না—'

পারুল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'এ তোমার অন্যায় কথা সব। বিয়ে হ'লে কি অমনি আজই ছেলে হচ্ছে? তা ছাড়া আমি তো আছি, আমার সইয়ের মেয়ে —আমিই তাকে দেখাশুনো করব, তোমার ভাবনাটা কি?...কি বল, বলি তা হ'লে তাদের যে তোমার মত আছে—'

কাশীনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, 'না না, ও সব পাগলামি ক'রো না বৌ। লোকে কি ভাববে বল দেখি! ছিঃ ছিঃ—'

সে এক রকম ভাত ফেলিয়াই উঠিয়া পড়িল।......

রাত্রে বিছানায় শুইয়া পারুল বলিল, 'আমার ঘটকালির জোর দেখেছ, ছোটবাবুকে প্রায় কাত করে এনেছি। নিম্‌রাজী গোছ হয়েছে।'

আনন্দেরই কথা, কিন্তু নন্দর মনে হইল পারুলের কণ্ঠে কেমন যেন নিরাসক্তির আভাস। সে একটু থতমত খাইয়া কহিল, 'তা বেশ তো! কিন্তু আবার আলাদা বাসা ভাড়া করবে না তো?'

পারুল ওপাশ ফিরিয়া শুইয়া জবাব দিল, 'কে জানে বলো। ঠাকুরের অত বড় পিতিজ্ঞে তো দেখছি বাতাসেই ভেসে গেল—'

ইহার পর দিন-কয়েক উভয় পক্ষই চুপচাপ। সহসা একদিন কাশীনাথ ভোরবেলাই কোথায় বাহির হইয়া গেল, ফিরিল একেবারে রাত্রি দুপুরে। পারুল তখনও হাঁড়ি-হেঁসেল লইয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে দেখিয়া ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে কহিল, 'তুমি এখনও জেগে আছ বৌ? ঈস, রাতও আমার হয়ে গেল ঢের!'

পারুল বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তুমি গিছ্‌লে কোথায়!'

কাশীনাথ কহিল, 'একটু কাজে গিছ্‌লুম, একটা মিটিং ছিল তাই—'

পারুল কহিল, 'বেশ করেছ! নাও এখন মুখ-হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি, আমার ভারি ঘুম পেয়েছে।

কাশীনাথ বার দুই মাথা চুলকাইয়া কেমন যেন মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, 'তুমিই খেয়ে নাও, আমি আর এখন খাব না। আমি—আমি এক রকম খেয়েই এসেছি!'

'খেয়ে এসেছ?' পারুল বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তোমাদের মিটিং-এ কি আজকাল খেতেও দিচ্ছে?'

ঈষৎ রাগত ভাবে কাশীনাথ জবাব দিল, 'মিটিং-এ কেন খেতে দেবে? ফেরবার পথে মনোহরপুরের রাস্তা দিয়েই ফিরছিলুম, তোমার সইদের বাড়ির লোকেরা দেখতে পেয়ে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেল, তা আমি কি করব বল—'

গভীরতর বিস্ময়ের সহিত পারুল কহিল, 'তুমি সইয়ের বাড়ি গিয়েছিলে? সেইখানে খেয়ে এলে?'

খাপছাড়া ভাবে কাশীনাথ জবাব দিল, 'বা-রে, আমি বুঝি সেইখানেই গিয়েছিলুম, জোর ক'রে তারা—বা-রে!'

বলিতে বলিতেই সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া আগড়টা টানিয়া দিল, তাহার পর ভিতর হইতে পারুলকে শুনাইয়া বারবার বলিতে লাগিল, 'বাব্‌বা, যা ঘুম পেয়েছে। ঈস্...'

ঘুম পারুলেরও পাইয়াছিল, কিন্তু সে তখনই শুইতে গেল না, চুপ করিয়া ডিবার কম্পমান শিখাটার দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ তেমনিই বসিয়া রহিল। যখন তাহার হুঁশ হইল, তখন তৃতীয় প্রহরের শিবাদল চিৎকার শুরু করিয়া দিয়াছে; তাহার আর খাওয়াও হইল না, রান্নাঘরের আগড়টা বন্ধ করিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

পরের দিন দুপুরবেলা অকস্মাৎ টগরের মা ভাইকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। উঠানে পা দিয়াই হাসি-হাসি মুখে কহিল, 'তখনই জানি যে আমার সই যখন এ কাজে হাত দিয়েছে তখন আর ভাবনা নেই। তা ভাই এতদূর যা হোক্ তো এনে দিলি, এখন যাতে তাড়াতাড়ি সব মিটে যায় সেই ব্যবস্থা একটা করে দে—'

পারুল তাহাকে দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছিল, হাজার হউক টগরের মায়েরা ভদ্রলোক, সে যে এমন করিয়া পায়ে হাঁটিয়া তাহার বাড়িতে আসিতে পারে তাহা পারুলের ধারণাই ছিল না। সে আশ্চর্য হইয়া কহিল, 'সই তুমি! এ কী ব্যাপার, বসো—বসো! কেন আমার পাপ বাড়ানো ভাই, ডেকে পাঠালে আমিই যেতুম! তুমি কেন কষ্ট ক'রে হেঁটে এলে আবার!'

দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া দিয়া সে ছুটোছুটি করিয়া পা ধুইবার জল, গামছা পান প্রভৃতি আনিয়া দিল। তাহার পর পাশে মাটির উপরই বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'ব্যাপার কি বল দেখি সই—?'

সই বলিল, 'তুই কিছু খবর দিস নি বটে কিন্তু কাল যখন দুপুরবেলা হঠাৎ কাশীনাথ গিয়ে হাজির হ'ল, তখনই বুঝতে পারলুম যে কাজ হাসিল ক'রে এনেছিস—'

পারুলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, 'দুপুরবেলা ?'

টগরের মা বিস্মিত হইয়া কহিল, 'হ্যাঁ, দুপুরবেলাই তো। তুই জানতিস না ?'

ঘাড় নাড়িয়া পারুল কহিল, 'জানতুম, তবে ভেবেছিলুম যে বিকেলের দিকে হয়ত যাবে—'

টগরের মা কহিল, 'না। দুপুরবেলা ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া করল যে! সারাদিন ছিল, একেবারে সন্ধ্যের পর খাইয়ে তবে ছেড়ে দিয়েছি। টগরের কাজকর্ম দেখে খুব খুশী, বললে আমাদের বৌও সব কাজেই বেশ চোকোশ বটে কিন্তু এতটা পরিষ্কার নয়।'

পারুল আঁচলে বাঁধা দোক্তার কৌটাটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, কোন কথাই কহিল না। টগরের মা পুনশ্চ কহিল, 'হাওয়া বেশ ভাল দেখে আমি ফেরবার সময়ে সোজাসুজিই কথাটা পেড়ে ফেললুম, বুঝলি—'

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া পারুল জবাব দিল, 'পাকা লোক তুমি ভাই, ওকে খেলিয়ে তুলতে আর তোমার কতক্ষণ বল। তা কি বললে ?'

টগরের মা জবাব দিল, 'চট ক'রে কি আর 'হ্যাঁ' বলতে পারে! জিজ্ঞেস করতেই মুখ লাল হয়ে উঠল, বার দুই মাথা চুলকে জবাব দিলে, 'আমি কিছুই জানি না, বৌ যা করবে তাই হবে—তাকেই বরং জিজ্ঞেস করবেন।' ওধারে তো ঐ কথা বললে, আবার বেরিয়ে আসবার সময় টগর যখন পান দিতে গেছে, তখন আমি আড়ি পেতে শুনি তাকে বলছে, 'দিব্যি পান সাজো তুমি, বিয়ে হ'লে এই একটা খরচ বাড়বে আর কি।''

একটা ইঙ্গিতপূর্ণ চোখের ভঙ্গী করিয়া টগরের মা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পারুলের সমস্ত দেহ ঠিক কিসে জানি না, হয়ত বা ঘৃণাতেই, কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এই লোকটির প্রতিজ্ঞাভঙ্গকেই সে একটা সুকঠিন কার্য মনে করিয়াছিল, আশ্চর্য! সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'দাঁড়াও ভাই, কাউকে দিয়ে বৈরিগীকে ডাকতে পাঠাই—। দুটো মিষ্টি-টিষ্টি এনে দিক।'

টগরের মা প্রতিবাদ করিতে গেলে পারুল একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল। সে কখনও স্টেশনে নন্দর সহিত দেখা করিতে যায় নাই, অতি বড় বিপদে পড়িয়াও না। সেদিন একেবারে স্টেশনের ধারে গিয়া তাহার হুঁশ হইল, কিন্তু আর ফিরিল না ; বিস্মিত নন্দকে কিছু মিষ্টান্ন ও চায়ের দুধ সংগ্রহ

করিবার নির্দেশ দিয়া ধীর পদক্ষেপে যখন সে আবার বাড়িতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার অস্থিরতা সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে। টগরের মার অনুযোগের জবাবে হাসিয়া কহিল, 'কাকে আর পাঠাই ভাই, নিজেই গিয়ে মিন্‌সেকে বলে এলুম। অবাক হয়ে গেছে একেবারে—কখনও ইস্টিশনে যাই না তো! দাঁড়াও ভাই চায়ের জলটা বসিয়ে দিই আগে—'

চা প্রস্তুত হইল, মিষ্টান্ন আসিল, আতিথেয়তার কোন ত্রুটিই ঘটিল না কিন্তু টগরের মা তবু মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পারুল আসল কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় কেন? শেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়াই ফেলিল, 'হ্যাঁলা সই, তুই কাজের কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন বল্ দেখি?'

পারুল কাছে আসিয়া বিষণ্ন মুখে কহিল, 'ভাই বড় আশা নিয়েই টগরের সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু এখন যেন আর লজ্জায় তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছি না।'

কন্যাদায়গ্রস্ত মাতার মুখ নিমেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পারুলের হাত দুইটি ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, 'কেন, কি হয়েছে পারুল? আমার মাথা খাস—সব কথা খুলে বল্ আগে!'

পারুল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'ঐটি আমায় মাপ করতে হবে ভাই। তবে টগর তো আমার মেয়ের মতোই—এইটুকু বলতে পারি যে আমার নিজের মেয়ে হ'লে ও পাত্তরে আমি দিতুম না। একথা জানবার পরও যদি দিতে চাও তো বলো, আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি—'

অনুনয়, বিনয়, অশ্রুজলেও ইহার অধিক কোন কথা বাহির করা গেল না। শেষকালে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে টগরের মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিদায় হইয়া গেল, পারুল তবু তাহাকে কাশীনাথের অপরাধটা কিছুতেই খুলিয়া বলিল না।

যাইবার পূর্বে টগরের মা বেড়ার ধার হইতে বলিয়া গেল, 'আমার টগরের বরাত সই, নইলে তুমিই বা এমন বিরূপ হবে কেন!'

পারুল এই কঠিন অভিযোগও নীরবে সহ্য করিল।

রান্নাবাড়া শেষ করিয়া নন্দকে খাইতে দিয়া পারুল কহিল, 'হাজার হোক

আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের আর বুদ্ধি কত বল না। ভেবে দেখলুম যে তোমার কথাই ঠিক।'

নন্দ বহুদিন পরে স্ত্রীর মুখে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা শুনিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু কারণটা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পারুল আর এক হাতা ডাল স্বামীর পাতে ঢালিয়া দিয়া কহিল, 'বিয়ের কথা না পাড়তে পাড়তেই ছোটবাবুর শ্বশুরবাড়ির দিকে যে টান দেখছি, বিয়ে হ'লে আর একদণ্ডও এখানে থাকত না, শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই হয়ত বাসা বাঁধত—'

নন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, 'আমি তো তখনই তোকে বলেছিলুম—'

বাধা দিয়া পারুল কহিল, 'তখন অতটা বুঝি নি, যখন বুঝলুম তখনই সে পথ মেরে দিলুম। সম্বন্ধ আমি ভেঙে দিয়েছি।'

নন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাঁচা গেছে। আসছে মাস থেকে ঘরের ভাড়া বলেও এক টাকা ক'রে দেবে বলেছে। কিন্তু কি ক'রে ভেঙে দিলি—'

মুখে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করিয়া পারুল জবাব দিল, 'বিয়ে ভাঙা তো একটা বড্ড কথা—হুঁ!'

কিন্তু উপায়টা না বলিয়াই পোড়া-বাসন মাজিতে ঘাটে চলিয়া গেল।

কাশীনাথ সেদিনও ফিরিল রাত দশটার পর। উঠানে পা দিয়াই কহিল, 'আজও একটু রাত হয়ে গেল বৌ। কিন্তু তাই বলে তুমি রাগ করতে পারবে না। তোমার জন্যে কি এনেছি দেখ—'

বগলের মধ্য হইতে খবরের কাগজ জড়ানো একখানা রঙীন শাড়ি বাহির করিয়া ডিবের আলোতে মেলিয়া ধরিয়া কহিল, 'ঘাটের ধারে বেচতে এসেছিল, গৌরহাটির তাঁতের কাপড়, তোমার জন্যে একটা কিনে ফেললাম—'

পারুল হাত বাড়াইয়া কাপড়টা গ্রহণ করিল বটে কিন্তু সেদিকে সে যেন ভাল করিয়া চাহিতেও পারিল না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া রহস্যের সুরে কহিল, 'ঘুষ দেওয়া ব্যবসা কবে থেকে শিখলে ছোটবাবু? রাত ক'রে ফিরে রোজ যদি একটা ক'রে শাড়ি দাও তো মন্দ হয় না—'

কাশীনাথ কৃত্রিম কোপের সহিত কহিল, 'ঘুষ দিচ্ছি আমি, বটে? যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর—'

বাধা দিয়া পারুল কহিল, 'বলি হাত পা ধুয়ে নেবে, না রাত বারোটা করবে? কত রাত অবধি বসে থাকব?'

কাশীনাথ কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া বসিলে সে ভাত বাড়িয়া দিয়া কহিল, 'আজ আমিও একটা অন্যায় করে ফেলেছি, তুমি তার জন্যে রাগ করতে পারবে না।'

বিস্মিত কাশীনাথ জবাব দিল, 'আমি রাগ করব কেন?'

তাহার পর পরিহাসের সুরে কহিল, 'বিলিতী জিনিস কিনেছ বুঝি?'

নত মুখে পারুল জবাব দিল, 'না না। আজ বিকেলে টগরের মা এসেছিল। সে এসেই তোমার নামে এমন কতকগুলো কথা বললে, সে নাকি কার কাছ থেকে শুনেছে, যে—আমার রাগ হয়ে গেল। আমিও তাকে কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম। বলে দিলুম যে তার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার চেষ্টা যেন সে আর কোনদিন না করে।'

ক্ষীণ কেরোসিনের আলো, কিন্তু তাহাতেই কাশীনাথ যে কত বড় আঘাত পাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারুলের বিলম্ব হইল না। কাশীনাথ ভাতের থালাতে হাত রাখিয়াই কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

পারুল হঠাৎ অনুতপ্ত হইয়া কহিল, 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না ছোটবাবু, আমি এক হপ্তার মধ্যেই ওর চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে এনে দেব—'

সহসা যেন কাশীনাথের চমক ভাঙিল। সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'বাঃ বেশ তো! আমি বুঝি বিয়ে-পাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি অত ক'রে বললে তাই—নইলে তো আমার দেশের কাজের ক্ষতি করাই একরকম—না, না, এ ভালই হ'ল বৌ—আমি বেঁচে গেলুম।'

তাহার যে কিছুই হয় নাই, এইটাই দেখাইবার জন্য সে গোগ্রাসে আরও কতকগুলা ভাত খাইয়া উঠিয়া পড়িল। বাহির হইতে আঁচাইতে আঁচাইতে পারুলকে শুনাইয়া কহিল. 'একবার যদি বাবা খবর পেতেন তাহলে ওর মতো কত মেয়ে এনে আমার দু'পায়ের কাছে জড়ো ক'রে দিতেন। আমি করব না তাই—!'

সে আগড় দিয়া শুইয়া পড়িল।

পারুল কিন্তু সেখান হইতে উঠিল না। হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতেই শুকাইল, সামনে এঁটো বাসন তেমনি পড়িয়া রহিল, চারিদিকে সব জিনিস ছত্রাকার হইয়া পড়িয়া—তাহারই মাঝে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল পারুল। প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, শেষে এক সময় পূর্বাকাশে পাণ্ডুর ঊষা দেখা দিল, তবু তাহার চোখের পল্লবে তন্দ্রার আভাস পর্যন্ত নামিল না—

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাশীনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। পারুল একখানা ফরসা কাপড় পরিয়া তাহারই একটা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়াছে, এবং তাহাকে ডাকিতেছে। সে উঠিয়া কহিল, 'কী ব্যাপার?'

'একবার এখনই আমার সঙ্গে মনোহরপুর যেতে হবে ভাই! লক্ষ্মীটি, না ব'লো না। তোমার কাগজগুলো ফটিক বিলিয়ে দেবে এখন—'

কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কিন্তু এই যে কাল বললে—! আমার কি যাওয়া ভাল দেখাবে বৌ?'

পারুল অসহিষ্ণু ভাবে কহিল, 'কাল তোমাকে ঠাট্টা করেছিলুম! ঠাট্টা বোঝ না? যাও, ওঠ তাড়াতাড়ি, দোহাই তোমার, নইলে আবার ফিরতে দেরি হয়ে যাবে—'

ফাউল কাট্‌লেটের ইতিহাস

পরিমল টাকা জমাইয়াছে; কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য।

লিলুয়ায় রেল কোম্পানীর যে কারখানা আছে, বছর আষ্টেক পূর্বে পরিমল সেখানে ঢোকে মাসিক সতেরো টাকা ছয় আনায়। সে মাহিনা আজ অনেকখানি বাড়িয়া একত্রিশ টাকা পাঁচ আনায় পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সংসারেও পাঁচটি পোষ্য বাড়িয়াছে, স্ত্রী ও চারটি ছেলেমেয়ে; মা আর বিধবা বোনটি তো ছিলই। পৈতৃক বাড়িটা নিজের বটে, কিন্তু সেইখান হইতে লিলুয়া পৌঁছিতে মাসিক সাড়ে ছয় টাকা রেল কোম্পানীকে দিতে হয়। ইহা ছাড়া

জমি-জায়গা তাহাদের কিছুই ছিল না—উপার্জন কারবার দ্বিতীয় লোকও কেহ সংসারে নাই।

তাহার বাবা একটা পাঠশালায় পণ্ডিতি করিতেন; তাহা সত্ত্বেও বহু কষ্ট করিয়া ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন—কিন্তু পরিমল যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে তখনই তাহার বাবা গেলেন মরিয়া। লেখাপড়ার কোনও সম্ভাবনাই রহিল না; শুধু উদরান্নের জন্যই, মায়ের দেহে যাহা কিছু খুলাগুঁড়া ছিল, সব এক বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া গেল। তখন পাড়ার মাখন মল্লিকের কাছে বহু কাঁদা-কাটা করিয়া, হাতে-পায়ে ধরিয়া পরিমলের জন্য ঐ কাজটি তিনি যোগাড় করিয়া দেন। সেই হইতে আজ পর্যন্ত সে ঐ কাজই করিয়া আসিতেছে। রাত চারটার সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া তাহাকে ভাত খাইতে বসিতে হয়; তাহার পর প্রায় মাইল-দুই রাস্তা হাঁটিয়া স্টেশনে আসিয়া ভোরের ট্রেন ধরে এবং চারটা পর্যন্ত সেখানে ভূতের মতো খাটে, দৈবাৎ (এবং সেটা সৌভাগ্যক্রমেই) ওভারটাইম পাইলে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত, ফলে বাড়ি পৌঁছিতে রাত্রি আটটা-ন'টা। এই ষোল ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাহার জলখাবার বরাদ্দ ছিল আটার খান-দুই বাসি রুটি এবং তাহাও হইয়া না উঠিলে এক পয়সার মুড়ি!...ইহাতে শরীর থাকে না—কিন্তু তা না থাক, সংসার চলে।

তাহার জীবনে সর্বাপেক্ষা ভুল বোধ হয় ঐ বিবাহ করাটা; কিন্তু যৌবন সাংসারিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আসে না—মনের মধ্যে ফাল্গুন সকলকারই একদিন জাগে, তাই তেইশ বৎসর বয়সের এক রঙীন অপরাহ্ণে যদি সে বিবাহে সম্মতি দিয়াই থাকে তো তাহাতে আপনারা অপরাধ লইবেন না। সে ভুলের যে শাস্তি তাহাকে বহিতে হইতেছে, তাহা অপরাধের তুলনায় গুরু।

ওভারটাইম পর্যন্ত হিসাব করিয়া মাসিক আয় তাহার গড়ে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ টাকা পর্যন্ত হয়; কিন্তু তাহাতে এতগুলি প্রাণীর ভরণ এবং পোষণ, জামা কাপড় হইতে শুরু করিয়া ছেলের দুধ ও ঔষধের দাম যোগানো যে কি অসাধ্য ব্যাপার তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন। তবু বাজার হয় তাহাদের মাসে তিন-চারদিন। আলুর মুখও কদাচিৎ দেখা যায় ব্যঞ্জনের মধ্যে। উঠানের ডুমুর, ডাঁটা, কাঁচকলা, থোড়—ইহারই উপর ভরসা। কিছু

না থাকিলে—ডাল আর ডালের পোডা পোড়া বড়া ভরসা!

কিন্তু তবুও—

তবুও বাল্যকালের একটি অভ্যাস সে ছাড়িতে পারে নাই। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে দেশের অদ্বিতীয় মুমূর্ষু লাইব্রেরীটিতে আসিয়া সে নিয়মিত ভাবে মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ—যে কয়টি লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়—সব কয়টিরই পাতা উল্‌টাইত। লিলুয়া ওয়ার্কশপের একেবারে সরস্বতী-হীন আবহাওয়ায় আজও যে সে কি করিয়া তাহার 'একদা সাহিত্য-চর্চা'র স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে—ভাবিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইত। কিন্তু তবুও ঐটুকুই ছিল তাহার সান্ত্বনা।

পল্লীগ্রামের দরিদ্র ঘরের নোংরা জীবনযাত্রা, লিলুয়ার সেই বিশ্রী আবহাওয়া, সর্বদা সহস্র রকম অভাবের চিন্তা, এ সমস্ত ভুলিয়া যাইত সে ঐ দেড়ঘণ্টা সময়ের মতো; বড়লোকের অদ্ভুত বিলাসের কাহিনী, আধুনিকা তরুণী মেয়েদের প্রণয়-বিলাস, কত নরনারীর ব্যথা-বেদনা আনন্দ-নিরানন্দের অপূর্ব কাহিনী—পড়িতে পড়িতে প্রত্যেকটিই সে মন দিয়া অনুভব করিত। নিজের কঠিন জীবনযাত্রার বন্ধুর রূপ, কল্পনার সেই ইন্দ্রধনুচ্ছটায় একেবারে ঢাকিয়া যাইত; সেই সময়টুকুর জন্য সে সম্পূর্ণ বিপরীত আবহাওয়ায় বিচরণ করিত। ভদ্রলোকের বাড়ির চায়ের টেবিলের দামী চা ও মাছের কচুরির গন্ধ পর্যন্ত তাহার নাকে আসিয়া পৌঁছিত।

কিন্তু সে ঐ দেড়ঘণ্টা! তাহার পরই বাড়ি ফিরিয়া আবার সেই দীন, দারিদ্র্য-মলিন জীবনযাত্রা শুরু হইত। মায়ের বকুনি, স্ত্রীর সহস্র রকমের অভাব-অভিযোগ, রুগ্ন দুর্বল ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েগুলির অবিশ্রাম ঘ্যানঘ্যানানি এবং তার পরদিন আবার অফিস। এইভাবেই এই দীর্ঘকাল কাটিয়াছে।

অফিস হইতে ফিরিবার পথে বন্ধুবান্ধবরা যখন ট্রেনে তাস বিছাইয়া বসিত এবং নানাবিধ অশ্লীল রসিকতা করিয়া সারাদিনের ক্লান্তিকে লঘু করিবার চেষ্টা করিত, তখন সে এক-একদিন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত, আবার এক-একদিন শরীর খারাপের দোহাই দিয়া গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া কল্পনার আশ্রয় লইত। কোনও দিন ভাবিত যে সে বন্ধুবান্ধবদের লইয়া চাঙ্গুয়ায়

খাইতে গিয়াছে, সেখানে ঝক্‌ঝকে মেয়ে মিলি দত্তের সহিত দেখা হইয়াছে—সরস কথাবার্তায় সে সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছে, মিলি দত্ত সে ছাড়া আর কাহারও দিকে চাহিতেছে না পর্যন্ত।···কিংবা তরুণ সাহিত্যিকদের নায়করা যেমন ইম্পিরিয়ালে গিয়া ভার্মুথ বা শ্যাম্পেন খায়, সেও তেমনি খাইতে গিয়াছে। কি ভাবে সেখানকার বেয়ারাদের ফরমাস করিতে হয় বা ফিরিবার সময়ে কি পরিমাণ বকশিশ করিতে হয় তাও তাহার কণ্ঠস্থ, সুতরাং কল্পনা করিতে তাহার বাধে না। মিলি দত্তর চেহারা কিরূপ হইবে বা ভার্মুথের আস্বাদ মধুর কি-না, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা তাহার ছিল না এবং তাহার প্রয়োজনও বিশেষ সে অনুভব করিত না; ঐ রকম একটা অস্পষ্ট কল্পনা স্বপ্নময় তন্দ্রার মতো কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে আবেশ-আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত।

কিন্তু তবু সে দুরাশা—

আগে আগে সে কয়েকবার টাকা জমাইবার চেষ্টা করিয়াছে, ফল হয় নাই। অতি কষ্টে দুই-একটা ওভারটাইমের কথা গোপন করিয়া সেই টাকা সে পোস্টঅফিসে জমা দিয়াছিল; কিন্তু যখনই টাকাটা দশ-বারোর কোঠায় ওঠে তখনই বাড়িতে কাহারও না কাহারও দুর্দান্ত অসুখ হয়, আর টাকা বাহির করিয়া না দিয়া উপায় থাকে না। নিজের স্ত্রী-পুত্র চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় মরিবে, আর সে সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিবে—এ কেমন করিয়া সম্ভব হয়? ফলে সেখানকার জমার অঙ্কটা চার আনায় আসিয়া ঠেকিয়া রহিয়া গিয়াছে।

এখন আর জমাইবারও উপায় নাই। অভাবের ঘরে অর্থপ্রাপ্তির দিকটায় সকলেই সজাগ হইয়া ওঠে। তাহার ফিরিতে কত বিলম্ব হয়, সেই হিসাবমতো মাসের শেষে কত টাকা আনা বেতন প্রাপ্য হইবে—স্ত্রী ও জননী তাহার নির্ভুল হিসাব করিয়া রাখেন এবং বলাই বাহুল্য যে খরচের হিসাবও সেই অঙ্ক অনুসারে শেষ পর্যন্ত ধরা থাকে।

কিন্তু দিনে দিনে টাকা জমাইবার আশা যত দুরাশায় পরিণত হয়, পরিমলের অন্তরের ক্ষুধাও তত উগ্র হইয়া ওঠে। শেষে সে এক অভিনব উপায় ভাবিয়া বাহির করিল। বাড়িতে বলিতে শুরু করিল যে বাাস রুটি তাহার হজম হয় না—অম্বল হয়; সুতরাং মুড়ি খাওয়াই তাহার পক্ষে শ্রেয়। অফিসে

সকলকে জানাইয়া দিল যে রুটি বা মুড়ি কোনটাই হজম হয় না এমনি সাংঘাতিক তাহার পেটের অবস্থা। এইভাবে প্রাণপণে ইচ্ছাশক্তির জোরে দৈনিক একটি করিয়া পয়সা সঞ্চয় করিয়া সে টাকায় পরিণত করিতে লাগিল ; অর্থাৎ একদিনের ভোজের আশায় নিজেকে সে প্রতিদিন বঞ্চিত করিয়া চলিল।

ইহা ছাড়াও অবশ্য সে দুইবার দুইটি টাকা বাড়তি উপার্জন করিয়াছিল ; অফিসের থিয়েটারের দলের পার্ট লিখিয়া দিয়া একটি করিয়া টাকা পাইয়াছিল। ইতিপূর্বেও সে লিখিয়াছে কিন্তু টাকা লয় নাই। এখন আর না লইলে চলে না —বৃথা পরিশ্রম করিবার মতো অবস্থা তাহার নয়।

যাহা হউক—টাকা তাহার জমিয়াছে। দশটি টাকা ; পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি মিলাইয়া দশটি টাকা তাহার জমিয়াছে! চাঙ্গুয়ায় খাইতে ঠিক কত খরচ পড়ে তাহার জানা ছিল না, কারণ গল্পলেখকরা কখনও ঐ জিনিসটির কথা লেখে না ; তবুও সে মনে মনে ধারণা করিয়া লইয়াছিল যে সেখানে যখন দেশী লোকেরাই খায় তখন খরচটা খুব বেশী হইবে না। এইবার খাইতে যাওয়া চলিবে—

কিন্তু শুধু চাঙ্গুয়ায় খাওয়া নয়, তাহার আশা ছিল আরও বেশি। হাওড়া স্টেশনে নামিয়া ট্যাক্সি করিয়া চাঙ্গুয়ায় যাইবে, সেখান হইতে এক প্লেট ফাউল কাটলেট ও সম্ভব হইলে অর্থাৎ খরচ যদি খুব বেশী না হয়, এক ডিশ মটন-কারীও খাইয়া সে সিনেমায় যাইবে ; সেখান হইতে আবার বাড়ি। আচ্ছা, পয়সা যদি না কুলায় এবার না হয় হাঁটিয়া কিম্বা বাসে ফিরিবে। কিন্তু এই সমস্ত প্রোগ্রামটি তাহার হওয়া চাই-ই ; ইহার সামান্য ব্যতিক্রমও চলিবে না।

সে অধীর আগ্রহে বড়দিনের ছুটির অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঐ সময় সাহেবপাড়া সাজায় ভাল, বায়স্কোপেও ভাল ছবি আসে, হয়ত বা গ্রেটা-গার্বোর ছবিও আসিতে পারে এবং ঐ সময়ে ঐ দিকের হোটেলে আহার্যও ভাল তৈয়ারী করে।…বড়দিনের দিনটিতেই সে যাইবে, তিনটা চুয়াল্লিশের ট্রেনে ; আর ফিরিবে—সে যত রাত্রি হয়।

বড়দিনের আগের আগের দিনে সে বহুদিন আগেকার জীর্ণ সিল্কের

জামাটি বাক্স হইতে বাহির করিল এবং সেই সঙ্গে বিবাহের সময়কার দেশী কাপড়টি। কাপড়-জামা ধোপার কাছে গিয়া আবার টাটকা ইস্ত্রী করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া সযত্নে সাজাইয়া রাখিল এবং সাদা ক্যাম্বিশের জুতাটিকে বার-দুই খড়ি মাখাইয়া যথেষ্ট সাদা করিল। বোনের প্রশ্নের উত্তরে জানাইল—এক বন্ধুর বাড়ি বড়দিনের নিমন্ত্রণ আছে। পৈতৃক শালটি বহু স্থানেই কীটদষ্ট হইয়াছে, তবুও ময়লা আলোয়ানের অপেক্ষা সেইটিই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া সেটিও বাহির করিয়া রোদে দিল।

বড়দিনের দিন সকাল-সকাল স্নানাহার সারিয়া দাড়ি-গোঁফ ভাল করিয়া কামাইয়া বেলা আড়াইটার সময়ই কাপড় ছাড়িতেছে, এমন সময় স্ত্রী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। যদিচ তাহার তখনকার মানসিক অবস্থায় কোনও ছোটখাটো জিনিস চোখে পড়া উচিত নয়, তবুও তাহার মনে হইল ইন্দিরার মুখখানা খুবই শুষ্ক দেখাইতেছে, চোখের ভাবও যেন ছলছলে।

সে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, 'তোমার চোখমুখ অমন ছল-ছল করছে কেন গো? জ্বর-টর হয় নি তো?'

ঈষৎ অভিমানক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ইন্দিরা জবাব দিল, 'জ্বর তো ক'দিন ধরেই বিকেলের দিকে হচ্ছে; একটু ঘুষঘুষে জ্বর আর তার সঙ্গে তলপেটের কাছে কেমন একটা ব্যথা। বিকেলবেলাই ব্যথাটা ধরে—জ্বরও সেই সময় আসে—আবার রাত্তির আটটা-নটা নাগাদ ছেড়ে যায়—'

মিনিট-দুই স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরিমল কহিল, 'কই, আমাকে তো এ-কথা একবারও বল নি!'

ইন্দিরা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, 'বললেই বা তুমি করতে কি শুনি? মল্লিকদের ন'বৌর নাকি ঠিক এমনিই হয়েছিল। অশোক-সার বলে কি একটা ওষুধ আছে তাই খেয়ে ওর সেরেছে। তার দামও ঢের, দেড় টাকা দু'টাকা বোতল।'

পরিমল কহিল, 'দাম যতই হোক—অসুখ যখন হয়েইছে তখন একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। দরকার হয়ত ধার করেও করতে হবে—'

ইন্দিরা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমার অসুখে আর ধার ক'রে ওষুধ কিনতে হবে না। ও আপনিই হয়েছে, আপনিই সেরে যাবে।...ধার যে করবে, ধার

শুধবে কি দিয়ে শুনি ?···খোকাটা শীতে কি রকম কষ্ট পাচ্ছে, ধার করবার হ'লে দেড় টাকা দিয়ে ওর একটা সোয়েটারই আগে কিনে দিতুম—'

ইন্দিরা শাশুড়ীর ডাকে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পরিমলের সমস্ত উত্তেজনা যেন নিমেষে বরফের মতো জমিয়া গেল। সে কোনও রকমে কাপড়-জামা-জুতা পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কোঁচাটা ঠিকমত কোঁচানো হইল কি না সেটা দেখিবার মতো উৎসাহও তখন তাহার ছিল না। কিন্তু চলিতে চলিতে একটু একটু করিয়া আবার মনকে সে দৃঢ় করিল, অভাব তো আছেই, চিরকালই থাকিবে। তবে এই একটিমাত্র দিন, যাহার জন্য সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সে অপেক্ষা করিরাছে—সেই দিনটিকে সে কি জন্য নষ্ট করিবে ?··· না, যাহা হইবার হউক—তাহার উৎসব সে আজ শেষ করিবেই।

গাড়িতে আসিতে আসিতে তাহার দৃঢ় সংকল্পের ফাঁকে ফাঁকে ইন্দিরার শুষ্ক মুখ যতবার দেখা দিবার চেষ্টা করিল, ততবারই সে জোর করিয়া তাহাকে মন হইতে সরাইয়া দিল। শেষ পর্যন্ত মনকে প্রবোধ দিল, আচ্ছা বেশ তো, চিকিৎসা যদি করাইতেই হয় তো ধার করিয়াই তাহার খরচ যোগাইবে। এই টাকাও যেভাবে জমিয়াছে, ধার শোধও না হয় সেইভাবে হইবে। তাহার জন্য আজিকার প্ল্যান নষ্ট হয় কেন ?

হাওড়ায় নামিয়া সে সোজাসুজি একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল। ট্যাক্সি যে আজকাল দরদস্তুরে পাওয়া যায় সে কথা পরিমলের জানা ছিল না, তাই খানিকটা দূর গিয়াই যেমন মিটারের অঙ্ক উঠিতে শুরু করিল, তাহার মুখও ততই শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। এতদিনের সংযত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মন কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মনে হইল এই টাকার প্রতি পয়সা সে সঞ্চয় করিয়াছে নিজেকে বহুক্ষণ উপবাসী রাখিয়া—প্রতিদিন !···এ কি অপব্যয় ! ট্যাক্সির নরম গদী যেন ক্রমে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল, বাহিরের হাওয়া বৃশ্চিকদংশনের মতোই তাহাকে জ্বালা দিতে লাগিল।

মনে পড়িল ইন্দিরার শুষ্ক বিবর্ণ মুখ, মনে পড়িল ছেলেমেয়েদের শীতার্ত পাণ্ডুর চেহারা। ইন্দিরা তাহার ঘরে আসিয়া কত দুঃখই পাইতেছে—তাহারও তো একদিন আমোদ করিবার অধিকার আছে। আমোদ চুলায় যাক—চিকিৎসা

পর্যন্ত হইতেছে না, অথচ এই অর্থ সে অপব্যয় করিতে বসিয়াছে! ছেলে-মেয়েদের এই পৃথিবীতে কি সে নিজেই টানিয়া আনে নাই? তাহাদের ক্ষুধার অন্ন, শীতের বস্ত্র দেওয়া কি সর্বাগ্রে প্রয়োজন নয়? কোন্ অধিকারে সে তাহাদের বঞ্চিত করিয়া নিজে উৎসব করিতে চলিয়াছে?

মিটারের প্রতিটি দু-আনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষস্পন্দন যেন দ্রুততর হইতে লাগিল। প্রতি দু-আনি যেন আটদিনের ক্ষুধার যন্ত্রণা লইয়া তাহার চোখের সামনে বীভৎসমূর্তিতে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সেই দুর্দান্ত শীতেও সে ঘামিয়া উঠিল, শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল—

অবশেষে চাঙ্গুয়ার সামনে ট্যাক্সিওয়ালাকে দেড় টাকা ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে মিনিট পাঁচেক হোটেলের আলোকোজ্জ্বল, উৎসবমুখরিত অভ্যন্তরের দিকে চাহিয়া রহিল; একবার মনে হইল যে—যাহা হয় হউক, ঢুকিয়াই পড়া যাক কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে কিছুতেই জোর পাইল না। তেমনি বিমূঢ় বিহ্বলভাবে শুধু চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার স্ট্র্যাণ্ড রোডের রাস্তা ধরিল। নাঃ—নভেল আর সে পড়িবে না, সাহিত্য তাহাদের জন্য—ওয়ার্কশপের কুলীদের জন্য নহে।

ফিরিবার পথে ইন্দিরার ঔষধ, খোকার সোয়েটার, কোলের মেয়েটার জন্য একটা গরম কাপড়ের ফ্রক এবং আধসের বেদানা কিনিয়া লইল। শেষ পর্যন্ত বোন এবং মায়ের জন্য ভীম নাগের দোকান হইতে দুইটি নতুন গুড়ের সন্দেশ কিনিয়া পকেটে ফেলিয়া একটা রেস্তোরাঁর সম্মুখে আসিয়া আবার মিনিট খানেক ইতস্ততঃ করিল। কিন্তু নিজের এতদিনের আশাকে এ-ভাবে অপমান করিতেও তাহার মন সরিল না। সে আর একটা উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চাপিয়া হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়া হাঁটিতে শুরু করিল।

প্রাচীনা

আগরতলা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক দিলেই সিকিউরিটি চেকিং-এর ঘেরার মধ্যে ঢুকব—হঠাৎই নজর পড়ল মহিলার দিকে। খুব বিপন্ন মুখে এদিক ওদিক চাইছেন, বোধহয় ছেলে দূরে লাইন দিয়েছে সেদিকে চেয়ে একটু

আশ্বস্ত হচ্ছেন—আবার একটু পরে শঙ্কা ও বিহ্বলতার ভাব নেমে আসছে মুখে।

মালপত্র সম্ভবতঃ ছেলেই ওজন করিয়ে দিয়েছে ইতিপূর্বে। দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঁথা-জড়ানো একটা বিছানা লক্ষ্য করছি, কেমন যেন মনে হ'ল—এ নিশ্চয়ই ঐ মহিলার। সাধারণ পূর্ববঙ্গীয় মহিলার ধরনে থান কাপড় পরা, হাতে দড়ি-বাঁধা একটা ঘটি ও একখানা পাখা। গলায় কণ্ঠী, আঁচলের খুঁটে বাঁধা তামাকের গুঁড়ো। বয়স ষাটের কাছাকাছি বলেই মনে হ'ল।

আমি ওঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে যেন মনে একটু ভরসা পেলেন ভদ্রমহিলা। হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন, 'কইলকাতায় যাইবেন?' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম 'আপনি?'

'আমি যামু কাশী। অহনে কইলকাতা—সেখানের থন কাশী।'

তারপর যেন দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললেন, 'আমি কইলকাতা কখনও দেখি নাই। শুনছি খুব ভারী শহর।'

'কখনও কলকাতা যাননি!'

'কোথাও যাই নাই। কখনও রেলগাড়িতে চড়ি নাই। এই প্রেথম।' উৎসাহ পেয়ে ভদ্রমহিলা গলগল ক'রে অনেক কথা বলে গেলেন। দেশ ছেড়ে কোথাও যান নি এতকালের মধ্যে। হাওয়াই জাহাজ দূর থেকে দেখেছেন, ট্রেন দেখেন নি। এখন ছেলে চাকরি করে, সে-ই নিয়ে যাচ্ছে মাকে কাশীতে তীর্থ করাতে।

'ছেলে কইলকাতায় মস্ত চাকরি করে', একটু সম্ভ্রম মেশানো কণ্ঠে বলেন ভদ্রমহিলা।

চোখ দুটো অর্ধনিমীলিত ক'রে মুখে এক বিচিত্র চাপা আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে বলেন, 'ছোট খাটো কাম না। হেই চাইরতলা বড় বাড়িখানার উপুর-তলায় হ্যার আপিস। মস্ত কাম করে।'

একটু পরেই সিকিউরিটি চেকিং-এর ডাক এল। মেয়েদের লাইনে ভীড় কম। উনি আগেই এনক্লোজারের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ভেতরে ঢোকার আগে দেখি ভয়ে ভদ্রমহিলার মুখখানা সাদা হয়ে গেছে, পা দুটো কাঁপছে। ভাগ্যে আমি এ লাইনের গোড়ার দিকে ছিলাম। আমি ওপারে পৌঁছতে যেন মনে

হ'ল মহিলার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

'তুমি আইলা বাবা। আমি বাচলাম। একা একা—। আমার পোলাটারে তো দেখি না।'

'উনি লাইনের পিছনে আছেন তো—তাই দেরি হচ্ছে।' আশ্বাস দিয়ে বলি।

ওঁর ছেলে বোধহয় মার ধরণ-ধারন দেখে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন, হেসে বললেন, 'আমার মাদার। দেশের বাইরে তো যান নি। নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।'

প্লেনের ভেতরে উঠে ভদ্রমহিলা আরও হতচকিত, বিহ্বলও। এদিক ওদিক চান, আশেপাশের যাত্রীদের সঙ্গে যে তাঁর মিলছে না—সেটাও সহজাত বুদ্ধিতে বোঝেন। আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন, 'ঘটির জলটা কি ফ্যালায় দিমু বাবা?'

আমি তাঁকে যতটা সম্ভব আশ্বস্ত ক'রে ধরে বসিয়ে দিই। বেল্টটা কেন—সে রহস্যটাও বোঝাবার চেষ্টা করি। ওঁর এখন দেখি ছেলের চেয়েও যেন আমার ওপর ভরসা বেশি। আমার জামার একটা প্রান্ত ধরে বলেন, 'তুমি বাবা এই হানডায় বসো। আমার কেমন যেন মাথাটা ঘুরায়।'

পাশেই বসতে হ'ল অগত্যা। প্লেন ছাড়তে উনি 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে উঠলেন বেশ সরবেই। ছেলে লজ্জা পেয়েই হয়ত প্রাণপণে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরে ভদ্রমহিলা আবার চুপিসাড়ে প্রশ্ন করেন, 'এতবড় গাড়িডারে উপরে উঠায় ক্যামনে? দড়ি, রশি তো কিছু দেখি না।' তারপরই আবার, 'পইরা যাইব না তো গাড়িডা? ওঠল তো হুশ কইরা, অহনে যদি পড়ে? আমার কিছু না, পোলাডার কী হইব সেই চিন্তা।'

আবারও ওনাকে বোঝাতে হয়—অদৃষ্টের বিচিত্র রহস্য। সব যাত্রাতেই কিছু না কিছু বিপদের সম্ভাবনা থাকে। নৌকো ডোবে, ট্রেনে কলিশন হয়। এমনকি গরুর গাড়িও গড়িয়ে পুকুরে পড়ে যায়—এ আমি নিজে চোখে দেখেছি। যেদিন যার অদৃষ্টে যা আছে তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর মৃত্যু যে দিনটিতে যেভাবে লেখা আছে, সেদিন ঠিক সেইভাবেই হবে—কেউ তা খণ্ডাতে পারবে না।

বৃদ্ধা এবার আশ্বস্ত হলেন কিছুটা। কিন্তু তিনি আর এক যা কাণ্ড করলেন—আমার প্রাণ যায় আর কি। আমার হাতখানা শক্তভাবে চেপে ধরলেন—এবং বাকী পথটা একবারও ছাড়লেন না। এতগুলি লোকের মধ্যে কে জানে কেন—আমাকেই তাঁর স্বজন মনে হ'ল।

দমদমে নেমে আবার মাটিতে পা দিয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন চারদিক।

'বাপরে, হ্যাত্তবর দালান আছে পৃথিবীতে! কত হাজার টাকা না জানি খরচ করছে!'

ওঁর ছেলে যতক্ষণ না মালপত্র নামিয়ে কাছে এল ততক্ষণ আমাকে ছাড়লেন না। তারপর যাওয়ার আগে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন। 'দীর্ঘজীবী হও বাবা। আমার পোলাডার মতো বড় কাম পাও। কী আর কমু—তুমি যা করলা।'

সাধারণ ঘটনা

ঘটনাটি নিতান্তই সাধারণ, যেমন আজকাল সচরাচর ঘটিয়া থাকে; তবে ফলটি আজকালকার মতো অসাধারণ নয় কারণ তখন ডুবিয়া মরিবার মতো লেকও তৈয়ারী হয় নাই এবং ঘটনাটি ঘটা করিয়া ছাপিবার জন্য ছাপ্পান্নহাজারী কোন সংবাদপত্রও ছিল না।

সে আমাদের শ্রীপতিবাবুর প্রথম যৌবনের কথা। অর্থাৎ চল্লিশ বছর পূর্বের কথা, কলিকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। মানিকতলা স্ট্রীটের এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে পাশাপাশি দুইখানি বাড়ি, নায়ক আমাদের শ্রীপতিবাবু, বয়স সতের এবং নায়িকা তাঁহার পাশের বাড়ির মালতীলতা, বয়স তেরো। আসা যাওয়া ছিল, সম্পর্কও যথারীতি একটা পাতানো ছিল কিন্তু তাহাতে কিছু আটকায় না; তখন প্রথম রোমান্টিক উপন্যাসের যুগ; 'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'-এর পরিবর্তে পাশের মেসবাড়ির বন্দী হিয়ার দিকে নজর দেওয়া সবে শুরু হইয়াছে। শ্রীপতিবাবু ইতিমধ্যেই খানকতক বটতলার টাটকা নভেল শেষ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারও আটকাইল না, তিনি একদা প্রকাশ

করিলেন যে পাশের বাড়ির মালতীলতাকে না পাইলে তিনি আর ইহজীবনে বিবাহই করিবেন না। আরও শোনা গেল যে মালতীলতাও তাঁহার সমবয়সা বৌদির কাছে শ্রীপতি অভাবে আত্মহত্যা করিবার সংকল্প জানাইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে সেটা লেকের যুগ নয়; ডুবিয়া মরিবার জন্য তখন বালগঞ্জে লেক তৈয়ারী হয় নাই। তাহা হইলে বাপ-মা ভয় পাইয়া কি করিতেন বলা যায় না তবে এক্ষেত্রে যাহা করিলেন তাহা নিতান্তই অকবিজনোচিত। শ্রীপতির বাবা শ্রীপতিকে ধরিয়া একদিন বেদম ঠ্যাঙ্গাইলেন এবং মাস্টারের সংখ্যা একটির জায়গায় আরও একটি বাড়াইয়া দিলেন, আর মালতীরা অন্য বাড়ি দেখিয়া উঠিয়া গেল।...

যাহা হউক, ঐ ঔষধেই উভয় পক্ষের রোগ সারিল। শ্রীপতি যথাক্রমে গোটা তিনেক পাস করিয়া সরকারী অফিসে ঢুকিলেন, তারপর বিবাহ করিয়া রীতিমতো মাহিনা বৃদ্ধির সঙ্গে বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন এবং মালতীও এক সাব-ডেপুটির গৃহিণীত্ব মানিয়া লইয়া অচিরে স্থূলাঙ্গী, তেরটি সন্তানের জননী হইয়া উঠিলেন। উভয়েই প্রায় সম্পূর্ণ উভয়ের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং সেজন্য যে কোনও পক্ষের বিশেষ কষ্ট হইল, তাহাও নয়।

এই ব্যাপারে চল্লিশ বৎসর পরে একদিন শ্রীপতিবাবু কাশী হইতে তাঁহার ভগ্নীর পত্র পাইয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত, ক্রুদ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গেলন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র অরুণ বি.এ. পরীক্ষা দিয়া পিসীমার সহিত কাশীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। মাস খানেক গিয়াছে, আজকালকার মধ্যেই ফেরার কথা, এমন সময় এই সংবাদ! ভগ্নী জানাইয়াছেন যে অরুণ নাকি তাঁহাদের বাড়ির পাশেই একজনদের এক মেয়ের সঙ্গে রীতিমত 'লভ্' জমাইয়া তুলিয়াছিল, তিনি পূর্বেই ধরন-ধারণ দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন, সেদিন নিঃসন্দেহ হইয়া স্পষ্ট করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাবধান করিতে গিয়া স্পষ্ট জবাব পাইয়াছেন যে অরুণ ঐ মেয়েটিকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে, উহাকে ছাড়া কাহাকেও বিবাহ করিবে না এবং বিবাহ করিতে না পাইলে সে আত্মহত্যা করিবে।...মেয়েটি নাকি কোথাকার এক ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা, দেখিতে শুনিতে নেহাৎ মন্দ নয়, একটা নাকি পাসও দিয়াছে, তবে ধিঙ্গী স্বভাবের। মেয়ের দিদিমা কাশীতে থাকিত, মেয়েটি তাঁর কাছে বেড়াইতে আসিয়াছিল,

ইত্যাদি ইত্যাদি—

শ্রীপতিবাবুর কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি তো হইলই না, চিন্তাশক্তিও যেন কিছুক্ষণের মতো লোপ পাইল। তাঁহার ছেলে হইয়া অরুণ এমন করিয়া তাঁহার নাম ডোবাইল? কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মাথা ঠাণ্ডা হইলে তিনি নিজেও যে বাল্যকালে ঐ ব্যাধিতে ভুগিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের কথাও স্মরণ হইল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া কয়েকটা টাকা পকেটে ফেলিয়া স্টেশনে আসিলেন এবং ঘণ্টা দেড়েক স্টেশনেই অপেক্ষা করিয়া অবশেষে বেনারস এক্সপ্রেসে কাশী যাত্রা করিলেন।

মেজাজ তাঁহার সারাটা পথ এতই উগ্র হইয়া রহিল যে কাশীতে পৌঁছিয়া তিনি ভগ্নীর বাড়িতে পা দিবার পূর্বেই নম্বর চিনিয়া সেই 'ধিঙ্গী' মেয়েটির বাড়ি উপস্থিত হইলেন এবং যথোচিত ব্যস্তভাবে কড়া নাড়িলেন।

একটু পরে এক হিন্দুস্থানী দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল যে, তিনি কি চান।

শ্রীপতিবাবু বলিলেন, 'তোমাদের বাড়ির গিন্নীমা—বুড়ো মাকে গিয়ে বল যে কলকাতা থেকে একটি বাবু এসেছেন, তিনি দুটো কথা বলতে চান।'

দাসী চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'আপনি এই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ান, দিদিমা আসছেন—'

শ্রীপতিবাবু ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতেই মাথায় ঈষৎ ঘোমটা দিয়া একটি বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন, তারপর মৃদুস্বরে কহিলেন, 'আপনি আমার সঙ্গে কথা কইতে চান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারই একটি নাতনী আছে না? অবিবাহিতা?'

মুহূর্তের জন্য বিধবার মুখে যেন একটা কঠিন ছায়া পড়িল, তারপরই সামলাইয়া লইয়া তেমনি শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আছে।'

অকস্মাৎ কটুকণ্ঠে শ্রীপতিবাবু কহিলেন, 'আছে তো বেশ করেছে, কিন্তু থাকলেই যে আইবুড়ো ধিঙ্গী মেয়েকে পাড়ার ছেলেদের মাথা খাবার জন্য লেলিয়ে দিতে হবে, তার মানেটা কি শুনতে পাই? আমরা গরীব মানুষ, অনেক কষ্ট ক'রে ছেলে মানুষ করি, আমাদের ছেলেদের দিকে নজর কেন?'

আঘাতটা এতই অভদ্র যে ধাক্কাটা সামলাইতে ভদ্রমহিলার মুহূর্ত কয়েক

সময় লাগিল, কিন্তু জবাব তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত দিতেও হইল না। ভিতর হইতে অত্যন্ত মোটা এবং ভারী গলায় প্রশ্ন হইল, 'হ্যাঁ গা মাসীমা, ও কে কথা কইছে গা?'

মাসীমার জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই অপেক্ষাকৃত চড়াগলায় পুনশ্চ প্রশ্ন হইল, 'সেই হাড়হাবাতে, হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটার বাপ নাকি···? ওমা, কোথাকার বেহায়া গো? লজ্জা করে না একটু?···ওঁর গুণধর ছেলে ভদ্দর-ঘরের কুমারী-মেয়ের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়, তাকে শাসন না ক'রে এখানে আসা হ'ল চোখ রাঙাতে?···ঘেন্নাপিত্তি কিচ্ছু কি নেই?···দেখি কতবড় বেহায়া লোক একবার—'

প্রবল বেগে মোচা কুটিতে কুটিতে মোচা হাতে করিয়াই একটি স্থূলাঙ্গী মহিলা বাহিরে আসিয়া সহসা যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গেলেন।

'ওমা! শ্রীপতিদাদা, না?'

শ্রীপতিবাবুর অবস্থা আরও খারাপ, ইতিমধ্যে কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তাঁহার ঠিক অপরিচিত নয়, বহুদূরের বিস্মৃতি পার হইয়া সে স্বর তাঁহার স্মৃতির দুয়ারে ঘা মারিতেছিল। এখন সব সন্দেহ দূর হইয়া গেল, মূঢ়ের মতো প্রশ্ন করিলেন, 'মালতী!'

কিছুক্ষণ দু'জনেই এমনি ন যযৌ, ন তস্থৌ অবস্থায় থাকিবার পর মালতীর মুখেই প্রথম হাসি ফুটিল। কহিলেন, 'গুণবান ছেলেটি বুঝি তোমারই?···তা আর কি হবে বল, যেমন বাপ, তেমনি ছেলে হবে তো?'

শ্রীপতিবাবুরও অপ্রস্তুতভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, তিনিও একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিলেন, 'যেমন মা, তেমনি মেয়ে হয়েছে—সেটাও বল।'

মালতীলতা মাথায় কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া কহিলেন, 'মাসীমা একটা মাদুর দাও গো, ও মানুষটিকে আমি চিনি। ছেলেবেলায় আমারই পাশের বাড়িতে ছিলেন, অনেক কীর্তিই একদিন করেছেন!'

ইহার পর আরও কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া শ্রীপতিবাবু ভগ্নীর বাড়িতে অনেক শান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। অরুণ বাপকে দূর হইতে দেখিয়াই সরিয়া পড়িল কিন্তু শ্রীপতিবাবু সেদিকেও বিশেষ আর মনোযোগ করিলেন না, পরন্তু রাত্রিবেলা মালতীদের বাড়ি হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া

ভগ্নীকে জানাইলেন যে, যে ঔষধ তাঁহাদের বেলায় প্রয়োজন হইয়াছিল, তাঁহার পুত্রের বেলায় সে ঔষধের আর প্রয়োজন নাই। দেনা-পাওনার কথা মালতীর সঙ্গে মোটামুটি তিনি কহিয়াই আসিয়াছেন, মেয়েটিও নেহাৎ মন্দ নয়। সুতরাং আগামী মাসেই চার হাত এক করিবার ব্যবস্থা হইবে বোধ হয়।

ব্যক্তিগত

তরুণ বয়স্ক ছেলেদের খুন হয়ে পথে পড়ে থাকার খবর কলকাতা বা তার আশপাশের জনপদে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। সংবাদদাতারা অবশ্য কিছুটা রকমফের করার জন্যে কখনও লেখেন youth, কখনও লেখেন man। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন—বয়সের হিসেবটা আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কদাচিৎ কখনও ষোলও দেখা যায়।

এ নিয়ে পাঠকরা আর মাথা ঘামান না। পুলিসও না। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, এসব দলের ব্যাপার। কোন্ দল, দুই ভিন্ন দলের কলহ, কি নিজের দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি—তা তাঁরা জানেন না। জানার চেষ্টাও করেন না। তাঁরা যে ধরতে পারেন না তা নয়, একটু চেষ্টা করলেই পারেন। কিন্তু তাঁদেরও বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘর করতে হয়। সাপের হাঁড়িতে হাত ঢোকাতে যাবেন কোন্ দুঃখে? তাছাড়া ধরেই বা লাভ কি, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ফোন-কল আর পাঁচখানা চিরকুট আসবে, নিজে নিজে কানমলা খেয়ে ছেড়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে সব দলই সমান, আর সকলেরই কিছু না কিছু অনিষ্ট করার শক্তি আছে।

সুতরাং যার সন্তান গেল—তার মা-বাবা-বোন ছাড়া এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। এবং তাঁরাও এর কোন প্রতিকার আশা করেন না, শুধুই কাঁদেন আর মাথা চাপড়ান। না শাসক, না রক্ষক, আর না জনসাধারণ—কেউই কোন উদ্বেগ বা ক্ষোভবোধ করেন না। পাঠকরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সংবাদে চলে যান। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে, সেটুকুও লক্ষ্য করেন না অনেকে।

তবে এবারের খবরটায় অনেকেই একটু বিস্মিত হয়েছেন। একটু ভাব-

বার চেষ্টা করেছেন, এই বিশেষ খুনের কারণ বা তাৎপর্য কি ?

কারণ এবার খুন হয়েছে ছেলে নয়, মেয়ে।

ঘরে আত্মীয় স্বামী বা চোর ডাকাতের হাতে খুন হয়ে পড়ে থাকা নয়—অথবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কি গড়ের মাঠের আনাচে-কানাচে নয়—সেও তো অতি সাধারণ ঘটনা—একেবারে লালদীঘির পাশে, মহাকরণের সামনে লাশটা পড়ে আছে, একটি সুবেশা তরুণী মেয়ে। কে বা কারা তার গলা টিপে মেরেছে। না, কোন জৈবিক অত্যাচারের চিহ্নও নেই—রেপ আর মার্ডারও সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছে প্রায়—এ শুধুই হত্যা। কোন কাগজপত্র সঙ্গে নেই, সনাক্ত করার মতো কোন চিহ্ন কোথাও রাখে নি হত্যাকারী। শাড়িতে ধোপাখানার নম্বর ছিল বোধহয়—কে সুনিপুণ হাতে সেটা কেটে নিয়েছে।

তবু সনাক্ত হল। দৈবাৎই।

যে ক'টি পুলিসের লোক এসে লাশ গাড়িতে তুলেছিল, হাসপাতাল তথা মর্গে পাঠাবার জন্যে, তার মধ্যে একটি অল্পবয়সী কন্‌স্টেবল ছিল। সে বলে উঠল, 'আরে, এ যে আমার পাড়ার মেয়ে. সান্তু। বিশ্বাসদের মেয়ে, ভাল নাম কি জানি না, তবে দেখি তো প্রায়ই। এম. এ. পড়ে শুনেছি। গতবারেই পাস করার কথা, তৈরী হয় নি বলে দেয় নি। দেখে তো যা মনে হয় শান্তশিষ্ট মেয়ে—একে কে খুন করলে ?'

অতঃপর সনাক্তকরণে কোন অসুবিধা রইল না আর।

মহেশ বিশ্বাস এই মহাকরণেই কাজ করেন, তাঁর দাদা অর্থাৎ মেয়ের জ্যাঠা উড়িষ্যার পুলিস অফিসার। মেয়ের নাম সান্ত্বনা, ওই প্রথম সন্তান, আরও দুটি ভাই আছে। একজন বি. কম. পাস ক'রে চাকরির চেষ্টা করছে, আর একটি স্কুলে পড়ে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবার। বেলেঘাটায় নিজেদের বাড়ি, অবস্থা খুব অসচ্ছল নয়।

এখন প্রশ্ন, কে খুন করলে, কেন খুন করলে ?

এ প্রশ্ন নিয়েও অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না, যদি না মেয়ের জ্যাঠা পরেশবাবু খবর পেয়ে এসে পড়তেন। তিনি নিঃসন্তান, এই ভাইঝিটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। নিজের কাছেই রাখতেন, পড়ার অসুবিধে হবে বলে উড়িষ্যায় রাখেন নি—কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি এসে এখানকার এক কর্তাব্যক্তিকে চেপে ধরলেন, 'এই খুনের কারণ আর কর্তার খবরটা আমাকে জেনে দিন দয়া ক'রে।'

'দিতে পারি কিন্তু লাভ কি হবে পরেশবাবু? কোন শাস্তি দেওয়াতে পারবেন না। যদি বা য়্যারেস্ট করি, কেসও ওঠে দায়রায়, দেখবেন শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট প্রমাণ আর পুলিস পক্ষ দিতে পারছেন না। সাক্ষীও গোলমাল করে ফেলছে।'

'তা হোক। যদি পলিটিক্যাল পার্টির ব্যাপার না হয়, তাহলে তো—'

'তা হলেও কি প্রমাণ লোপ পায় না? আপনি অভিজ্ঞ লোক হয়ে এ কি বলছেন! কত রকম কারণ থাকে চাপ আসবার, সে তো আপনি জানেন।'

আর কিছু বললেন না পরেশবাবু।

এসব কথা যে কত সত্য আজকাল, তা তিনিও জানেন বৈকি।

তাই তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। খোঁজখবরও আর বিশেষ করলেন না। করলে আরও আঘাত পেতেন। কারণ সান্ত্বনার পরেই যে লোকটি তাঁর বেশি প্রিয়—বা যে ছেলেটি বলাই উচিত—সে হল তাঁর শালার ছেলে অতনু। অতনু প্রিয়দর্শন, বুদ্ধিমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তেমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও পাস করেছে সবগুলোই এবং বেশ ওয়াকিবহাল। পড়াশুনো করা ছেলে। স্নেহ করার মতোই।

সেই অতনুই আসলে এ কাহিনীর নায়ক।

আত্মীয়তাটা খুব নিকট না হলেও আসা-যাওয়া ছিল। সান্ত্বনার যে এমন একটি 'দাদা'-কে ভাল লাগবে, সে তো স্বতঃসিদ্ধ। বয়সে খুব একটা তফাৎ ছিল না, বছর চারেকের বড় অতনু। কিন্তু সে এম. এ. পাস করেছে যখন, সান্ত্বনা তখন ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ে। বাড়িতে আসা-যাওয়া তো ছিলই। প্রেসিডেন্সী কলেজের করিডরে দেখাশুনো গল্পগুজব হত প্রায়ই। অতনু প্রায়ই ওকে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াত—চা কফি শরবত যখন যা সুবিধে। তার বাবার অবস্থা খুব একটা ভাল না হলেও পিসেমশাইয়ের দৌলতে হাতখরচের অভাব হত না অতনুর।

অতনুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে তার বন্ধুদের সঙ্গেও মেলামেশা হবে বৈকি।

তারাও কেউ বাজে বকাটে ছেলে নয়—সবাই লেখাপড়া করে। তাদের কথা-বার্তা থেকে অনেক কিছুই জানতে পারলে। সান্ত্বনার মনে হল যেন বিশ্বের বাতায়ন খুলে দিয়েছে ওরা তার মনের সামনে। পৃথিবীজোড়া যে রাজনীতির দাবাখেলা চলছে—তা আগে কিছুই বুঝত না—এরাই বুঝতে শেখাল। শ্রেণী সংঘর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু পুঁথিগত জ্ঞান ছিল বটে, তাও পাঠ্যবই থেকে যেটুকু আহরণ করা যায়। কম্যুনিজম্ জানত—সেও আব্ছা আব্ছা। চীনের সাম্যবাদ ও রাশ্যার সাম্যবাদে কি ফারাক তা জানত না; যুগোশ্লাভিয়া কেন আলাদা—তাও না। কেন সিয়া কোটি কোটি ডলার খরচা ক'রে দেশে দেশে অন্তর্কলহ বাধাচ্ছে ও রাজনৈতিক খুন-জখম করছে, তাও কিছুটা জানল। আগেকার কংগ্রেসী রাজনীতির কথা বাবা জ্যেঠা মামাদের কাছে শুনেছে, সে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী তাঁরা। কিন্তু এখনকার কংগ্রেসী রাজনীতি তাঁরা জানেন না, তার গোপন কুটিল বা জটিল দিকগুলো তো নয়ই। তাও জানল খানিকটা এদের কাছ থেকে।

তারা কতটা ঠিক জানে, কতটা অনুমান, আর কতটা গালগল্প—তা সান্ত্বনার জানার কথা নয়। ঠিক বিচারের শক্তি অভিজ্ঞতা ছাড়া হয় না। সুতরাং সে এদের কথা যেন হাঁ ক'রে গিলত এবং বিশ্বাস করত।

অতএব ক্রমশঃ তাদের সঙ্গে এক বিশেষ রাজনৈতিক দলে জড়িয়ে পড়বে —এও সুনিশ্চিত। দুইয়ের পর তিনের মতোই যেন সনাতনক্রমে।

প্রথম প্রথম উৎসাহের অন্ত ছিল না সান্ত্বনার।

পুরুষ বন্ধুদের মতো অর্ধেক মন নিয়ে, ইংরেজীতে যাকে বলে 'হাফ হার্টেডলি' আসে নি সে। নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কর্তৃত্বাধিকার বাঁচিয়ে রাজনীতি করা—মত ও দলের কাজ করা সে জানে না। সে নিজে যেমন উঠে পড়ে কাজ করতে শুরু করল—এদেরও কতকটা ঠেলা মেরে করাতে লাগল।

সে এই দলের মত বা বিশ্বাস বা ধারণাকে বিশ্বাস করেছে, সে মনে করে এই দলের হাতে বা এই মতে বিশ্বাসী কর্মীদের হাতে দেশ গঠন কি শাসনের ভার এলে দেশবাসীর সত্যকার কল্যাণ হবে, একদিন প্রকৃতই শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে এ দেশে। সংখ্যাতত্ত্ব সে জানে না, এই বিপুল জন সংখ্যার মুক্তির পথ বড় বড় নেতারা, চিন্তাবীররা ভেবে কুল পাচ্ছেন না—এত সহজে এ

বিপুল সমস্যার সমাধান হবে না—এ কথা তার মাথায় কেউ ঢোকায় নি।

তার পৃথিবী ছোট। লেখাপড়া সীমাবদ্ধ। তার কাছে 'ব্রিলিয়াণ্ট' এই ছেলেগুলির বাগ্‌জালই যথেষ্ট, মনে প্রাণে এদের কথা বিশ্বাস করেছে সে। আর সেই কারণেই কার্যক্ষেত্রে নেমে প্রচণ্ড আঘাত পেল।

'পাটির কাজ' কি, আগে জানত না; দলের কর্মীদের অন্তরঙ্গ এবং বিশ্বস্ত হয়ে ওঠার পর অনেক কথাই জানল। ধারণা, বক্তৃতা এবং উত্তেজক বাক্য থেকে বাস্তব সত্য যে অনেক দূরে—সে সম্বন্ধে কিছুটা সত্যকার জ্ঞান লাভ করল।

ক্রমে ক্রমে জানল যে, এই যে প্রতিদিন কিছু কিছু খুন হচ্ছে কিশোর বা তরুণ—এরা সকলেই রাজনৈতিক দলের বলি নয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিগত কারণে, অনেক সময় প্রণয়ঘটিত কারণে—তাও নিতান্তই 'কাফ্‌লাভ্‌' যাকে বলে—তার জন্যও খুন হয়, খুন হয় গোপন জুয়া খেলার চক্রে এসে পড়ে যে নির্বোধ ছেলেরা হেরে যাওয়া টাকা শোধ করতে পারে না—তারাও। এগুলো করা ভবিষ্যতে এমনি মাকড়সার জালে এসে পড়া ছেলেগুলোর মনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য, যাতে তারা পরে যেমন ক'রে হোক, চুরি জুচ্চরি জালিয়াতি ক'রেও এদের প্রাপ্য শোধ করে।

আর, এমনি খুন হওয়া মাত্রই বিভিন্ন দল বা পার্টি ছোটে আগে কে এই লাশটাকে দখল ক'রে নিজেদের দলের কর্মী বলে দাবি করতে পারে? তাতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিকে অপরাধী বলে প্রচার করার সুবিধা হয়।

আরও জানল ক্রমশঃ যে চতুর্দিকে যে বড় বড় লুঠ হচ্ছে, ব্যাঙ্ক ডাকাতিই বেশির ভাগ, তা সবই রাজনৈতিক দলের কাজ নয়। এই আবহাওয়ায় অনেক ক্রিমিনাল ফায়দা তুলছে। আবার ফ্ল্যাটে ঢুকেও যে গহনা টাকা লুঠ হয়, তাও সব সাধারণ অপরাধীদের কাজ নয়।

এবং কিছুদিন পরে আরও দেখল, দলের নাম ক'রে তাদের শক্তির সুবিধা-সুযোগ নিয়ে যে সব ডাকাতি হয়—তারাও সব টাকা দলের কোষাগারে জমা পড়ে না। যারা এতটা ঝুঁকি নিচ্ছে, এ টাকার অনেকখানিই তাদের প্রাপ্য বলে এরা নিজেদের বিবেককে বোঝায় এবং সেই টাকায় কিছু কিছু মদ্যপান, ক্যাবারে ক্লাবে ফুর্তি বা ফ্লাশ খেলা ইত্যাদিতে খরচ করা কিছুমাত্র অন্যায় নয়

—বরং প্রাপ্য, তাদের হক, একথা মুখেও বলে। দলের কর্তাদের বোঝায়, যতটা কাগজে লিখেছে, অত টাকা তারা পায় নি, শালারা মিছে করে বলেছে, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে বলে—তবে হ্যাঁ, কিছু তারা নিয়েছে। নেবে বৈকি! প্রাণ হাতে ক'রে দলের রসদ যোগাচ্ছে, একটু আনন্দ করতে না দিলে চলবে কেন। তাদের তো ধরুন এক পা জেলে দিয়ে এসব কাজ করা'

এইখানেই বাধল সংঘাত।

সান্ত্বনা সরল বিশ্বাসে কাজ করতে এসেছিল। উচ্চ আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করবে, জীবন পর্যন্ত দেবে প্রয়োজন হলে। দেশের সেবা করতে গেলে কিছু কিছু তথাকথিত অন্যায় করা যেতে পারে। সে অন্যায় পাপ নয় —তাকে বোঝানো হয়েছিল।

সে বলল, 'এভাবে কেন টাকা নেবে তোমরা? তাহলে সাধারণ ক্রিমিনালের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কি রইল? প্রাণ-ধারণের জন্যে যে টাকার দরকার—সে টাকা দল তো তোমাদের দিচ্ছেই, ফূর্তি করার জন্যে এ টাকা খরচ করার কোন অধিকার নেই। তা করলেই সেটা পাপ বা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়বে।'

প্রথম প্রথম দাদার বন্ধুরা—বর্তমানে ওর দাদারা, সান্ত্বনা ওদেরও দাদা বলতে আরম্ভ করেছে, কাজলদা, দীপুদা ইত্যাদি—ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। তারা জীবন বিপন্ন ক'রে এ টাকাটা দলের জন্যে সংগ্রহ করছে, ধরা পড়লে দীর্ঘমেয়াদী জেল তো অনিবার্য, কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষও মরে দু' একটা—ফাঁসিও হতে পারে। এর জন্যে একটু স্টিমুলাস দরকার বৈকি। ঐ ফূর্তিটুকুই সেই উত্তেজক রস।

কিন্তু এতদিন সান্ত্বনাও কিছু কিছু বুঝতে শিখেছে। সে বলে, 'তোমরা বেশ জানো যে তোমাদের কেউ ধরবে না, ধরলেও সাজা হবে না—এ শুধু আমাদের জুজুর ভয় দেখানো।'

অতনু উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'কে বললে তোকে, কোনদিন কখনই কিছু হবে না? দলে দলে ঝগড়া তো আছেই—তাকে লড়াই বলাই উচিত—আর সব দলেরই কিছু না কিছু ইনফ্লুয়েন্স আছে। বেকায়দা করতে কতক্ষণ।'

তবু সাস্ত্বনা বুঝতে চায় না, খুঁত খুঁত করে। ক্রমশঃ এই সব দেশোদ্ধারের কাজে যে সে বীতস্পৃহ হয়ে উঠছে, উদাসীন মনমরা হয়ে থাকে, নিজেকে অপরাধী বোধ করে—এটা ওর দলের বাকি সকলেই লক্ষ্য করে। বিরক্ত হয়, চিন্তিত হয়—কেবল অতনুর কথাতেই চরমপন্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকে। অতনু বলে, 'আমি ওকে জানি, সাচ্চা হীরে, যদি এ দল ছেড়েও দেয়—চুকলি খাবে না আমাদের নামে এটা ঠিক। আমি ওর জামিন।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জামিন থাকাটা হয়ে উঠল না। অত ভরসা আর রইল না। আর সে সবটার মূলেই এক বোকা আধ-পাগল ইমবেসাইল একটা ছেলে—সজল।

সজল সাস্ত্বনাদের পাড়ার ছেলে, ডানহাতি দু'খানা বাড়ির পরেই ওদের বাড়ি। ওরা একবয়সী—সাস্ত্বনার মা যা বলেন—বরং সজল মাস দুয়েকের ছোট সাস্ত্বনার চেয়ে। সাধারণ গৃহস্থের ছেলে, অবস্থা খুব একটা সচ্ছল নয়। বাড়িটা নিজেদের কিন্তু মেরামতের অভাবে জীর্ণ, কাজেই সাস্ত্বনার কাছাকাছি থেকে এম. এ. পড়বার প্রচণ্ড লোভ থাকা সত্ত্বেও ওকে বি. এ. পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং শিখতে হয়েছিল এবং নানা জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কের একটা চাকরিতেও ঢুকতে হয়েছিল। আপাততঃ কম মাইনে, তবে, এ থেকে অফিসার হওয়ার জন্যে পরীক্ষা দেওয়া চলে, আর সে ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল মাইনেই পাবে, এ আশা আছে।

সজল এমনি সরল ছেলেমানুষ গোছের হলেও লেখাপড়ায় খুব খারাপ নয়। সে উঠে পড়ে লাগলে অফিসারের পদবীতে ওঠা একবারে অসম্ভব নয়—তা সকলেই স্বীকার করবেন।

সজল আগেও আসত এ বাড়ি। সাস্ত্বনা উড়িষ্যা থেকে আসার পর সেটা বাড়ল। সে কখনও ঝোঁকের মাথায় সান্তও বলে ফেলত, কখনও বলত সাস্ত্বনাদি। সে যে সাস্ত্বনার অনুরক্ত তা দু' বাড়ির সকলেই জানত, তবে সে অনুরাগটা প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছেছে তা কেউই অনুমান করতে পারে নি, সাস্ত্বনা তো নয়ই। সে ওকে স্নেহের চোখে দেখত, ছোট ভাইয়ের মতোই মনে করত, সময় বিশেষে তিরস্কারও করত। অর্থাৎ ওর আনুগত্যটা, যাকে

সিরিয়াসলি নেওয়া বলে—তা কখনও নেয় নি সান্ত্বনা।

কিন্তু সজলের আর ধৈর্য মানছিল না। চাকরিতে ঢোকার বছরখানেক পরেই একদিন সোজাসুজি সান্ত্বনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল।

সান্ত্বনা তো অবাক। বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। আমি না তোমার দিদি, তোমার চেয়ে বয়সে বড়, দিদি বলেই ডাকো। এ আবার কি অসভ্যতা?'

সজল তখন মরীয়া। সে বলে, বড় না ছাই, একবয়সী। আর বড় হলেই বা কি, পৃথিবীর সব দেশেই আখছার এমন বিয়ে হচ্ছে, এদেশেও হয়। আমাদের পাড়াতেই ছাখো না—গোবিন্দ ওর থেকে দশ বছরের বড় মেয়েকে বিয়ে করল, তার আগের স্বামীর দরুন একটা মেয়েসুদ্ধ।'

'সে ক্ষেত্রে হয়ত দু'জনেরই ভালবাসার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আমি তোমাকে চিরদিন নিজের ভাইয়ের মতোই ভেবে এসেছি—স্বামী বলে ভাবতে পারব না। আর এই সবে এক বছর চাকরিতে ঢুকেছ, কীই বা মাইনে পাও। এরই মধ্যে বিয়ে করবে কি, বৌ ছেলে পুষবে কিসে?'

'যা পাই তাতে গরিবের মতো তো চলবে। আর যদি তোমাকে পাই, তোমাকে সুখী করার জন্যে দু' তিন বছরের মধ্যে দেখো অফিসার র‍্যাঙ্কে চলে যাবো। তখন আমার কোন অভাব থাকবে না। ইন দ্য মিন টাইম, একটা পার্টটাইম কাজ কোথাও যোগাড় ক'রে নেব। লক্ষ্মীটি, তুমি 'না' বলো না।'

'লক্ষ্মী' কিন্তু 'না'-ই বলল, শেষ পর্যন্ত কিছু কড়া কথাও। আর সজলেরও বুক ভাঙ্গার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে লেগেই রইল এবং পুনঃপুনঃ প্রেম নিবেদনে, সান্ত্বনার রূপের স্তুতিতে (সান্ত্বনা জানে তার এমন কোন রূপ-গৌরব নেই, ওটা সজলের চোখের দোষ), বিদ্যাবুদ্ধি বিবেচনার স্তবগানে, ব্যক্তিত্বের জন্য ভক্তিমিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশে—বরফ গলাবার চেষ্টা করতে লাগল। একদিন কিছু উপহারও এনেছিল, সান্ত্বনা তৎক্ষণাৎ সেটা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিতে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে আর সাহস করে নি।

তবু, সান্ত্বনা যে কোমল হয়ে এসেছিল, এটাও ঠিক। আর সেটা সান্ত্বনাও বুঝেছিল। এমন একনিষ্ঠ ভক্ত যে কোন দুর্বাক্যে, কোন দুর্ব্যবহারে বিরক্ত কি ক্রুদ্ধ হয় না—তার সম্বন্ধে মনে দুর্বলতা আসতে বাধ্য। পুরাণের দেবদেবীরা

এর থেকে অনেক কম স্তুতিতে বিগলিত হয়ে অনেক দুষ্কর্ম করেছেন—অশ্বত্থামার প্রতি শিবের প্রসন্নতা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—মানুষ তো কোন্ ছার!

সজল যে প্রাণপণে পরিশ্রম করছে আপিসের পরীক্ষার জন্যে—তা শুধু তার মুখে নয়, অপরের কাছেও শুনেছে। আর সে কি কেবল ওর কাছে যোগ্য হয়ে ওঠার জন্যেই নয়?

হয়ত আর এক আধ বছর পরে সান্ত্বনা ওর কাছে আত্মসমর্পণই করত—যদি না এই নিদারুণ দুর্ঘটনাটা ঘটে যেত।

সজলের কাউন্টারে থাকারও কথা নয়। ক্যাশ ঘরে তো নয়ই। কারণ তখনও সে টাইপিস্ট মাত্র। কিন্তু কাজ শেখার প্রবল আগ্রহে একটু ফাঁক পেলেই যেচে সেধে সকলের শাগরেদী করতে আসত। আর—বেগার দেবার জন্যে তেমন আগ্রহী, বিনয়ী ও সৎ লোক পেলে সে সুযোগ কে না নেয়?

দক্ষিণ কলকাতার এক ব্যাঙ্কে যে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা লুঠ হল, তা বিনা রক্তপাতে হয় নি। চৌকিদাররা এ ডাকাতির কথা পূর্বাহ্ণেই জানত; বাবুরা বাধা দেবেন না, কারণ তাঁরা ইতিপূর্বের অনুরূপ ঘটনার কথা জানেন। একাজে যারা আসে, তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। সুতরাং ঘটনাটা মিনিট দশেকের মধ্যে নির্বিঘ্নেই ঘটে যাবার কথা। নির্বোধ সজল এত ভাবে নি, হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারেই তার সহজ সৎবুদ্ধি কাজ করেছে—সে একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। তখন আর গুলি করা ছাড়া উপায় কি? খুন করার ইচ্ছা আদৌ এদের ছিল না। খুব বেকায়দা হলে বোমা ফাটানোর কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে বোমা ফাটালে নিজের দলের লোকও জখম হবে—অগত্যা রিভলভার।

গুলি পিছন থেকে সোজা এসে মাথায় লেগেছিল। কোনমতেই তাই সজলকে বাঁচানো গেল না, জ্ঞানই হল না। আধ ঘণ্টাটাক মাত্র প্রাণটা ছিল।

সান্ত্বনা এ খবর পায় নি। মানে নিহত ব্যক্তির নামটা শোনে নি। প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা লুঠ হয়েছে—এ অঙ্কের কথাটা শুনেছিল দুপুরের রেডিওর খবরে।

সেদিন ওদের দেখা হবার কথা নয়। কারণ—এসব ঘটনার পর ঘটনার

নায়করা চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে, এই-ই নিয়ম। টাকাটা সংগৃহীত হয় ওদের কাছ থেকে পুরনো কাগজওলা মারফত। সন্ধ্যার সময় পার্টি আপিসে গিয়ে শুনল, টাকাটা সাড়ে সাত নয়, সাড়ে পাঁচ—আর পাহারাদার, গাড়ির চালক ইত্যাদিকে ঘুষ দিতে গেছে এক লাখ। মোট সাড়ে চার লাখ টাকা পাওয়া গেছে।

এটা যে মিথ্যা তা সান্ত্বনা জানে। শুধু সে কথাটা ফাঁস করা উচিত হবে কিনা, সেই বিষয়েই মনটা স্থির করতে পারে নি। বিষন্ন গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল আড্ডা থেকে, এও আঘাত, কিন্তু তখন এমন প্রচণ্ডতর আঘাতের কথা ভাবতে পারে নি। বাড়ি এসে দেখল, তার বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, মা কাঁদছেন। সজলকে এ বাড়ির সকলেই ভালবাসত, কাঁদারই কথা। শুনল, ওর ভাই দুটি সজলদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে থানায় গেছে, মৃতদেহের শেষ লাঞ্ছনা মর্গের কাটা-ছেঁড়া বাঁচানো যায় কিনা সেই চেষ্টায়।

অতনুর সঙ্গে দেখা হল আট দিন পরে। এ সময়টা ওরা কে কোথায় কাটালো তা জিজ্ঞাসা করা বারণ। তবে মুখচোখের চেহারা দেখে ক'টা দিন যে তথাকথিত কোন ফূর্তির আড্ডায় কেটেছে, সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। এগুলো আগে বুঝত না সান্ত্বনা, এরাই বুঝতে শিখিয়েছে। মুখে মদের গন্ধ, চোখের কোলে কালি, কথাবার্তায় একটা চাপা বিজয়গর্ব।

অতনু স্বাভাবিকভাবেই সম্ভাষণ করতে গেল—কিন্তু ঠিক সহজ হতে পারল না। সজলকে সে চিনত, সজল যে এ বাড়ির অতি ঘনিষ্ঠ—তাও জানা ছিল। এমন কি, তার সান্ত্বনা সম্বন্ধে পাগলামির কথাও না জানবার কথা নয়, সান্ত্বনাই কত দিন হাসতে হাসতে গল্প করেছে। সেদিন সজলকে চেনার মতো মনের অবস্থা ছিল না, চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটেছে, ভাল ক'রে দেখারও অবসর পায় নি। পরে জেনেছে নামটা।

সান্ত্বনা কিন্তু সহজ হবার চেষ্টাও করল না।

ওদের দেখা হয়েছিল আপিস পাড়াতেই। সন্ধ্যা কেটে যাবার খানিকটা পরে। গোপন কথা আলোচনা করতে গেলে প্রকাশ্য স্থানে করাই নিরাপদ, কেউ অত সন্দেহ করে না।

সান্ত্বনা চাপা কিন্তু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই প্রশ্ন করল, 'তোমরা নোব্‌ল্ কাজের জন্যে টাকা লুঠ করছ এই কথাই বল, সে সঙ্গে একথাও বারবার বলেছ, মানুষ খুন কখনও করা হবে না। এবার ও ছেলেটাকে মারলে কেন?'

'হি ইজ এ ড্যাম্‌ড্ ফুল। কেউ যদি অমন ক'রে মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, আমরা কি করতে পারি?'

তীক্ষ্ণতর শুধু নয়, বিষাক্ত হয়ে উঠল সান্ত্বনার কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু মানুষ খুন করা দলের জন্যে, দেশের কাজ করার জন্যে যদি বা সহ্য করা যায়—সে পয়সায় ফূর্তি করার কি জবাব বলতে পারো?···না অতনু—দাদা বলতে আর তোমাকে ইচ্ছে করে না—আমি এবার ডিসগাস্টেড হয়ে উঠেছি, তোমাদের হয়ে কাজ করেছি ভাবলেই নিজেকে অশুচি বলে মনে হচ্ছে—কিন্তু আর নয়, আমি এ একেবারেই ছেড়ে দিলাম। আমার অন্য প্রায়শ্চিত্তর কথা পরে ভাবব—আপাততঃ—না, ভয় নেই, পুলিসের কাছে যাবো না, আমাদের সেক্রেটারীকে সত্য কথাটা জানিয়ে বিদায় নেব। তারপর তিনি কোন স্টেপ নেবেন, না তোমাদের হাতে রাখার জন্যে এটা ঘুষ বলে ধরে নেবেন, সে তিনি বুঝবেন!'

অতনু ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'এই সান্তু, পাগলামি করো না। এ করার পরও কি আমাদের পার্টি কোন স্টেপ নেবে না ভাবো? মানে তোমার মুখ বন্ধ করার স্টেপ? পাগলকে বাজারে ছেড়ে রাখা যায় না—জানো তো! আর ও ছেলেটা তো তোমার জীবন অস্থির করে তুলেছিল!'

'অতনু, ভুলে যেও না—ও আমাকে সত্যিই ভালবাসত, পুজো করার মতো ক'রে। অত ভাল কেউ কোনদিন বাসবে না, অমন ভালবাসা শতকরা একটা মেয়েও পায় কিনা সন্দেহ। সেজন্যে আমার দুর্বলতা বল কৃতজ্ঞতা বল, থাকতে বাধ্য। আর তা না হলেও একটা নিরপরাধ ভাল ছেলের প্রাণের বিনিময়ে তোমরা ফূর্তির টাকা লুঠবে—এ তো ক্রিমিন্যাল! যাও, তোমরা যা যা স্টেপ নিতে চাও নিও। মারবে? এই তো? মেরো, আমার আর বাঁচবার ইচ্ছেও নেই। এই পাপের বোঝা ঘাড়ে করে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।

'কি ফূর্তি ফূর্তি করছ? কে বলেছে আমরা অত টাকা মেরেছি?'

'তোমার কথাতেই তো বেরিয়ে গেল। আমি তো কত টাকা বলি নি।' বিদ্রূপ শাণিত হয়ে ওঠে সান্ত্বর গলা।

'শোন শোন, আচ্ছা একটু এদিকে এসো—এই ছায়াটায়। পাঁচ মিনিট আমার কথাটা শোন—তারপর যা খুশি করো।'

সান্ত্বনা খুবই বিচলিত আর উত্তেজিত ছিল বলেই—কিংবা এত কালের পরিচয়ের পর—যে পরিচয় প্রায় প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছেছিল—ব্যক্তিগতভাবে অতনুকে অবিশ্বাস কি ভয় করার কথা মাথাতে যায় নি—সে নির্ভয়েই ওর সঙ্গে এই গাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

তাছাড়া পথ জনবিরল হয়ে এসেছে ঠিকই—একেবারে নির্জন তো হয় নি।

কিন্তু অতনুরই বা কি উপায় ছিল আর, সান্ত্বনার কণ্ঠ চিরকালের জন্যে বন্ধ করার?

এ সুযোগ ছাড়লে যে আবার সুযোগ পাবে—তারই বা নিশ্চয়তা কি? তাছাড়া, বেশি ভাবারও তো সময় ছিল না। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের চিন্তা বিবেচনা করার অবস্থাও থাকে না তেমন।

বিগতস্পৃহ

আমি তাকে প্রথম দেখি বছর দশেক আগে। দিল্লীর একটা ব্যাঙ্কে ট্রাভেলার্স চেক ভাঙ্গাতে গিয়েছিলুম—হঠাৎই নজরে পড়ল। না, অফিসার নয়, এমন কি কোন কনিষ্ঠ কেরানীও নয়, নিতান্তই ছাই রঙের উর্দিপরা সাধারণ কর্মচারী, হয়তো ঘর ঝাঁট দেওয়া বা চায়ের কাপ ধোওয়ার কাজও করতে হয়, আমি যা দেখলুম, মোটা মোটা খাতা এ টেবিল থেকে ও টেবিলে নিয়ে যাচ্ছে, পাস করা চেক কেশিয়ারের খোপে রেখে আসছে—এই ধরনের কাজ।

লেখাপড়া বেশি জানে না সে তো বোঝাই যাচ্ছে, সেইরকম নিম্নবিত্ত ঘরেরই ছেলে নিশ্চয়, ঝি চাকর যেসব ঘর থেকে আসে, কিন্তু কি আশ্চর্য রূপবান! খুব ধনী কাশ্মীরী বা পাঞ্জাবী পরিবারে যে রূপ আমার প্রথম বয়সে দেখেছি—(এখন সেসব ঘরেও আর দেখা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময়

ও পরে নানা রক্ত সংমিশ্রণে ও ব্যাধির প্রকোপে কাশ্মীরী গুর্খা খাসিয়া সব সুন্দরীরাই পূর্ব গৌরব হারিয়েছে)—সেই রকমই কান্তিমান ছেলেটি। তাও আমি এমন রূপবান সে-বয়সেও খুব দেখিনি, দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না, দৃষ্টি আটকে যায়।

শুধু রূপই নয়—চলাফেরা, ভাবভঙ্গী ধার ভাবে কথা বলা—সবই একটা আভিজাত্যের পরিচয় দেয়, অথচ, এই কাজ করছে! তার মানে হয় লেখা-পড়া শেখে নি, নয়তো—নিরুপায় হয়ে উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও তা গোপন করে এই চাকরি নিয়েছে। অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অন্নসংস্থানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সেদিন ফিরে এলাম ; কাজ শেষ হয়ে গেল এক সময়, দাঁড়াবার কোন প্রয়োজন বা অজুহাত রইল না।

কিন্তু দিন-তিনেক পরে একদিন, কৌতূহল প্রায় অসম্বরণীয় হয়ে উঠতে কতকটা বিনা প্রয়োজনেই—আর একখানা চেক ভাঙ্গাতে গেলাম। এদিন একটু আলাপ করারও সুযোগ ঘটল। ঠিক সেই সময়টাই ওকে কি একটা কাজে—বোধ হয় সিগারেট আনতেই, ঠিক মনে নেই—এক অফিসার বাইরে পাঠালেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

ছেলেটি প্রায় তখনই ফিরল। আমি কতকটা তার পথ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলুম, 'তোমার নাম কি বেটা? কোথায় থাকো?'

সে যে খুবই বিস্মিত হল তা তার চোখ দেখেই বুঝলুম, কিন্তু সে শান্ত ভাবেই দুহাত তুলে একটা নমস্কারের ভঙ্গী ক'রে বলল, 'আপনার এ বান্দার নাম পরমেশ, থাকি মেহরৌলীতে।'

আমি হঠাৎই বলে ফেললুম, যে কথাটা গত কদিন ধরে মাথায় ঘুরছিল সেটাই বেরিয়ে এল বিনা ভূমিকায়, 'তোমার এত সুন্দর চেহারা, এমন ফিগার, চাল-চলন কাথাবার্তাও এত ভাল, তুমি ফিল্ম লাইনে গেলে না কেন? বম্বে গেলে তোমাকে লুফে নেবে, দু তিন বছরের মধ্যেই হাজার হাজার টাকা রোজগার দাঁড়াবে।'

মাথা নিচু ক'রে হাসল ছেলেটি, ভারী মিষ্টি হাসি, আর তেমনি দাঁত, এই ধরণের কাজ ক'রে কিন্তু সম্ভবত বিড়ি খেতে শেখেনি, কারণ দাঁতে কোন ছোপ

নেই ··কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটু যেন কুণ্ঠিতভাবেই বলল, 'জী, ময়নে শুনা হ্যায় কি উস লাইনমে জানে পর ইনসানিয়াৎ নেহি রহতা। পৈসাকে লাল-চমে জানোয়ার বন জাতা আদমী।···হামারে লিয়ে তো এহি দো রোটি আউর থোড়া নমক কাফি হ্যায়! জ্যাদা পৈসাকে জরুরত নেহি!'

বলতে গেলাম যে মনুষ্যত্ব একেবারেই থাকে না এটা ঠিক নয়—যে রাখতে জানে তার ঠিকই থাকে—কিন্তু সে সুযোগ পেলুম না, ছেলেটা আশ্চর্য কৌশলে আমাকে পাশ কাটিয়ে ব্যাঙ্কে ফিরে গেল।

আর কীই বা করার আছে।

কিন্তু ছেলেটাও যেন আমাকে পেয়ে বসল!

শেষে আর থাকতে না পেরে একটা ছুটির দিন সকালে সত্যি-সত্যিই মেহরৌলীর বাসে চেপে বসলুম।

কিন্তু মেহরৌলী পৌঁছে মনে পড়ল ইতিপূর্বে আমি এখানে যখন এসেছি তারপর সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কেটে গেছে। তখন ছিল গ্রাম, এখন জমজমাট শহর।

ফিরে যাওয়াই উচিত, ফিরতি বাসে, বে-অকুফিটাকে দীর্ঘায়ত করার কোন প্রয়োজন নেই, তবু ঠিক তখনই ফিরতেও পারলুম না। কলকাতার লোক আমি, এত সহজে হার মানব! দেখি না একটু খোঁজ ক'রে। যা চেহারা ছেলেটার—সকলেরই লক্ষ্য পড়বে।

তিন চারটে রাস্তার দোকানে দোকানে জিজ্ঞাসা করার পরই এক বৃদ্ধ চা-ওয়ালা খবর দিল।

'বহুৎ খুবসুরৎ? নওজোয়ান? গোরে সা, লম্বাসা? কেয়া ফরমায়া আপনে, ব্যাংমে কাম করতা। হাঁ হাঁ, হামারা মালুম হো গিয়া।'

এই বলে সে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পথের হদিশ দিল। জায়গাটা বেশি দূরে নয়, সামনের এই নতুন বাড়িগুলোর পিছনে কয়েকটা পুরনো আমলের ছোট ছোট বাড়ি আছে, কিছু খাপরার ঘরও আছে। তারই একটাতে থাকে পরমেশ-পরসাদ। বহুৎ নেক ছোকরা। এক বুড়ি মা আছে বাড়িতে, চির-রুগ্ন, উঠতে পারে না, ঐ ছেলেটাই তাকে দেখে, সব কাজ করে। রসুই ভি

করে, মাকে চান করিয়ে খাইয়ে নিজের কাজে যায়।

অর্থাৎ, আমার অনুমানই ঠিক। ছেলেটা ঠিক সাধারণ গৃহভৃত্য শ্রেণীর লোক নয়, অভিজাত না-ই হোক ভদ্রবংশের রক্ত আছে কোথাও, সে সংস্কার ও সংস্কৃতি আচারে ব্যবহারে কথায় বার্তায় পরিস্ফুট।

খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেলাম ওর ঘর এক সময়। সামান্য একটি ঘর, পাকা দেওয়াল ও মেঝে, খাপরার চাল। সামনে এক ফালি রক। বোধ হয় বাথরুম বা আলাদা কল নেই, বাড়ির সামনের রাস্তায় কল আছে। কারণ সেখান থেকেই জল তুলতে হয়। আমি যখন গেলাম তখন পরমেশ এক বালতি জল নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। পিছনে ছিলুম বলে দেখতে পেল না।

এখন আপিসের পোশাক নেই, একখানা ধুতি পাট করে পরা, সেটা জল আনার সুবিধার জন্য ওপরের দিকে তোলা, অনেকটা দক্ষিণীদের লুঙ্গি পাট করে পরার মতো। গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি, অর্থাৎ অধিকাংশ দেহই অনাবরিত। আগেই দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এখন সে বিস্ময় আরও বাড়ল। মনে হল যেন কোন শিল্পীর খোদাই করা মূর্তি! দুধে-আলতা রঙ, আর তেমনি দৈহিক গঠন, প্রাচীন গ্রীস হলে ওকে নগ্ন দেহে পথ চলতে বাধ্য করত।

আমি দরজার বাইরে গিয়ে আস্তে ডাকলাম, 'পরমেশ।'

খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যেটা দেখার কোন অসুবিধা ছিল না। একদিকে একটা চৌকিতে একটি বৃদ্ধা মহিলা শুয়ে আছেন, একটা সুতি চাদর মুড়ি দিয়ে। কিন্তু তার পাশে যে বস্তুটি সেটি বোধ হয় এদেশে ধনীগৃহেও দুর্লভ—একটি পোর্টেবল্ কমোড, চাকা দেওয়া, কতকটা বাক্সর মতো—সেটা ঐ চৌকীর সঙ্গে সমান উঁচু, মানে কেউ বসে বসেই ওখানে গিয়ে ব্যবহার করতে পারে। সম্ভবত মহিলা একেবারে শয্যাশায়ী, হয়ত বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত—সেইজন্যই এ ব্যবস্থা। কিন্তু এ ছেলেটা এত জানল কি ক'রে?

ঐ ঘরেরই এক পাশে একটা স্টোভ, সামান্য কিছু রান্নার সরঞ্জাম, দু'তিন বালতি জল। একটা তাকে কিছু বাসনও। এ ছাড়া আছে একটা দড়ির আলনায় দু'-একটা পাজামা ওড়না, আর পেরেকে টাঙ্গানো ছেলেটার আপিসের পোশাক।

ডাক শুনে পরমেশ যে চমকে উঠল তা বেশ পরিষ্কারই দেখা গেল। কিন্তু ফিরে চেয়ে দেখার পর ওর মুখখানা যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল, আর চোখে দেখা দিল অপরিসীম বিস্ময়। কিছুক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে অতি-কষ্টে উচ্চারণ করল, 'বাবুজী!'

আমি হেসে বললুম, 'ভয় নেই। আমি কোন বদ মতলবে আসি নি। তোমাকে দেখে আর তোমার সঙ্গে কথা বলে বড় ভাল লেগেছিল, তাই খুঁজে খুঁজে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।'

দুশ্চিন্তা, সন্দেহ এবং অপ্রতিভতা ছাড়িয়ে ওর ভদ্র সংস্কারেরই জয় হল। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'আপকা বহুৎ মেহেরবাণী। আইয়ে, অন্দর আইয়ে।'

এই বলে বোধ হয় নিজের গায়ে দেবারই একখানা চাদর পেতে দিলে মেঝেতে।

আমিও চেপে চুপে বসলুম। ও তখনও চুপচাপ। কী বলবে হয়ত তাও ভেবে পাচ্ছে না, আমার মতলব খুঁজছে মনে মনে। অগত্যা—মনের বরফ গলাতে আমিই একা অনর্গল বকে যেতে লাগলাম।

একথা ওকথা, আমি কোথায় থাকি, কদিনের জন্যে এসেছি, পরশুই চলে যাব, আবার আসব অবশ্য, শিগগিরই—মাস দুই বাদেই; এখানে আমার নিজের একটা বাসা আছে; ইত্যাদি। তারপর একটু একটু ক'রে আমার প্রশ্নের ঝাঁপি খুললুম—ওদের কোথায় দেশ ছিল, আর কে কে আছে—মার কি অসুখ। এইটুকু এক ফালি ঘরের কত ভাড়া দিতে হয়, জলের ব্যবস্থাও তো নেই দেখছি—পাইখানার কি ব্যবস্থা, কোন বাথরুম আছে কিনা ইত্যাদি—

দু একটা প্রশ্নের উত্তর দিল, দু একটা এড়িয়ে গেল। আসলে তখনও বুঝতে পারছে না ওর সম্বন্ধে আমার এত কৌতূহল বা আগ্রহ কেন।

ওদের দেশ ছিল নাকি, পশ্চিম পাঞ্জাবেরও পশ্চিমে, আগেকার সীমান্ত প্রদেশে। সে দেশ ও দেখে নি। ওর মা বাবা কোন মতে পালিয়ে এসেছেন—কিছুই নিয়ে আসতে পারেন নি, কিছু আনার মতো ছিলও না। পাহাড়ে দুতিন বিঘা জমি, বাদাম আখরোট ও 'লুকাট' ফলের বাগান—তাতে সংসার চলে যেত কিন্তু বাড়তি কিছু থাকত না।

ওখান থেকে ওরা চলে আসে শ্রীনগরে। •সেখানেই ওর জন্ম হয়। কিছু লেখাপড়া শিখেছে, তবে তাতে ভাল 'নৌকরী' মেলে না। পড়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মা এই যে হঠাৎ পড়ে গেলেন—তাতেই ওকে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে রোজগারের ধান্দায় লাগতে হয়েছে। আর তাতেই কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসতেও হয়েছে এই দেশে, মার অত শীত সহ্য হবে না, ডাক্তার বললেন।

'তোমার বাবা বুঝি তোমার বাচপনেই মারা গিছলেন?'

একটু ইতস্তত করল ছেলেটা। ওর সুগৌর শুভ্র ললাটে যেন কে এক ছোপ আলতা মাখিয়ে দিল।

কিন্তু দেখলাম সত্যকার ভদ্রবংশের গুণ আছে ওতে, যেন চেষ্টা করেও মিথ্যা বলতে পারল না। একবার আড়ে মার দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'জানি না বাবুজী, তিনি আমাদের ত্যাগ করেছিলেন। তাঁকে আমি জ্ঞান হয়ে দেখিও নি।'

এই পর্যন্ত বলেই চট করে উঠে পড়ে বলল, 'একটু মাপ করবেন বাবুজী, আমি দু কাপ চা নিয়ে আসি—'

আমিও তার চেয়ে দ্রুত তার একখানা হাত চেপে ধরলুম, 'না পরমেশ, আমি দোকানের চা খাবো না! তোমার এখানে কাপ কেতলি সবই তো আছে দেখছি—তুমি যদি করে দাও তো খাবো—'

আবারও একবার রাঙা হয়ে ওঠবার পালা। বলল, 'কিন্তু আমার যে বড্ড কম দামের চা সাহেব, এ কি আপনি খেতে পারবেন?'

'আর ঐ যে দোকানে যে সব চা করছে···আসার পথেই তো একটা দোকান দেখলুম, ওই বুঝি ভাল দার্জিলিঙ চা আনিয়ে ব্যবহার করে! আর ও যা নোংরা! তাছাড়া এদেশে চা-পাতা দুধ একসঙ্গে ফোটায়—ও আমার চলবে না। তুমি যত কম দামী পাতাই দাও ওদের চেয়ে ভাল হবে।'

আর কোন প্রতিবাদ করল না, গিয়ে স্টোভ জ্বালতে বসল।

আমি বসে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর পরিচ্ছন্নতা ও নৈপুণ্য দেখতে লাগলাম। চা শুধু নয়, একটা কৌটো থেকে দুখানা ভাল বিস্কুটও বার করে সযত্নে ও সসম্ভ্রমে আমার সামনে রাখল।

চা করল দেখলুম তিন কাপ। কাপ দুটোই ছিল, শেষ খানিকটা চা

একটা গ্লাসেই ঢালল।

তারপর সেটা এনে চৌকির ওপাশে রাখা একটা টুলে বসিয়ে অতি সন্তর্পণে ও সস্নেহে মাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আধবসা করে মুখের সামনে গ্লাস ধরে খাওয়াতে লাগল।

ওর মা মৃদুকণ্ঠে একটু কি প্রতিবাদ মতো করলেন। মনে হল বললেন, 'আবার আমাকে কেন মুন্না, আমার তো দুবার হয়ে গেছে।'

'তা হোক।' গলায় জোর দিয়ে বলল, 'তুমি চা ভালবাসো, অসময়ে তো কোনদিন বড় একটা হয় না—আজ এই সাহেবের মেহেরবানীতে যদি হলই, একটু খাও না।'

আমি বললুম, 'না পরমেশ, সাহেব আমার সহ্য হবে না, তার চেয়ে বাবুজীই বল। আরও ভাল হয় যদি বাবাজী বলো।'

হাসল একটু পরমেশ, বলল, 'তাই হবে।'

আমি ঘরে ঢুকতেই ওর মা চাদরটা মুখেও চাপা দিয়েছিলেন, এখন মুখ খুলতেই হল—দেখলাম ওর মাও যে বয়সকালে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তা এখন এই রূপের ভগ্নাবশেষ দেখেও বেশ বোঝা যায়। মুখ চোখ, গোলাপী রঙ—এগুলো এখনও আছে। সব চেয়ে চোখ। এমন সুনীল চোখ আমি দেখেছি, এর আগে বার্লোগঞ্জের রাস্তায়—মতিলালজীর এক বৃদ্ধা বান্ধবীর। রিক্সা করে যাচ্ছিলেন, অত বয়স তবু রূপসী যে তাতে সন্দেহ নেই। আর এইরকমই আশ্চর্য নীল চোখ।···

সেদিন চা পানের পরই উঠতে হল। এরপর বসলে অভদ্রতা হয়। আর কোন কৈফিয়ৎও নেই। ওদের গৃহস্থালীর কাজ আমি থাকতে হবে না, বিশেষ বৃদ্ধার প্রাকৃতিক কাজগুলো, স্নান ইত্যাদি তো বাইরের লোকের সামনে হবে না।

পরের দিনই চলে আসা। তবু একবার মনে হয়েছিল চলে যাই। কিন্তু আপিসের দিন পরমেশকে সাড়ে আটটায় বেরিয়ে পড়তে হয়। সে তালা দিয়ে যায় ঘরের দোরে, 'কুঞ্জি' বাড়িওলাদের জিম্মায় থাকে। তাঁর যা প্রাকৃতিক কাজের দরকার—তা তিনি সেরে নিতে পারেন নিজেই, হাত দুটো চালু আছে। অন্য যদি কোন দরকার হয়—বা বিপদ আপদ—হাঁক দিলে

বাড়িওলাদের কেউ না কেউ ছুটে আসে।

তাই বলে তালা খুলিয়ে বুড়ির সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়া শোভন নয়। গোয়েন্দাগিরি ভাবতে পারে। অগত্যা ইচ্ছাটা দমন করতে হল।

এর মাস ছয়েকের মধ্যে আর দিল্লী যাওয়া ঘটে ওঠেনি। গেলুম একেবারে চৈত্র মাসের গোড়ার দিকে। তখনও গরম পড়ে নি, বরং রাত্রিটায় একটু শীতই করে।

ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখা করার কোন অজুহাত নেই। সবে এসেছি, চেক ভাঙাবার দরকার পড়ে নি। তাছাড়া, ওখানে গল্প করার অবসর পাওয়া যাবে না। সেদিন দেখে মনে হ'ল, কাজের সময় অকারণে দাঁড়িয়ে খোশগল্প করার ছেলে নয় ও।

প্রথম রবিবার আসতেই বেরিয়ে পড়লুম। আগ্রহের তাগিদে একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছিলুম—ফলে আমি যখন পৌঁছলুম তখনও আটটা বাজে নি। পরমেশ তখন রাস্তার কল থেকে জল তুলছে। ভীড়ও খুব, দেখলাম গরম পড়ার আগেই জলের চাপ কমে গেছে, বালতি ভরতে দেরি হচ্ছে। হয়ত সেইজন্যেই, খররোদে দাঁড়িয়ে বেচারী ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

আমাকে দেখে ভরার আগেই জলের বালতিটা তুলে নিয়ে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এল। আজ আর তার মুখে বিস্ময় কি সন্দেহের ছায়া দেখা গেল না···বরং যেন মনে হল সে আমাকে প্রত্যাশাই করছিল। হয়ত আরও আগে থেকেই।

সে 'আইয়ে আইয়ে বাবুজী' বলে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে বালতিটা নামিয়ে একটা কম্বল বিছোতে বিছোতে বলল, 'মায়ী, উয়ো বাবুজী আ গিয়া।'

ওর মাও আমাকে দেখে সেদিনের মতো মুখে চাপা দিলেন না বরং হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে মুখেও বললেন, 'নমস্তে জী। আপকো বহুত মেহেরবানি।'

আমি সেদিন কিছু বরফি, গরম সমোসা আর কিছু ফল নিয়ে গিয়েছিলুম। সেইগুলো দেখেই বরং ওর ভ্রূ-কুঁচকে উঠল একটু। তবে এগুলো কি ওর দারিদ্র্যের প্রতি আমার ইঙ্গিত ভাবল? কে জানে। তবে মুখে কোন প্রতিবাদ জানাল না। শুধু বলল, 'ইৎনা কিঁউ—কোন্ খায়েগা।'

'আরে আমিও খাবো।' বললাম, 'আমি নাস্তা করে আসি নি। তোমার হাতে চা খাব বলেই আরও—। তোমারও তো বোধহয় নাস্তা হয় নি এখনও। চা করো, একসঙ্গে খাই। মাকে একটু ফল মিষ্টি দাও না। গরম সিঙ্গাড়াও আছে—'

পরমেশ মুখ টিপে একটু হেসে, হাতের উল্টো পিঠে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে স্টোভ জ্বালতে বসল।...

এরপর আর রবিবারের জন্যে অপেক্ষা করিনি, কোনমতে দুটো দিন কাটিয়ে বুধবারই আবার গিয়ে হাজির হলাম, একটু বেলা করেই। ওর কাছে যখন পৌঁছলাম তখন নটা বাজে। ওর খাওয়া হয়ে গেছে, মার খাবার ওদিকের টুলে ঢাকা, তাঁকে চান করিয়ে দু-তিনটে বালিশে ঠেশ দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। আপিস যাত্রার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ।

আমাকে দেখে একটু বিপন্ন হয়ে পড়বে—সে স্বাভাবিক। আমিও সেজন্য প্রস্তুতই ছিলুম। বললুম, 'না না, তুমি আপিস যাও। আমি দু-তিন বার চা খেয়ে এসেছি। এদিকে একটু কাজ ছিল তাই—ভাবলুম তোমার মা একা পড়ে থাকেন, একটু গল্প করে যাই। আমি একটু বসে, দোরে তালা লাগিয়ে চাবি এঁদের হাতে দিয়ে যাব, কোন চিন্তা নেই।'

খুব যে খুশী হল না তা বলাই বাহুল্য, তবে তখন আর তকরার করার সময় ছিল না। দ্রুত কম্বলটা বিছিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অনেকখানি উদ্বেগ নিয়ে যে গেল, তা ওর মুখের চেহারা দেখেই বুঝলুম।

সেই সূত্রপাত। সেদিন অল্পক্ষণ থেকেই চলে এসেছিলাম। তাই আমার দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা কেটে গেল। এরপর আবার রবিবার, তারপর দু-একদিন অন্তর। কোনদিন কিছু ফল নিয়ে যাই, কোন দিন বা বরফি। পরমেশ শুনলাম জিলিপি ভালবাসে, একদিন ইচ্ছে করেই সন্ধ্যের দিকে গরম জিলিপী নিয়ে উপস্থিত হলুম। একটা রবিবার পরমেশ—বোধহয় আয়োজন প্রস্তুতই রেখে ছিল—হালুয়া ক'রে খাওয়াল। উৎকৃষ্ট হালুয়া, প্রশংসা করতে বলল, এ নাকি ওর মায়ের কাছেই শিক্ষা। মা আগে করতেন, এখন বলে দেন, পরমেশ ওঁর সামনে বসে করে।

এর মধ্যেই ওদের ইতিহাস কখন যে আমার জানা হয়ে গেছে তা বোধহয় ওরা বুঝতেও পারে নি। আর বলতে আরম্ভ করলে অনেক বেশী বলা হয়ে যায়। মানুষ তার বহুদিনের রুদ্ধ বেদনা অপরকে শোনাতেই চায়—সহানুভূতিশীল শ্রোতা পেলে তো কথাই নেই। গুহামধ্যস্থ ঝরণার মুখের বড় পাথরটা সরে গেলে যখন বিপুলবেগে জল বেরোতে থাকে তখন ছোটখাটো নুড়ি পাথর ভাসিয়ে দিতে দেরি হয় না। পরমেশদের ঘরেই বেশির ভাগ; দু-এক ছুটির দিনে, রবিবার বা অন্য ছুটিতে, আমার অনুরোধে আমার বাড়িতেও এসেছে। দুপুরে খাওয়ার পর বহুক্ষণ বসে গল্প করেছে, যাবার সময় ওদের দুজনের মতো রাত্রির খাবার করিয়ে সঙ্গে দিয়েছি, তাতে কৃতজ্ঞই হয়েছে। আবেগের মুখে কোন দূরত্ব থাকে নি, আমার হাত দুটো চেপে ধরে বলেছে, 'আমার মতো অনপঢ় নৌকরের মধ্যে কি দেখলেন বাবুজী যে এত ভালবাসলেন!'

আমিও ওকে বুকে চেপে ধরেছি, বলেছি, 'কী দেখে মানুষ তা তার চোখ দিয়ে না দেখলে কি করে বুঝবে?'

ওদের ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি দুঃখের।

পরমেশ সীমান্ত প্রদেশের খানদানী ঘরের ছেলে। পাকিস্তান হয়ে যাবার পর যখন পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে নরকাগ্নি জ্বলল, তখন অ-প্রস্তুত হিন্দুরা অনেকেই বুঝতে পারে নি যে সে আগুনে এত লোক মরবে। ওদের ও এলাকায় হিন্দু খুবই কম—তবু তারা মিলেমিশে সুখেই ছিল, অহিন্দুরাও আত্মীয়ের মতোই হয়ে গিছল। সেদিনকার সে উন্মত্ততার স্রোত আচম্বিতে ওদের ওখানে ঢুকে সেই কিছু পূর্বের আত্মীয়দের এমন বিদ্বিষ্ট করে দেবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

সেই সময়কার সে উপপ্লবে পালাতে গিয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছিল তা অপরে জানতে পারে নি অনেকেই। কোন কোন পরিবারের লোকেরা বিস্তর দুঃখের পর মিলিত হয়েছে। কেউ খবর পর্যন্ত যোগাড় করতে পারে নি। সে ঘূর্ণাবর্তে এমন অবস্থা পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমান সকলেরই হয়েছে।

পরমেশের মা একাই পড়ে গিয়েছিলেন, এক মুসলমান প্রতিবেশিনী বুরখা

পরিয়ে নিজের আত্মীয়া পরিচয়ে কাশ্মীর সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেন নি। তার কোন খোঁজ পানও নি পরমেশের মা, সম্ভবত তিনি মারাই গেছেন, অথবা এমন অবস্থায় দূরে কোথাও ছিটকে পড়েছেন—যাতে স্ত্রীর ব্যাপক খোঁজ করা সম্ভব হয় নি।

স্বেচ্ছাসেবকরা ওর মাকে কিছুদিন এক ক্যাম্পে রেখেছিল, তারপর শ্রীনগরের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে দিয়ে দেয়. সে বাড়ির গৃহিণী রুগ্ন—ছেলেমেয়েদের দেখার জন্য একটি ভদ্র স্ত্রীলোক প্রয়োজন, সেই হিসেবেই দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু কার্যত দেখা গেল রোগিনীর সেবা ও সংসার নিয়ন্ত্রণের সব কাজই তাঁর ঘাড়ে পড়ল এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই গৃহস্বামীর পরিচর্যাও।

তারপর ঠিক কি হয়েছিল তা পরমেশ জানে না—কারণ এ তার জন্মের পূর্বেকার কাহিনী। স্বেচ্ছায় বা বলপ্রয়োগের ফলে ওর মা মনিবের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন তা কে জানে, তবে তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন এটা ঠিক, এবং ও বাড়িতে তেমন পুরুষ আর কেউই ছিল না।

এ তথ্য জানাজানি হতে গৃহিণীর অসুস্থতা যেন মন্ত্রবলে সেরে গেল। তিনি কুৎসিত একটা দুর্নাম দিয়ে সত্যি সত্যিই মেথরানীকে দিয়ে ঝাঁটা মারিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিলেন।

সেদিন পরমেশের মার লেকের জলে ডুবে মরা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। রক্ষা করলেন এই ভদ্রমহিলা, যাকে পরমেশ তার মা বলে আর এমন অস্খলিত ভাবে সেবা করে। তিনি সামান্য গৃহস্থ ঘরের বধূ কিন্তু কারও কোন কথায় কর্ণপাত না ক'রে হতভাগিনাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন, নির্বিঘ্নে প্রসবের ব্যবস্থা ও স্থান ক'রে দিয়েছিলেন। এঁর স্বামী গত হয়েছিলেন অল্পবয়সে। ছিলেন শ্বশুর শাশুড়ি, তাঁরা এই সুযোগে পুত্রবধূকে তাড়িয়ে দিলেন। সে ভদ্রমহিলা তাতেও আশ্রিতাকে ত্যাগ করেন নি—অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে নানা উপায়ে এই সব ব্যয় চালাতে লাগলেন।

তাঁকে সত্যকার বিপন্ন করলেন পরমেশের গর্ভধারিণী—ছেলে মাস ছয়েকের হতে লজ্জায় ঘৃণায়—লজ্জা আরও এঁকে এমন বিপদে ফেলার জন্যে—একদিন সত্যিই লেকের জলে গিয়ে ডুবলেন।

তাতে পরমেশের কোন ক্ষতি হয় নি—বরং ও বলে ভালই হয়েছে—এই মহিলা প্রাণপণ পরিশ্রম করে ওকে মানুষ করেছেন, ভদ্রঘরের ছেলের মতোই। নিজে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছেন, ইস্কুলেও দিয়েছেন। ভালভাবেই মানুষ হচ্ছিল, একেবারে স্কুলের পড়া শেষ হবার মুখে হঠাৎই এঁর এই স্ট্রোক এবং তার ফলে পক্ষাঘাত হ'ল।

পরমেশ জ্ঞান হবার পর কোন দুঃখ পায় নি, ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া কাকে বলে তা জানত না। সে যেন একেবারে পাহাড়ের ওপর থেকে অগাধ জলে পড়ল। কিছু টাকা ছিল মহিলার হাতে—সে প্রাথমিক চিকিৎসাতেই শেষ হয়ে গেল। পাড়ায় যে সব বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁরা তদ্বির ক'রে হাসপাতালে দিলেন, ফ্রি বেডের ব্যবস্থাও হ'ল। কিন্তু পরমেশ কোথায় দাঁড়ায়, কি খায়? কেউ কেউ বাড়ির কাজ দিতে চাইলেন অর্থাৎ বর্তনমলা ঘরমোছা ঝাড়ু লাগানো ইত্যাদি। কিন্তু প্রথমত ওর এই মাইজী ওকে কোন ছোট কাজ কোনদিন করতে দেন নি, খাটতেই দেন নি কোন দিন, নিজে খেটেছেন প্রচুর। এসব কাজ জানেও না, একটু সম্মানেও বাধল। এসব কাজ যদি করতেই হয়—অন্য কোথাও গিয়ে করবে। এখানে, ওর সহপাঠীদের সামনে করতে পারবে না।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত একটা কাজ মিলল। কোথাকার এক নবাব এক ফিল্ম য়্যাকট্রেসকে বিয়ে ক'রে এখানে এসেছেন—দীর্ঘায়ত হনিমুন যাপন করবেন বলে। একটা প্রাসাদের মতো বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। চাকর-বাকর অনেক আছে—কিন্তু কর্ত্রী অর্থাৎ ঐ অভিনেত্রীটি একটি নাকি 'পেজ বয়' বা ফাইফরমাশ খাটার জন্যে ছোকরা খুঁজছিলেন, তিনিই ওকে বহাল করলেন—খানা মিলবে, শোবার জায়গাও, ত্রিশ টাকা তন্‌খা।

এর পরের ইতিহাস পরমেশ বলেছিল আমার ফ্ল্যাটে বসে। আমার পাশে, কাছ ঘেঁষে বসিয়েছিলাম। ওর একটা হাত ধরা ছিল আমার হাতে —টের পেলাম বলতে বলতে ওর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। মুখের ওপর দিয়ে বার বার যেন আলতার ঢেউ বয়ে গেল, কপালের কোলে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম জমে উঠল, হাতখানাও ঘেমে উঠল দেখতে দেখতে—তবু ও বলেই গেল

সব কথা, মিথ্যা বলল না, আবরণ দেবারও চেষ্টা করল না।

নতুন কর্ত্রীর করুণার কারণ বোঝা গেল দু-তিন দিন না যেতে যেতে। নবাব সাহেব এখানের কোন কুমার বাহাদুরের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন ; দিন দুইয়ের ব্যাপার। সেই প্রথম দিনই বেলা এগারোটা নাগাদ ওকে ডেকে পাঠালেন এবং ভেতরে আসতেই দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

পরমেশের তখন পনেরো বছর বয়স—কিছু যৌন চেতনা যে না জেগেছে তা নয়, কিন্তু নরনারী মিলনের ব্যাপারটা ঠিক বুঝত না। সেই জ্ঞানই দিলেন মালেকা, এক রকম জোর করেই। পরমেশ ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করল কয়েকবার কিন্তু ক্ষিপ্রতায় তার সঙ্গে পেরে উঠল না, দরজাতেও চাবি দেওয়া। জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারত। উনি জোর ক'রে ধরে ওকে বিছানায় শুইয়ে দু হাতে চেপে রেখে বললেন—ওঁকে খুশী করলে অনেক টাকা পাবে, মার চিকিৎসা করাতে পারবে—না হ'লে উনি চেঁচিয়ে লোক ডাকবেন, উনি মিছে দোষ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। ও নির্দোষ, উনি মিছে কথা বলছেন, কেউ বিশ্বাস করবে না।

আর কোন উপায় সেদিন দেখতে পায় নি পরমেশ, আত্মসমর্পণ করা ছাড়া। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ছাড়া কিছু টাকাও পেল অবশ্য। দুদিনের জন্য উনি পুরো দুশো টাকাই দিলেন।

'সেই থেকেই বাবুজী আমার ও লাইনে এত ঘেন্না হয়ে গেছে বেগম সাহেবের এক নিজস্ব ঝি এসেছিল সঙ্গে বোম্বাই থেকে—সে অবসর সময়ে, আমার আর কাজ কি বলুন, ওরও বিশেষ কাজ ছিল না, বহু দাসী চাকর ছিল বাড়িতে—সে ঐ ফিল্ম জগতের গল্প করত। বাবুজী, তার আধাও যদি সত্যি হয় তো বলতে হবে—ওখানে রোজগার করতে গেলে ইনসানিয়াৎ বাইরে রেখে যেতে হয়। মানুষগুলো পয়সায় পাগল হয়ে ওঠে—নেশায় মনুষ্যত্ব হারায়। সরাবের নেশা, ভোগের নেশা। ঝিটা বলেছিল আমায়—ভারী চমৎকার একটা কথা—ওখানে কে কার মদের গেলাসে চুমুক দেয়, কে কার মেয়ে-ছেলেকে চুমু খায়—তা খেয়াল থাকে না।'

প্রথম একবার মনে হয়েছিল ঐ নোট দুটো ওঁর সামনেই জ্বালিয়ে দেয় কিন্তু মার কথা ভেবেই পারে নি। তারপরই—ও মাকে নিয়ে দিল্লী চলে

আসে। অবশ্য ঐ দুশো টাকাতেই হয় নি—মা যাঁদের হয়ে কাজ করতেন, তাঁরাও কিছু কিছু দিয়েছিলেন, সেই টাকাতেই ও মাকে নিয়ে দিল্লী আসে। প্রথমে একটা ঝুগ্‌গিতে উঠেছিল। পাগলের মতো ঘুরেছে রোজগারের আশায়; গাড়ি ধোওয়া, বাসের ক্লীনারের কাজ, বাড়ির কাজ, মোট বওয়া সব কিছুই করতে প্রস্তুত ছিল সে, কিন্তু ওকে যেন কেউ এসব ছোট কাজ দিতে সাহসই করত না, ওর চেহারা দেখেই পিছিয়ে যেত। বাড়ির কাজ করতে গেছে—গৃহিণীরা সাফ বলে দিয়েছেন, 'আমাদের বাড়ি ঝি বৌ আছে, তোমাকে রাখতে পারব না।'

'বাবুজী সে চার-পাঁচটা বছর যে কি করে কেটেছে এখনও মনে হলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সে যেন একটা একটানা দুঃস্বপ্ন! কী ক'রে যে মাকে বাঁচিয়ে রেখেছি সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!'

এত কষ্টের জন্যেই—প্রায় তপস্যার মতো ক'রে—এক রকম জীবন দিয়ে জীবনদায়িনী এই মহিলাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল বলেই বোধহয়, এই কাজটা পেয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। এক ভদ্রলোক সব শুনে, ওর দুর্দশা দেখে এই চাকরি ক'রে দিয়েছেন।

আর ওর কোন দুঃখ নেই। মাকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পেরেছে এতেই সে সুখী। অন্য সুখ, বিশেষ যা অর্থমূল্যে কেনা যায়, বিলাসদ্রব্য, তাতে ওর রুচি নেই।

এর পর বহুদিন আর দিল্লী আসতে পারি নি। নানা ঝঞ্ঝাটে দিন কেটেছে—এদিক ওদিক ভ্রমণেও গিয়েছি, দিল্লী আসার কোন কারণ ঘটে নি তার মধ্যে।

এলাম একেবারে বছর তিনেক পরে।

এই দীর্ঘ সময়েও পরমেশ আমার মন থেকে মুছে যায় নি। দিল্লী আসার পথে সমস্ত সময়টাই ওর কথা ভাবতে ভাবতে এসেছি। ওকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম কিছুদিন আগে, কোন উত্তর পাই নি। কেমন আছে, ওর মা-ই বা কেমন—বিয়ে থা করল কিনা—সহস্র প্রশ্ন মনে। তাই পৌঁছবার পরের দিনই মেহরৌলী রওনা দিলুম।

কিন্তু ওর ঘরে গিয়ে দেখি সেখানে অন্য একটি পাঞ্জাবী পরিবার বাস করছে, পরমেশের চিহ্নও নেই কোথাও। যারা আছে তারা কিছু বলতে পারল না। খবর পাওয়া গেল বাড়িওলার কাছে।

বছর খানেক আগে এক ফিল্ম কোম্পানীর লোক ওকে ব্যাঙ্কে দেখে। ও তখন কনট সার্কাস ব্রাঞ্চে কাজ করছে। বিস্তর বড়লোকের আনাগোনা। যিনি দেখে পছন্দ করেন, তিনি খুব বড় ডিরেকটর—'নামী পিকচার উঠানেওয়ালা'। তিনি এসে ওকে ধরপাকড় করলেন। গোড়ায় পরমেশ রাজী হয় নি, শেষে তাঁরা চরম লোভ দেখালেন। ওর মাকে তাঁরা বড় নাম-করা হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাবেন, খুব বড় বড় ডাক্তার আছেন সেখানে—নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন। না হয় তো 'বিলায়ৎ' পাঠাতেও প্রস্তুত তাঁরা, খরচ সব তাঁদের।

এই লোভ আর সামলাতে পারে নি পরমেশ, সে রাজী হয়ে গেছে। ওঁরা ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে একজন নৌকরও—চেয়ারে ক'রে তোলা নামানোর ব্যবস্থা। কিন্তু এত সুখ ভদ্রমহিলার সইবে কেন? সেই ট্রেনই দুর্ঘটনায় পড়ল। ওর মা মারাই গিছলেন, পরমেশও সাংঘাতিক আহত হয়েছিল। ওঁরাই ব্যবস্থা ক'রে বড় হাসপাতালে দিয়েছিলেন। সেরেও উঠেছিল বেশ, শুধু কপালে একটা বড় দাগ—তা ওঁরা অভয় দিয়ে বলেছিলেন 'পিলাস্‌টিক' সার্জারীতে ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু হঠাৎই সেই হাসপাতাল থেকে সে একদিন উধাও হয়ে গেল—আর তাকে কেউ খুঁজে পেল না। সে কোম্পানীর লোক এখানেও খোঁজ করতে এসেছিল—তা ওঁরা কিছু বলতে পারেন নি। এখানে আসে নি সে।

বুঝলাম সে মার জন্যই টাকার ফাঁদে পা দিয়েছিল, আর তার টাকার প্রয়োজন রইল না। মিছিমিছি যে জীবন তার একান্ত অরুচিকর তার মধ্যে যাবে কেন!

কিন্তু গেল কোথায়? সাধু হয়ে গেল নাকি?

উত্তর পেলাম আরও বছর দুই বাদে।

বাসে আসছিলাম বদরীনারায়ণ থেকে। রুদ্রপ্রয়াগের কাছাকাছি এসে

এক জায়গায় বাস বিগড়ে গেল। শুনলাম এখান থেকে লোক গিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কী একটা যন্ত্রাংশ কিনে না আনলে বাস চলবে না…অন্তত ঘণ্টা তিনেক তো লাগবেই। অন্য বাস আসছে, তবে তা সবই ভর্তি… অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়া সম্ভব নয়।

সৌভাগ্যক্রমে জায়গাটার কাছেই একটু গ্রামের মতো ছিল এবং এখনকার জনপদের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে একটি খাবার-কাম-চায়ের দোকানও। কিছু গাঁটিয়া, হালকা কুঁচো নিমকি ও বোঁদের লাড্ডু। সবই তিন-চারদিনের বাসি —তা দোকানদার বলেই দিল। তবে 'ভূখ না মানে ঝুটা ভাত' সেই আর্য-বাক্য অনুসারেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। আমার সঙ্গে কিছু খাবার ছিল—যোশীমঠ থেকে সংগ্রহ করেছি সুতরাং আমি আর ওর মধ্যে গেলুম না। একটু অন্য দিকে হাঁটতে লাগলুম। রাস্তার নিচের দিকটা জঙ্গলমতো, কিন্তু ওপর দিকে থাকে থাকে চাষের জমি উঠে গেছে।

সেই দিকে চেয়েই অন্যমনস্ক ভাবে পথ হাঁটছি—হঠাৎ চোখে পড়ল যে অল্প দু-চারজন কাজ করছে তাদেরই একজনের দিকে।

এখান থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে না…পিছন ফিরে কাজ করছে কিন্তু পিঠের গঠনটা মনে হল চেনা চেনা। এমন সুগঠিত দেহ—কাঁধের দিক চওড়া, কোমরের কাছটা সরু, আমি মাত্র একজনেরই দেখেছি।

কি করছি ভাবার আগেই মুখ দিয়ে ডাকটা বেরিয়ে গেল, 'পরমেশ!'

চেপে-ধরা বেত ছেড়ে দিলে যেমন ছিটকে সোজা হয়ে ওঠে—সেই ভাবেই সে সোজা হয়ে এ দিকে ফিরল এবং চিনতেও পারল।

তার সেই আগের মতোই মিষ্টি হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, 'বাবুজী!'

লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এল সে এবার। কাছে এসে আবারও প্রশ্ন করল, 'বাবুজী, আপ হিঁয়া—!'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েই ছিলাম ওর দিকে, নীরবে বাসটা দেখিয়ে দিলাম শুধু।

চেহারা তেমনিই আছে, শুধু সে জ্বলন্ত দীপ্তিটা নেই। কপালে একটা গভীর কাটা দাগ বাঁ দিকের চোখের পাশ পর্যন্ত নেমে এসেছে। পাহাড়ের

রুক্ষ হাওয়া, প্রখর রৌদ্র এবং প্রচণ্ড শীতে অমন দুধে আলতা রঙে কে যেন একটা তামাটে ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। তবু এখনও যথেষ্ট সুশ্রী।

বললাম, 'তুমি এখানে এই ভাবে ঘাপ্‌টি মেরে আছ! আমি তোমার ও বাসায় গিছলুম। শুনলাম দুর্ঘটনার কথা। তা হাসপাতাল থেকে পালালে কেন? ওখানে না-ই যেতে, চাকরিটা ছাড়লে কেন? তোমার পাওনা-গণ্ডাও কিছু ছিল, তাও নাও নি। তারা 'ডেড' বলে লিখে দিয়েছে!'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল পরমেশ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ওঁরা আমার জন্যে অনেক খরচা করেছেন। ওঁদের আশা আমার এই কাটা দাগটা কি প্লাষ্টিক সার্জারী ক'রে মিলিয়ে নেবেন, তারপর ছবিতে নামাবেন। আপনি তো জানেন বাবুজী···ও জীবন আমার ভাল লাগে না। ও মানুষগুলোর সঙ্গে বনবে না। যাচ্ছিলাম মার জন্যেই···তা তিনিই যখন মুক্তি দিয়ে গেলেন, তখন আর কেন ওদিকে যাই। একটা পেট, দুখানা রুটি মিলেই যাবে!'

'তা চাকরি করতে দোষ কি ছিল?'

'না, সে ওরা খোঁজ করবেন জানতুম, খবর নিয়েছেনও। তা ছাড়া ঐসব মানুষের সঙ্গও ভাল লাগছিল না। অত টাকা তন্‌খাতেই বা কি হবে আমার তখন—মা-ই যখন নেই।'

'তা তুমি কি সন্ন্যাস নিতে চাও? সে তো একরকম ভাল, বিশেষ যদি কোন আখড়ায় ভিড়ে যেতে পারো—। অসুখ-বিসুখ তো আছে, তখন ওরা দেখত।'

'সে আমি ভেবেছি বাবুজী। তবে ঈশ্বরের জন্যে তেমন আকুলতা না জাগলে যেতে চাই না। ভ্রষ্ট্ সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছে নেই।'

তারপর আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'হয়ত যেতেই হবে, মেয়ে-গুলো বড় জ্বালাতন করে—কাটা দাগেও আমার নিষ্কৃতি নেই, ছাই মেখে জটা রাখলে যদি অব্যাহতি পাই। লেকিন বাবুজী আমার এ পাত্তা কাউকে দেবেন না মেহেরবানি করে!' বলে দু হাত জোড় করল সে।

বর্ধমানে এক রাত্রি

সে উনিশশো ত্রিশ কি একত্রিশ সাল হবে, আজ আর ঠিক মনে নেই। আমি তখন (স্বর্গত) বুক কোম্পানীর হয়ে ইস্কুল-বই ক্যানভাস ক'রে বেড়াই। মালিকরা অবশ্য বর্ধমান শহরেরই লোক, বাড়িও তাঁদের খালি পড়ে থাকত—গিরীনবাবু বলেও ছিলেন সেখানে গিয়ে উঠতে—সে প্রস্তাব আমার পছন্দ হয় নি। বড় বাড়ি খালি পড়ে আছে, সরকার আর চাকরের রাজত্ব—তার জন্যে অত দূরে থাকব কেন। তাছাড়া ওঁরা যখন খরচ-খরচা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৃপণ নন—তখন অত কষ্ট ক'রে থাকব কেন?

সুতরাং উঠেছিলাম ডাক-বাংলোয়। সেও অবশ্য খুব সুখপ্রদ নয়। স্টেশন থেকে নেমে শহরের উল্‌টো দিকে যেতে হয়, খেতে আসতে হয় রাণী-গঞ্জ বাজারে—আগেকার আমলের মোটা দেওয়ালের বাড়ি, ভ্যাপসা গন্ধ, তবু একা থাকায় একটা শান্তি আছে। হোটেলের থেকে অনেক ভাল। নিজস্ব বাথরুম। তাছাড়া, বসবাসযোগ্য হোটেল পরে কিছু হয়েছে, তখন বিশেষ ছিল না।

বিকেলে এসে পৌছে মুখ হাত ধুয়ে একটা বই পড়ছি—এবার উঠে খেতে যাবো, হঠাৎ মনে হ'ল কানে একটা পরিচিত স্বর এসে পৌছল। দুটো ঘরের মধ্যে যদিও একটা নিরেট দেওয়াল—তবু খড়ের চাল বলে কথা কানে যেতে অসুবিধে নেই, আর যাঁর গলা কানে গেল—জোরালো কণ্ঠ, স্বরের ওপরই তাঁর জীবিকা—মাঠে বহু লোককে প্রত্যহ বক্তৃতা শোনাতে হয়, সেইটেই তাঁর পেশা। সে সময়ে মাইক্রোফোনের চল ছিল না। 'অ-মাইক' গলা ছাড়া বক্তৃতা সম্ভব হ'ত না।

আজ যাঁদের সত্তর-আশি বয়েস—এমনকি ষাট-পঁয়ষট্টিও—তাঁদের অনেকেই নগেনবাবুর বক্তৃতা শুনেছেন। তিনি ঐটে পেশা করবেন বলেই প্রথম বয়সে স্টেশনে, পার্কে দাঁড়িয়ে বিনা শ্রোতায় বক্তৃতা শুরু করতেন, পরে শ্রোতা এসে জুটত। তখন ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করতেন, এখন রাজনীতিক বক্তৃতা করেন। গলা, বাচনভঙ্গী, সুষ্ঠু সময়োপযোগী উদ্ধৃতির (কোটেশান)

শক্তি দেখে ইংরেজ সরকার ডেকে চাকরি দিয়েছেন—স্বদেশীওলাদের ভাঁওতায় না ভুলে বাঙালী জনগণ যাতে বর্তমান ভারত সরকারের প্রতি অনুরক্ত ও অনুগত হয় এই আশায়। অর্থাৎ কংগ্রেসকে কষে গালাগালি দিতে হবে এবং ইংরেজ সরকারের গুণগান। কাজটা খুব সহজসাধ্য ছিল না তখন—বলাই বাহুল্য।

কালো লম্বা মানুষটি, মুখে মায়ের-অনুগ্রহ চিহ্ন কিন্তু গলা—বাজখাঁই বললে তার অপমান করা হয়—উদাত্তমধুর বলাই উচিত। যত্ন করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও চৈতন্যচরিতামৃতর বহু স্থান মুখস্থ করেছেন, সেই সঙ্গে কারলাইলের ও এমার্সনের কিছু কিছু রচনাংশ—সুতরাং উদ্ধৃতির জন্যে হাতড়াতে হ'ত না।

একটু ভাল করে শুনতেই বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল। সঙ্গীদের তিরস্কার করছেন, ভোজনের ব্যাপারেই। সরকার ওঁর সঙ্গে একটি তল্পীবাহক ও একটি পাচক দিয়েছেন—অর্থাৎ সরকার খরচা দেন। তল্পীবাহকটি পিওন নামে আখ্যাত। তার কাছে হ্যাজাগ আলো থাকে, একটা হার্মোনিয়াম, ফরাস পাতার সরঞ্জাম এবং নগেনদার ব্যক্তিগত মালপত্রও দুজনেই বয়ে নিয়ে যায়—লোক পেলে তাও ভাড়া করে।

আমার একটু কৌতুক বোধ হ'ল। পাড়ার লোক, এতদূরে এসে পাশাপাশি ঘরে উঠেছি, কেউই কারও খবর জানি না।

জামাটামা পরে বেরিয়ে ঘুরে (আমি ছিলাম পিছনের ঘরে, উনি সামনে) এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, 'কে, নগেনদা নাকি !'

সেই উচ্চ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন এল, 'কে !' তারপরই বোধ করি ওর ইঙ্গিতেই পিওন কেষ্ট দোর খুলে দিল। ভেতরে ঢুকতে বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি ! কোথা থেকে ! এখানে ? এসো এসো, বসো।'

সংক্ষেপে আমার এখানে আসার কারণ বিবৃত ক'রে জানালুম এখন আর বসা চলবে না, ওপারে হোটেলে খেতে যেতে হবে।

'আরে রামোঃ ! রামোঃ ! আমি এখানে থাকতে তুমি হোটেলে খেতে যাবে কি। আমার সঙ্গে দুটো লোক রয়েছে কি করতে। ঐ তো দেখছ স্টোভ জ্বলে গেছে। এক কাপ চা খাও, তারপর জমিয়ে বসো। তোফা

কপির ডালনা লুচি হচ্ছে—এ ফেলে কোথায় সেই কোন্ নরককুণ্ডুতে পচা মাছ আর লঙ্কাবাটা খেতে যাবে। বসো, বসো। ঐ বিছানাটায় বেশ বাবু হয়ে বসো। সিগারেট খাওয়ার অব্যেস থাকে তাও খেতে পার, লজ্জার কোন কারণ নেই। আমার সঙ্গে তামাকের সরঞ্জাম আছে, আমি চায়ের পর হুঁকো ধরাবো।'

অগত্যা বসে গেলুম। সত্যি কথা বলতে কি, আমারও এই ঠাণ্ডায় অতদূরে হেঁটে ওভারব্রিজ পেরিয়ে খেতে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বিশেষ এখানে অসময়ের কপি (তখন বারো মাস কপি পাওয়া যেত না) আর ঘিয়ে ভাজা লুচি—এ ফেলে যাবই বা কেন।

বসে একথা সেকথার পর হঠাৎই বলে ফেললুম, 'আচ্ছা, এই যে আপনি কংগ্রেসীদের গাল দিয়ে ইংরেজের জয়গান ক'রে বেড়ান—আপনার আত্মগ্লানি হয় না? না, পেট চালানোর জন্যে তো করতেই হবে—সে কথা বলছি না, তবে দেহটা তারা ভাড়া ক'রে রেখেছে, মনটা তো আপনার নিজের!'

তিনি ডাকবাংলোর ভারী বড় ইজিচেয়ারে পা তুলে বেশ আরাম ক'রে বসেছিলেন। হঠাৎ গড়গড়ার নল মুখ থেকে নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মোটেই না। একটুও আত্মগ্লানি হয় না। আমি মনেপ্রাণে চাই—ইংরেজ আরও কিছুদিন থাকুক। ছ্যাখো বহুদিনের পাপ জমেছে, জগদ্দল শিলার মতো চেপে বসেছে জাতের মাথায়। কাশীতে সারনাথ গিয়েছ? সেখানে শুধু ধুলোমাটি পড়ে পড়ে মৌর্য, গুপ্ত সভ্যতা কোন্ অতলে চাপা পড়ে গিছল। এ তো পর্বতপ্রমাণ পাপ। আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস তো চোখের সামনে, বুদ্ধর আমল থেকে ছ্যাখো, জ্ঞাতি-বিরোধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোভ আর ইতরতা, নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহ। এই তো জয়চাঁদ অনঙ্গ পাল থেকে শুরু ক'রে রাণা সংগ্রাম সিংহ পর্যন্ত এক ইতিহাস, নিজেরা না পেরে উঠে বিদেশী বিধর্মীকে ডেকেছে। গ্রীক হুণ শক সকলের সঙ্গেই কিছু লোক নগদ লাভের আশায় মিতালি করেছে।'

তারপর নিভে যাওয়া ফুরসীতে আর একটা টান দিয়ে নলটা ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'নিয়ত মারামারি কাটাকাটি আত্মকলহ এ তো মহাভারতের আমল থেকেই চলে আসছে—হয়ত আগেও ছিল। নিজে ধনী হবো, শক্তিমান

হবো।—এই একমাত্র চিন্তা। ইংরেজ যখন আসে তখন দেশের কি অবস্থা ছিল ইতিহাস পড়ে দেখেছ। অসংখ্য রাজা শুধু পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে আর একটু জমির জন্যে, নয়ত মেয়েমানুষের জন্যে। কংগ্রেস! বলি এই জাতীয়তা বোধটা আমাদের দিল কে? এই ইংরেজ না? বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, রবি ঠাকুর থেকে শুরু ক'রে গান্ধী, দেশবন্ধু এ সবাই ইংরেজী শিক্ষা, তাদের চিন্তাধারার ফল। ইংরেজের শিক্ষা চালু না হলে এরা জন্মাত না। আমি তো মনে করি আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বিদ্যাসাগর, আর তিনি কি স্বভাবে, কর্মশক্তিতে, চিন্তায়, স্বাধীনতায় আত্মসম্মানবোধে—আস্ত ইংরেজ নন?'

আবার একটু থেমে বললেন, 'আমি তাই বলে চিরকাল ইংরেজের অধীন থাকতে চাই না। স্বাধীনতা চাই বৈকি। তবে আমি চাই…আর একটু আমাদের চরিত্রের ভিতটা পাকা হোক। এত তাড়াতাড়ি স্বাধীন হ'লে আবারও সেই নিজেদের কদর্য স্বভাব বেরিয়ে পড়বে। লোভ লালসা স্বার্থপরতা, অসাধুতায় দেশ ভরে যাবে, স্বাধীনতাও ডুববে সেই পাঁকে। স্বাধীন দেশে যদি আমরা স্বেচ্ছায় কটা জবরদস্ত ইংরেজ এনে বসাতে পারি …যারা আমাদের সম্পদ লুটে নিয়ে যেতে পারবে না কিন্তু আয়রণ হ্যাণ্ডে দেশশাসন করবে…তাহলে আমি আজ এই মুহূর্তে স্বাধীনতা চাইব। আসলে কি জানিস…এত হাজার বছরের চরিত্রের ছাঁচ কি গান্ধী এই ক'দিনে পাল্‌টাতে পারেন? পারেন না। সম্ভব নয়।'

এই পর্যন্ত বলে থামলেন নগেনদা। হাঁক ডাক ক'রে আর এক কল্‌কে তামাক সাজতে বললেন তেওয়ারীকে। তারপর গলাটা নামিয়ে বললেন, 'তা তুই একা আছিস। একাই থাকতে পারবি তো? না কাউকে চাই?'

কথাটা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে মুচকি হেসে চোখ টিপে বললেন, 'মানে রাত কাটাবার যন্তর? ও অব্যেস আছে? চৌকীদার বলেছে, যত খুশি যোগাতে পারবে…আট আনা পয়সা দিলেই হবে। দু-তিন ঘণ্টা, চাই কি সারারাত থাকতে পারে।…আমার অত চক্ষুলজ্জা নেই, বে করি নি জানিস তো, খেতেই পেতুম না, বে করব কি! মধ্যে মধ্যে ও শখটা দেখা দেয়। তোর যদি দরকার থাকে তো বল্, লজ্জা করিস নি। অবিশ্যি

প্রিকশ্যান নিতে হবে। এরা সব এক একটি কুচ্ছিৎ রোগের ডিপো। তা সে ব্যবস্থাও আছে আমার সঙ্গে। বাড়তিও আছে।'

বুঝুন ব্যাপার। তখন আমার উনিশ বছর বয়স। অন্ন চিন্তা চমৎকারা। সাহিত্য করব, সাহিত্যিক হবো এই স্বপ্ন দেখছি। এসব কখনও ভাবিও নি। কথাটা বুঝতেই আমার বেশ সময় লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যে রাঙা হয়ে উঠলুম তা কান মাথা গরম হওয়াতেই বোঝা গেল।

নগেনবাবুও বুঝলেন আমার মুখ দেখেই। বললেন, 'অ, ও ঝোঁক নেই? ভাল, ভাল। না থাকাই ভাল।'

এর মধ্যে তেওয়ারী এসে জানাল, খানা তৈয়ার, এখনই কি চৌকা লাগবে?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর কি, সাড়ে ন'টা তো বাজে। এই টেবিলেই দাও ছু'জনকে।'

তারপর আমাকে বললেন, 'কি, তুমি মুখ হাত ধোবে নাকি? বাথরুমে ভাল জল আছে, যেতে পারো। আমিও একটু ঠাকুর পেন্নামটা সেরে নিই। ......হ্যাঁ হ্যাঁ, হেসো না। বামুনের ছেলে, ঠাকুর দেবতা মানব না? তবে আমার ঠাকুর ছুই ইংরেজ!' বলে হেসে উঠলেন খুব জোরে। ওঁর কথার অর্থে বিস্মিত কি ক্রুদ্ধ হবো সে অবস্থা ছিল না। আমি তখন ওঁর সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। সেই জন্যেই আরও বাথরুমে ঢুকে গেলুম। নইলে হাত মুখ ধোবার কোন দরকার ছিল না, আমি তো তৈরী হয়েই বেরিয়ে ছিলুম নিজের ঘর থেকে, তাও যতটা সম্ভব দেরি করেই বেরোলুম। পায়ে কেড্‌স্ জুতো, শব্দ হয় নি, হ'লেও উনি টের পেতেন না।

বেরিয়ে এসে কিন্তু সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হল। যে দৃশ্য চোখে পড়ল তার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না, কল্পনাও করতে পারতুম না, কুড়ি বছর ধরে ভাবলেও।

আগে নজরে পড়ে নি। ওদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের চেয়ারে একটু পুজোর বেদীর মতো করা হয়েছে। তাতে ছুটি ফ্রেমে বাঁধা ছবি··· বিদ্যাসাগর আর মহাত্মা গান্ধীর। ছুটিরই গলায় ফুলের মালা। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নগেনদা। তাঁর ছুই চোখের প্রান্ত বেয়ে জলের ধারা নেমে

দুই গণ্ড প্লাবিত করছে। অস্ফুট কণ্ঠে বার বার শুধু বলছেন, 'আমাদের মানুষ করো, আমাদের মানুষ করো।'

বধূ-বরণ

অকস্মাৎ নিচের তলা হইতে তুমুল ঝগড়ার আওয়াজটা আসিতে ইন্দিরা যেন বাঁচিয়া গেল। সকলেই দুড়-দুড় করিয়া নিচে নামিয়া যাইতে সে এতক্ষণে একটু একা থাকিতে পারিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

বাড়িতে পা দিবার সময়ই সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছিলেন, তবু তখন গুরুজনরা দলে ভারী ছিলেন বলিয়া ছোটরা ঘেঁষিতে পারে নাই। তাঁহাদের দৃষ্টির পরীক্ষাটাই চলিয়াছিল বেশি, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে মৃদু মন্তব্য; কিন্তু কড়ি খেলা প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট-ছোট দেওর-ননদ ভাগ্নে-ভাগ্নী ভাসুরঝি প্রভৃতির দল সেই যে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, এখনও পর্যন্ত একটু নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ দেয় নাই। তাহাদের প্রশ্ন চলিয়াছে অবিরাম, তাহার অধিকাংশই হয়ত ছেলেমানুষী কিন্তু তবু তাহার সবগুলির উত্তর দিতে গেলে বিব্রত হইতে হয়।

ইন্দিরা উঠিয়া গিয়া বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইল। কী বিশ্রী অবস্থাই হইয়াছে তাহার! ভারী বেনারসী কাপড়টা এখনও ছাড়া হয় নাই; একে গরম তায় এত লোকের ভীড় তাহার উপর এই কাপড়, ফলে অনবরত ঘামিয়া তাহার সমস্ত দেহ যেন ফ্যাকাশে হইয়া চুপ্‌সাইয়া গিয়াছে। ভিতরের সাদা ব্লাউজটা তো ভিজিয়াছেই, উপরের সিল্কের জামাটা পর্যন্ত সপ্‌সপে হইয়া উঠিয়াছে। কপালের চন্দন চিহ্ন অধিকাংশই ধুইয়া গিয়াছে, অযত্নরচিত কবরী হইতে অনেকগুলি চুল, মাথায় কাপড় দেওয়ার অনভ্যাসজনিত টানাটানিতে নামিয়া আসিয়া কপালময় জড়াইয়া রহিয়াছে। তা ছাড়া আসিবার সময় ঠাকু'মা সিঁথিতে খানিকটা সিঁদুর লাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারও অনেকখানি ঘামের সঙ্গে মিশিয়া তাহার শুভ্র কপালকে আপনা-আপনিই রক্তিম করিয়া তুলিয়াছে। আগের দিন রাত্রি-জাগরণ ও দুশ্চিন্তার ফলে চোখের কোলে গভীর কালিমা—এক কথায়, তাহার উপর দিয়া যেন

একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে!

কিন্তু তবুও, কপালের উপর হইতে ভিজা চুলগুলি একটা আঙুলে করিয়া সরাইতে সরাইতে ইন্দিরা ভাবিল, তাহাকে খুব খারাপ দেখাইতেছে না তো! বাপের বাড়িতে চিরকাল সে শুনিয়া আসিয়াছে যে তাহার স্ত্রী-জনোচিত কমনীয়তার নাকি একান্ত অভাব, তাই তাহার রূপ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে পছন্দ করা কঠিন। 'গেছোমেয়ে' 'মদ্দাটে' 'ঘোড়ায়চড়া মেয়েমানুষ' এইসব তাহার চিরকালের আখ্যা। সুতরাং তাহার আশঙ্কা ছিল যে বধূবেশে হয়ত তাহাকে খুবই বেমানান দেখাইবে, কিন্তু হঠাৎ আজ সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবিষ্কার করিল যে তাহাকে বধূ সাজিয়া অন্যান্য নব-অনুরাগিনী বধূদের মতোই দেখাইতেছে—এবং সুন্দর দেখাইতেছে। কখন—আর কী করিয়া ইহা যে সম্ভব হইল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না, শুধু আবেশ-মুগ্ধ-নেত্রে নিজের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার মনে পড়িল স্বামী ললিতের কথা। লোকটি শুভদৃষ্টির সময় কিছুতেই ভাল করিয়া মুখ তুলিতেছিল না, অথচ একবার চোখোচোখি হইবার পর হইতে কত বার কত ছলেই না তাহার দিকে চাহিতেছিল। বাসর ঘরে আত্মীয়াদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া কেবলই যে তাহার গোলমাল হইতেছিল, তাহার কারণটাও ইন্দিরা জানে, ললিতের মনটা ছিল নতমুখী নববধূর দিকেই। ইন্দিরা ইচ্ছা করিয়াই ললিতের দিকে অবগুণ্ঠনটা টানিয়া দিতেছিল আর তাহার জন্য বেচারার চোখে কী করুণ মিনতি।···ইন্দিরা আপন মনেই হাসিয়া উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে সুখে ও লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখে কে যেন খানিকটা আবির ছড়াইয়া দিল।

অকস্মাৎ আয়নায় আর একখানা মুখ তাহারই পাশে প্রতিফলিত হইল।

এ তাহার দেবর, ললিতের ঠিক পরেই যে ভাই, অসিত, একবার দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আয়নাতে ইন্দিরার সহিত চোখোচোখি হইতেই লজ্জা পাইয়া সরিয়া গেল। ইন্দিরাও ত্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিল। ছিঃ ছিঃ, না জানি অসিত কি ভাবিল।

একটু পরেই তাহার কানে গেল অসিত চাপা গলায় বলিতেছে, 'আচ্ছা কি তোমাদের আক্কেল মা! এতক্ষণ এসেছে একটা মানুষ, এখনও সেই

বেনারসী জড়িয়ে বসে রয়েছে—কাপড়টাও ছাড়াতে পারোনি। মুখ-হাত ধোওয়াবে, জল খাওয়াবে—এসব কথাও কি এখনও মনে করিয়ে দিতে হবে ?'

তাহার শাশুড়ী জবাব দিলেন, 'মনে করিয়ে দিতে হবে কেন বাছা, সব মনে আছে। কী করব, একলা মানুষ, যে দিকটিতে না যাবো সে দিকেই গোলযোগ বেধে বসে থাকবে। ওলো ও সরি, বিন্দী, তোদের কি একটু বিবেচনা নেই ? এই খেটে খেটে মুখ দিয়ে রক্ত তুলছি, এর মধ্যে কি আমাকেই আবার গিয়ে বৌয়ের কাপড় ছাড়বার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে ? তোরা কি একটা কাজও পারিস না ? আর বড় বৌমাও তো রয়েছে, কাকে বলব বলো, সব হয়েছে সমান !'

তিনি আরও কিছুক্ষণ বকিয়া চলিলেন। ইতিমধ্যে সরি-বিন্দী অর্থাৎ তাঁহার দুই যমজ কন্যা হৈ হৈ করিয়া উঠিল, 'এরই মধ্যে অমনি নতুন বোয়ের কথা টুকুস্ ক'রে কে লাগালে মায়ের কাছে, ছোড়দা বুঝি ? বাব্‌বা, বাড়ি না ঢুকতে ঢুকতেই এই।···বড় বৌদি এসেছিল তবু একটু ময়লা, তাই এখনও বাপের বাড়িতে ঠাঁই হচ্ছে, এবার সুন্দরী বৌ এসেছে, দেখছি এখানকার মায়া কাটাতে হবে !'

অসিত কী বলিল বোঝা গেল না। কিন্তু সরমা, বিনোদিনী ও বড়বৌ এবং তাহাদের সঙ্গে একপাল ছেলে মেয়ে, আবার আসিয়া পড়িল।

সরমা কহিল, 'চল গো বৌদি ও ঘরে, ঐখানেই কাপড়টাপড় ছাড়বে। কলঘরও ঐ পাশে, মুখ হাত ধোও তো চলো।'

বড়বৌ এখনও বধূ, সে ঘোমটার মধ্য হইতেই ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, 'বিন্দী ঠাকুরঝি, ওর তোরঙ্গটা দেখেছ, কী কাপড়চোপড় আছে ?'

বিন্দী ঘাড় নাড়িয়া চুপি চুপি জবাব দিল, 'দেখেছি ভাই। ঐ অম্‌নি খানকতক ক'রে সব রকম দিয়েছে। তোমার সঙ্গে যা কাপড় এসেছিল তার অর্ধেকও নেই।'

বড়বৌ তেমনি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, 'তা হোক ভাই, তাতে তো দোষ হবে না, এবারে যে সুন্দর বৌ এসেছে—'

ইন্দিরার ঘাড় আরও নিচু হইয়া গেল। সরমা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া তাড়া লাগাইয়া কহিল, 'বিন্দী কী দাঁড়িয়ে আছিস সঙের মতো, যা না, তোরঙ্গ

খুলে একটা দিশী কাপড় বার ক'রে নিয়ে আয় না—'

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিন্দী বলিল, 'যাচ্ছি, যাচ্ছি—বলি সাবান-টাবান চাই তো!'

সরমা জবাব দিল, 'ওসব কিচ্ছু দরকার নেই, কলঘরে এইমাত্র আমার নতুন সাবান রেখে এসেছি। চল গো বৌদি—'

সামান্য কিছু প্রসাধনের পর ইন্দিরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। ইহার পর একথালা খাবার আসিয়া পৌঁছিল। জল খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি। যাহারা অনুরোধ করিতেছে তাহারা সকলেই বিবাহিতা—সবাই জানে যে এ অবস্থায় খাওয়া যায় না—তবু পীড়াপীড়ির অন্ত নাই।

যে ঘরটাতে ইন্দিরা বসিয়াছিল সেটা নাকি ললিতেরই ঘর, অর্থাৎ এখন হইতে তাহারও। ইহারই এক ফাঁকে ললিত একবার ব্যস্ত ভাবে ঢুকিল, অকারণে দেরাজটার দু-তিনটা টানা খুলিয়া কী নাড়াচাড়া করিল, আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। বড়বৌ আর বিন্দী তখন চুপি চুপি আপোসে আলাপ করিতেছিল; কিন্তু সরমা মুখ টিপিয়া হাসিল, আর ইন্দিরা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, কী লোকটার আক্কেল! বুদ্ধি বিবেচনা যদি একটুও আছে, দেরাজ হইতে কিছু একটা বাহির করিয়া লইয়া গেলেও তো চলিত!

ইতিমধ্যে নীচে আরও বহু লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আত্মীয়া কুটুম্বিনীর দল একে একে আসিতেছেন। বিন্দী কহিল, 'মুঙ্গেরের পিসীমা এলেন বোধ হয়—ওলো সরি, শোন্, আমাদের মোহিনীদির গলা পাচ্ছি না? চল্—দেখে আসি—'

ফলে সবাই নীচে নামিয়া গেল। ইন্দিরা আবারও একা, সে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিছানাতে গা এলাইয়া দিল। সমস্ত শরীর তখন ক্লান্তিতে ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, আর যেন বসিয়া থাকা যায় না। কিন্তু একটু পরেই লক্ষ্য করিল দ্বারপ্রান্তে অস্পষ্ট একটা ছায়া, কে যেন আড়াল হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। একটু ঘাড় ফিরাইতেই দেখিল বছর চৌদ্দ-পনোরোর একটি ছেলে, ললিতের সহিত মুখের এতই সাদৃশ্য যে চিনিতে ভুল হয় না—এ-ও তাহার একটি দেবর।

সহসা চোখোচোখি হইতেই দারুণ লজ্জা পাইয়া জিতু পলাইতেছিল কিন্তু

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চুপি চুপি ডাকিল, 'এসো না ভাই ঠাকুরপো—'

জিতু অপ্রতিভ-ভাবে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল। ইন্দিরা তাহার হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া কহিল, 'অমন চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলে যে, আমি বুঝি তোমার পর?'

ইন্দিরার ঠিক পরের যে ভাইটি, তাহার এমনিই বয়স, তাহার কথাই ইন্দিরার মনে পড়িয়া গেল।

জিতু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, 'না তা নয়। ভাবলুম আপনার শরীর খারাপ, শুয়েছেন, মিছিমিছি ঘরে ঢুকলেই আবার হয়ত আপনি উঠে পড়বেন—'

ইন্দিরা কহিল, 'তা হোক্।…তুমি ব'সো। কিন্তু তা ব'লে তুমি ভাই আমাকে 'আপনি' বলতে পারবে না, বড্ড যেন পর পর লাগে।'

জিতু বলিল, 'তবে কা বলব?'

'কেন, 'তুমি' বলবে। তোমার দাদাকে কি বলো?'

জিতু ঘাড় নীচু করিয়া কহিল, 'বা-রে। একদিনেই কি বলা যায়।'

এই সময় নীচে হইতে অসিতের গলা পাওয়া গেল, 'জিতু! ওরে জিতু!'

জিতু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, 'ছোড়দা ডাক্‌ছে বৌদি, আমি এখন আসি। বোধ হয় আবার কোথাও নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে।'

ইন্দিরা হাসিয়া প্রশ্ন করিল, 'তুমিই বুঝি সব নেমন্তন্ন করছ?'

জিতু লজ্জা পাইয়া কহিল, 'না, তা নয়। ভট্‌চাজ্জি মশাই যাচ্ছেন, আমাকেও সঙ্গে থাকতে হচ্ছে—'

জিতু চলিয়া গেল। কিন্তু ইন্দিরার আর শোওয়া হইল না। কারণ সেই সময়েই ওপাশের বারান্দায় আবার কাহার পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দিরা মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া ভাল করিয়া বসিতে না বসিতেই ঘরে ঢুকিল উনিশ-কুড়ি বৎসরের একটি বিবাহিতা মেয়ে। মেয়েটির দিকে একবার মাত্র চাহিলেই নজরে পড়ে তাহার অস্বাভাবিক গৌরবর্ণ এবং বড় বড় চোখ। কিন্তু আর যেন কোথাও কোন শ্রী নাই, অত্যন্ত কঠিন ও পরুষ মুখের ভাব।

সে কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, 'তুমিই বুঝি নতুন বৌ এলে?'

ইন্দিরা একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'হাঁ।'

মিনিট কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'ভাল। ললিতদা তোমাকে নিজে দেখেই এনেছে বোধ হয়? পছন্দ হ'লেই ভাল।'

আরও কিছুক্ষণ সে তেমনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইন্দিরা তাহার এই কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল; সে নীরবে বসিয়া ঘামিতে লাগিল, কী আলাপ করিবে ভাবিয়া পাইল না।

আরও একটু পরে সেই মেয়েটিই কহিল, 'শোন, মুখ তুলে চাও।...আমি তোমার চেয়ে ফরসা না কালো?'

ইন্দিরা অস্পষ্ট স্বরে কহিল, 'ফরসা।'

'তোমার চেয়ে ভালো দেখতে না খারাপ? না না, চুপ ক'রে থেকো না, জবাব দাও!'

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দিরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এই মেয়েটির মধ্যে কোন শ্রী খুঁজিয়া পাইল না। তবু মুখে কহিল, 'অনেক ভালো?'

'হুঁ। তবু তোমাকে পছন্দ ক'রেই এনেছে।'

সে আর দাঁড়াইল না। চোখের দৃষ্টিতে যেন এক ঝলক অগ্নিবৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাহির হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকিলেন মুঙ্গেরের পিসিমার দল! পিসিমা, তাঁহার মেয়ে মোহিনী, তাঁহার পুত্রবধূ—একদল। সঙ্গে সঙ্গে সরি-বিন্দীও।

ঘর ভরিয়া গেল। আবার সেই মুখ তুলিয়া দেখানো—লজ্জায় চোখ বুজিয়া আসা। পিসিমা পুত্রবধূর দিকে কী যেন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'বাঃ বেশ বউ হয়েছে আমাদের ললিতের, খাসা বৌ। ওর বরাতটাই ভালো।'

বলিয়া একজোড়া সোনার ঝুম্‌কা বাক্সসুদ্ধ হাতে গুঁজিয়া দিলেন। মোহিনী এতক্ষণ পিছন হইতে একদৃষ্টে দেখিতেছিল, এখন কোলের ছেলেটা নামাইয়া দিয়া কাছে আসিয়া সহসা পাশে বসিয়া পড়িল, তাহার পর দুই হাত দিয়া ইন্দিরাকে জড়াইয়া ধরিয়া দুই গালে দুইটা চুম্বন করিয়া কহিল, 'বেশ ভাই বৌদি, তোমাকে আমার বড্ড পছন্দ হচ্ছে। আমি যদি পুরুষমানুষ

হতুম তো তোমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যেতুম, না হয় ললিতদা শেষ পর্যন্ত পুলিসে দিত।

সবাই হাসিয়া উঠিল। সরমা কহিল, 'আহা আমাদের মোহিনীদি নতুন বৌ পেয়ে যে গলে গেলে একেবারে! এখন আর আমাদের দিকে নজর নেই —আগে তো আমাদের নিয়েই পালাবে বলতে!'

মোহিনী একটা ভালো হাতীর দাঁতের সিঁদুর কৌটা বাহির করিয়া খানিকটা সিঁদুর লইয়া ইন্দিরার সিঁথিতে লাগাইয়া দিল, তাহার পর কৌটাটা হাতে দিয়া কহিল, 'এই কৌটো থেকেই সিঁদুর নেবে রোজ; আমার দেওয়া কৌটো, ওর পয় আলাদা। আমার শাশুড়ী সধবা গেছে, দিদিশাশুড়ী গেছে, তার শাশুড়ীও গেছে—আমিও যাব, দেখবে!

সগর্ব হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তাহার, সে একবার উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া লইয়া কহিল, 'সরি হাসছিস, দেখবি যাই কি-না!'

ইতিমধ্যে বিন্দী কাছে আসিয়া ইন্দিরাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রশ্ন করিল, 'আমাদের আসবার আগে ঐ যে ছুঁড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ও কিছু বলছিল নাকি তোমাকে?'

ইন্দিরা কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিন্দী তখন নিজেই বলিল, 'কী আস্পদ্দা ছুঁড়ির, আর কি সাহস! জানো বৌদি, আমাদের মেজদাকে কী কম ফাঁদে ফেলেছিল ও! মেজদা দিনকতক ওকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল একেবারে। ছেলে এই বিষ খায় তো ওই বিষ খায়—কী কাণ্ড! তবে নাকি বাবা বড় শক্ত মানুষ, তাই কিছুতেই রুইল না। শেষে বেগতিক দেখে ওর বাবা অন্য বিয়ে দিলে।···সাংঘাতিক মেয়ে ও!'

সহসা ইন্দিরার মনে হইল মনের মধ্যে অনেকগুলি আশার আলো একসঙ্গে নিভিয়া গেল। উৎসব বাড়ির যে রেশ তাহার মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে-ছিল, তাহারও সব কয়টি তার আকস্মাৎ যেন বেসুর বাজিয়া উঠিল। সে বিবর্ণ মুখে একবার ঢোঁক গিলিল।

সরমা কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, 'কার কথা বলছিস লা বিন্দী?'

বিন্দী কহিল, 'আমাদের হিমি, আর কার কথা, কেন দেখিসনি, আমরা

যখন আসছি, ছিমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।'

গালে হাত দিয়া সরমা কহিল, 'ওমা, তাই নাকি? কী সাহস বাবা, কালা-মুখ এখানে বার করতে লজ্জা করে না ওর'!'

বিন্দী কহিল, 'হাঁ, ওর আবার লজ্জা। লজ্জা হবে একেবারে ম'লে। মায়েরও যেমন, ওদের বাড়ি আবার গেল নেমন্তন্ন করতে।'

সরমা কহিল, 'তা ও যে আবার এ ভিটেয় পা দেবে, তা মা কেমন ক'রে জানবে বল্।'

'এখনও কি মেজদার আশা ছাড়তে পারে নি ও?...'

সহসা ইন্দিরার বিবর্ণ মুখের দিকে চোখ পড়িতে মোহিনী কহিল, 'বৌদির মুখটা অমন শুকিয়ে গেল কেন ভাই? কোন অসুখ করছে কি?'

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'না।'

কিন্তু মোহিনী শুনিল না, বলিল, 'তুমি 'না' বললে কি হবে ভাই, ও আমি জানি যে, আমারও তো বিয়ে হয়েছে, আর সে এমন বেশী দিনের কথা নয় যে ভুলে যাব।...একে উপোস, তায় ঘুম নেই, তায় এই ধকল, শরীরের যা অবস্থা হয় তা আমি জানি তো!...ওরে তোরা চ' দেখি—আমরা নিচে যাই ভাই বৌদি, মামিমার সঙ্গে এখনও দেখাই হয় নি বলতে গেলে—তুমি বরং একটু শুয়ে পড়ো। এই সরি চল্, বিন্দী ওঠ্—এখন আর বেচারীকে জ্বলাতন করিস নি।'

মোহিনী একরকম জোর করিয়াই সবাইকে টানিয়া লইয়া গেল। খালি গেল না ছোটর দল। তিন-চারিটি ছেলে-মেয়ে তখনও তাহাকে ঘিরিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল। সুতরাং ইন্দিরা শুইতে পারিল না, চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। যদিও তখন সত্যই তাহার মাথাটা রীতিমতো ধরিয়া উঠিয়াছে—

বারান্দার দ্বারপথে কাহার যেন একটা ছায়া পড়িল। একটু পরেই অসিতের গলা পাওয়া গেল, 'এই বেবি শোন্—'

একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে সেই দলের মধ্য হইতেই সাড়া দিল, 'ছোটকা, ডাকছ?'

সে উঠিয়া গেল, এবং একটু পরেই একখানা পাখা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে সাড়ম্বরে হাওয়া করিতে বসিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া

ইন্দিরা হাসিয়া তাহার হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইতে গেল কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িল না, বরং গম্ভীর মুখে কহিল, 'ছোটকা ভারি বকাবকি করছে আমাকে, বলে তোরা অতগুলো লোক হাঁ ক'রে বসে রয়েছিস ওখানে, এ কথাটাও কি আবার ব'লে দিতে হবে, একটু বুদ্ধি নেই! সে হবে না কাকামা, বাতাস আমি করবই—

অগত্যা ইন্দিরা চুপ করিয়া রহিল। হাওয়াটাতে বাস্তবিকই বড় আরাম বোধ হইতেছিল তাহার। সঙ্গে সঙ্গে অসিতের প্রতি কৃতজ্ঞতাতেও তাহার মন ভরিয়া গেল; এখানে আসা পর্যন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যেই লোকটির যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতেই বুঝিয়াছে যে বাড়ির মধ্যে এই লোকটিরই বুদ্ধি বিবেচনা সকলের চেয়ে বেশী।

কিন্তু বেশীক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। যত আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা লইয়া সে এ বাড়িতে আসিয়াছিল—তাহার বিকশিত কুমারী-জীবনের যত কিছু স্বপ্ন—সমস্তই আনন্দমঞ্জরীগুলি কিছুক্ষণ পূর্বের সেই গৌরাঙ্গী মেয়েটির উষ্ণ নিঃশ্বাসে যেন পুড়িয়া ঝলসাইয়া গিয়াছে, আর তাহারই অসহবেদনা তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতেছে। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে, পান্তুয়া-ভাজা শুরু হইয়াছে এই সংবাদ পৌঁছিতে ছেলের দল সরিয়া পড়িয়াছে—ইন্দিরা তখন একা। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বাগানের দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, তাহারই চমৎকার স্নিগ্ধ ঝির-ঝিরে হাওয়ায় তাহার মাথা যেন অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিল। সে একটা লোহার থামে মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিল। উৎসব-বাড়ির কোলাহল সেখানেও কানে আসিতেছিল; বাগান হইতে ভাসিয়া আসা মিশ্র ফুলের গন্ধ মিষ্টান্নের গন্ধের সহিত মিলিয়া বার বার তাহাকে স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে এই আনন্দ উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই, ইহার নায়িকা সে-ই—কিন্তু কিছুতেই তাহার মনে কোন উৎসাহ জাগিল না। সামান্য একটুখানি ইতিহাস এই সব-কিছুই তাহার কাছে অর্থহীন করিয়া দিয়াছে, মনে হইতেছে ইহার কোনও অর্থই কোন দিন সে খুঁজিয়া পাইবে না।...

বহুক্ষণ সে এইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে-যে কোন একটা বিশেষ কথা ভাবিতেছিল তাহা নয়, কোন বিশেষ আঘাতের কথাও নয়, তবু কখন যে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে শুরু হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এমন কি কখন যে ললিত নিঃশব্দে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে টের পায় নাই। সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল ললিতের স্পর্শে। সে আস্তে আস্তে ইন্দিরার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া চুপি চুপি কহিল, 'তুমি এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে কেন ইন্দু, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে—ও কি, কাঁদছ তুমি ?…'

ইন্দিরা চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া মাথার কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিল। কিন্তু চোখের জল তাহার, বোধ করি ললিতের স্পর্শেই, আরো বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে কিছুতেই কান্না চাপিতে পারিল না।

ললিত অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল। স্ত্রীর সহিত পরিচয় তাহার বেশীক্ষণের নহে, এমন কি পরিচয় নাই বলিলেও চলে, এক্ষেত্রে কী বলা কিম্বা কি ভাবে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। অসহায়ভাবে খানিকটা এদিক-ওদিক চাহিয়া ইন্দিরার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিল, 'কেঁদো না লক্ষ্মীটি। আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, ছি!…তোমার কি মায়ের জন্যে মন কেমন করছে ? এইত পাঁচ-ছটা দিন পরে আবার সেখানে যাবে। ভয় কি ?…এখানে কি কেউ কিছু বলেছে তোমাকে ?'

ইন্দিরা নীরবে ঘাড় নাড়িল। তাহার পর বার বার মুছিয়া চোখের জলটাকে কতকটা সংযত করিয়া লইল, এবং ললিতের হাত হইতে হাতটা টানিয়া লইয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। ললিতও পিছু পিছু ঘরের মধ্যে ঢুকিল কিন্তু আর কাছে গেল না। সেইখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া আপন মনেই কহিল, 'এরাই বা গেল কোথায় ছাই, কী সব আক্কেল জানি না! বেচারীকে একলা রেখে—আচ্ছা দেখছি আমি, সরিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

ইন্দিরা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'না না, আমি বেশ

আছি। কাউকে ডাকবেন না—'

আবারও দুজনে নীরব।

খানিকটা পরে ললিত আস্তে আস্তে গিয়া চৌকীটারই একপাশে বসিয়া পড়িল। তাহার বুকে এ কিসের চঞ্চলতা, সে কিছুতেই ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেছে না কেন?···ইন্দিরারও মনে হইতেছিল যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহার বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে—

ললিত চুপি চুপি কহিল, 'তোমাকে পেয়ে একটু আগে আমার নিজেকে কী সৌভাগ্যবানই যে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তখন তোমার দিকটা ভাবি নি, তোমাকে পেলুম এই আনন্দেই মাতাল হয়ে ছিলুম। তুমি যে তেমনি আমাকে পাওয়া দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করতে পারো এ কথাটা তখন মনে পড়ে নি। সত্যিই তো, কীই বা আমার যোগ্যতা।'

কে জানে কেন, ললিতের গলার সুরে ইন্দিরার কণ্ঠ উপচাইয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল। সে কোন মতেই অশ্রু রোধ করিতে পারিল না।

ললিত আবার কী বলিতে যাইতেছিল কিন্তু নীচে হইতে তাহার মায়ের কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল। তিনি কাহাকে যেন চুপি চুপি বলিতেছেন, 'তুইও যেমন, বৌ একলা আছে ব'লে দুর্ভাবনায় তো তোর ঘুম হচ্ছিল না!·· ওরা আজকাল-কার ছেলেমেয়ে, তা ভুলে যাস কেন?···ভাবলুম যে এসে অবধি তো আমি একটি মিনিট অবসর পাই নি, যেতেও পারি নি, এখন একটু গিয়ে নতুন বোয়ের কাছে বসি; ওমা, গিয়ে দেখি ছেলে-বৌ আমার দিব্বি বারান্দায় হাত ধরাধরি ক'রে গল্প করছে, যেন কতকালের পরিচয়। আমি লজ্জা পেয়ে পালিয়ে এলুম!

ইন্দিরা জিভ কাটিয়া ঘোমটা আরও নিচু করিল, ললিতও আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইল না, বিষম লজ্জিত হইয়া ওপাশের বারান্দা দিয়াই পলায়ন করিল।

নিচে হইতে সরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ওমা তাই নাকি! অবাক করেছে বাবা! আমরাও তো আজকালকার মেয়ে, কিন্তু এমন বেহায়া—'

কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, মোহিনীদিই বোধ হয়—বলিল, 'তুই থাম্ সরি। সবাইকেই চিনি, আর ষাঁড়ের মতো গলা বার ক'রে অত

জাহির করতে হবে না। তুই তো বাসরঘর থেকেই বরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করতে শুরু করেছিলি—'

একটু পরেই মোহিনী উপরে আসিল। কোলের ছেলেটাকে মেঝেতে নামাইয়া দিয়া বিছানার উপরেই বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'ওমা, তুমি তো একলাই রয়েছ, তবে যে ওরা—'

তাহার পরই কথাটা চাপিয়া গিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'তোমার চোখ অত লাল কেন ভাই, যেন মনে হচ্ছে কাঁদছিলে—'

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িল। কিন্তু মোহিনী ছাড়িবার মেয়ে নয়, সে ডান হাতে তাহার চিবুকটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, 'উঁহু, তুমি না বললেই আমি শুনব কেন? এ যে দিব্যি কান্নার চিহ্ন দেখছি। ব্যাপার কি বলো তো, বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে?'

ইন্দিরা কথাটা চাপা দিবার জন্য সায় দিল। কিন্তু এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী মেয়েটিকে তবু ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'না ভাই, আমায় অত সহজে ঠকাতে পারবে না। আমি তখনই দেখে গেছি, হঠাৎ তোমার কি হ'ল। ওহো···সরি-বিন্দির কথাটা তোমার কানে গেছে, না? আ আমার কপাল!···নিশ্চয়ই তাই।'

ইন্দিরা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

মোহিনী কাছে আসিয়া তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া কহিল, 'ওরে পাগলী,·· বৌদিই হও আর যা-ই হও, বয়েসে আমার ছোট··· পাগ্লীই বলব, ওসব কথা নিয়ে কি দুঃখু পেতে আছে! তখন সবে ওর উঠ্তি বয়স আর মেয়েটাও ভারী পাজী, ওকে জড়াতে চেয়েছিল। তখন ঝোঁকের মাথায় কী বলেছিল সেই কথা কি আজও ধ'রে বসে থাকে কেউ? তা ছাড়া পুরুষমানুষ, বিয়ের আগে অমন অনেক নেশা লাগে, তখন তো আর তুমি আসো নি ভাই, এমন ভাগ্যি যে হবে তা ও জানতও না।···নাও নাও, ওসব তুচ্ছ কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। একটু মাথা তুলে চাও দেখি আমার দিকে. মুখ তোল···হুঁ, এমন রূপ যার, সে আবার ঐসব ভেবে মন খারাপ করে!···ওলো বৌদি, আমারই যে মাথা ঘুরে যাচ্ছে তোমার দিকে

চেয়ে, মেজদা তো তুচ্ছ। চিরকাল মাথা মুড়িয়ে এই পায়ে দাসখত লিখে বসে থাকবে দেখ্‌বি—'

ইন্দিরা তাহার ভাবভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিল। তখনও তাহার চোখের পাতা ভিজা, তাহারই মধ্যে এই হাসিটি শরতের আকাশের মতোই ভারী মধুর লাগিল। মোহিনী তাহাকে একটা চুম্বন করিয়া কহিল, 'চল্‌ ভাই বৌদি আমরা নিচে যাই, ওদের কাছে গিয়েই বসিগে—'

ইন্দিরা উঠিয়া মোহিনীর ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তখন তাহার মন হাল্কা হইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণ পূর্বের বেদনার যেন চিহ্নমাত্রও নাই। আবার উৎসবাড়ির নেশা লাগিয়াছে তাহার মনে।

মোহিনীর পিছনে পিছনে লজ্জিত নত মুখে সে নিচে নামিয়া গেল।

দেবাঃ ন জানন্তি

ওদিকের টেবিলে কানাকানি আর চাপা হাসি চলছে যূথিকাকে নিয়ে। বেশ বড় জটলা। আবার একটা স্ক্যাণ্ডাল। দাঁতে দাঁত ঘষে সুমিত্রা। ওরা কি এই জন্যেই অফিসে আসে নাকি? একেই তো মেয়েদের দুর্নামের শেষ নেই! সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হরিশবাবু দু'বেলা শোনাচ্ছেন, 'অফিসে একটি ক'রে মেয়ে ঢুকছে আর আমাদের কাজ বাড়ছে। মেয়েদের দ্বারা যদি কাজ হ'ত তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। ঈশ্বর কি তাহ'লে ওদের অবলা ক'রে সৃষ্টি করতেন! সে যা হোক—ওরা না হয় ভূষণ হয়েই থাক। অনেক ফার্নিচারই তো আছে এমন—কিন্তু ওরা এসে ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে এইতেই যে আপত্তি। এদের দিয়েও যে কোন কাজ পাচ্ছি না।'

সুমিত্রা ওদিকে তাকাবে না প্রতিজ্ঞা ক'রে খাতার ওপর ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু কানে কথার টুকরোগুলো এসে যেন বেঁধে তীরের মতো। নিবারণ বলছে, 'হিরণটার পেটে পেটে এত!' সুরেশ তার জবাবে বলছে, 'হিরণের দোষ দিই না ভাই—যূথিকা মেয়েটি সোজা নয়, নাছোড়বান্দা একেবারে! দিনকতক আমার পেছনে লেগেছিল কিনা—আমি জানি!' ফোঁস ক'রে উঠল চারু, 'তুই থাম্‌ সুরেশ। অমনি নিজে খানিকটা বাহাদুরী

নেবার চেষ্টা। যূথিকার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই—তোর পেছনে লাগবে।' রাগলে তোত্‌লা হয়ে যায় সুরেশ, 'মা—মাইরি ব—বলছি। তু—তুই র—রবিকে জ—জিগ্যেসা কর।' রবি অম্লানবদনে মুখের ওপরই বলে দিলে, 'আমি তো জানতুম তুই-ই ওকে বিরক্ত করিস যেখানে সেখানে।'

ডেপুটি ডাইরেক্টার জেনারেলের টি-এ বিল। সাবধানে দেখতে হবে। সুমিত্রা টাইম-টেব্‌ল্ খুলে মাইলের হিসাব দেখে। ওদিকে কান দিলে চলবে না। এ কাজটা হরিশবাবুর করার কথা—কিন্তু তিনি ওকেই ভার দিয়েছেন, 'বুঝে-সুঝে নাও সব কাজ। কোন্‌দিন কি করতে হয় বলা কি যায়?··· তোমার মাথা তো ভাল—চাই কি এস-এ-এসটা যদি পাস করতে পারো তো—। মেয়েদের অবিশ্যি হয় না। অঙ্কে যা মাথা!' নিজেই নিজের মন্তব্যের উত্তর দিয়ে শেষ করেছেন।

ওঁর এ আস্থার মর্যাদা রাখতেই হবে।

তবু রাগটা ও দমন করতে পারে না। প্রাণপণে চেপে থাকা সত্ত্বেও অনুভব করে যে ঠোঁটের স্নায়ুটা দপ্‌ দপ্‌ করছে। কাঁপছে ভেতরে ভেতরে। অপমান? তাই অন্তত ও বিশ্বাস করতে চায়। এই দু-একটা মেয়ের জন্যে ওদের সকলের অপমান! কাজ তো কেউই করে না—সমস্ত অফিসটার মধ্যে সে আর বেলা, এই দু'জন যা কিছু কিছু করে—বাকী সবাই ব্যাগের মধ্যে ক'রে নভেল আনে আর দশ মিনিট অন্তর নাকের ডগায় পাউডার বুলোয়—ছোট্ট আয়না বার ক'রে। আর যা করে, তরুণ ছেলেদের সঙ্গে ইয়ার্কি—ফষ্টিনষ্টি।···সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় সুমিত্রার।

ছেলেগুলোও তেমনি।

কী আছে ঐ যূথিকার? সুমিত্রার চেয়ে ঢের বেশি কালো। হ্যাঁ—পাশে বসে মিলিয়ে দেখেছে সে। চোখ দুটো ওরই মধ্যে একটু ড্যাবা ড্যাবা—আর দাঁতগুলো বেশ সাজানো। তা হাসলে সুমিত্রাকেও ভাল দেখায়। বয়সটা কম এই যা—

কতই বা কম? কুড়ি-বাইশের তো কম নয়। আই-এ পাস ক'রে এসে ঢুকেছে, মেয়েরা কি আর ষোল বছরে ম্যাট্রিক পাস করে?···কিছুতে না। তার প্রমাণ তো সে নিজেই—।

নিজের বয়সের হিসাবটা মনে পড়ে যায়, উনত্রিশ বছর সাত মাস—গোনা-গাঁথা। অনেকেরই বয়সের হিসাব গুলিয়ে যায়। ওরও যদি যেত! সুমিত্রা বাঁচত তা হ'লে। কী কুক্ষণে যে ঠিক ঐ দিনটিতে ও জন্মেছিল! ওর দাদার যে দিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ—সেই দিনে ওর জন্ম। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে অষ্টপ্রহর ঐ কথাই শুনছে এবং সেই সঙ্গে সেই বিশেষ তারিখ ও দিনটা। দাদার এই অর্থহীন রসিকতা সুমিত্রার পক্ষে কী বেদনাদায়ক হ'তে পারে তা বোঝবার মতো বুদ্ধি ভগবান তাকে দেন নি। মেয়েদের বয়স স্মরণ করায় যে দায়িত্ব আছে অভিভাবকদের, সে কথাটাও দাদা কখনও ভেবে দেখে নি। মনে করিয়ে দিতে পারত খুবই—কিন্তু আত্মসম্মানে বেধেছে ব'লে প্রত্যেকবারই উদ্যত রসনাকে দমন করেছে সুমিত্রা।

দাদা নিজে বিবাহিত। সাত-আটটি সন্তান ওর। যা রোজগার করে তাতে নিজের সংসার চলে না। সে বোনের বিয়ে দেবার কথা কল্পনা পর্যন্ত করে নি। দু-একজনে দু-একবার মনে করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে বাবার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে সরে পড়েছে, 'বাবার মেয়ে, বাবা বুঝবেন! আমার নিজের তিনটে মেয়ে কেমন ক'রে পার করব তার ঠিক নেই, তা আবার বাবার মেয়ে!'

নিজের বোনকে বাবার মেয়ে ব'লে উল্লেখ করার রসিকতায় হেসে উঠত প্রতিবারেই—হো—হো—হা—হা—!

অপমানে সুমিত্রার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে যায় ওর ঐ হাসিতে, ইচ্ছা করে মাথাটা ধরে গুঁড়িয়ে দেয় ওর—

বাবা যখন রিটায়ার করেছেন তখন ইচ্ছা করলে বিয়ে দিতে পারতেন সুমিত্রার। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাগুলো ছিল, সুমিত্রাও এমন শীর্ণ ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে নি। প্রথম কৈশোরের শ্যামল সরসতা একটি অপরূপ লাবণ্যে ঘিরে ছিল ওর তনুলতাকে। কিন্তু তখন তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সে কথাকে—'পনেরো বছরে বিয়ে! পাগল নাকি তুমি বড় বৌ!' আসলে সদ্য-পাওয়া অতগুলো টাকা তখন তিনি একটু অনুভব করতে চেয়েছিলেন। সামান্য কেরানীর সুদূর স্বপ্নের অতীত অতগুলো টাকা। অন্তত সুমিত্রার তাই বিশ্বাস।

তারপর সে টাকার অঙ্ক ক্ষীণ হয়ে এল। মধ্যে কী একটা ব্যবসা করতে গিয়েও বাবা হাজার চারেক টাকা নষ্ট করলেন। আর যা বাকী রইল তা সংসারের নিত্য-অনটনে দু টাকা চার টাকা ক'রে খরচ হ'তে হ'তে একদিন আর কিছুই রইল না। দাদার যা মাইনে তাতে তার খরচই চলে না। শেষে প্রতিদিনের হাঁড়ি চড়াই হয়ে উঠল সমস্যা।

সুমিত্রা ক্লাস এইট্ পর্যন্ত প'ড়ে ইস্কুল ছেড়েছিল। মার শরীর খারাপ, সংসারের কাজ দেখে কে? দুটো ছোট ছোট ভাই। দিদি নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। ছোড়দি যদিও বিধবা তবু তাঁর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল ব'লে বাবা আনতে চান না এখানে—'এখানে এলে যদি চিরদিনের মতো ঘাড়ে পড়ে? খেতে দেব কি?'...তারপর দাদার বিয়ে হ'তে জোর ক'রে আবার ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল সুমিত্রা। আবার ম্যাট্রিক পাস ক'রে পড়া বন্ধ হয়। বাবার আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, মেয়ের কলেজের খরচা যোগান। মাও বললেন, 'আর গুচ্ছের প'ড়ে কি হবে। এবার মেয়ের বিয়ের যোগাড় দেখ—'

যোগাড় দেখলে অবশ্য দেখা যেত। তখনও কোন মতে বিয়ে দেওয়া চলত। গরিবের মেয়ের কি বিয়ে হয় না? পাড়ার নেড়ুবাবু সাতাশ টাকা মাইনের বেয়ারা কোন্-যেন-সদাগরী অফিসে। তবু তিনিও তো মেয়ের বিয়ে দিলেন। কিন্তু তার বেলা সে-রকম উদ্যোগী হয়ে পরিশ্রম করবে এমন লোক ছিল না। বাবা তাস আর তামাক—সেই সঙ্গে পাড়ার অকর্মণ্য বৃদ্ধদের সঙ্গে আড্ডা—এই নিয়েই থাকতেন। স্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে বলতেন, 'বিয়ে বললেই বিয়ে? ঐ তো তোমার কালো ভূত মেয়ে—না রূপ না আমার রূপো, বর জোটাই কোথা থেকে? তাও তো সবাইকে ব'লে রাখছি, আর কি করব, রাস্তায় রাস্তায় পাত্তর চাই পাত্তর চাই ব'লে ঘুরে বেড়াব পাগলের মতো?'

দাদা তো চিরদিনই উদাসীন। সে দেখে তার স্ত্রীকে সাহায্য করার লোক, মা দেখেন তাঁর সংসারের ভরসা। ব্যস্! সবাই নিশ্চিন্ত।

অবশেষে সুমিত্রাই উদ্যোগী হয়ে পাড়াতে একটা টিউশানী জুটিয়ে নিলে, তারপর ভর্তি হয়ে গেল কলেজে। মাস কয়েক পরে চাকরিও জুটল একটা। ভোর ছটায় বাসী রুটি খেয়ে কলেজ যেত, সেখান থেকে সোজা অফিস—

বাড়ি ফিরে সংসারের কাজ, রান্নাবাড়া। মা বুড়ো হয়েছেন, ছুপুরটা চালান একরকম ক'রে—সন্ধ্যায় একেবারে অনড় হয়ে পড়েন। বৌদির কোলে চির-দিনই ছোট ছেলে। সুতরাং—

এখন তো আর তার বিয়ের কথা মুখে কেউ উচ্চারণই করে না। স্নেহ যে করে না তা নয়। বৌদি চিরদিনই ভালবাসে। কিন্তু সে তার ছেলেমেয়ে ধরার লোক বলে। দাদা-বাবা-মা সবাই ভালবাসে ; ওর উপার্জনে উপবাস করা বন্ধ হয়েছে। ছোট ভাইদের পড়াশুনো চলছে। এক কথায় সুমিত্রার এই সরকারী চাকরি হওয়াতে ওঁরা নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছেন। সংসারটা অপেক্ষাকৃত মসৃণভাবে চলেছে। দাদা তো এমন ভাবেই কথা বলে যে সুমিত্রার আর বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়—এবং সে কথাটা নিশ্চয় সুমিত্রাও এতদিনে বুঝেছে—এটা স্বতঃসিদ্ধ। ··

এর আগের ঔদাসীন্য বিঁধেছে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি বেঁধে এখনকার এই নির্মম স্বার্থপরতা। ওরা কি ভাবে সুমিত্রাকে ? তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা সব কি বাইরের চেহারাটার মতোই শুকিয়ে গেছে ? তাও যে গেছে, সে তো ওদেরই অত্যাচারে। খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই—উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম। আর তার ফলে ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্য। শেষেরটাই তাকে আরও বেশি ক'রে শুকিয়ে দিয়েছে। নইলে বৌদিও তো তার বয়সা—হয়ত কিছু বড় হবে—তার ওপর আটটি সন্তানের মা। তবু এখনও কেমন ঢলঢলে আছে তার মুখখানা। ওর বন্ধুরাও কেউ এমন হয়ে পাকিয়ে যায়নি।

নাঃ—এসব কি ছাইভস্ম ভাবছে সে ? ছি ছি—এ বিলটা আজকে চেক্ ক'রে না দিতে পারলে হরিশবাবু কি ভাববেন ! মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে, কান দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে আসা যাক।

সুমিত্রা উঠে পড়ে। ফিরে আসবার পথে চোখে পড়ে বারান্দায় অসিত দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে—অতসী যেতে যেতে মুচকি হেসে গেল। ছুজনেরই চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল নিমেষে। বহু পরিচিত এ চাহনি—

এমন কি অতসীও ?

ওর চামড়াটা দু-পোঁচ বেশি ফরসা এটা ঠিক। কিন্তু বয়স তো সুমিত্রার চেয়েও বেশি…

বুকের মধ্যে যে দীর্ঘনিঃশ্বাসটা প্রাণপণে দমন ক'রে রেখেছিল সেটা এবার বেরিয়ে আসে। কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারে না। মনকেও এতক্ষণ ধরে যে প্রবঞ্চনা ক'রে চলেছে আর সেটা সম্ভব নয়। হ্যাঁ—সে ঈর্ষিত। কই, এতকালের মধ্যে তার দিকে তো কেউ ফিরেও তাকাল না? তার সঙ্গে রসিকতা করতে চায়, ইয়ার্কি দিতে চায় এমন কি কেউ নেই? একজন মাত্র তাকে নির্জনে পেলে কিছু অশ্লীল রসিকতা করেন—তবে সে আরও অপমান। তিনকড়িবাবুর রিটায়ার করারও বয়েস পেরিয়ে গেছে, এখন এক্সটেনশানে আছেন।

আশ্চর্য। আজ না হয় সে এমন রোগা আর কাঠি-মতো হয়ে গেছে; যখন তা ছিল না, তখনও তো কোন ইতিহাস ওর কোথাও রচিত হয় নি। পাড়ার অনেক মেয়ের অনেক কাহিনী সে জানে—আজকাল তো কথাই নেই, ক্লাস এইট পেরোলেই এবাড়ি থেকে ওবাড়ি এবং ওপর থেকে নিচে চিঠি লেখা-লেখি। কোন কোন ক্ষেত্রে চিঠিরও বেশি।—শুধু কি বিধাতা তারই চরিত্র নির্মল রাখবার জন্য বিশেষ একটি অদৃশ্য প্রহরায় ঘিরে রেখেছেন তাকে? রূপকথার রাজপুত্র না আসুক, পাড়ার কোন বকা ছোকরাও তো কোনদিন তার জানালা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে নি, তাকে দেখে শিস দেয় নি। এমন কী কাঠিন্য তার মুখে চোখে মাখানো আছে? এমন কী গম্ভীর এবং ভয়াবহ সে?

ঠং ঠং ক'রে চারটে বেজে যায়। হরিশবাবু হেঁকে বলেন, 'কই গো সুমিত্রা-রাণী, হ'ল তোমার? আমি ও ফাইলটা ক্লোজ করতে চাই যে। কোন্ দিন আবার শালা হুড়ো দেবে—'

সুমিত্রা অপরাধীর মতো এসে দাঁড়ায়, 'বড্ড মাথা ধরে উঠেছে কাকাবাবু, কিছুতেই যেন কাজ এগোচ্ছে না। আমি ক'রে দিয়ে যাবো যত দেরিই হোক—'

হরিশবাবু মুখ তুলে তাকাতেই ওর মুখের অপরিসীম বিবর্ণতা তাঁর চোখে পড়ে, 'ইস্ সত্যিই তো—মুখচোখ যে শুকিয়ে গেছে একেবারে। য়্যাস্পিরিন খাবে নাকি? আছে আমার কাছে।…ও বিল থাক্ গে আজ, এখন বরং

বাড়ি চলে যাও। কাল ফার্স্ট আওয়ারে ক'রে দিও। ইস্—তোমরা যে মোটে শরীরটার দিকে নজর দাও না। যত বলি একটু ক'রে ত্রিফলার জল খেয়ো ভোর বেলা—'

বাকী কথাগুলো আর শোনে না সুমিত্রা। সত্যিই ওর মাথা ধরে উঠেছে ভীষণ। কেন এমন হ'ল কে জানে। বিশেষ ক'রে আজই ওর চিত্ত কেন এমন উদ্বেল হয়ে উঠল? এসব আঘাত তো নিত্য-নৈমিত্তিক।

বাড়ি আসতেই বাবা প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'কি রে, এত সকাল সকাল?'

উত্তর দিলে না সুমিত্রা। হাতে সাজা হুঁকো এবং সামনে চায়ের পেয়ালা। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবন। সে নিজেই নিরুপদ্রব ক'রে দিয়েছে ওঁর জীবন। ওপরে উঠতে মা বললেন, 'হ্যাঁরে তোর চোখমুখ এমন বসে গিয়েছে কেন? অসুখ করেছে নাকি? কই, আয় তো দেখি—'

অন্যদিন হ'লে ওঁর এই উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে সুমিত্রার মনও আর্দ্র হয়ে উঠত কিন্তু আজ যেন আরও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল। সে সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিলে, 'আমার কি অসুখ করে মা? না করতে পারে? তাহ'লে তোমাদের চলবে কি ক'রে?'...পাশ কাটিয়ে তেতলায় যাবার চেষ্টা করে সে। ওপরে দুটি মাত্র ঘর, একটি দাদার আর একটি তাদের, অর্থাৎ বাবা মা দুটি ভাই এবং সে, এই সব ক'জনের। অনেকদিন ধরেই অসহ্য হয়ে উঠেছে, সম্প্রতি নিজে কিছু টাকা খরচ ক'রে ওপরের চিলকুঠরীটা চলনসই ক'রে নিয়ে তাতেই আশ্রয় নিয়েছে—একরকম জোর ক'রেই। মা আপত্তি করেছিলেন, 'আইবুড়ো মেয়ে একা ছাদের ঘরে থাকবি কি? ওমা—লোকে কি বলবে?'

সুমিত্রাও চোখা উত্তর দিয়েছিল, 'কী বলবে? ছাদ ডিঙিয়ে আমার ঘরে লোক উঠবে? না কি ভূতে ধরবে? তোমার যা মেয়ে, ভূতেও ছোঁবে না মা। ··সে যে যা বলে বলুক, সারাদিন খেটেখুটে একটু একা-একা থাকতে না পারলে পাগল হয়ে যাবো!'

বাবা মা আর কিছু বলতে সাহস করেন নি। অর্থ উপার্জন করতে শুরু করলেই মেজাজ দেখাবার অধিকার জন্মায়—এ তো সবাই জানে।

বৌদির ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তার পুলকিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল,

'ওমা ঠাকুরঝি আজ এরই মধ্যে এসে গেছ! বাঁচলুম! তোমার ভাইঝিকে একটু সামলাও দিকি, কাপড় কাচতে পর্যন্ত যেতে পারছি না!'

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল সুমিত্রার। সে ওপরে উঠতে উঠতেই বললে, 'আমি এখন আর কিছুই পারব না বৌদি, বড্ড মাথা ধরেছে—'

'আবার মাথা ধরল! বেশ। মাথাধরা ভাই আজকাল যেন তোমার হাত-ধরা হয়ে উঠেছে!'

'হ্যাঁ বৌদি, আমি ইচ্ছে ক'রেই ধরাই।'

অপ্রসন্নকণ্ঠে বৌদি বললে. 'আমি কি তাই বলছি!'

কিন্তু শুয়ে থাকারই বা উপায় কি? এক সময় তো উঠতেই হয়! দাদা আসবে, চা জলখাবারের পাট আছে। ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যে থেকেই খাবো খাবো করবে। একরাশ আটা মাখতে হবে। মা দয়া ক'রে কুট্‌নোটা কুটে রেখে দেন তাই। বৌদি রান্নঘরে নামে আটটারও পর। কোলের মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, বেশভূষা ক'রে। নেমে এসে শুধু রুটি কখানা বেলে দেয়।

সুমিত্রা অফিসের কাপড়-জামা ছেড়ে নেমে এসে খুব কড়া ক'রে এক কাপ চা তৈরী ক'রে খায়—তারপর রান্নাঘরে ঢোকে প্রতিদিনকার মতোই। আর নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ মেলে না—চিন্তা কল্পনাও একান্ত অনবসরের কোন্ ছায়ায় মিলিয়ে যায় ক্রমশ।

অবসর মেলে একেবারে সব রান্না সেরে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে—রাত নটারও পর। রান্নঘর পর্যন্ত ধুয়ে সে নিজে যায় গা ধুতে। এটা ওর প্রতি-দিনকার অভ্যাস। রান্নার তেল যেন সর্বাঙ্গে লেগে থাকে নইলে। তেল আর গন্ধ। আজও গা ধুয়ে এসে প্রসাধন করতে বসল। একটু যেন বিশেষ ক'রেই প্রসাধন করল, কেন, তা সে নিজেও জানে না। তারপর বাইরে বেরিয়ে তারাভরা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। এইবার ঘণ্টাখানেক ওর ছুটি। নিরন্ধ্র অবসর। বাবা আড্ডা থেকে ফেরেন নি, দাদা ক্লাব থেকে আসবে দশটারও পরে। বৌদি এই সময় একটু ঘুমিয়ে নেয়, শেষরাত্রে ছেলেমেয়ের উপদ্রবে কোন দিনই ভাল ঘুম হয় না। অন্যদিন এ সময়টা সে অফিস-লাইব্রেরী থেকে আনা বই পড়ে কাটায়। কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছে না। বইও না।

সমস্ত বাড়িটা নির্জন নিস্তব্ধ। শুধু ওদের একতলার ভাড়াটেদের ছেলেটি পরীক্ষার পড়া পড়ছে। নিচের দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে ওরা—সিঁড়ির নিচের খাঁজটুকু চটের পর্দা টাঙিয়ে ছেলেটা পড়ার ঘর ক'রে নিয়েছে। পড়া! …মনে হলেও হাসি পায় সুমিত্রার। দুবার ফেল করেছে আই-এসসিতে, এইবার নিয়ে তিন তিনবার হবে পরীক্ষা দেওয়া। বিশ্ববকাটে ছেলে বীরু, লম্বা একহারা গড়ন, সিগারেট বিঁড়ি তো মুহুর্মুহুঃ চাই—অন্য ব্যাপারেও পরিপক্ক। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই ও-পাড়ায় কী একটা এমন কেলেঙ্কারী করেছিল যাতে আর ওখানে থাকতেই পারেন নি ওর বাবা-মা। পুলিস পর্যন্ত গড়াত, অনেক কষ্টে সেটা বেঁচেছে। এখানে এসেও নিশ্চেষ্ট নেই বলা বাহুল্য—সুমিত্রা অনেক চিঠি লেখালেখির ইতিহাস জানে। মোড়ের বাড়ির নন্দার দাদা রাত নটার সময় ধরে কী মারটাই দিলে সেদিন! ওর বাবা শাসন করতে পারেন না—অথচ আশা করেন যে ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।

বীরু!

কথা কইতেও ঘৃণা হয় সুমিত্রার—ওর সঙ্গে। আজ পর্যন্ত নিতান্ত বাধ্য হয়েই বোধ হয় গোটা পাঁচ-ছয় শব্দ উচ্চারণ করেছে ওকে লক্ষ্য ক'রে।

একঝলক দক্ষিণা বাতাস হঠাৎ আশ-পাশের গাছপালাকে মর্মরিত ক'রে বয়ে যায়। অসময়ের উষ্ণ বাতাস। কেমন যেন শিউরে ওঠে সুমিত্রার গা-টা।

সহসা বীরুর সম্বন্ধে আজই বা ওর কৌতূহল উগ্র হয়ে ওঠে কেন?…ওকে কখনও কাছ থেকে দেখে নি। কী আছে ওর ঐ চোয়াড় চোয়াড় চেহারায়? নন্দা নাকি একরাশ চিঠি লিখেছিল ওকে।

এক-পা এক-পা ক'রে কখন এক সময়ে সুমিত্রা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। একতলায় গিয়ে ভাড়াটেদের দিকের দরজাটা সন্তর্পণে ঠেলে। ভেজানোই ছিল—খুলে গেল নিঃশব্দে। ভেতরে ঢুকে চটের পর্দাটা সরিয়ে একসময় ও সত্যিই ঢুকে পড়ল বীরুর ঘরে।

সমস্ত ঘরটা বিড়ির ধোঁয়া ও গন্ধে পূর্ণ। ওকে দেখে যেন ভূত দেখার মতোই চমকে উঠে চট্ ক'রে অপূর্ব কৌশলে বিড়িটা নিভিয়ে ফেলে পাশের দেওয়ালে চেপে। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'এ কি সুমিত্রাদি? হঠাৎ এত রাত্রে? মাকে ডেকে দেব?'

'না না—নিশ্চয়ই একটু বিশ্রাম করছেন এখন, ডেকে কাজ নেই। এমনিই এলুম—কি পড়ছ দেখতে। বোস বোস, তোমার পড়ার ব্যাঘাত করতে চাই না—'

সে জোর ক'রেই ওর কাঁধে হাত দিয়ে বসিয়ে দেয়, তারপরও কিন্তু হাতখানা থাকে বীরুর কাঁধেই—সরানো হয় না।

বীরু কেমন যেন হক্‌চকিয়ে গেছে। সে একটু বোকার মতো হেসে বলে, 'বাঃ রে, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বসে থাকব।…এখানে কিছুই নেই ছাই। না হয় চলুন ওঘরেই—মা হয়ত ঘুমোন নি একেবারে—'

'না না থাক্। কেন, আমি থাকলে কি অসুবিধা হচ্ছে?' আল্‌গাভাবে হাসে সুমিত্রা। কিন্তু মনে হয় ঠোঁট দুটো কান্নার ধরনে বেঁকে যাচ্ছে—নিজে নিজেই অনুভব করে সেটা। বীরুর কাঁধে রাখা হাতখানা কাঁপছে অল্প অল্প। অনভ্যস্ত ভূমিকার বিড়ম্বনায় স্নায়ুগুলো যেন অবশ হয়ে আসে।

টুক্‌রো টুক্‌রো আলাপ—কিছুতেই দানা বাঁধে না। বেশ বুঝতে পারে সুমিত্রা, বীরু কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছে।

ও নিজেও ঘেমে ওঠে। আরও মিনিট পাঁচ-ছয় বৃথা চেষ্টা ক'রে সুমিত্রা উঠে পড়ে, 'আচ্ছা, তুমি পড়ো। সময় নষ্ট করলুম খানিকটা।'

'না না, তা নয়। তবে আপনি আসাতে আমি ভেবেছিলুম কী না কি, বিপদ-আপদই হ'ল বুঝি। আপনি তো এমনি কারুর সঙ্গে কথাই কন না—বাবা, যা গম্ভীর!'

সৌজন্যের কথা। কিন্তু চোখে যে হাসির আভাস ওর লেগে ছিল, তাতে কি বিদ্রূপ নেই? কাল কি ওর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে এই কথাই বলবে না, 'ওপরের বাড়িওলাদের সেই কেল্‌টে ছুঁড়ীটা কাল রাত্তিরে জমাতে এসেছিল, মাইরি!'

আড়াল থেকে শুনে শুনে এদের কথা বলার ধরন ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। কেন গেল ও, কেন এই অপমানটা হ'তে গেল স্বেচ্ছায়?

ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে চোখে জল এসে গেল সুমিত্রার। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সত্যিই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল সে।

খানিকটা পরেই ওদের চাকর রাখাল এসে পৌঁছল দেশ থেকে। রাখাল ওর দাদার অফিসে কাজ করে, ওদের বাড়িতে থাকে এবং খায়। তার বদলে দু'বেলা যতটা পারে কাজকর্ম ক'রে দেয়। সুমিত্রার চাকরি হওয়ার পর থেকেই এই ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে।

রাখাল মাস-খানেকের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। মুড়ির ছাতু, নতুন গুড়—কত কি এনেছে। ততক্ষণে দাদা ও বাবাও এসে গিয়েছেন। খুব খানিকটা হৈ-হৈ হ'ল। রাখাল বললে, 'আমি যা ছাতু এনেছি তাই খাবো এখন—দিদির তো রান্নাটান্না সারা।'

সুমিত্রা জোর দিয়ে বললে, 'না না, রুটি বেশি আছে। সত্যিই বেশি আছে। তা ছাড়া আমার শরীরটা ভাল নেই, আমি তো কিছু খাবোই না।'

সে জোর ক'রে নিজের ভাগের খাবারটা রাখালকে খাইয়ে দিলে। রাখাল বললে, 'আপনি মিছে ক'রে বললেন দিদি, পাছে আমি না খাই।'

মিষ্টি হেসে সুমিত্রা বললে, 'বললুমই বা রাখাল। সত্যিই যদি তোমার দিদি হ'ত—তুমি হঠাৎ গিয়ে পড়লে না খাইয়ে সে নিজে খেতে পারত?'

উত্তর দিতে গিয়ে রাখালের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে, 'সে কথা আমি দেশে গিয়ে সবাইকে বলেছি দিদি, যে আমায় দিদিমণি যা যত্ন করেন, অমন আমার আপনার লোকেও কেউ করতে পারত না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই যে-যার ঘরে চলে যায়, রাখাল রান্নাঘর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার ক'রে এখানেই শোবে। চাকরদের শোবার মতো ঘর আর নেই এখন। রান্নাঘরেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ঘর ধুতে ধুতে রাখাল পেছনে ছায়া দেখে চমকে ওঠে—সুমিত্রাই আবার কখন নিচে নেমে এসেছে—!

'কী চাই দিদিমণি? জল? বললেন না কেন ডেকে—দিয়ে আসতুম।'

'না না। এমনিই। ঘুম আসছে না তাই। তোমার কাছে তোমাদের দেশের খবর সব শুনতে এলুম।'

টুক্‌রো টুক্‌রো খবর দেয় রাখাল ঘর মুছতে মুছতে। একুশ-বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে—দেশে গিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি ক'রেই এসেছে। তবু সুমিত্রা

যখন কাছে গিয়ে ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে বললে, 'যাই বলো রাখাল, তুমি একটু রোগা হয়েই এসেছ!' তখন একবার নিজের দিকে তাকিয়ে রাখালও তা স্বীকার করলে, 'বড্ড রোদে রোদে ঘুরেছি কিনা—তাছাড়া ঘরদোরগুলো নিজেই সারলুম। বাবা ছিষ্টির কাজ জমিয়ে রেখেছিলেন।'

অবশেষে রাখাল যখন বিছানা পাততে শুরু করলে, সুমিত্রাকে চলে আসতে হ'ল। আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন অজুহাতই নেই। তাছাড়া শোভনতা ও ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

কিন্তু তবু সে তখনই শুতে যেতে পারল না। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ছাদে, একা একা— নিশাচরী প্রেতিনীর মতো।

অনেকক্ষণ পরে খুট ক'রে কি একটা শব্দ হ'ল নিচে। ওদেরই সদর দরজা খোলার মতো। হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলে—হ্যাঁ, ওদের বাড়ি থেকেই কে একজন বেরিয়ে গেল খুব সন্তর্পণে। একবার মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকালও—তবে অন্ধকারে বোধ হয় সুমিত্রাকে দেখতে পেল না। কিন্তু সুমিত্রা চিনতে পারল—রাখাল।

ওধারে দাশগুপ্তদের বাড়িরও খিড়কীর দোর খুলে গেল—প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে এল এক ছায়ামূর্তি। মধ্যেকার খালি মাঠে বসে দু'জনে কি গল্প হ'তে লাগল। রাখাল একটা বিড়িও ধরাল। সেই আলোয় সুমিত্রা দেখল তার অনুমানই ঠিক—দ্বিতীয় প্রাণীটি গুপ্তদের ঝি চপলা।

মিনিট কতক গল্প করার পরই দুজনে উঠে পড়ল। চপলা ফিরে গেল ওদের বাড়ি, রাখালও ফিরে এসে সাবধানে দোর বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল। খুব সামান্য শব্দ হ'লেও সুমিত্রা ওর নিজের ঘরে বসে দোর দেওয়াটা পর্যন্ত শুনতে পেল।

সামান্য ব্যাপার। ওদের এই প্রণয় রহস্য অনেক দিনই অনুমান করেছে সুমিত্রা, আগে আগে কৌতুকই অনুভব করেছে বরং— কিন্তু আজ কে জানে কেন অসহ্য ক্রোধে জ্বলে উঠল। খানিকটা চুপ ক'রে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থেকে তর্ তর্ ক'রে নেমে এল নিচে। বারান্দায় পড়ে মায়ের মাথার কাছে জানলা থেকে চাপা গলায় ডাকলে, "মা মা শোন—ওঠ একবার!'

মা তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে উঠে দোর খুলে দিলেন, 'কি রে, ব্যাপার কি? কী হয়েছে মা?'

'তোমাদের ঐ রাখাল মা, ওকে কিছুতেই রাখা চলবে না। ওকে সকালে উঠেই তাড়িয়ে দেবে—'

'কেন—কেন, হ'ল কি ?'

'ওর স্বভাব চরিত্র ভারী খারাপ। একেবারে যা-তা—ওদের বাড়ির ঐ চপলা—। ছি ছি !'

ঘৃণায় কথাটা শেষ করতে পারলে না।

মা কিন্তু অতি সহজেই কথাটা নিলেন, 'ও, এই ! সর্ব রক্ষে। আমি বলি না জানি আর কি : ওসব তো বাছা আছেই। বলি ভদ্দরলোকদেরই স্বভাব-চরিত্র পাহারা দেওয়া যায় না—তা চাকর-বাকর। নে, নে—যা তুই শুয়ে পড়গে যা। তিলকে তাল ক'রে মাথা গরম করিস নি।'

তিনি একরকম ঠেলেই মেয়েকে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন।

নিজের ঘরে ফিরে এসে সুমিত্রা বিছানায় একরকম আছড়েই পড়ল। সারাজীবনের সমস্ত হতাশা, সমস্ত ব্যর্থতার বেদনা যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে আজ অশ্রুর আকারে বেরিয়ে এল। কঠিন ঠাণ্ডা বিছানাতে আকুল হয়ে মাথা ঠুকতে লাগল সুমিত্রা। বেঁচে থাকার এ যন্ত্রণা সে আর সইতে পারছে না : হে ঈশ্বর, সে মরতে চায় শুধু এখন !

পুনর্মিলন

কাজল যখন তার পুঁটুলিটা হাতে ক'রে আবার তার মায়ের দরজায় এসেই দাঁড়াল তখন রাধাদাসী ভূত দেখার মতোই আঁতকে উঠেছিল। বিস্ময়ে ভয়ে—অবিশ্বাসেও।

বিস্মিত অবশ্য কাজলও কম হয় নি। না, তার মায়ের এই দৈন্যদশা দেখে নয়, আবার যে তাকে এই এঁদো স্যাঁৎসেঁতে অদ্বিতীয় মাটির ঘরে এসে বাকি ভাইবোনের মধ্যে আশ্রয় চাইতে হল—এইটেই তখনও তার কাছে অবিশ্বাস্য। এমন যে হবে, হতে পারে—মাস দুই আগেও কে ভাবতে পেরেছিল !

রাধাদাসী লোকের বাড়ি কাজ ক'রে খায়—নেহাৎই বাটনাবাটা বাসন-মাজার কাজ। ভোর চারটেয় উঠে নিজের ঘরের বাসি পাট সেরে, ছেলেমেয়ে-

গুলোর জন্যে পান্তা বা বাসি রুটি বার করে রেখে তাদের বাবাকে এক গেলাস চা দিয়ে পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ে, চার বাড়ি কাজ সেরে দৌড়তে দৌড়তে ফিরে আসে দশটার মধ্যে। অবশ্য ওর বর পাঁচুগোপাল এই সময়টায় উনুন ধরিয়ে ভাত কিংবা রুটি ক'রে দেয় ছেলেমেয়েদের—তবে বিশ্বাসও নেই. হয়ত বেলা আটটাতেই ঘুমিয়ে পড়বে আবার—বড় ছেলে তিনটে, যারা ইস্কুলে পড়ে, তাদের খাওয়াই হবে না। মেজ মেয়েটাকে ইস্কুলে দিতে পারে নি, আট বছর বয়স থেকেই তাকে কাজে লাগাতে হয়েছে, সে এখন মাসে প্রায় চল্লিশ টাকা নিয়ে আসে।

বিশ্বাস করুন চাই না করুন—রাধাদাসী এককালে রূপসী ছিল। সেই-জন্যেই ওর বর ওকে আজও ছেড়ে যায় নি, নইলে ওদের ঘরে এ ঘটনা আক্‌-ছারই ঘটে, বিয়ে করে দু-তিনটে ছেলেমেয়ে হয়—তারপর পুরুষরা বেমালুম একদিন কোথায় সরে পড়ে। অন্য কোথাও গিয়ে আর একটা মেয়েকে বিয়ে ক'রে ঘর বাঁধে।

পাঁচুগোপাল যে তা করে নি তার দুটো কারণ। প্রথম—রাধাদাসী দেখতে ভাল, আজ এই নটি ছেলেমেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও দেহের বাঁধন অটুট আছে; দ্বিতীয় কারণ, পাঁচু হল কুঁড়ে। ঘরের বাইরে গিয়ে জন-মজুর খাটবে কি রাজ-মিস্ত্রীর সঙ্গে যোগাড় দেবে এত মেহনত তার পোষায় না। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে ঘরে বসে থাকে, অথচ খায় রাধাদাসীর তিনগুণ। সময়ে অসময়ে চা না পেলে গালাগাল দেয়, কখনও বা চ্যালাকাঠ ছুঁড়ে মারে।

রাধা যে তার এই অত্যাচার সহ্য করে, তার কারণও দুটো। প্রথমত সে বরকে সত্যিই ভালবাসে। দ্বিতীয়—ও ছেলেমেয়েগুলোকে সামলায়। সকালের ভাত বা রুটিটাও ক'রে দেয় বেশির ভাগ দিন। সে যদি অন্য বরেদের মতো ফেলে পালাত তো—কি আতান্তরেই না পড়ত। ছেলে দেখত, না কাজ করতে যেত?

রোজগার করাবার জন্যে অবিশ্যি রাধাদাসীর চেষ্টার ত্রুটি নেই, বলে কয়ে বিড়িওয়ালাদের কাছ থেকে কুলো, পাতা, মশলা সব এনে দিয়েছে, চেয়ে-চিন্তে পুরনো কাগজও এনে দিয়েছে ঠোঙা গড়ার জন্যে। কিন্তু কাজ যে করবে না তাকে দিয়ে করাবে কে! তবে—যা দু-চার পয়সা রোজগার করে তাতে

নিজের বিড়িটা, (কোন কোন দিন তাড়িও খায়) গায়ের গেঞ্জিটা নিজেই ক'রে নেয়।

কাজল রাধার বড় মেয়ে। তারপর তুটো ছেলেমেয়ে মরবার পর এই—এখনকার যে বড় ছেলে—নকড়ি জন্মেছে। এদের সঙ্গে ওর বয়সের অনেক ফারাক। কাজল মায়ের মতো রূপ না পাক—চটকটা খুব পেয়েছিল। তাই তের বছর বয়সে ওকে পার করতে বেগ পেতে হয় নি রাধার। পাত্রও—যতদূর সম্ভব ভাল পেয়েছিল। বাইশ বছর বয়েস, নাম করা একটা মোটর সারাই কারখানায় কাজ করে, তখনই কুড়ি টাকা হপ্তা পায়। দেখতে বেশ গ্যাট্টাগোট্টা, জোয়ান।

কিন্তু যার কপাল খারাপ তার তুঃখ খণ্ডাবে কে? বলাই যে ঐ বয়সেই চতুরঙ্গ নেশায় পাকা এবং রেস খেলতে শিখেছে তা কেউ বলে নি ওদের। বছর তুই ঘর করার পর তার মাইনে অনেক বাড়ল—কাজটা ভাল জানত, যন্ত্র-পাতিতে মাথাও খেলত—কিন্তু তার এক পয়সাও ঘরে আসত না। শ্বশুর দেখে শুনে 'ভেন্ন' করে দিলে, সে আরও আতান্তর। তখন একটা ছেলে কোলে এসে গেছে। শাশুড়ি পরামর্শ দিল বাড়ির কাজ ধরতে, রান্নার কাজ ধরতে পারলে আরও ভাল। তা-ই হয়ত করত শেষ পর্যন্ত কিন্তু এর ওপর একদিন নেশা করে এসে ভাত না পেয়ে যেদিন জুতোর বাড়ি বেদম পিটল সেদিনই মনস্থির করে ফেলল কাজল—ছেলেটাকে ঠাকুমার কোলে ফেলে দিয়ে মার কাছে চলে এল।

তারপর আর যায় নি। বলাই নিতে এলে আঁশবঁটি বাগিয়ে ধরেছিল। শ্বশুরকে বলেছিল, 'জ্যান্তে তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবো, বুড়ো ড্যাকরা, বদ-মাইশ হতচ্ছাড়া মিন্‌সে। ছেলেকে সামলাতে পারে না—ব্যাটার বৌকে খেতে দিতে পারে না, ঝি-গিরি করতে নিয়ে যেতে এসেছে! দূর হয়ে যা এখুনি বলছি—'

আর তারা আসে নি। কোন সম্পর্কও ছিল না। শুনেছে বলাই আবার বিয়ে করেছে। তা নিয়ে মামলা করা যায় নাকি, অনেকেই বলেছিল। কাজলের অত গরজ ছিল না, সে সিঁথির সিঁতুর মুছে আইবুড়ো সেজে এক বাড়িতে কাজে লেগে গেল। 'কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড' যাকে বলে, রান্না বাসনমাজা

সবই করত, খালি রাত্রে শুত এসে মায়ের কাছে।

এইখানে থাকতেই ওর বরাত ফিরে গেল। সুকুমার ছিল এঁদের ড্রাইভার। দেখতেও ভাল, লম্বা চওড়া জোয়ান। দুশো সওয়া দুশো টাকা মাইনে পায়। তখনও পর্যন্ত বিয়ে করে নি—অন্তত এই কথাই বলেছিল, পরে অবিশ্যি জানা গিয়েছিল আগে দুর্গাপুরে কাজ করত, সেখানে একজনকে জড়িয়ে পালিয়ে এসেছে এই যাদবপুরে। মেদিনীপুরে দেশ, সেখানে মা বাবা আছে, ভাই আছে দুটো, তেমনি দু-তিন বিঘে জমিও আছে। বাবা এখনও খাটতে পারে, কাজেই তাদের মাসে মাসে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা পাঠালেই চলে যায়।

সুকুমার তার দিকে আকৃষ্ট হবে এ স্বাভাবিক। কাজলও হল। অদৃষ্টও মুখ তুলে চাইলেন। সুকুমার পাটনায় এক বিলিতী ফার্মের ইঞ্জিনীয়ারের কাছে চাকরি পেয়ে গেল—তিনশো টাকা মাইনে, থাকার একটা ঘর দেবে। সুকুমার খেতে চাইলে তাঁরা খেতেও দেবেন—মাইনে না কমিয়েই। অতঃপর কালীঘাটে গিয়ে মালা বদল করে স্ত্রী পরিচয়ে নিয়ে গিয়ে সেই ঘরে তোলার কোন অসুবিধাও রইল না। মা বাবাকে বলে কয়েই গেল কাজল। মনিবরা নতুন বৌ শুনে একটা চৌকি আনিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে কিছু বিছানা দিলেন, হাঁড়িকুড়িও।

এইবার, এতদিনে সুখের মুখ দেখল কাজল। কুড়ি-একুশ বছর বয়স, এ বয়সে আজকাল কারও প্রথম বিয়েই হয় না। সম্ভোগের বয়সই এটা। তার উপকরণেরও অভাব রইল না। যা মাইনে পেত সুকুমার তা-ই যথেষ্ট। তাছাড়া পেট্রল চুরি করে, গাড়ি খারাপ হয়েছে বলে কারখানায় নিয়ে গিয়ে শতকরা পঞ্চাশ টাকা উপরি রোজগার হত। এক কথায় ঝি বা কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড কাজল প্রামাণিক 'লেডী' হয়ে গেল, মিসেস সামন্ত বলে পরিচয় দিতে শুরু করল। ভাল ভাল শাড়ি হতে লাগল, গয়নাও হয়ে গেল চার বছরে ছ-সাতখানা। রাধাদাসীকে টাকা পাঠিয়েছিল, সে কোলের দুটোকে নিয়ে এসে তিনদিন থেকে গেল। কাজল তাকে সাইকেল রিক্সা করে পাটনা শহর দেখিয়ে, হোটেলে খাইয়ে—নতুন শাড়ি, বাবার জন্যে একটা বাফতার জামা—ভাইবোনদের জামা বাবদ ষাটটা টাকা দিয়ে তাক লাগিয়ে দিলে। রাধাদাসী অভিভূত হয়ে একই সঙ্গে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার এবং কন্যার সৌভাগ্যের

জন্ম মা কালীকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ফিরে এল।

তারপর অকস্মাৎই এই বজ্রাঘাত—বলতে গেলে সত্যি সত্যিই বিনামেঘে।

কিছু বুঝতে পারে নি কাজল। মেমসাহেবের বাচ্চা দেখবার জন্যে নতুন আয়া এসেছিল একটি অল্পবয়সী মেয়ে। দেখতে মন্দ নয় তা কাজলও মানতে বাধ্য। হয়ত নতুন উদ্ভিন্ন-যৌবনা বলেই আরও ভাল দেখায়। তবে এই দেশের মেয়ে, বিহারী—কাজলের ভাষায় খোট্টা। কাজলকে ফেলে সুকুমার তার দিকে আকৃষ্ট হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

অথচ সেই অঘটনই ঘটে গেল। কবে ওদের ভাব হয়েছে, কোথায় দেখাশুনো গুজগুজ ফুসফুস হত—কিছুই খবর রাখে নি কাজল। হুঁশ হ'ল একেবারে যেদিন লালিয়া আর সুকুমার অন্তর্ধান হ'ল সেদিনই। কোথায় গেল—নিশ্চয় কোথাও নতুন চাকরি ঠিক করেছে। কিন্তু মালিকরাও সে কথা কিছু জানতে পারেন নি।

অনেক খোঁজখবর ক'রেও কোন হদিস করা গেল না। টাকাকড়ি সুকুমার এখানের একটা ব্যাংকে রাখত। সেখানে গিয়ে জানা গেল এক মাস আগেই সব উঠিয়ে নিয়েছে। ঘরেও একটি পয়সা রেখে যায় নি। মায় হারটার কোঁড়া কেটে গেছে বলে সারাতে দিয়েছিল কাজল, সেটাও নিয়ে গেছে। শুধু নিতে পারে নি ওর গায়ে যা ছিল, আর যা দুখানা ভারী গয়না মনিব-পত্নীর লকারে রাখতে দিয়েছিল—সেইগুলো।

খোঁজখবর কান্নাকাটিতে পেট ভরে না। মনিবরা দয়া করে মাসখানেক রাখলেন, খাওয়ালেনও, তারপর বললেন, ঘর ছাড়তে হবে। নতুন ড্রাইভারের বাড়ি পাটনা সিটিতে। সেখান থেকে আসা-যাওয়া করলে ওঁদের অসুবিধা. তারও।

কাজল অবশ্য শুধু বসে হা-হুতাশ করার লোক নয়। সে এর মধ্যেই কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছে। যে গয়লা গরু এনে এঁদের দুধ দিয়ে যেত, তার বয়স চল্লিশের ওপর। তাদের ছেলেপিলে হয় নি বলে দুঃখের অবধি ছিল না, তাকেই ছেলেটা দিয়ে দিল কাজল—ছেলে কোলে করে কোথায় কাজ পাবে? তবে এও বলে দিল, 'তোমাকে একেবারে দিচ্ছি না, আমি ওর খরচও কিছু

দিয়ে যাচ্ছি। যদি আবার দিন পাই এসে নিয়ে যাব।' সেই কথা-মতোই, ভারী নেকলেস আর মোটা বালাটা—সব মিলিয়ে সাড়ে চার ভরি সোনা—তাকে দিয়ে দিল ছেলের সঙ্গে, রসিদ লিখিয়ে নিয়ে। তারপর গায়ে যা ছিল খুলে পেট-কাপড়ে বেঁধে কাপড় জামাগুলো পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে মায়ের কাছে এসে উঠল।

প্রথম বিস্ময় কমতে রাধাদাসী বেশ চাট্টি কথা শোনাল।

'কেন, এখন এই গরীব দুঃখী মায়ের দোরে এসে দাঁড়াতে লজ্জা করল না? এতদিন পরে এই ঝাড়ুদারণী চাকরাণী মাকে মনে পড়ল কেন? মেম-সাহেব লোক, এ ঘরে থাকতে পারবে?...টাকার আণ্ডিলের ওপর বসে ছিলে যখন মা—কই, তখন তো মাসে কুড়িটা টাকাও পাঠাবার কথা মনে পড়ে নি। তখন ভাবো নি একবারও যে ভিখিরী মা-বাপকে আবার দরকার হতে পারে, না? ছোট ছোট ভাইবোনগুলো ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট করে দিন রাত, জানো তো। এখানে থেকে তো দেখেছ। উপার রোজগারের তো কোন হিসেব ছিল না জামাইয়ের—তুমি কুড়ি-পঁচিশটা করে টাকা পাঠালে সে টেরও পেত না। তখন আর মা বাপ ভাই বোনকে মানুষ বলে মনে হয় নি—না? বোধ হয় পরিচয় দিতে লজ্জাই হ'ত। কিন্তু সে যখন মুখে লাথি মেরে চলে গেল—আর কোন চুলোয় ঠাঁই হ'ল না, এই ভিখিরীর ঘরে এসেই তো সেঁধুতে হ'ল। হাত্তোর মেয়ের নিকুচি করেছে রে!' ইত্যাদি—

অবশ্য কাজলও এর উত্তর দিতে কসুর করল না। সে সমান তেজের সঙ্গে শুনিয়ে দিল, তেরো বছরে বিয়ে হয়েছিল তার, তার আগে দশ বছর বয়স থেকে চাকরি করেছে। আবার যখন এসে উঠতে হয়েছে তখনও এক মাসের বেশি পুষতে হয় নি তাকে—চাকরিতে ঢুকে তাদের কাছে খেয়েছে, এখানে মাইনের টাকা গুঁজেছে। পাটনাতে যে নিয়ে গিয়েছিল—তাতে ওর প্রায় দেড়শো-দুশো টাকা খরচ হয়েছে। সে কি কিছুই করে নি? এমন বেইমানীর কথা মুখে আনল কি ক'রে মা-বাবা।

ফলে একটা রফা হতেও দেরি হ'ল না। কিন্তু দিন-কুড়ি যেতে-না-যেতে কাজল বুঝল শুধু এখানে আসাটা উচিত হয় নি। ওর যে অল্প সোনায় দু-

তিনটে গয়না সঙ্গে এনেছিল, সরু বারোমেসে হার, ব্রোঞ্জের চুড়ি আর কানের দুল—বাবা-মা দুজনেরই শ্যেন দৃষ্টি পড়ল তার ওপর। বাবা বলেন, 'আমাকে দুশোটা টাকা দে, আমি একটা চায়ের দোকান দি।' মা বলে, 'সামনে শীত, ছেলে-মেয়েগুলো হি-হি ক'রে কাঁপে। আমাকে দুশোটা টাকা ধার দে, আমি মাসে পাঁচ টাকা ক'রে শোধ দেব।'

ভাইবোনেরাও বাদ যায় না—বোধ হয় বাপের শিক্ষাতেই—ইস্কুলের বই-খাতা চায়। কিন্তু সেইটেই পারে না কাজল। যখন কিচ্ছু ছিল না তখন অত পরোয়া করে নি, এখন আর এই সামান্য পুঁজি হাতছাড়া করতে সাহস হয় না। অথচ আর যায়ই বা কোথায়! যা সামান্য পুঁজি আছে, হাতিয়ে নিয়ে মা-বাবা যদি পায়ে থ্যাতলায়? এই চার-পাঁচ বছরে অভ্যেস পাল্টে গেছে—এখন আর বাসন মাজা ঘর মোছার কথা ভাবতেও পারে না।

তবু, হরিণীও ফাঁদে পড়লে মরীয়া হয়ে ওঠে। কাজলও কতকটা মরীয়া হয়েই একটা কাজ করে বসল। খোঁজ নিয়ে একদিন দুম করে বলাইয়ের কারখানায় গিয়ে হাজির হ'ল। তাঁরা বললেন সে এখানের কাজ ছেড়ে আজ বছর দুই হ'ল অন্য কারখানায় গেছে। তবে সেখানের নাম ঠিকানা জানেন তাঁরা, বলেও দিলেন। বোধ হয় বলাই কিছুটা বিপদে পড়বে এই আশাতেই।

খোঁজ নিয়ে সেখানেও গেল একদিন। বড় কারখানা ঠিকই, তবে এমন নয় যে এত্তেলা দিয়ে ঢুকতে হবে। সোজা গিয়ে যেখানে বলাই কাজ করছিল সেখানে দাঁড়াল। বলাইয়ের তো ভূত দেখার মতো অবস্থা। কিন্তু সে বিস্ময় সামলাবার সময় দিল না কাজল। বলল, 'আমার খোরপোশের টাকার ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমার সঙ্গে বে এখনও ফারকৎ হয়ে যায় নি, তার আগে আর একটা বে করেছ—বে-আইনী। আমি নালিশ করলে এখনকার আইনে তোমার জেল হয়ে যেতে পারে, তা জানো।...ভাল চাও তো আমার একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করো।'

বলাই যে বলাই—সেও ওর সাহস দেখে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে শুধু চেয়েই রইল। চারদিকে এর মধ্যেই অনেকে হাতের কাজ ফেলে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে। বিরাট একটা মজার গন্ধ পাওয়া গেছে, সকলেরই এমনি মুখের ভাব।

অবশ্য সামলে নিতেও বলাইয়ের খুব দেরি লাগল না। সে একটা কদর্য কটূক্তি ক'রে বলল, 'যা যা মাগী, আমাকে আইন দেখাস নি। যা, যদি মুরোদ থাকে—আদালতে গিয়ে দাঁড়াগে যা। কে তোর কত আসনাইয়ের মুরুব্বী আছে, মামলার খরচ চালায় দেখি একবার। আমি তো তাই চাই। পাঁচ বছর একটা লোকের ঘর ক'রে এলি রাঁড় হিসেবে—এখন আমার ইস্ত্রী সাজতে এসেছিস। তোর বুকের পাটাও বলিহারি যাই।'

ফস ক'রে বলে ফেলল কাজল—কিছু না ভেবেই· 'রাঁড় সিহেবে কিসের, দস্তুরমত পুরুত ডেকে মালা বদল করিয়ে তবে সঙ্গে গেছি, বেস্তর সাক্ষী আছে।'

'এই তো। শোন ভাই সবাই তোমরা। এক বে ফারকৎ না হতেই আর একজনকে বে করেছে। কর্ এবার নালিশ, কে জেলে যায় দেখি—এই এত-গুলো লোক আমারও সাক্ষী রইল।'

এবার দমে যাওয়া ছাড়া উপায় কি ? নিজের বোকামিতে নিজের চোখেই জল এসে গেল, আপসোসের সীমা রইল না। চারিদিকে লোক মিচাক মিচকি হাসছে, মালিকরা তাড়া দিচ্ছেন, 'যাও যাও সব নিজের কাজে যাও, কাজ ফেলে এসব কী তামাশা!' তার মধ্যেই পা পা ক'রে বেরিয়ে আসতে হ'ল।···

লজ্জায় দুঃখে হতাশায় চোখে জল এসে গিছল, তাই অত লক্ষ্যও করল না যে বলাই মুখে যা-ই বলুক এর মধ্যেই তার নেশা করা কোটরগত চোখে অপরিসীম একটা লুব্ধতা ফুটে উঠেছে। কাজল কোনমতে এসে ফুটপাথে একটা আলোর থামে ঠেস দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করছে—বলাই এসে দাঁড়াল।

'এই শোন্!'

এ আবার কি! দুঃখ অপমান—'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' অবস্থাও ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখল বলাইয়ের দিকে। হঠাৎ এই আশ্চর্য নরম গলা —এমন তো কখনও শোনে নি, এমন কি সেই প্রথম যৌবনেও না!

'শোন্—ঝগড়াঝাঁটি চোখ-রাঙানোতে কিছু হবে না। তোর অবস্থা তো বুঝতেই পারছি। তা বলি কি, আমার ঘরেই আবার এসে ওঠ্ না।'

'তোমার ঘরে? কেন সে বৌ—?'

'আরে, সে আর বলিস না। সে চিররুগ্নী। মাসের আদ্দেক দিন উঠতে পারে না। দুটো বাচ্চা হয়েছে, তোর ছেলেটাও আছে—তাদের নিয়ে যে কী নাটাঝামটা খচ্ছি কি বলব। তুই আয়—কোন অসুবিধে হবে না।'

'হ্যাঁ, তারপর আর একটা কোলে আসুক—তখন একটা বদনাম দিয়ে আবার তাড়াবে—এই তো! আর নেশা ক'রে এসে ঠেঙাবে।'

'ওরে না না, নেশা-ফেশা সব ছেড়ে দিয়েছি। যা দিন-কাল, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তাছাড়া মদ, তাড়ি আর সহ্যিও হয় না, পেটে ব্যথা ধরে। তুই আয়, তোর কোন ভয় নেই। আমি একদম বদলে গেছি।'

অনেকক্ষণ ভাবল কাজল। আকাশ-পাতাল ভাবল বলতে গেলে। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, 'লাভের মধ্যে যা দু-এক কুচি আছে সেগুলো কেড়ে নিয়ে বেচে দেবে—এই তো?'

'ও হরি! এই ভয় করছিস?' হঠাৎ বলাই উদার হয়ে ওঠে। বলে, 'বেশ তো, ওগুলো মায়ের কাছে দিয়ে আয়, তাহলে তো আর সে ভয় থাকবে না। তাছাড়া আমি তোকে লেদের কাজ শিখিয়ে দোব—যদি আমি মরেও যাই, তোকে কারও হাত-তোলায় থাকতে হবে না।'

আর দ্বিধা করে না কাজল। তখনই বাড়িটা দেখে আসার জন্যে রওনা হয়।

এই বুদ্ধিই ভাল। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে গয়নাগুলো খুলে মার কাছে রেখে কাপড় জামা নিয়ে আসবে। আর একবার দেখবে বেয়ে চেয়ে—বরাতের সঙ্গে আর একটা বোঝাপড়া করবে।

ক্ষতি

প্রথম থেকেই ওর ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছিল। আমি হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে বাস্-এ চড়বার পর তিনবার না চারবার ও টিকিট চেয়ে গেল কিন্তু একবারও—আমরা যে দিকে বসেছিলুম, সে দিকে অর্থাৎ পিছনের দিকে কারুর কাছে টিকিট চাইলে না। সোজা এগিয়ে যায় সেই মাথার

দিকে—ওখানেই চারটে সীটের আটজন লোকের কাছে টিকিট চায়—আবার ফিরে আসে। কোন দিকে তাকায় না—দৃক্‌পাত করে না। ফলে একেবারে সামনের সীটের এক বুড়ো ভদ্রলোক তো একবার রেগেই উঠলেন, 'কতবার টিকিট চাইবে, সেই থেকে তো বার পঁচিশেক হ'ল। একই লোক বসে আছে সেটা কি এখনও মনে পড়ছে না—এতবার দেখেও!'

কণ্ডাক্‌টরটিও বিড় বিড় ক'রে কি বকতে বকতে চলে গেল। সেটা ক্ষমা প্রার্থনা, অথবা বিরক্তি প্রকাশ তা—বোঝা গেল না।

এরপরই উঠল চেকার—অর্থাৎ জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে। তখনও দেখা গেল যে আমাদের পিছনে এক রো আর সামনের তিন চার রো—কারুর টিকিট নেওয়া হয় নি। কেউ আসছে কলেজ স্ট্রীট থেকে, কেউ বা বৌবাজার থেকে। খান দু-তিন তিন-আনার টিকিট চাইতেই ইন্‌স্পেকটার বা চেকার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন. 'এতক্ষণ কি করছিলেন মশাই, এতগুলো তিন আনার টিকিট? কি বললেন, আপনার চৌদ্দ পয়সা! বলিহারি।'

এসব ক্ষেত্রে সব কণ্ডাক্‌টরই সাফাই গায়, 'আমি তো চেয়ে চেয়ে গেছি, ওঁরা না দিলে কি করব।' কিন্তু এ লোকটি সে দিক দিয়েই গেল না। মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল চেকারের মুখের দিকে।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, আমি যে আধুলি দিয়েছিলুম তার ফেরত পেলুম, তের আনা। আট আনা ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, 'আমি তো আধুলি দিয়েছিলুম!'

'ও মাপ করবেন। টাকা উনি দিয়েছিলেন—'বলে আমার পাশের ভদ্রলোকের হাতে তের আনা গুঁজে দিলে লোকটি।

'সে কি কথা! আমারও যে আধুলি, আর সে আধুলি তো আমার হাতেই এখনও মুঠো করা রয়েছে, আপনাকে তো এখনও দিই নি!'

'কি হয়েছে আপনার বলুন তো!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন ইনস্পেক্‌টার ভদ্রলোক।

তার কোন উত্তর দেবার আগেই—এইমাত্র পাওয়া আধুলিটা ঠকাস্ ক'রে কোথায় পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে খুঁজতে গিয়ে চামড়ার ব্যাগটা থেকে আরও ক'একগুলি রেজগি গেল পড়ে—ঝন্ ঝন্ ক'রে। ইন্‌স্পেকটার

ভদ্রলোক এবং অন্য দু-চারজন যাত্রী—সাহায্য ক'রে যতগুলো পারলেন খুঁজে দিলেন। কিন্তু ক্যাশ যদি বা উদ্ধার হ'ল, দাঁড়িয়ে উঠে টিকিট দিতে গিয়ে দেখা গেল ছ পয়সার টিকিটের বাণ্ডিলটা কোথায় উধাও হয়েছে।

এতক্ষণে ওর মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলুম। অল্পবয়সী তরুণ ছেলে, একহারা চেহারা, অথচ ঠিক রোগা নয়—বরং ওরই মধ্যে একটু বলিষ্ঠ দেখায় যেন। মোটের উপর সুশ্রী বলতেও বাধত না যদি না মুখখানা তিন-চারদিনের দাড়ি-গোঁপে কন্টকাকীর্ণ হয়ে থাকত। তাছাড়া চোখের কোলে সুগভীর কালি, প্রায় রক্তবর্ণ চক্ষু, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল—সব মিলিয়ে ওকে রীতিমতো অসুস্থই দেখাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি শুধু মূঢ় নয়—কতকটা উদ্‌ভ্রান্তও বটে।

আমার পাশের ভদ্রলোকও বোধ হয় এটা লক্ষ্য করেছিলেন—তিনি অর্ধ-স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'ওঁর বোধ হয় শরীরটাও ভাল নেই।'

কণ্ডাক্‌টার যেন চমকে চাইল তাঁর দিকে, নিমেষের জন্যে তার মূঢ় দৃষ্টিতে দীপ্তি ফিরে এল—মনে হ'ল আঁধারে কূল দেখতে পেলে সে।

সে একবার অসহায়ভাবে ইন্‌স্পেকটরের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'সত্যিই শরীরটা বড় খারাপ লাগছে!'

'সিক রিপোর্ট ক'রে চলে যান নি কেন?' ইন্‌স্পেকটার জবাব দিলেন।

দেশপ্রিয় পার্কে এসে থামতেই আমি বাস থেকে নেমে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই কণ্ডাক্‌টারটিও নেমে এল। প্রথমটা ভেবেছিলুম টাইম নিতে নেমেছে কিন্তু গুম্‌টির কাছাকাছি যেতেই কানে এল, 'দেখুন রায় বাবু, শরীরটা বড়ই খারাপ লাগছে, আমাকে রিলিফ দেবেন?'

'বেশ তো, ক্যাশ গুণে দিয়ে ব্যাগ জমা রেখে চলে যান। কিসে যাবেন, এই বাসেই যাবেন তো? না আট নম্বরে? আপনি যাদবপুর থাকেন না?'

'না, আমি শ্যামবাজারের বাসে উঠব—আজকাল ঐ দিকেই থাকি।'

কৌতূহল প্রবল হ'ল। গল্প লেখকের কৌতূহল। আমি পাশের ভদ্র-লোকের সঙ্গে একমত হই নি। আমি বেশ বুঝেছিলুম—খারাপ হয়েছে শরীর নয়, মন। একশো' চার জ্বর নিয়েও ডিউটি দিতে দেখেছি লোককে কিন্তু তাতে

এত অন্যমনস্কতা দেখি নি কখনও। এ রকম উদ্‌ভ্রান্ত ও মূঢ় দৃষ্টি তো নয়ই।

বেশ বুঝতে পারলুম কোন একটা বড় রকমের মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু এতটা উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলার মতো কী ঘটতে পারে?

অপেক্ষা করলুম একটু। এমন কোন কাজও ছিল না হাতে। বাড়ি ফেরা তো, যখন হোক ফিরলেই হবে। আর এই তো মোটে আটটা।

ছোকরা ক্যাশ আর টিকেট জমা দিয়ে সরে এসে ফুটপাথে দাঁড়াল খানিকটা—ওপারে যাবার কোন চেষ্টাই করল না। আশান্বিত হয়ে উঠলুম, অর্থাৎ এখনই শ্যামবাজারের বাস ধরবে না।

তেমনিই মূঢ় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রাসবিহারী য়্যাভিন্যুর জনস্রোতের দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে থেকে একসময় যেন চমকে উঠল, হয়ত মনে পড়ল গুম্‌টির রায়বাবুর কথা।

যদি দেখতে পান তো কী মনে করবেন ভদ্রলোক! তাড়াতাড়ি খানিকটা পূর্বমুখে এগিয়ে গিয়ে পার্কের গেটটার সামনে আর একবার থমকে দাঁড়াল। কোথায় যাবে মন স্থির করতে পারছে না—বাড়ি যাবার ইচ্ছা আদৌ প্রবল নয়। আমার অনুমানই সমর্থিত হ'ল—ব্যাধি শরীরে নয়, মনে। দেহ অসুস্থ হ'লে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না।

খানিকটা অমনি দাঁড়িয়ে থাকবার পর একটু ইতস্তত ক'রে সে পার্কেই ঢুকে পড়ল। ভেতরে গিয়ে ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে একটু ঘুরল—সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে, তারপর অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও নির্জন কোণ বেছে নিয়ে ঘাসের ওপরই এলিয়ে শুয়ে পড়ল, আকাশের দিকে চেয়ে।

আমি দূর থেকে এতক্ষণ ওর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। এইবার সুযোগ পেয়ে কাছে গিয়ে ঠিক ওর পাশটিতে বসে পড়লাম। ও চমকে উঠল, একটু বোধ হয় বিরক্তও হ'ল এই ঘনিষ্ঠতায়।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'দেখুন, আমি ঐ বাসে ছিলুম।'

'কো-কোন্ বাসে?' কেমন যেন ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে।

'এইমাত্র যে বাস থেকে এলেন। আমিও ছিলুম, প্যাসেঞ্জার একজন। আমাকেই আপনি আধুলি নিয়ে টাকার রেজগি দিয়েছিলেন!'

'ও!' নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর এল। সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে এটাও ছিল যে

বেশ তো, বাস তো ছেড়েছি, আর কেন? সরে পড়ো দিকি বাপু।

'আচ্ছা কি হয়েছে আপনার বলুন তো ঠিক ক'রে।'

'শরীরটা খারাপ লাগছে।' বিরক্ত, ঈষৎ যেন রুষ্টও শোনাল কণ্ঠস্বর।

'তা তো আপনি ওখানেও বললেন। কিন্তু তাই কি ঠিক? সে রকম অসুখ করলে বাড়িই চলে যেতেন। অত দাঁড়িয়ে ভাবতেন না। আমার বিশ্বাস মনের মধ্যেই আপনার একটা কি প্রলয় কাণ্ড ঘটেছে—ঠিক কিনা বলুন?'

'কী হবে আপনাকে ব'লে? কে আপনি? আপনাকে তো আমি চিনি না!'

বেশ একটু রূঢ় হয়ে ওঠে। রাস্তার উজ্জ্বল আলোর আভায় আমাকে ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করে।

'বলাটা আপনারই প্রয়োজন, যতক্ষণ না বলতে পারছেন ততক্ষণ আপনার শান্তি নেই। আর সে রকম বলবার মতো লোকও আপনার নেই তা বুঝতে পারছি, নইলে আপনি সেখানে না গিয়ে মাঠে এসে শুয়ে পড়তেন না। বাড়িও ছেড়েছেন মনে হচ্ছে—থাকতেন যাদবপুর—চলে গেছেন শ্যামবাজারে। আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে বলুন দিকি!'

'আপনি কি গোয়েন্দা?' কেমন যেন ভয়ে ভয়ে উঠে বসে সে।

'না, গোয়েন্দা নই, সাহিত্যিক। তাদের কৌতূহল পরের তাগিদে—আমার কৌতূহল সাহিত্যের তাগিদে। তফাত এই!'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, 'ঠিক বলছেন? শুধুই কৌতূহল? অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?'

'ঠিক বলছি, দরকার হয় তো দিব্যি গেলে বলতে পারি।'

'তাহলে শুনুন। আপনাকেই বলব সব খুলে। কাউকে বলতে না পারলে আমারও আর চলছে না, সত্যিই।'

একটু একটু ক'রে খাপছাড়া এলোমেলো ভাবে বেরিয়ে এল সমস্ত বিবরণ। তার মধ্যে যে ঠিক পারম্পর্যও রইল না, তা বলাই বাহুল্য। বহু কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, জেরা ক'রে জানতে হ'ল। কাহিনী যখন শেষ হ'ল তখন যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এই:

ছেলেটির নাম অশোক। বাড়ি ওদের পূর্ববঙ্গে। সংসারের অবস্থা খুব ভালো না হ'লেও পড়াশুনো করত, বাংলা যখন ভাগ হ'ল তখন সবে ইণ্টারমিডিয়েট পাস ক'রে সে বি-এস-সিতে ভর্তি হয়েছে। তারপর আর পড়াশুনো সম্ভব হয় নি। ওদের গ্রামে ঠিক কিছু হয় নি কিন্তু তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে টিকতে পারবে না ওরা—তা আগেই অনুমান করেছিল। শহর ছেড়ে পড়াশুনো ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বসতে হ'ল। কারণ প্রতিদিনই নতুন গুজব। বাড়ির ছেলেরা বাড়িতে না থাকলে মেয়েরা থাকে কি ক'রে? বৌদি ছিলেন, বয়স্কা বোন ছিল—মা কাকী পিসি তো ছিলই। দাদা রংপুরে চাকরি করতেন, তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়, বাবা বুড়ো মানুষ সুতরাং অশোক আর তার ছোট ভাইকেই দেশে গিয়ে বসতে হ'ল।

তারপর ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারীতে এমন কাণ্ড শুরু হ'ল চারদিকে, যে আর দেশে থাকা সম্ভব হ'ল না। শোনা গেল যে এর পর আর আসাই যাবে না। পড়ে রইল জমি-জমা গরু বাছুর, ঘরের টিনগুলো পর্যন্ত বিক্রী ক'রে আসা গেল না। তবে ওর বাবার বন্ধু হবিব মিয়ার ছেলে আতোয়ার দয়া ক'রে এসে সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাওয়াতে সামান্য কিছু গহনাপত্র টাকা-কড়ি নিয়ে আসা গিয়েছিল। ওরা আশা করেছিল পরিবারবর্গ নিরাপদে কলকাতায় এসে পৌঁচেছে জানলে দাদা আর চাকরীটা ছাড়বে না। কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে যে কদিন থাকতে হয়েছিল তারই মধ্যে দাদাও এসে জুটলেন, চাকরী ছেড়ে দিয়ে।

এর পরের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এই যে ওরা যাদবপুরের কাছাকাছি একটু জমিতে ছিটে-বাঁশের দুখানা ঘর তুলে নিয়েছে এবং দাদা অন্য কোথাও কোন কাজ জোটাতে না পেরে এক বাজারে ফলের দোকান দিয়েছেন। ওদের পড়াশুনার কথা ওঠেই না—কারণ সামান্য যা কিছু আনতে পেরেছিল ওরা, তা এক বছর বসে খেতে এবং ঘর তুলতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। বৌদির হাতের শেষ বালা জোড়া বেচে দাদা দোকান দিয়েছেন। যাই হোক—অশোক এ চাকরীটা পেয়ে গিয়েছিল বছর খানেকের মধ্যেই, তাই রক্ষা, কোনমতে সংসার চলছে। ছোট ভাই অরুণ—সম্প্রতি এক কারখানায় ঢুকেছে, য়্যাপ্রেণ্টিস্ হিসেবে।

অর্থাৎ এইবার একটু সুখের না হোক—স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবার কথা।

এমন সময় এসে জুটল দীপ্তি—কোথা থেকে অতর্কিতে।

মাস আষ্টেক আগের কথা। গাড়ি এসে গড়িয়াহাট ডিপোয় থেমেছে—অশোক একটা সীটে বসেই ক্যাশটা মোটামুটি একবার মিলিয়ে নিচ্ছে, হঠাৎ মুখ তুলে দেখে সামনের সীটে তখনও একটি তরুণী মেয়ে বসে আছে—বেশ সুশ্রী চেহারা, হাতে বই খাতা ;—বেশভূষার মধ্যে মহার্ঘতা না থাকলেও রুচির পরিচয় আছে ; এক কথায় শিক্ষিত ও সম্পন্ন ঘরের মেয়ে—ওরই দিকে স্মিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

হিসেব গোলমাল হয়ে গেল নিমেষে।

'আপনি নামবেন না ?' প্রশ্ন করে অশোক।

'না।' বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ—দ্বিধা কি সঙ্কোচের নাম-গন্ধ নেই। 'আমার নামার কথা দেশপ্রিয় পার্কে। আমি ল্যান্সডাউন অঞ্চলে থাকি—'

'তবে ?'

'অন্যমনস্ক হয়ে চলে এসেছি। তাতে কি, আবার ফিরে যাবো।'

রাত তখন নটা। সামনে আরও তিনখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। স্বভাবতই ব্যস্ত হয়ে উঠল অশোক, 'আপনি নেমে ঐ আগের গাড়িতে গেলেন না কেন ? এটার বেরোতে অনেক দেরি হবে। অন্তত আধ ঘণ্টা।'

'থাক গে, আমি আর উঠতে পারছি না। একসময় যাবে তো ! অবশ্য আপনার অসুবিধা হয় তো আলাদা কথা।'

'না না—আমার অসুবিধা কি ?' লজ্জিত হয়ে অশোক হিসাবে মন দেয়। ড্রাইভার বসে ছিলেন আলো নিবিয়ে দেবেন ব'লে, তিনি একটু মুচকি হেসে ওপাশ দিয়ে নেমে গেলেন অসংখ্য চায়ের দোকানের একটিতে—আলুর দম পাঁউরুটি আর চা খাবেন ব'লে।

অশোক ক্যাশগুলো আবার থলিতে ও পকেটে পুরল। টিকিটগুলো আর একবার মিলিয়ে নিলে। এইবার ওর নেমে যাবার পালা। গুমটিতে যেতে হবে। চা একটু খেয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। ক্ষিধেও পেয়েছে। শ্যামবাজারে খাবার সুবিধে হয় না। এখানেই ভাল।

সে একবার মেয়েটির দিকে চাইল।

মেয়েটি তেমনি নির্নিমেষ নয়নে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পাতলা দুটি ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য প্রসন্নতা।

ওর চোখে চোখ পড়তেই বললে, 'বসুন না একটু।'

'এটা একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসি, নইলে—'

'একটু পরেই যাবেন। এখনও তো দেরি আছে। এঁরা আলো নিভোবেন নাকি?'

'না—না। অসিতদা নেমে গেছেন। বসুন আপনি।'

তারপর মেয়েটি একে একে ছোট ছোট নানা প্রশ্ন করে। ওর নাম ধাম, সাধারণত কখন ডিউটি পড়ে, আসছে কাল কটা থেকে কটা—কোন্ লাইন। ওর নম্বর কত ইত্যাদি। খুব যে আগ্রহ আছে তা প্রশ্ন করবার ভঙ্গীতে মনে হয় না। মনে হয় সময় কাটানোর জন্য অলস প্রশ্ন এগুলো।

ওর নামধামও অশোকের জানতে ইচ্ছা হয় বৈকি। কিন্তু সঙ্কোচে বাধে। অপরিচিতা সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী মেয়েকে 'আপনার নাম কি' প্রশ্ন করা যায়? বিশেষত ওর মতো লোকের কাছে সেটা ধৃষ্টতা।

অবশেষে আগের বাসটাও যখন ছেড়ে চলে গেল তখন হঠাৎ এক সময় মেয়েটি বললে, 'আপনাকে যখন এত কথা জিজ্ঞাসা করলাম তখন নিজের পরিচয়ও কিছু দেওয়া দরকার—আমার নাম দীপ্তি লাহিড়ী। আমার বাবা য়্যাটর্নী।···আবার আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন তো?'

'সেটা আগে থাকতে কি ক'রে বলি বলুন! এর পরে দেখা হোক।' মুচকি হেসে বলে অশোক।

'বা-রে, বেশ তো কথা কইতে পারেন। এতক্ষণ কেমন ভালমানুষের মতো হাঁ-না জবাব দিচ্ছিলেন!'

'আপনাদের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলাও যে আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। আমরা সামান্য কণ্ডাক্টার বই তো নই। প্যাসেঞ্জারের কাছে আমরা মানুষের চেয়ে ছোট কোন জীব।'

দীপ্তি উত্তেজিত ভাবে কি একটা প্রতিবাদ করতে গেল কিন্তু সেই সময়ই দুটি মহিলা এসে উঠলেন। ওদিকে ড্রাইভার অসিতবাবু এলেন গাড়িখানাকে এগিয়ে নেবার জন্য। অশোককেও নেমে যেতে হ'ল টাইমবাবুর কাছে। আর

কোন কথাই হ'ল না।

অশোক মনে মনে চটেই গেল মেয়েটার ওপর—কী দরকার ছিল এমন ভাবে বসে থাকার! মাঝখান থেকে ওর চা খাওয়াই হ'ল না। পেটে যেন কুকুর কামড়াচ্ছে—এত ক্ষিধে।

দেখতে দেখতে বাস ভরে উঠল। আর কথা কওয়ার সময় হ'ল না। একেবারে ল্যান্সডাউনের মোড়ে নেমে যাওয়ার সময় শুধু মেয়েটি একবার ওর চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে খুব মিষ্টি হেসে গেল।

সেদিন রাত্রে কি দীপ্তির কথা ওর খুব মনে পড়ছিল? খুব মনে হয় নি নিশ্চয়ই। সে অবসর কোথায়? রাত বারটার পর বাড়ি ফিরে গিয়ে শুতে শুতে একটা হয়েছে। তখন শারীরিক ক্লান্তিতে সমস্ত স্নায়ু আপনিই অবশ হয়ে এসেছে—একবার হয়ত মনে হয়েছিল মিষ্টি একখানা মুখ, পাতলা লাল দুটি ঠোঁটে ঈষৎ একটু হাসির ভঙ্গী। রাগও হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে—অশোকদের জীবন নিয়ে এসব অলস কৌতূহল ঐ ধনী দুলালীদের কেন?

পরের দিন সকালে উঠেও সহস্র সাংসারিক কাজের মধ্যে একবার মনে পড়েছিল কিংবা পড়ে নি। বাসের পাটাতনে পা দিলে তো পৃথিবীটাই ভুলে যেতে হয়—তা সুশ্রী তরুণী মেয়ে!

কিন্তু হঠাৎ ও চমকে উঠল রাত নটা নাগাদ যখন ওর বাস থেকে গড়িয়া-হাটের গোল পার্কের কাছে একটি ছাড়া সব যাত্রী নেমে গেল—তখন সেই একটির দিকে চেয়ে।

দীপ্তি লাহিড়ী! ঠিক তো!

কৌতুকভরা চাপা হাসি ওর ঠোঁটের কোণে, চোখের চাহনিতে।

'এ কি! আজও অন্যমনস্ক হয়ে নাকি? না এদিকেই যাবেন?' প্রশ্নে একটু খোঁচা ছিল অশোকের।

'যাক। চিনতে পেরেছেন তাহলে? বাঁচলুম।'

'কিন্তু আমার কথার তো জবাব পেলাম না!' সাহস কি বেড়েই যায় অশোকের?

'হ্যাঁ—অন্যমনস্ক তো বটেই। তবে সে অন্য আপাতত আমার জানা এবং এক। স্থির ও ধ্রুব।'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না অশোক। অত বিদ্যাবুদ্ধি ওর নেই, কলেজে পড়ার স্মৃতি ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। দু-চারখানা সাহিত্যগ্রন্থ তখন যা পড়েছিল—এখন পড়বার সময়ও নেই, সুযোগও নেই।

সেদিন কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না—গাড়ি ছিল না আগে।

'এত তাড়াতাড়ি! কী মুশকিল।'

হাত-ঘড়িটা তুলে দেখে নটা দশ। আপন মনেই বলে, 'এত রাত্রে আর শ্যামবাজার যাওয়া সম্ভব নয়। কাল কটায় ডিউটি আপনার? এই সময়েই তো?'

'কেন বলুন তো!'

চাপা গলায় দীপ্তি তর্জন করে, 'ব'লে ফেলুন না তাড়াতাড়ি—দেখছেন না লোক আসছে।'

'হ্যাঁ—আফ্‌টারনুন ডিউটি।'

'ঠিক আছে।...'

পরের দিন ওর কথাটা ভোলে নি কিন্তু অশোক। সকালেও মনে পড়েছিল বারকতক। কালও কেন এল মেয়েটি? কাকে দরকার? কার কথা বলছিল? তবে কি—? না, তা বিশ্বাস হয় না অশোকের। এটুকু সহজ বুদ্ধি আছে ওর। ঐ রকম মেয়ে—কলেজে পড়া নিশ্চয়ই, সুশ্রী, শিক্ষিতা—অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, আর সে একটা বাসের কণ্ডাক্‌টার! নিশ্চয় অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে সে। ওকে তরুণ পেয়ে একটুখানি কৌতুক করে শুধু, একটু নাচাতে চায়। ভাবে বোকা বোকা লোক, এতেই চরিতার্থ হয়ে যাবে। সময়ক্ষেপের প্রয়োজন শুধু তার অশোককে নিয়ে।

তবু মনে পড়ে বৈকি।...

আসমানী রঙের শাড়ি আর লাল ব্লাউজে ওর দেহের স্বাভাবিক কান্তি যেন উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছিল, এলো খোঁপাতে ছিল দুটি রজনীগন্ধা ফুল। নামবার সময় তার একটি পড়ে গিয়েছিল—এক ফাঁকে সযত্নে কুড়িয়ে নিয়েছিল অশোক।...

সেদিন সন্ধ্যার সময় যতবার দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসেছে—তাকিয়ে দেখছে অশোক যাত্রীদের দিকে। না—তার অনুমান ভুল নয়, সাড়ে আটটা বরাবর ওদের বাস যখন ল্যান্সডাউনের মোড় অতিক্রম করছে তখনই দেখতে পেয়েছে সে, একটু দূরে স্ট্যাণ্ডের কাছে আব্‌ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে—সাদা শাড়ি ও মেরুন রঙের সিল্কের ব্লাউজ তার পরনে। ভাল দেখা যায় না—তবু চিনতে পারে সে। মেয়েটিও খুব সহজ ভাবে কোন দিকে না তাকিয়ে বাসে এসে ওঠে।

গড়িয়াহাটে এসে থামতে অশোক আর বিরক্তি চাপতে পারে না। বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'কই, নামলেন না ?'

'নামব বলে তো উঠি নি।' বেশ আরাম ক'রে পা দুটো সামনে ছড়িয়ে বসে দীপ্তি, 'আজ সামনে দুখানা গাড়ি আছে। অনেক সময় পাবো।'

ড্রাইভার হারানদা নেমে যেতে যেতে বলে, 'আলো জ্বালাই রইল অশোক, তোর তো দেরি হবে।'

ওপরের কণ্ডাক্‌টর হিসেব মিলোবে বলে আসছিল, দীপ্তিকে দেখে মুচকি হেসে সামনের বাসে গিয়ে বসে ক্যাশ গুনতে লাগল। দৃষ্টিটা কিন্তু এদিকে।

অশোকের কান মাথা গরম হয়ে উঠল। সেও নেমে পড়বার উপক্রম করলে।

'ও কি, চললেন কোথায় ?' বেশ সহজ সুরেই বলে দীপ্তি।

'ওদিকে যাচ্ছি, বিনয়দার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

'বা রে ! আমি বুঝি একা থাকব ?'

'সে আপনার খুশি। আমি কি করব বলুন।'

'বসুন দিকি লক্ষ্মী হয়ে। ঐখানে বসেই টাকা গুনুন।' আদেশের ভঙ্গী ওর।

হতাশ হয়ে বসে পড়ে অশোক, 'এ কী শুরু করেছেন বলুন তো !··· আমার বাসেই ওঠেন কেন বেছে বেছে,—এরা যে এখনই হাসাহাসি শুরু করেছে !'

'করুক না। তরুণ ছেলের পক্ষে তো এ দুর্নাম গৌরবের !'

'গরীবের ছেলের পক্ষে নয়।' একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলে অশোক।

দীপ্তি কিন্তু অপ্রস্তুত হ'ল না, সেও সমান তেজের সঙ্গেই জবাব দিলে, 'বয়েস যাদের অল্প তাদের জীবনকে টাকার হিসেবে মাপা যায় না।'

'অল্প বয়সের সে তেজ ততক্ষণই ভাল মানায়, যতক্ষণ না পেটের প্রশ্ন ওঠে। ক্ষিদের কাছে কিছুই বড় নয়।'

'এখানে সে প্রশ্ন উঠছে কি? পেটের জন্য পরিশ্রম যারা করে, তাদের কী আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভদ্র হওয়া সম্ভব নয়?' দীপ্তির কণ্ঠস্বরে অনুযোগ ফুটে ওঠে।

অশোক অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে। যদিচ নিজেই অনুভব করে যে অপ্রস্তুত হবার তার কোন কারণ নেই। সে কিছুই অন্যায় করে নি। সত্যিই—ধনীর সন্তানের পক্ষে যা কৌতুক তাদের কাছে তা মারাত্মক। তাদের জীবনে এ স্মরণীয় বিলাসের অবসর নেই। বাজে খরচ করার মতো এত সময় তাদের নেই। কিন্তু তবু কিছুই যেন বলতে পারে না। দীপ্তির মতো মেয়ের সঙ্গে সমানে তর্ক করার মত দুঃসাহস তার নেই। তার অবস্থা শিক্ষা দীক্ষা পদবী —কোনটাই ওর সমান নয়। এইখানেই ওর জিৎ!

সে চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে বসে আছে দেখে দীপ্তি বললে, 'কই, আপনি হিসেব মিলোলেন না?'

'পরে মিলোব!' সংক্ষেপে উত্তর দেয় অশোক।

'আচ্ছা আচ্ছা। আমি নেমে যাচ্ছি।' দীপ্তি ওঠবার ভঙ্গী করে।

'না, না—বসুন না।' আকস্মিক আকুল আমন্ত্রণ বেরিয়ে আসে অশোকের কণ্ঠ থেকে—নিজের অজ্ঞাতসারেই।

'কী দরকার আপনার কাজের ক্ষতি ক'রে!' সূক্ষ্ম অভিমান ওর গলার আওয়াজে।

'না, না—কাজ সারছি আমি।'

'আচ্ছা, কালও কি আপনার ইভনিং ডিউটি?'

'না, কাল মর্ণিং। রাত চারটেয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে লেকে এসে গাড়ি ধরতে হবে। পাক্কা তিন মাইল হাঁটা।'

'তারপর? ফিরবেন কখন?'

'বাড়ি পৌছতে আড়াইটে তিনটে। তাও যদি একটু দেরি হয়ে যায়,

ফার্স্ট কার না পাই তো আরও দেরি।'

'যাক্‌গে—তাহ'লে বিকেলে তো ছুটি আছে। কাল সন্ধ্যেয় ছটার সময় দেশপ্রিয় পার্কের গেটের কাছে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। ঠিক আসবেন কিন্তু।'

বিস্মিত অশোক প্রশ্ন-প্রতিবাদ মিলিয়ে কী একটা বলতে গেল, দীপ্তি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, নেমে যাবার সময় বলে গেল, 'দুজনে একটু বেড়াতে যাবো। তাতে আর ক্ষতি কি? সে তো আপনার কাজের সময়ের বাইরে।'

উত্তর বা প্রতিবাদের অপেক্ষা না ক'রে এগিয়ে গিয়ে সামনের বাসে উঠল।

না গিয়ে পারল না অশোক। অমোঘ, অপ্রতিহত আকর্ষণ, নানা প্রশ্ন জাগে মনে—দীপ্তির এ খেয়ালের অর্থ কি? কি খেলা খেলতে চায় সে ওকে নিয়ে? সংশয় ও উদ্বেগে ওর মন কণ্টকিত হয়ে যায়—তবু নিজেকে সে খেলার বাইরে রাখতে পারে না—পারে না সাবধান হ'তে!

ঠিক ছটায় পৌঁছেও দেখলে দীপ্তি দাঁড়িয়ে আছে। দীপ্তি একটা ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছিল, অশোক বেঁকে দাঁড়াল। বেড়াতে যেতে হয় তো সে তার সাধ্যমতো যানবাহনেই যাবে। ট্যাক্সি ভাড়া দিতেও পারবে না—দীপ্তিকে দিতে দেবে না।

অগত্যা দীপ্তি ট্রামে চড়ে। বসে পাশাপাশি। যৌবন-তপ্ত দেহের সামান্য স্পর্শ পায় অশোক। সে স্পর্শ স্যাম্পেনের নেশার মতো মাথায় চড়ে একটু একটু করে। কথার ফাঁকে যেন অন্যমনস্ক ভাবেই আতপ্ত কোমল হাত একখানা বার বার এসে পড়ে ওর হাতের মধ্যে। অশোক এক সময় চরম সাহসে ভর ক'রে সে হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে। ফিরিয়ে নেয় না দীপ্তি। তবু অশোকের নিজের লজ্জা করে। সামান্য ধুতি ও শার্ট—নিজের যা বেশ-ভূষা। তার পাশে দীপ্তির সাদা জর্জেটের শাড়ি নিতান্তই বেমামান!

গঙ্গার ধারে দোতলার ভাসন্ত রেঁস্তোরাঁয় গিয়ে বসে দুজনে—সামনা-সামনি। ওদের পাশেই গঙ্গা—এই হোটেলের আলো তার জলে নাচছে। দূরে বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে—তাদের বিজলী আলোর পাশাপাশি অসংখ্য ডিঙ্গি নৌকোর হ্যারিকেন থেকে আলো এসে পড়ছে ওদের আলোর পাশে।

হু-হু করে হাওয়া বইছে, সজল মিষ্টি হাওয়া। তাতে দীপ্তির চুল উড়ছে—উড়ছে অশোকের ললাটের চুল। দৃষ্টি হয়ে এসেছে মদির। খাবার সামনে পড়ে ঠাণ্ডা হয়, চা জল হয়ে যায়—ওরা তাকিয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। লজ্জিত ও সচেতন হয়ে চোখ সরিয়ে নেয়—লম্বা বারান্দার অন্য অধিবাসীদের ওপর থেকে দৃষ্টিহীন সে চোখ ফিরে এসে আবার পরস্পরের সঙ্গে মেলে। একটু ক্ষীণ হাসি হাসে তুজনেই। অপ্রাতিভের হাসি। অনেক রাত্রে তুজনেই নিঃশব্দে বাড়ি ফেরে। হঠাৎ যেন তুজনেরই কথার উৎস গেছে ফুরিয়ে।

এরপর থেকে সাক্ষাৎ ঘটে নিয়মিত। সকালে তুপুরে সন্ধ্যায়—নিজেদের কাজের ফাঁকে সুযোগটা মিলিয়ে নেয়। জানাজানি একটু হয়—হাসাহাসিও, কিন্তু ক্রমশ অশোকও হয়ে ওঠে বেপরোয়া। এমন কি এক একদিন ওর বাসে চেপে গড়িয়াহাট আসে দীপ্তি—আবার হয়ত ফিরে যায় শ্যামবাজার পর্যন্ত। কাজের মধ্যেই হয়ত মুহূর্তের জন্য চোখে চোখ মেলে—তা-ই লাভ!

মাস তুই আগে দীপ্তিই প্রস্তাব করল, 'এসো আমরা বিয়ে করি।'

চমকে ওঠে অশোক। ধ্বক ধ্বক করে বুকের মধ্যে, শুকনো মুখে বলে, 'পাগল নাকি! তুমি লাহিড়ি, আমি মণ্ডল। তোমার বাবা কী বলবেন?'

'রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে হবে। আমার বয়স একুশ হয়ে গেছে তা জানো? অন্তত ইউনিভার্সিটি এজ। বাবার মত না নিলেও চলবে।'

'আমার বাড়িতে আপত্তি করবে। বাপের অমতে মেয়েকে ঘরে আনা—'

'আমরা তুজনেই তো কূলের নোঙর ছিঁড়ে অকূলে ভাসছি। কী হবে বাড়ির কথা ভেবে!'

'তোমাকে খাওয়াবো কি? মাইনে যা পাই তাতে ক'দিন চলবে?'

'যেমন ক'রে হোক চালাবো। আমি রান্না করবো, আমি বাসন মাজবো। তোমার জন্যে করছি মনে হ'লে কোন কাজই আমার আটকাবে না। না, তুমি হেসো না—ঠিক পারবো।'

হাসে না অশোক, গম্ভীর হয়েই যায় বরং। এ সম্ভাবনা কখনও ভাবে নি। তু'দিনের খেলা ভেবে স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। শুধু সংযত রেখেছিল খেলাটাকে মানসিক সীমার মধ্যেই।

বলে, 'বাড়িতে তো কিছু দিতে হবে আমাকে।'

'কেন?' তীব্রকণ্ঠে বলে দীপ্তি, 'তোমার দাদা আর ভাই দুজনেই রোজগার করছেন। তুমি আর কত স্যাক্রিফাইস করবে? এবার না হয় নিজের দিকে তাকালে। নিজের নীড় বাঁধবার দিকে মন দাও। আর নিতান্ত না চালাতে পার, আমি তো লেখাপড়া শিখেছি—বি. এ. পাসও করেছি, আমি পারব না একটা চাকরি জোটাতে?'

ইচ্ছার অগ্নিতে প্রলোভনের ঘৃতাহুতি পড়ে। প্রত্যহ একই কথা বলে দীপ্তি। ভবিষ্যতের সোনার ছবি আঁকে। দীপ্তির মতো মেয়ে তাকে রেঁধে খাওয়াবে, তার সেবা করবে? সে কি সম্ভব? ঐ দুর্লভ তনুলতা তারই শয্যায় পাশে শুয়ে থাকবে? তার সামান্য শয্যায়? এ যে কল্পনাতীত সৌভাগ্য!

তবু সে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। দারিদ্র্যের ছবিকে যতটা সম্ভব বাস্তবের তুলিতে ভয়াবহ ক'রে তোলে। বোঝাবার চেষ্টা করে যে এ বিবাহে ওরা কেউ-ই সম্ভবত সুখী হতে পারবে না। কিন্তু দীপ্তি কোন কথাই শুনতে চায় না।

অবশেষে একদিন বেলা দুটোর সময় ডিপোতে রিপোর্ট করতে গিয়ে দেখে দীপ্তি দাঁড়িয়ে আছে।

সোজা কাছে এগিয়ে এসে দীপ্তি বললে, 'আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি চিরকালের মতো। ভেবে দেখলুম ঝাঁপ দিয়ে না পড়লে আর কোনদিনই তোমাকে রাজী করানো যাবে না। আজ আর ডিউটিতে গিয়ে কাজ নেই। তুমি ঘর খোঁজগে। সন্ধ্যের মধ্যে ঘরকন্না পাততে হবে। যাও, যাও—আর দাঁড়িও না।'

নিমেষে ঘেমে ওঠে অশোক, 'কিন্তু বিয়ে—'

'সে তো নোটিস না কি দিতে হয়। সে কাল দুপুরে গিয়ে জেনে নেবো-খন। তুমি দু'দিন ছুটি নেবে। এখন আগে তো ঘর খুঁজে বের করো গে। পথে পথে কতক্ষণ ঘুরব?'

তবু অশোক ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কী পাগলামি করছ দীপ্তি, ঘরে ফিরে যাও। এভাবে হবে না। সবটাই খেয়াল নয়। তাছাড়া ঘর কোথায় পাব

এত তাড়াতাড়ি ? পয়সাকড়িও তেমন হাতে নেই।'

দীপ্তি ব্যাগ খুলে চল্লিশটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'এই টাকাটা হাতে ছিল, নিয়ে এসেছি। আপাততঃ একটা ঘর দেখোগে। চিঠি লিখে রেখে ঘর থেকে বেরিয়েছি, সে চিঠি এতক্ষণে ওঁরা হয়ত পেয়েছেন। আর ফেরা যায় না। এখন যদি তুমি গ্রহণ না করো আমাকে তো, আজই আত্মহত্যা করতে হবে।'

এর পর তরুণ ছেলে আর কি করতে পারে ?

সারাদিন ঘুরে শোভাবাজারের দিকে এক বস্তিতে একখানা ঘর পাওয়া গেল। মেঝে দেওয়াল পাকা, খোলার চাল। তাই বারো টাকা ভাড়া— দু'মাসের ভাড়া অগ্রিম।

সামান্য বিছানা, দু একটা ঘরকন্নার সামান্য তৈজসপত্র—দীপ্তির জন্য এক-সেট শাড়ি সায়া ইত্যাদি কিনে রেখে যখন দীপ্তির খোঁজে গঙ্গার ধারে এল তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

অশোক বললে, 'এখনও ভেবে ছাখো দীপ্তি।'

ওর হাত ধরে ওর ওপরই নিজের ভার যেন এলিয়ে দিয়ে দীপ্তি বললে, 'অনেক ভেবেছি, আর নয়। আজ থেকে তুমি ভাববে। চলো, আমাদের বাড়ি যাই।'

অত্যন্ত সংকীর্ণ অন্ধকার গলি পেরিয়ে সেই স্যাঁতসেঁতে দুর্গন্ধময় বস্তির মধ্যে পড়ে অবশেষে যখন ওদের ঘরের তালা খুলে অশোক বললে, 'এসো'— তখন কিন্তু দীপ্তি থমকে দাঁড়িয়েই রইল কিছুক্ষণ। এই প্রথম সে বাস্তবের সামনে দাঁড়াল—মুখোমুখি।

ঘরে হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে রেখেই বেরিয়েছিল অশোক। সস্তা দামের দেশী হ্যারিকেন। তার একদিকের পল্‌তেতে কালি পড়ে ইতিমধ্যেই মলিন আলো মলিনতর হয়ে এসেছে—কেরোসিনের গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখা গেল ঘরের অপর্যাপ্ত আসবাব। দু-একটা য়্যালুমিনিয়ম আর এনামেলের বাসন, আমকাঠের চৌকিতে একটা পাতলা বিছানা, জলের বাল্‌তি, মগ—বিছানার ওপরই শাড়ি সায়াগুলো পড়ে আছে।

'কই, এসো। ভয় পাচ্ছ নাকি ?'

দীপ্তি এসে ক্লান্তভাবে বিছানাটায় বসে পড়ে বলে, 'এই ঘর তুমি খুঁজে বার করলে! পাকা বাড়িতে ঘর পেলে না ?'

'সে কি আজকালকার দিনে অত সহজ! চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ঘরের ভাড়া, সেলামী য়্যাডভান্স! তাও জামিন চায়। অপরিচিত লোককে কেউ ভরসা ক'রে এক কথায় বাড়ি ভাড়া দেয় ? এই তাই দু মাসের ভাড়া আগাম দিতে হয়েছে। তোমার চল্লিশ ছাড়া আরও চল্লিশ ধার করেছিলুম, সব খতম।'

খানিকটা স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে দীপ্তি আবারও প্রশ্ন করলে, 'বাথরুম নেই বোধ হয় ?'

'বাথরুম! বস্তিতে! কলই নেই। রাস্তায় কল থেকে ঝিকে দিয়ে জল আনতে হবে, এই ভিতরের রকে বসে কাজ সেরো। ঝি যতদিন না পাই— আমিই জল তুলে দেব।'

কাঠ হয়ে যায় যেন দীপ্তি। ভেতরের দিকে অসংখ্য আরও ঘর—তাতে অগণিত ভাড়াটে। রান্নার গন্ধে, ধোঁয়ায় ও নানাবিধ দুর্গন্ধে বাতাস যেন ভারী। কোলাহলও কম নয়। একটু পরে বলে, 'তুমি কাল-পরশুর মধ্যে একটা ভদ্র বাড়িতে ঘর দেখে নাও। হারটা তো আছে গলায়, বিক্রী ক'রে য়্যাড্‌ভান্স দেব। খাই না খাই—থাকাটার জন্য ভদ্র পরিবেশ দরকার।'

'কিন্তু সে যে অনেক টাকা দীপু। তারপর খরচ জোগাবো কোথা থেকে ?'

'সে আমিই ব্যবস্থা ক'রে নেবো।'

'আচ্ছা সে হবে। এখন ঐ বালতিতে জল আছে, তাকে সাবান স্নো সব আছে। তুমি একটু সুস্থ হও—আমি কিছু খাবার নিয়ে আনি। এখন তো আর রান্না সম্ভব নয়।'

সেদিন রাত্রে দুজনে পাশাপাশিই শুল। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা কেউ-ই করলে না। বিয়ে এখনও হয় নি ব'লে অশোকের সঙ্কোচ। আর দীপ্তি ? সে বোধ হয় ঠিক এ স্বপ্ন দেখে নি। তার মন অসাড় হয়ে এসেছে ততক্ষণে। ধনীর মেয়ে, খেয়াল হওয়া মাত্র মেটাতে সে অভ্যস্ত—অশোককে পাবার

খেয়ালে বাধা পড়াতে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়েছিল কিন্তু তাই ব'লে—। সব ব্যাপারেরই একটা সীমা থাকা দরকার।

পরের দিনও রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হ'ল না। সারা সকাল ঘর খুঁজে বেড়াল অশোক। দু-তিনটে সন্ধান পাওয়া গেল এই মাত্র। একটায় ডিউটি—অশোক বললে, 'মিছিমিছি কামাই ক'রে লাভ কি? এখানে যখন ঘরকন্না পাতবেই না, তখন ভাল ঘর পেলেই ছুটি নেব। বিয়ে-থার ব্যাপারও আছে—তখন ছুটি নেওয়াই ভাল।'

সে ডিউটিতে চলে গেল।

দীপ্তি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সেই নিরানন্দ বুকচাপা ঘরে একা। এতক্ষণে বাড়ি থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই। তাই রাস্তায় বেরুতে ভরসা হ'ল না।

খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছিল ঠিকই। যার টাকা আছে তার এসব ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাও আছে। খুঁজতে খুঁজতে বাসের গুমটিতে এসে খবর মিলল; মেয়েটির সঙ্গে বর্ণনাতেও মিলে গেল। অশোক মণ্ডল! মিঃ লাহিড়ী ছুটে গেলেন ওদের বাড়িতে—শুনলেন সেখানেও সে অনুপস্থিত, সেদিন ডিউটিতে আসে নি। দুই আর দুইয়ে যে চার হয়, সে বিষয়ে মিঃ লাহিড়ী নিঃসন্দেহ হলেন।

কিন্তু গেল কোথায়? পুলিসই পরামর্শ দিলে চুপ ক'রে থাকতে। ডিউটিতে এলেই জানা যাবে। ডিউটি শেষ হ'লে পিছু নেওয়া কিছু শক্ত নয়। মিঃ লাহিড়ী কথাটা বুঝলেন।

গভীর রাত্রে অশোক এসে দোরে ধাক্কা দিতে দীপ্তি নিঃশব্দে এসে দোর খুলে দিলে। অভ্যর্থনার একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোল না। হ্যারিকেনটা সকালে মোছা হয় নি, দীপ্তি জানেও না মুছতে। পাশের ঘরের কাকে ডেকে শুধু জ্বালিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু কালিতে কালিতে এখন সে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু তারই ক্ষীণ আলোতে অশোক বুঝতে পারলো দীপ্তি বহুক্ষণ ধরেই কাঁদছিল। সমস্ত মনটা তারও বিরক্তিতে ভরে গেল। সে

একটু রূঢ় কণ্ঠেই বললে, 'এ আমি আগেই জানতুম—তাই সহজে রাজী হই নি। খেলা তো ঢের হয়েছে, এবার আর কি, ধনী-দুহিতা ঘরে ফিরে যাও। আমারই শুধু ইহকাল পরকাল মাটি হয়ে গেল, কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

ফলে দীপ্তির কান্না বেড়েই গেল। এই অপ্রিয় এবং অরুচিকর নাটক কতক্ষণ চলত তা জানি না। কিন্তু ঠিক এই সময়ই মিঃ লাহিড়ী এসে প্রবেশ করলেন সদলবলে—আরও নাটকীয় ভাবে।...

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। অশোক আজও তা বলতে পারলে না ভাল ক'রে—সে নিদারুণ অপমানের কাহিনী। গলা বুজে আসতে লাগল বার বার।

দীপ্তি ছুটে এসে পড়েছিল বাবার পায়ে, তা মনে আছে। বোধ হয় ক্ষমাও চেয়েছিল। বলেছিল, 'আমাকে বাঁচাও বাবা—এখানে আর একদিন থাকলে মরে যাবো আমি!'

মিঃ লাহিড়ীর কটূক্তি ও অপমানকর বাক্যবাণ অনুমেয়। তিনি অশোককে ধরে হাজতে নিয়ে যাবার জন্যেই জেদ করেছিলেন, শুধু সঙ্গের পুলিস কর্মচারী যখন মনে করিয়ে দিলেন যে তাতে কেলেঙ্কারীটা বেশ ক'রে ছড়িয়ে পড়বে এবং যতদূর অশোকের সহকর্মীদের কাছে শোনা গেছে, এতে মিঃ লাহিড়ীর কন্যার আগ্রহই বেশি ছিল—সে ক্ষেত্রে অশোকের শাস্তি হবার কোন কারণ নেই। তখন অগত্যা তিনি নিরস্ত হলেন। আরও প্রচুর কটূক্তি ক'রে, নানারকম ভাবে শাসিয়ে কন্যাকে নিয়ে প্রস্থান করলেন। অশোকের ভাগ্যে পড়ে রইল সেই প্রায়-অন্ধকার ঘর এবং অন্ধকার ভবিষ্যৎ।...

কাহিনী শেষ ক'রে এই বয়সেও হু হু কেঁদে ফেললে অশোক।

আমি অনেক ক'রে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। সে তো খেলতেই এসেছিল, ভালবেসে তো আসে নি। অশোক তো তা আগেই বুঝেছিল, সতর্ক হতেও চেয়েছিল। পারে নি সেটা নিতান্ত বয়সের দোষ। ঐ বয়সে বুঝি পারা যায়ও না। তবু যখন সে একথা জানে যে দীপ্তি তাকে কোন দিনই ভালবাসে নি, ভালবাসতও না, তখন আর দুঃখ ক'রে লাভ কি? এ বরং ভালই হ'ল—যদি সত্যি-সত্যিই ঐ মেয়ের সঙ্গে তার আগে বিয়ে হয়ে যেত,

এই স্বপ্নভঙ্গের আগে, আরও সাংঘাতিক অবস্থা হ'ত অশোকের। সেই শোচনীয় অবস্থা থেকে সে যে পরিত্রাণ পেয়েছে, আরও বেশি ক্ষতি যে হয় নি —এই জন্যেই তার ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অনেক বোঝালুম, অনেক আশা দিলুম। পরামর্শ দিলুম ও বাসা এবং তার স্মৃতি ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে। মা ভাই কিছুই মনে রাখবেন না। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সহকর্মীদের মধ্যে যারা জানত তাদের টিট্‌কারিও এ কদিন সহ্য ক'রে যখন প্রায় ভুলিয়ে এনেছে—তখন আত্মীয়দের সামনে যেতে ভয় কি? 'সব ঠিক হয়ে যাবে। চিয়ার আপ!' পিঠ চাপড়ে শেষ সান্ত্বনা দিই।

পাথরের মূর্তির মতো বসে বসে সব শুনছিল অশোক। এবার আস্তে আস্তে কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মতো বললে, 'কিন্তু আমি—আমি যে এতদিনে তাকে ভালবেসে ফেলেছি! তাকে হারিয়ে আমার জীবনের যে আর কোন অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না। এমনভাবে কী ক'রে বাঁচব বলতে পারেন?'

এইবার আমিও স্তব্ধ হয়ে গেলাম!

অনাবশ্যক

কেষ্টর মা যে কোনদিন সমস্যা হয়ে উঠবে তা এতকাল কেউ কল্পনাও করে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাইতো হ'ল!

বোসেদের বর্তমান যাঁরা কর্তা, এঁদের পিতামহ রায় সাহেব অনুকূল বোস যখন এই বাড়িটি প্রথম করেন তখন থেকেই কেষ্টর মা এখানে আছে। অনুকূলবাবুর স্ত্রীর বাপের বাড়ি ধাত্রীগ্রামে। কেষ্টর মারও বাপের বাড়ি। তাঁর বাপের বাড়িতেই কেষ্টর মার মা—অর্থাৎ কেষ্টর দিদিমা কাজ করত। সেই সুবাদেই জানাশুনো! কেষ্টর মার নামটাই কিন্তু সব—অর্থাৎ কেষ্ট বা বলরাম, কোন ছেলেই কখনও ওর হয় নি। কেষ্টর মা যখন প্রথম এ বাড়িতে কাজ করতে আসে তখন অনুকূলবাবুর স্ত্রী সুবালা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী ব'লে তোকে ডাকব রে? তোর নাম কি?'

তখন বিষম বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে।

'ওমা, নাম? মায়ের যা কাণ্ড! এক নাম যা রেখেছে তা তো বলবার উপায় নেই। আবার নিজে ডাকে খুকি ব'লে—সেই বা লোকে কী মনে করবে? তা তোমরাই যা হয় একটা ঠিক ক'রে দাও না বাপু!'

'সে কী রে!' সুবালা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোর নাম আমরা ঠিক ক'রে দেব। কেন, তোর নামটা কি তাই শুনি না।'

'সে কথা আর বলো না। মা নাম রেখেছিল চারু।'

'বেশ তো, চারু বলেই ডাকব না হয়।'

'না না—বাপু, সে আমার বড্ড লজ্জা করবে। তার চেয়ে তোমরা বরং কারুর মা ব'লেই ডেকো।'

'না বিইয়ে কানাইয়ের মা!' সুবালা হেসে বলেছিলেন, 'তা মন্দ নয়, তোকে আমরা কেষ্টর মা ব'লে ডাকব।'

তখন ঝিকে নাম ধরে ডাকার রেওয়াজও ছিল না, ছেলে বা মেয়ের পরিচয়েই লোকে ডাকত। সুতরাং এই ব্যবস্থাই সকলের কাছে সহজ ব'লে মনে হ'ল।

সেই থেকেই কেষ্টর মা এ বাড়িতে আছে।

আর কখনও দেশে যাবার দরকার হয় নি—একবার ছাড়া। সে শুধু যেবার ওর মা মারা যায়। গিয়ে যা কিছু ছিল বেচে-কিনে শ্রাদ্ধশান্তি ক'রে চলে এসেছিল। ওর তিনকুলে কেউ ছিল না—থাকলেও কেষ্টর মা তাদের কখনও আমল দেয় নি। ছেলেপুলে ওর হয় নি—হবার সুযোগও মেলে নি। দু'বার বিয়ে হয়েছিল ওর। প্রথম বিয়ে হয়—তখন ওর সাত বছর বয়স। মাস কতকের ভেতরই কলেরায় ওর সে বর, শ্বশুর, দেওর সব শেষ হয়ে যায়। তারপর দশ বছর বয়সের সময় আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখে ওর মা। বৈষ্ণব-মতে কণ্ঠিবদল হয় আর একটি ছেলের সঙ্গে—কিন্তু সেও ওর কপালে টিকল না। মাঠে কাজ করতে করতে সাপে কাটল তাকে। তখন ওর সবে বারো পূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় বারও শাঁখা-রুলি খুলে বাপের বাড়িতেই এসে উঠতে হ'ল। মা তাতে অসুবিধা বোধ করে নি তত। মায়ে-বেটিতে মিলে কাজে যেত—তিন বাড়ির কাজ সকাল একপ'র বেলার মধ্যেই সেরে ফেলত। মেয়েকে চোখের

আড়াল করতে দেবে না ব'লে—যে ক'বাড়ি কাজ করত, একসঙ্গেই যেত, হাতাপিতি ক'রে একসঙ্গেই সারত। কিন্তু বছর কতক পরে দেখা গেল যে তাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না।

কেষ্টর মা নামের উপযুক্ত রকম ভাবেই কৃষ্ণবর্ণ ছিল—তবু তারও প্রণয়-প্রার্থীর অভাব হ'ল না। আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটা মোহ আছে—কেষ্টর মাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল একটু। সেই সময়ই তার মার কানে খবরটা পৌছল—রায়েদের মেয়ে সুবালার বর খুব বড় চাকরী করছে আজকাল, দিল্লী থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছে, বাড়িও করেছে নিজে। ঠিকানাটা রায়েদের বাড়ি থেকেই যোগাড় হয়ে গেল। তারপর সে একদিন মেয়েকে সঙ্গে ক'রে এসে সুবালার কাছে পৌছে দিয়ে গেল, 'এই তোমার কাছে গচ্ছিত ক'রে দিয়ে গেলুম, মেজদিমণি, মারো-কাটো, ফাঁসি দাও—যা করো করো—বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিও না কোনদিন। খাবে-দাবে থাকবে—আজ থেকে ও তোমাদেরই মেয়ে। আমি আর ক'দিন বলো?'

মেয়েকেও শাসন ক'রে গেল, 'খবরদার, এ বাড়ির চোকাঠ কোনদিন ডিঙ্গুবি নি।'

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে।

সুবালা গেছে, অনুকূলবাবু গেছেন। অনুকূলবাবুর তিন ছেলের ভেতর একজন ছেলেবেলাতেই গিয়েছিল—বাকী দুজন কেষ্টর মার চোখের সামনেই বড় হয়েছে, চাকরী পেয়েছে, বিয়ে-থা করেছে। তাদের ছেলেপুলেতে বাড়ি ভরে গেছে। তারা বড় হয়েছে, বিয়ে-থা করেছে। তাদের ছেলেপুলে হয়েছে। অনুকূলবাবুর ছেলে দুটির একজনও নেই। এমন কি তাঁদের স্ত্রীরাও গত হয়েছেন। তাঁদের ছেলেরাই আজ পরিণতবয়স্ক।

অর্থাৎ বহু বৎসর কেটে গেছে কেষ্টর মারও জীবনে।

কিন্তু সে-হিসেব সে রাখে না।

কত বয়স তার? ষাট সত্তর, আশি? একশো'?

'কে জানে। কত বছর। আমি কি ছাই অত হিসেব রেখেছি! তবে সে অনেকদিন। এই স্তাখো না, তখন মেজো মেসোমশায় বেঁচে, চাকরী

করছেন। সে কতকাল হ'ল গা?'

এইভাবেই হিসেব গুলিয়ে যায়।

এতকাল কেষ্টর মা একা এই বাড়ির সব কাজ করছে। ধোয়া-মোছা, বাসন মাজা, বাটনা বাটা, জল তোলা—মায় ছেলেমেয়ে দেখা পর্যন্ত। চাকর শুধু বাইরের ফায়-ফরমাশ খাটত আর বাজার করত। কেষ্টর মা কোনদিন কোন কারণেই একা বাড়ির বাইরে বেরুত না। এ বিষয়ে সে মার অনুশাসন মেনে চলত অক্ষরে অক্ষরে। গ্রহণে স্নান করতে বা কালীঘাট যাবার সময় গৃহিণীরা কেউ সঙ্গে নিয়ে গেলে তবে যেত। কিন্তু সে পাটও উঠে গেছে আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর। এখনকার যাঁরা গৃহিণী ওসব ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ কম—তাছাড়া গেলেও, কে ঐ চরচরে অনাত্মীয় বুড়ীকে টেনে নিয়ে যাবে?

কেষ্টর মা কখনও মাইনে পায় নি এ বাড়ি থেকে। সুবালা যতদিন বেঁচেছিলেন তিনি বলতেন, 'তোর সব খরচ তো আমরাই দিচ্ছি, মাইনে নিয়ে তুই করবিই বা কি? বরং যদি কখনও তীর্থধম্ম করতে ইচ্ছে হয় তো বলিস—সেই সময় কিছু টাকা দেব।'

কর্তার কাছে বলতেন, 'আমরা তো ঝি রাখতে যাই নি—ওর মা-ই গছিয়ে দিয়ে গেছে। মাইনে দেবার অত গরজ কি আমাদের? যদি কোনদিন চোখ-কান ফোটে, চায়—তো দেখা যাবে!'

সে চোখ-কান কেষ্টর মার কোনদিনই ফোটে নি। তার বহু আগেই সুবালা চোখ বুজেছেন। ছেলেরাও খাতায় কোন খরচা লেখা ছিল না ব'লে ও প্রসঙ্গ তোলে নি। মাইনের কথা ওঠেই নি কোনদিন।

খায়—কাপড় ছিঁড়লে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে না শুনিয়ে সাধারণভাবেই চেঁচিয়ে বলে, 'দুখানা কাপড়ই ন্যাতাকানি হয়ে গেল বাবুরা, বুড়ার একটা কাপড় চাই।' খরচের ভেতর একটু আফিং খাওয়ার অভ্যাস আছে। সেটা এঁরা দিতে খুব আপত্তি করেন না—বাজারবেলায় বাজারের খরচ থেকেই সেটা এসে যায়।'

আলাদা কোন টাকার দরকার আছে, কেষ্টর মাও কোনদিন ভাবে নি। এমন কি বিয়ে-থা শুভকর্মে বাড়ির অন্য ঝি-চাকর যখন বকশিশ আদায় করত

—কেষ্টর মা তখনও কোনদিন কিছু চায় নি। সে নিজেকে এ বাড়ির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই ভাবত। ঝি ব'লে কখনও ভাবে নি। সে আশা করতো যে এরাও তাই ভাবে!

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। বেশিদিন বাঁচারও সীমা থাকা দরকার। কেষ্টর মা সে সীমা লঙ্ঘন ক'রে গেছে। তাকে দিয়ে কোন কাজই হয় না আর—অথর্ব হয়ে বেঁকে পড়েছে। অথচ দু'বেলা খাওয়া-পরা, আফিং—সব খরচই আছে। সিঁড়ির নিচের ফালি ঘরটাও সে দখল ক'রে থাকে। আগে সে ওপরেই শুত ছেলেমেয়েদের ঘরে—ক্রমে ঘরের অভাব হওয়ায় এসে ঐখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে সেখান থেকে নড়ানো যায় না। অথচ অন্য ঝি-চাকরদেরও থাকার কষ্ট। তাছাড়া বড্ড খিটখিট করে ঝিয়েদের সঙ্গে। যেন ঐ-ই গিন্নী। বললেও শোনে না। পাগল ব'লে, ভীমরতি ব'লে তারা তবু ক্ষমা করে কিন্তু তাই বা কত সহ্য করবে তারা?

তবু সমস্যাটা এতকাল খুব প্রকট হয়ে ওঠে নি—একান্নবর্তী সংসার ছিল ব'লে।

কিন্তু আর তা রাখা সম্ভব নয়।

দোতালা বাড়িকে তেতালা করলেও ঘর তিনখানার বেশি বাড়ানো যায় নি। এদিকে ছেলেপুলে নিয়ে মোট অধিবাসীর সংখ্যা বর্তমানে ছাপ্পান্নটি। কিছুতেই, কোনমতেই এই স্থানে কুলোবার কথা নয়। বিশেষত এগারোটি যেখানে দম্পতি!

তাছাড়া বনিবনাও হচ্ছে না দীর্ঘকাল থেকে। টাকাকড়ি কে কত দেবে—এ নিয়ে প্রতি মাসেই শেষের দিকে কলহ। সকলেই এখন পৃথক হ'তে ব্যগ্র। এ বাড়ি ভাগ ক'রে থাকা সম্ভব নয়। প্রথমত দুটো ভাগ হবে, সেই অর্ধেক দুটির একটি হবে চার ভাগ, একটি পাঁচ ভাগ। শেষ ভাগে একটা ক'রে ঘরও পড়বে না। কী হবে ভাগ ক'রে?

সেজবাবু শ্বশুরের বিষয় পেয়েছেন, নগদ টাকাটা পেলেই তিনি সরে পড়েন। মেজবাবু বেহালা অঞ্চলে জমি কিনেছেন অনেকদিন, ভাগের টাকাটা হাতে পেলে বাড়িতে হাত দিতে পারেন। বড়বাবুর দুটি যমজ মেয়েই বিবাহ-

যোগ্যা—তাঁরও একখানা ঘরের ভাগে কুলোবে না—তাছাড়া বাড়ি মাথায় থাক্, মেয়েদের বিয়ে আগে। এমনি প্রত্যেকেরই ঝোঁক বাড়ি বেচার দিকে। এক ছোট কর্তা নিতে পারতেন সব বাড়িটাই, যুদ্ধের বাজারে দু'পয়সা করেছেন কিন্তু তিনিও তাতে রাজী নন্। বলেন যে, 'আমি যত দামই দিই না কেন মনে ভাববে আপনার লোক ব'লে ঠকালে। আর মুখে বলবে যে, তা যাক্‌গে—তবু তো নিজেদের মধ্যেই রইল। তারপর হয়ত তখন বাড়ি ছাড়বার তাগাদা থাকবে না। যাক্—তার চেয়ে সোজাসুজি পরেই যাক।'

সুতরাং—

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দালাল লাগিয়ে একদা বিক্রী ক'রে দেওয়া হ'ল। সাড়ে বাহান্ন হাজার টাকা দর উঠল—হয়ত আরও বেশি ওঠা উচিত ছিল কিন্তু বাবুদের ধৈর্যের অভাব।

এইবার সাজ-সাজ রব উঠল।

বাড়ি ভাড়া ক'রে রেখেছিলেন কেউ কেউ আগে থাকতেই, কেউ-বা এখনই খোঁজ-খবর ক'রে নিলেন। ছোট বাবুই কেবল বাড়ি কিনে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। এইবার প্রশ্ন উঠল, বুড়ীকে কে নিয়ে যাবে?

কেউই ঘাড় পাতে না।

এমন কি প্রশ্নটাও এড়িয়ে যায়।

সকলেই যেন সকলের আগে সরে পড়তে চান, তার মূলেও ঐ বুড়ী।

এ প্রশ্ন উঠবে, তা সবাই জানে—ওঠবার আগেই সরে পড়তে চায় তাই।

মেয়েদের ভেতর যাকে প্রশ্ন করা হয়, সে-ই জবাব দেয়, 'তা কী জানি ভাই! · আমরা তো ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে যাচ্ছি, ওকে রাখবই বা কোথায়, দেখবেই বা কে? একটা ঝি রাখারই সাধ্যি থাকলে হয়। ওকে নিয়ে গেলে তো ওর পেছনে একটা লোক চাই।···সে সব দিনকাল যখন ছিল তখন পোষা গেছে। এখন আমাদের কি আর সে ক্ষমতা আছে।···যাবে কারুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত। পড়ে কি আর থাকবে?' দায়িত্বটা এড়িয়ে যায়।

ছোট কর্তাই নিজের বাড়িতে গেলেন; তাঁর স্থানাভাবের প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু তিনিই সর্বাগ্রে চলে গেলেন। তখন প্রশ্নটা অত উগ্র হয়ে ওঠে নি।

শেষে বড়বাবু তাঁর অফিসে টেলিফোন করলেন, 'কি করবে হে

কেষ্টর মার ?'

'তা আমি কি বলব দাদা ? আপনারা যা ভাল হয় করুন। ওর দেশঘাট কোথায় ? সেখানে কেউ নেই ? এসে নিয়ে যাক্ না!'

'বিলক্ষণ! সাত কাণ্ড রামায়ণ সীতে কার পিসেমশাই। ওর আবার এতদিন পরে কে কোথায় গজাবে ? শুনেছি ঠাকুমার বাপের বাড়ির দেশের লোক। সেখানে কেউই নেই বোধ হয়। আমি তো এই বায়ান্ন বছর বয়সে একদিনও ওকে কোথাও যেতে দেখি নি, ওর কাছেও কেউ আসে নি। কেউ থাকলে কি কখনও শোনা যেত না!'

টেলিফোনের ও-প্রান্ত নীরব রইল বহুক্ষণ। শেষে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর এল, 'তা কী জানি। দেখুন আপনারা ভেবে। আমি কিছু করতে পারব না। পূর্বপুরুষের folly-র বোঝা টেনে বেড়ানো আমার কাজ নয়!'

ঠুং ক'রে রিসিভার রাখার শব্দ হ'ল। লাইন কেটে গেল। বড়বাবু ব্যাপারটা অমীমাংসিত রেখেই নিজে একদিন সরে পড়তে বাধ্য হলেন। তাঁর কন্যাদায়—ছোট ফ্ল্যাট নিতে বাধ্য হয়েছেন। ছেলেপিলেও বেশি তাঁর। তাঁর পক্ষে এসব বিবেচনা সম্ভব নয়।

এমনি ক'রে সবাই সরে যেতে যেতে শেষ যাঁরা থাকলেন—সেজবাবু আর রাঙাবাবু, তাঁরাই পড়লেন ফাঁপরে।

সত্যিই আর কিছু জ্যান্ত মানুষটাকে টেনে ফেলে দেওয়া যায় না! অথচ নিয়েই বা যেতে চায় কে—এই ক্ষেত্রে।

শেষে রাঙাবাবুর সম্বন্ধী খবর আনলেন, কোথায় যেন একটা অনাথ আশ্রম আছে। সেখানে গোটকতক টাকা দিলে তারা ভার নিতে রাজী আছে।— 'তোমরা ন'ভাই একটা ক'রে টাকা দিলেই ন টাকা। ছোট কর্তা হয়ত একটা টাকা বেশিও দিতে পারে—তাহ'লেই দশ টাকা হবে। মাসিক দশ টাকা দিলেই হবে।'

সেজবাবু ভাইদের অফিসে অফিসে ছুটোছুটি ক'রে প্রথম মাসের টাকাটা তুললেন। রাঙাবাবুর সম্বন্ধী গিয়ে টাকাটা জমা দিয়ে এলেন। এখন একটা রিক্সা ডেকে ওকে নিয়ে যাওয়ার ওয়াস্তা!

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রাঙাবাবুর।

কথাটা বুঝতে কেষ্টর মার সময় লাগল বহুক্ষণ। সে কেবলই ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তার ঘোলা দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে আর মধ্যে মধ্যে বিড়বিড় ক'রে বকে। শেষে অনেক কষ্টে যখন এইটুকু বুঝলে যে তাকে বাইরে যেতে হবে —তখন সোজাসুজি বেঁকে বসল, 'না বাপু, তা আমি পারব না। মা মানা ক'রে গেছে এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙুতে। মেজ মাসিমাও বারণ করেছিল। আমি কোথাও যেতে-টেতে পারব না।'

কাকুতি-মিনতি—অনেক কিছুই করা হ'ল। লোভ দেখানো হ'ল নানা-রকম। বাড়ি যে বিক্রী হয়ে গেছে সে কথা বোঝাবার চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু কেষ্টর মা অচল, অটল। সেজবাবু তো' প্রায় ক্ষেপে ওঠবার দাখিল, শেষে তিনি জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই, বুড়ি দু'হাতে সিঁড়ির থামটা ধরে মড়াকান্না জুড়ে দিলে। অপ্রতিভ হয়ে ছেড়ে দিলেন সেজবাবু।

'এখন উপায় ?' সরব ও নীরব প্রশ্ন চারিদিকে।

রাঙাবাবু রাগ ক'রে বললেন, 'উপায় আর কি। থাক্ পড়ে। আমরা যা করবার সবই করেছি—এখন তো, আর আমাদের কেউ দায়ী করতে পারবে না।'

সেজবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু—চাবি ?'

যাঁরা বাড়ি কিনেছেন তাঁরা ভদ্রতা ক'রে তিন মাস সময় দিয়েছিলেন। কাল সেই তিন মাস শেষ হবে। এঁরাও যাবার জন্য প্রস্তুত অবশ্য। কথা আছে বাড়ি খালি ক'রে তালা লাগিয়ে চাবি ওঁরা তাঁদের পৌঁছে দেবেন।

অনেকক্ষণ দুই তরফের কর্তা-গিন্নীরা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সেজগিন্নী বললেন, 'তালা লাগিয়ে দিয়ে যাও—তারা এসে খুলে যা হয় করবে'খন।'

'তারা যদি এখন কিছুদিন না খোলে ? বুড়ী যে মরে পচে থাকবে।' রাঙা গিন্নী বলে ওঠেন।

'তবে যা ভাল বোঝ করো।'

'পুলিস ডাকা হবে নাকি ?'

'আচ্ছা, সেই অনাথ আশ্রমের লোকদের বললে কী হয় ?'

কে যেন প্রশ্ন করলে।

রাঙাবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'উঁহু। সে তারা স্পষ্টই ব'লে দিয়েছে। অত হাঙ্গামা তারা করতে পারবে না।'

অনেক বিবেচনার পর ঠিক হ'ল যে বড়বাবুই যখন বাড়ির কর্তা তখন তাঁকে জানানোই ঠিক।

পরের দিন দু'পক্ষই প্রায় এক সময়ে বোরোবেন। তালাটা আর তাঁরা লাগাবেন না। যাবার সময় রাঙাবাবু গাড়িটা ঘুরিয়ে ঘটনাটা বড়বাবুকে ব'লে যাবেন—যা করবার তিনিই করবেন। চাবি দিতে হয় দেবেন—নয়ত নতুন মালিকদের জানিয়ে দেবেন, তারা যা হয় করবে, তাদের গরজে।

পরামর্শটা সকলেরই প্রাণে লাগল। নিশ্চিন্ত হ'ল—কতকটা।

যাচ্ছে এরা কিছুদিন থেকেই। সুতরাং ঘটনাটা কেষ্টর মার গা-সওয়া হয়ে গেছে। সে আর প্রশ্ন করে না। কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে—জানতেও চায় না।

আজকাল যেন কোন কথাই মাথাতে ঢোকেও না ওর—শোনেও কম, শুনলেও ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। সমস্ত অর্থটা ঠিক বোঝে না।

আজও যাবার সময় রাঙা বউ যখন এসে কানের কাছে চিৎকার ক'রে বললে, 'দোরটা দাও কেষ্টর মা, আমরা চলে যাচ্ছি।' তখনও সে কিছু বুঝলে না, শুধু বললে,—'সে আমি দোব অখন।' ব'লে বার কতক ঘাড় নাড়লে আপন মনেই।

ওরা চলে যাবার পর সত্যিই এসে হাতড়ে হাতড়ে দোরটা বন্ধ করলে। তারপর তেমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেওয়াল ধরে ধরে সিঁড়ির মুখটায় এসে একবার ওপর দিকে চেয়ে আপন মনেই বললে, 'ওমা, এরা সব গেল কোথায়? কই কাউকে তো দেখছি না।'

আস্তে আস্তে তখনকার মতো গিয়ে শুয়ে পড়ল কেষ্টর মা।

ক্রমশ অপরাহ্ণ সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে গেল। আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারদিকে।

আবার উঠল কেষ্টর মা।

'ওমা, এরা কেউ আলো জ্বালে না কেন রে? ওরে অ কেনা, অ বিন্দী!'

তারপর আপনিই এসে দেওয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে সুইচ্‌টা টিপে দেয়।

কিন্তু আলোও জ্বলে না।

তিনদিন আগেই লাইন কেটে দেওয়া হয়ে গেছে। এ ছু'দিন তেলের আলো জ্বলেছিল। তাও বুড়ী লক্ষ্য করে নি।

'ওমা, আলোটাও যে জ্বলছে না!'

অন্ধকারে খানিকটা জড়ভরতের মতো বসে থাকে বুড়ী।

তারপর আবারও বলে, 'বাড়িতে কি কেউ নেই নাকি? গেল কোথায় সব?'

আরও খানিকটা পরে খুন্‌খুন্‌ ক'রে কাঁদতে বসে, 'আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে!'

এ বেলার মতো খাবার কিছু কিছু ওর ঘরেই রেখে দিয়েছিল ওরা—মাটির একটা হাঁড়ি ক'রে, ব'লে গিয়েছিল, 'এই রুটি তরকারী রইল, খেও খিদে পেলে! বুঝলে?'

কিন্তু সে-কথা বুড়ীর মনে নেই। তাছাড়া সে খাবারও বেড়ালে খেয়ে গেছে। বুড়ী তখন ঘুমোচ্ছিল।

আফিং খাবার সময় হয়েছে।

'ওরে, আমাকে একটু চা দে না রে!' নাকিসুরে বুড়ী কাঁদে।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে সে।

তারপর সিঁড়ির রেলিংটা ধরে উঠে দাঁড়ায় আস্তে আস্তে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ওপরে ওঠে।

বৌদের নামগুলো হঠাৎ আজ মনে পড়ে যায়।

'অ বিরজা, অ লীলা-বৌ! তোমরা কোথায় গেলে গো!'

দোতালা থেকে তেতালা।

অকস্মাৎ আচ্ছন্ন চৈতন্যের মধ্যে কেমন ক'রে কথাটা ঢোকে। কেমন ক'রে একসময় বুঝতে পারে যে বাড়িতে কেউ নেই, সব খালি।

'খালি বাড়ি?...সবাই চলে গেছে?...ওমা, আমি কোথায় যাবো গো?

'ওমা, আমার যে বড্ড ভয় করছে গো—'

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে একসময় একটা ধাপ বুঝতে পারে না—হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে—গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে এসে থামে। একটাও শব্দ করে না বুড়ী, কাঁদেও না। হয়ত কিছু বুঝতেও পারে না।

কেমন যেন ঘুম পায় ওর।

'ও মেজো মাসীমা, চা দেবে না একটু?'

একবার শুধু অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করে।

বড়বাবু অফিস থেকে ফিরে সংবাদটা পেয়েছিলেন। সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল তাঁর রাগে। খানিকটা চেঁচামেচি দাপাদাপিও করেছিলেন—ভাইদের অবিবেচনার জন্য। কিন্তু আর কিছুই সে রাত্রে ক'রে উঠতে পারেন নি।

পরের দিন সকালে নতুন বাড়িওলাদের খবর পাঠিয়ে দিলেন—'বাড়ি তোমরা চাবি দিয়ে এসো গে। বাড়ি খালি।'

যা শত্রু পরে পরে! যা হয় ওরা করুক!

বাড়িওলারা বিকেলের আগে আসবার ফুরসুত পেলেন না। তখনও কিন্তু ঢোকা গেল না। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। ফিরে গিয়ে বড়বাবুকে খবর দিলেন তাঁরা।

বড়বাবুকে তখন কথাটা খুলে বলতে হ'ল। বললেন, 'তোমরা ভাই কেউ গাড়ি ক'রে ওকে অনাথ আশ্রমে পৌছে দাও। গাড়ি ভাড়া আমি দেব। তোমাদের কথা হয়ত শুনবে, আমরা হাজার হোক্ চেনা লোক কিনা, জন্মে ইস্তক্ আমাদের দেখছে—আমাদের কাছে বায়নাক্কা করে নানা রকম!'

এঁরা তাতে রাজী হন নি প্রথমটা। বাদানুবাদও কিছু হয়েছিল।

ফলে এই করতে করতেই রাত হয়ে গেল। কিছুই করা হ'ল না।

পরের দিন সকালে লোকজন এনে দোর ভেঙে এঁরা ঢুকলেন।

সিঁড়ির মুখটাতেই বুড়ী কেষ্টর মা মরে পড়ে আছে। বোধহয় বহুক্ষণ মারা গেছে। পিঁপড়েতে দুটো চোখই খেয়ে শেষ ক'রে ফেলেছে।

শিল্পী ও মডেল

দিন-পনেরোর জন্যে পুরীতে এসেছি। বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত অবসর—একটু ভালভাবেই কাটাবার ইচ্ছা। একটা হোটেলে এসেই উঠেছিলাম। কিন্তু এক বেলার পরই অসহ্য লাগল। খাওয়ায় ভাল, ঘরগুলিও মন্দ নয়; কিন্তু পরিবেশ এত নোংরা, প্রাকৃতিক কার্যের স্থানগুলি এমন অপরিষ্কার যে মন একেবারে বিষিয়ে উঠল। বেলা চারটে বাজতে না বাজতেই, বৈকালিক চা-জলখাবারের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই বেরিয়ে পড়লাম এবং সামনেই যে স্থানীয় লোকটিকে দেখতে পেলাম তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'হ্যাঁ মশাই, এখানে একটা ভাল ঘর কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন? মানে রুগী-টুগী থাকে নি এমন বাড়ি—আমি অবশ্য একখানা ঘর চাই শুধু।'

তিনি থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলেন একটু। তারপর আমি যে হোটেলটাতে এসে উঠেছিলাম ঠিক তার পাশের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঐ বাড়িতে দেখুন তো খোঁজ ক'রে। কোন মেয়েছেলের বাড়ি, সবে তৈরি হয়েছে। ওর মালীর মুখে শুনলাম যে, একখানা ঘর বুঝি ভাড়া দেবে। একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুনই না।'

গেলাম সেখানে। মালীটি বাড়িতেই ছিল। সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করল, 'কে থাকিবে? কয়জন-অ?' আমি একা থাকব শুনে আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল বোধ হয়ঃ 'আপনক অসুখটা কি?'

কোন অসুখ নেই, শুধু হাওয়া খেতে এসেছি শুনে বোধ হয় আশ্বস্ত হ'ল একটু; কিন্তু জেরা থামল না। তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল—'কেত্তে দিন-অ রহিবে?' চোদ্দ দিন শুনে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মিলিবে। ভড়া লাগিবে দেইলি দি-তঙ্কা।'

অর্থাৎ দৈনিক দু টাকা।

তাই সই। বললাম, 'দেখি বাবা ঘরটা।'

বাংলো প্যাটার্ন বাড়ি। সামনেই বারান্দা এবং একটা বড় হলঘর। দু পাশে দুটি শোবার ঘর। ভাড়া দেবেন ব'লেই বাড়িওয়ালী ডান পাশের

ঘরটির সঙ্গে আলাদা শৌচাগার ইত্যাদি তৈরি করিয়েছেন। সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা। কল আছে, কুয়াও আছে একটা। বাড়িটা শুনলাম একেবারে নতুন নয়, এখানে এই প্ল্যানেরই একটা বাড়ি ছিল, তবে তার বিশেষ কিছু আর নেই—বলতে গেলে সবটাই ঢেলে-সাজা হয়েছে।

যাই হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই। নবসাজে তৈরি হবার পর কেউ আসে নি—সেইটুকুই আমার যথেষ্ট। তখনই কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। ঠিক হ'ল যে, উক্ত মালী দৈনিক চার আনার বদলে আমাকে দু বেলা স্নানের জল ও পানের জল দেবে এবং ঘর ঝেড়ে বিছানা ঝেড়ে দেবে। অগ্রিম দশটি টাকা তার হাতে দিয়ে হোটেলে ফিরলাম। ম্যানেজারবাবুকে সংবাদটি দিয়ে তাঁর সঙ্গেই বন্দোবস্ত করলাম, দু বেলার চা-জলখাবার তিনি আমার নতুন বাসায় পাঠিয়ে দেবেন এবং স্থূল আহারগুলো এখানে এসে আমি খেয়ে যাব। পাশেই থাকব, সুতরাং তিনি খুব আপত্তি করলেন না। যদিচ সিটটা ছেড়ে দেবার জন্য দৈনিক চার্জ থেকে তিনি আট আনার বেশি কমাতে রাজী হলেন না কিছুতেই।

দিন-দুই বেশ নিরুপদ্রব শান্তিতে কাটল। একা থাকি এত বড় বাড়িতে, সমুদ্রগর্জন ছাড়া কোন শব্দ নেই। মালী বড় ঘর খুলে একখানা ক্যাম্প-চেয়ার বার ক'রে দিয়েছে, সেইটে পেতে চুপ ক'রে ব'সে থাকি বারান্দায়, ঢেউ দেখি আর ঢেউয়ের শব্দ শুনি। নিশ্ছিদ্র অবসর। সঙ্গে বই এনেছি খান-দুই, কিন্তু পড়তে ইচ্ছা করে না। সমুদ্রের দিকে চেয়েই দিন কেটে যায়, পড়ব কখন? বুঝতে পারি ভিক্তর হুগো শুধু সমুদ্র দেখেই তাঁর নির্বাসনের বারো বৎসর কেটে যাবে, এ কথা কেন বলেছিলেন। ঠিক এমনি একটি বিশ্রামেরই বুঝি কল্পনা করছিলাম এতদিন।

কিন্তু তৃতীয় দিন সকালবেলা সমুদ্রতীর থেকে বেড়িয়ে ফিরে দেখি, বিষম কাণ্ড। তিনখানা রিক্‌শা দাঁড়িয়ে আমাদেরই বাড়ির সামনে, তা ছাড়াও একটা ঠেলাগাড়ি। একখানা রিক্‌শা এবং ঠেলাগাড়ি বোঝাই নানা রকমের ডেয়ো-ঢাকনা, আর একটিতে একটি দাসী-গোছের স্ত্রীলোক—তাতেও যৎপরোনাস্তি মাল বোঝাই দেওয়া হয়েছে এবং বাকি একটি রিক্‌শা জুড়ে এক

ভদ্রমহিলা।

অনুমানে বুঝলাম, ইনিই বাড়ির মালিক বা মালেকা। ফরসা রঙ, খুবই ফরসা তাতে সন্দেহ নেই, বয়সকালে হয়তো সুন্দরীই ছিলেন—কারণ নাক চোখ মুখ ভালই, কিন্তু বেঢপ ও বেডৌল মোটা ব'লে প্রথম দর্শনে কিছুই বোঝা যায় না, চোখে পড়ে শুধুই মেদ—তাল তাল, ডেলা ডেলা মেদ। বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছিই হবে হয়তো, মাথার চুলে বিশেষ পাক ধরে নি, কিন্তু টাক ধরেছে—সামনেটা যেখানে এককালে সিঁথির সরু গলি ছিল সেখানে আজ চৌরঙ্গীর চওড়া রাস্তা। অবশ্য সিঁথিতে সিঁদুরের কোন চিহ্ন নেই, যদিচ চওড়া কালাপাড় শাড়ি পরনে এবং হাতে গোছাভর্তি চুড়ি। গলার হারটা দেহের অনুপাতেই বোধ করি তৈরি। জাহাজ বাঁধা শেকলের মতোই মোটা।

ভদ্রমহিলা বহু কষ্টে এঁকেবেঁকে নামলেন। দেহের সঙ্গে কণ্ঠস্বরটাও বেশ মানানসই। হাঁক-ডাক ক'রে রিক্‌শাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা এবং মালীকে ধমক দিয়ে চারিদিক সন্ত্রস্ত ক'রে তুললেন।

মনটা বিরক্তিতে ভ'রে গেল। মনে হ'ল আমার এই শান্তির তপোবনে যেন মূর্তিমতী অশান্তি এসে দেখা দিলেন। এটাকে কতকটা অনধিকার প্রবেশ ব'লেই বোধ হ'ল এবং মনটা বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল। অথচ উপায়ই বা কি? ওঁর বাড়িতে যে উনি আসবেন না—এ রকম কোন শর্ত তো হয় নি।

মালের স্তূপ, গাড়ি প্রভৃতি পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। বারান্দাতে ডেক-চেয়ারটা পাতাই ছিল, সেটাকে টেনে ঘরে তুলে দরজা বন্ধ ক'রে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে এসে বিছানায় বসলাম। যা ক'রে এখন জানলা—বারান্দায় ব'সে শান্তিতে একটু সমুদ্র দেখব—সে সম্ভাবনা তো গেল।

কিন্তু প্রথম তোলপাড়টা কমে যেতে কোলাহলটাও আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল। অনুমান করলাম, বাঁ দিকের ঘরটিতেই তিনি শয়ন করবেন। সুতরাং ভবিষ্যতে ঐ নাকাড়ার মতো গলা অন্ততঃ কানের কাছে বাজবে না। অনেকক্ষণ চুপচাপ দেখে আস্তে আস্তে একবার বাইরে বেরুলাম ভরসা ক'রে, দেখলাম আমার অনুমানই ঠিক। ডেয়ো-ঢাকনা বেশির ভাগই ওঁদের বড় রান্নাঘরে তোলা হয়েছে, বাঁ দিকের ঘরেই বিছানাপত্র উঠেছে। কিন্তু বিস্ময়ও

কিছু তোলা ছিল বইকি আমার জন্যে। হলঘরের জানলা ছুটি খোলা হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখি—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—সেটি রীতিমত হাল-ফ্যাশানের ড্রয়িংরুমের মতো সাজানো। গদিমোড়া সোফা-সেটি, তাতে খাকি কাপড়ের ঢাকা, মধ্যে নীচু কাশ্মীরী টিপয়—পাশে একটা ছোট হোয়াটনটে কিছু বই ও কাগজ। এ ছাড়াও খান চারেক বেতের চেয়ার এবং ডেক-চেয়ার। কি কাণ্ড! এ যে ধুকুড়ির মধ্যে খাসা চাল!

ফিরে এসে আবার দোর ভেজিয়ে দিয়ে বিছানায় বসলাম। মালীর পাত্তা নেই। সে বোধ হয় ওদের জন্যে বাজারে গিয়েছে। সঙ্গের মেয়েছেলেটি ইতিমধ্যেই উনুনে আঁচ দিয়েছে। বেশ শান্ত অবস্থা। আমি বিছানায় গা ঢেলে একখানা বই টেনে নিলাম। বাইরে ব'সে যেমন সমুদ্রের দিকে চেয়ে কাটানো যায়, ঘরের ভেতর তা সম্ভব নয়।

মিনিট পাঁচেক মাত্র কেটেছে, এমন সময় অত্যন্ত শান্ত এবং মধুর-গম্ভীর একটি নারীকণ্ঠ কানে এল, বাবা ঘরে আছেন নাকি?

শশব্যস্তে উঠে দোর খুললুম। দেখি বাড়িওয়ালী স্বয়ং। কিছুক্ষণ পূর্বের সে বজ্রনাদ এমন মাধুর্য পেল কোথা থেকে? আশ্চর্য তো! সে যাই হোক, উনি স্নান করেছেন। ভিজে চুল পিঠে এলানো, পরনে গরদের শাড়ি। বেশ মহিমময়ী মূর্তি। অতখানি মেদও যেন এখন আর বেমানান বোধ হচ্ছে না।

ভদ্রমহিলার হাতে একটি রূপোর রেকাবিতে কলকাতা-মার্কা চারটি 'আবার খাব' সন্দেশ, আর এক হাতে একটি কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল। আমায় দেখে একগাল হেসে বললেন, 'একটু জল খান বাবা। বাড়িতে আছেন—ছেলে-মানুষ, ছেলের মতো, আপনাকে না দিয়ে তো মুখে তুলতে পারি নে বাবা। আপনি নির্ভয়ে খান, কলকাতা থেকে এনেছি। আপনারা তো অত জাত-ফাত মানেন না, আর মানলেও সন্দেশে দোষ নেই, এ যার-তার হাতে খাওয়া যায়।'

আগেকার বিরূপ মনোভাব যেন কোন্ মায়ামন্ত্রবলে চ'লে যায়। বড় ভাল লাগে মানুষটিকে। হেসে বলি, 'আমাকে আর 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন? আপনি আমার মায়ের মতো। আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

আমিও বরং আপনাকে 'মাসিমা' ব'লে ডাকব।'

একগাল হেসে মাসিমা বললেন, 'বাবা, তোমার কথা শুনে প্রাণটা জুড়ল। মালীর মুখে ছোকরা ভাড়াটে এসেছে শুনে যা ভয় হয়েছিল! আমরা হলুম সেকেলে মানুষ, চেঁচামেচি করা স্বভাব। না জানি কি মনে করবেন, হয়তো বিরক্ত হবেন—ভয় হয়েছিল এমন। তারপর আবার মালীটা বললে, বাবু কারুর সঙ্গে কথা কয় না—চুপ ক'রে থাকে। তাই শুনে তাড়াতাড়ি পারুলের মাকে বলি, অত চেঁচাস নি মা, চুপ কর্। বাবু হয়তো অসভ্য ভাববে। তা একটু বসি বাবা—তুমি একটু মুখে দাও দেখি। ল্যাংড়া আমও এনেছি। এ-বেলা ভিজুক, ও-বেলা ছাড়িয়ে দেব।'

অগত্যা সন্দেশের থালা হাত থেকে নিতে হয়। ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্ন করি, 'আপনি জল খেয়েছেন?'

'না বাবা। এখনও আহ্নিক-পূজো কিছুই হয় নি। এইবার যাব। একটু চা করতে বলেছি। আমার গুরুর অনুমতি নেওয়া আছে—চা খেয়ে আহ্নিক করি। তা হ'লে মনটা স্থির হয়ে পূজোয় বসে। নইলে কেবল তেষ্টা পায় আর ছট্‌ফট্ করি—কখন পূজো শেষ হবে,—চা খাব!'

এই ব'লে একটু হাসলেন।

প্রশ্ন করলাম, 'কদিন থাকবেন?'

'এখন তো রথ অবধি আছিই। উনি যদি হুকুম দেন তো আরও কিছুদিন থাকব, নইলে তার পরই পালাতে হবে। অনেক ব'লে এই দেড় মাস ছুটি নিয়েছি। আমার বাবা বাতের ধাত কিনা! বুকেরও একটু গোলমাল আছে, এখানে থাকলেই ভাল থাকি। কিন্তু কি করব, ওঁর যে একদম ছুটি নেই। পাঁচ রকম ব্যবসা, দিনরাত তাই নিয়ে মেতে আছেন। একটা দিন বাইরে যাবার উপায় নেই। কত বোঝাই যে শরীরটার দিকে তাকাও—বয়স হয়েছে, একটু বিশ্রাম নেওয়াও দরকার। তা কে কার কড়ি ধারে! বাড়ি হ'তে গৃহ-প্রবেশের সময় পাঁচটি দিন এসে ছিলেন। বাস্—তাই আমার ভাগ্যি। উনি থাকবেন ব'লে কত শখ ক'রে ড্রয়িং-রুম সাজালুম—তা বরাতে থাকলে তো বাবা ছুটি ভোগ করবে—ইহজীবন খালি গাধার মতো খাটতেই এসেছিল। আবার বললে বলে—যতদিন খাটছি ততদিনই আছি, বসলেই একেবারে শুয়ে পড়ব।'

আবারও সিঁথির দিকে তাকাই। না, সিঁথিতে সিঁদুর নেই।

ভদ্রমহিলা আর যাই হোন, নির্বোধ নন। আমার চাহনির অর্থ বুঝতে তাঁর দেরি হ'ল না। মাথাটা ঈষৎ নামিয়ে বললেন, 'না বাবা, আমি ওঁর ঠিক বিবাহিতা স্ত্রী নই। আমি—আমরা—এই পথেরই। মিছে কথা কেন বলব বাবা তীর্থস্থানে এসে? জগন্নাথ যা করতে পাঠিয়েছেন তাই করছি। আমার দুঃখ করার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আজকাল অনেকে সিঁদুর পরে বটে, কিন্তু আমি ওটাকে পবিত্র চিহ্ন ব'লেই মনে করি। ও আমাদের নেবার অধিকার নেই।...তুমি বোধ হয় একটু আঘাত পেলে বাবা মনে মনে, তাই না?'

তাড়াতাড়ি সন্দেশের থালা নামিয়ে দু হাত জোড় ক'রে বলি, 'আপনি আমার মাসিমা, সেই পরিচয়ই আমার কাছে ঢের!'

ওঁর চোখ ছলছিলয়ে এল। বোধ হয় কি বলতেও গেলেন; কিন্তু তার আগেই পারুলের মা চা নিয়ে এল। ওঁর জন্য সাদা পাথরের বাটিতে, আমার জন্যে রীতিমতো হালফ্যাশানের এক কাপে।

চা খেয়ে তিনি আহ্নিকে চলে গেলেন। আমিও যথারীতি চেয়ারটা বার ক'রে বারান্দায় এনে বসলুম। বাঁচা গেল।

বিকেলে তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই পারুলের মা চা দিয়ে গেল। ঘন্টা-খানেক পরে মাসিমা নিয়ে এলেন ল্যাংড়া আম আর সন্দেশ, আর এক দফা চা।

একটু বিব্রতই বোধ করলাম।

সবিনয়ে বললাম, 'এসব আর কেন মাসিমা? এখনই আবার হোটেল থেকে চা দিতে আসবে।'

প্রসন্ন নিবিকার মুখে মাসিমা উত্তর দিলেন, 'সে আমি বারণ ক'রে দিয়েছি বাবা। ব'লে পাঠিয়েছি চা-জলখাবার আর পাঠাতে হবে না। ভাতটাও বন্ধ ক'রে দিতাম, কেন না পারুলের মা ভাল কায়স্থর মেয়ে—ওর হাতে খেলে তোমার জাত যেত না। কিন্তু তুমি হয়তো বড় বেশি লজ্জা পাবে ব'লেই বললুম না। কিন্তু তা ব'লে মাসিমার কাছে থেকে, হোটেল থেকে চা আনিয়ে খাবে, এ বাবা আমার পক্ষে বড় লজ্জার কথা—নয় কি?'

বাঁচলুম। মাসিমা দেখলুম মানুষটি খুব শৌখিন, উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা এনেছেন সঙ্গে। আমিও ঠিক এই চা-ই পছন্দ করি। হোটেলের চা খেতে গিয়ে চোখে জল আসে।

পরের দিন আরও খুশী হলুম—একটু বিস্মিতও হলুম ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় পারুলের মা চা নিয়ে আসাতে। এখানে এসে বেড-টি পাব—এ আশা কখনই করি নি। যাকে বলে প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাসিমারও এ অভ্যাস আছে বুঝি পারুলের মা?'

'না দাদাবাবু, উনি স্নান না ক'রে খান না। আপনার জন্যেই ব'লে রেখেছিলেন। সেখানে বাবু খান কিনা। স্পিরিট-স্টোভ, স্পিরিট সব সঙ্গেই আছে। মা বললেন, ওরা কলকাতার ছেলে, বিছানায় শুয়ে চা খাওয়া ওদের অভ্যেস। কাল ভোরবেলাই চা দিস।'

মুগ্ধ হয়ে গেলাম মাসিমার বিবেচনায়।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে এল গাওয়া-ঘিয়ে ভাজা লুচি, সন্দেশ ও চা। কিন্তু তার চেয়েও কৃতজ্ঞ হলুম যখন বেলা দশটার সময় মালী নিঃশব্দে আমার পাশে এসে একটি ছোট টিপয় এবং তার ওপর এক কাপ চা রেখে গেল। এই চা-টির জন্য এখানে এসে পর্যন্ত অসুবিধা বোধ করি। কাছাকাছি চায়ের দোকান নেই, তা হ'লে যেতাম। অথচ স্নান করার ঘণ্টাখানেক আগে এই চা খাওয়া আমার চিরদিনের অভ্যাস।

এমন ক'রে অন্তর্যামীর মতো মনের কথা বুঝতে পারেন কি ক'রে?

বিকেলবেলা চা এবং চা-জলখাবার শেষ ক'রে যথারীতি বাইরের চেয়ারে বসেছি, মাসিমা এসে পাশে মাটিতেই বসে পড়লেন।

এ-কথা সে-কথার পর প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি কর বাবা?'

মাথা চুলকে বললুম, 'সে এমন কিছু নয় মাসিমা। লিখি-টিখি।'

'ও, বই লেখো বুঝি? কি বই, ইস্কুলের বই? না, নাটক নভেল?'

'নাটক নভেল।'

'তাতেই সংসার চলে?'

'কায়ক্লেশে চলে। খুব কি আর সচ্ছলে চলে?'

'হ্যাঁ, আজকাল শুনেছি লেখকরা অনেকে শুধু লিখেই খান। এখন তা হ'লে বই বিক্রি বেড়েছে। আগে বই লিখে সংসার চলত না বিশেষ।'

মাসিমা দেখছি এ জগতের খবরও রাখেন।

বিস্ময় চাপতে পারলুম না। বললুম, 'আপনি এসব খবর এত রাখেন কি ক'রে?'

মাসিমা মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, 'দু-চারজন লেখককে আমিও চিনতুম বাবা, এখনও চিনি। তবে অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। দু-একজন দয়া ক'রে তাঁদের বইও দিতেন—নতুন বই বেরুলে।'

আগ্রহ বেড়েই যায়। প্রশ্ন করি, 'কাকে কাকে চিনতেন।—উনি—মানে মেসোমশাই কি এসব লাইনের লোক নাকি? কিংবা প্রকাশক-ট্রকাশক?'

'না না বাবা, উনি নিরেট লোহার কারবারী। লোহা আছে, সিমেন্ট আছে, কিছু কিছু কনট্রাক্টরিও করেন, ওঁর এসব করবার সময় কোথায়?'

'তবে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র কি?'

মাসিমা কথাটা এড়িয়ে যান। বলেন, 'সে আর একদিন বলব এখন।' তারপর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'অনিল ঘোষালকে চিনতে বাবা?'

'কে অনিল ঘোষাল? আর্টিস্ট? মানে ছবি আঁকতেন যিনি?'

'হ্যাঁ, তার কথাই বলছি।'

'তাঁকে বাংলা দেশের কে না জানে মাসিমা। বাংলা দেশের সব কাগজেই একসময় তাঁর ছবি ছাপা হ'ত। কোথাও ছবির প্রদর্শনী হ'লে রাজারাজড়ারা এসে ওঁর ছবিই আগে খুঁজতেন, আর কি দামে বিক্রি হ'ত—দেড় হাজার দু হাজার আড়াই হাজার পর্যন্ত এক-একটা ছবির দাম উঠত। আপনি তাঁকে চিনতেন নাকি?'

'চিনতুম বইকি। ওঁর ছবির য়্যালবামও আছে আমার কাছে। এখানেই আছে। দেখাব? দাঁড়াও, আনছি।'

হল-ঘরের বইয়ের র‍্যাকেই ছিল। মাসিমা উঠে গিয়ে ধুলো ঝেড়ে এনে দিলেন। ব'সে ব'সে পাতা ওলটাতে লাগলাম। টাইটেল-পৃষ্ঠায় উপহার লেখা আছে, 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী সত্যবালার করকমলে—অনিল ঘোষাল।' অর্থাৎ মাসিমার নাম সত্যবালা। শুধু সাহিত্যিক নয়, শিল্পীদের সঙ্গেও তাঁর

দহরম-মহরম যথেষ্ট। কারণটা কি ?

প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ বোধ হয়। স্পষ্টই দেখছি মাসিমা সঙ্কোচ বোধ করছেন। সুতরাং নীরবে য়্যালবামের পাতা ওল্‌টাই। সব ছবিই পরিচিত। এককালে আমি অনিল ঘোষালের খুব ভক্ত ছিলাম, আজও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কম নেই। এসব ছবিরই ইতিহাস আমি জানি, কোন্ প্রদর্শনীতে কোন্‌খানা কত দামে বিক্রি হয়েছে এবং কোন্ মহারাজা বা লাট সাহেব কিনেছিলেন, তা আমার এখনও মুখস্থ।

তেলের ছবি আঁকতেন অনিল ঘোষাল। আশ্চর্য ছিল তাঁর তুলির টান। রঙে ছিল অদ্ভুত দক্ষতা। অধিকাংশই নারীদেহের ছবি। একই মডেলের ছবি সবগুলো। ভদ্রলোক বোধ হয় কখনও দ্বিতীয় মডেল ব্যবহার করেন নি। করার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ যাকে সামনে রেখে তিনি ছবি আঁকতেন, সে মেয়েটি আশ্চর্য সুন্দরী—অমন রূপ বাঙালীর ঘরে দুর্লভ। হয়তো বাঙালী নয়। যেমন দেহ-লাবণ্য, তেমনি মুখশ্রী। এই একই মূর্তি কত রকমের কত ঢঙেই না এঁকেছেন, কোনটা খারাপ লাগে নি। কেউ স্নানরতা, কেউ কলসী-কাঁখে, কেউ প্রণতা, কেউ দর্পিণী—নানা রূপ ওই একই মেয়ের। বিচিত্র ভঙ্গীতে ছবি নিয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন মেয়ে ব'লে মনে হয় তাই। ওঁর ছবির প্রতি ক্রেতাদের যে পক্ষপাত ছিল, তার জন্যে হয়তো শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধাই সবটা দায়ী নয়—এই আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটির দেহলাবণ্যও খানিকটা দায়ী। হয়তো বা বেশির ভাগই।

অনিল ঘোষাল মারা গিয়েছেন। শোচনীয় মৃত্যু। শুনেছি কোন্ এক পতিতা রমণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিলেন তিনি, তার পেছনে ব্যয় ক'রেই তিনি সর্বস্বান্ত হন। তবুও নাকি তার মন পান নি—সে ওকে ত্যাগ করে। সেই দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করেন। এবং করেন সেই রমণীরই বাড়ির সামনে রাস্তায়। অতবড় শিল্পীর মৃত্যু হয় পথে।

এতদিন মনে হয় নি—আজ মনে হ'ল—যে-মেয়েটিকে মডেল ক'রে তিনি আঁকতেন, নিশ্চয় তাঁরই প্রেমে প'ড়ে ছিলেন তিনি। ঠিক তাই। এ কথাটা এতদিন কেন মনে পড়ে নি। আচ্ছা নির্বোধ তো আমি! এমন মেয়ের প্রেমে না পড়াই অস্বাভাবিক।

কে এ মেয়েটি! এত নিষ্ঠুর! যে শিল্পী এমন ক'রে শুদ্ধমাত্র তাকেই অমর ক'রে রেখে গেল নিজের সাধনায়—সারা জীবন শুধু ওই একটি রূপই আঁকল—তার দিকে ফিরেও তাকাল না, এমন নিষ্ঠুর এমন পাষাণী—সে কে?

সহসা প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আচ্ছা, এই যে ওঁর মডেল—মানে, যাঁকে সামনে রেখে এই সব ছবি উনি এঁকেছেন, এঁকে চিনতেন?'

মনে হ'ল মাসিমার সুগৌর মুখে কে একরাশ আলতা ঢেলে দিলে। উনি মাথা হেঁট করলেন। অকারণে ওঁর লজ্জার কারণ হওয়ায় নিজেই লজ্জা পেলাম। প্রশ্নের আর পুনরুক্তি না ক'রে নীরবে ছবিই দেখে যেতে লাগলাম।

একটু পরে কিন্তু উনিই মুখ তুললেন। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম এবং অবাক হয়ে গেলাম—ওঁর মুখে শুধুই লজ্জা নয়, যেন একটু গৌরবেরও আভাস ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে বললেন, 'জগন্নাথের কাছে এসে আর মিছে কথা বলব না বাবা, ও মডেল আমিই।'

সামনে সহসা জগন্নাথদেবকে সশরীরে আবির্ভূত দেখলেও হয়তো অত বিস্মিত হতুম না, যতটা হলুম ওঁর কথা শুনে।

এই মেদবিপুলা স্থবিরা প্রৌঢ়া রমণী আর সেই পূর্ণযৌবনা, স্বাস্থ্য-লাবণ্যবতী সুশ্রী মেয়েটি—এক এবং অভিন্না? এ কি সত্যি?

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। হ্যাঁ তো, ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে চোখ ললাট এবং চিবুকের গঠনে একটা সাদৃশ্য ধরা পড়ে বইকি!

কিন্তু তাই বলে ওই—আর এই!

না না, এ অসম্ভব।

লজ্জিতভাবে একটু হাসলেন মাসিমা। বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আজকের এ চেহারা দেখলে সেদিনকার ওই চেহারার মিল পাওয়া শক্ত। কিন্তু এই তো ভগবানের নিয়ম বাবা। সকলেরই যৌবন একদিন এই পরিণামে এসে পৌছয়।'

তবু অবিশ্বাস যায় না। বলি, 'কিন্তু উনি তো মারা গেছেন মোটে পাঁচ-ছ

বছর। তার আগে অবধি তো ছবি এ কেছেন আর এই ছবিই এঁকেছেন। তা হ'লে—'

মাসিমা বললেন, 'যা কিছু ছবি দেখছ বাবা—সব দু বছরের ভেতর স্কেচ করা—তারপর আর ওঁর দরকার হয় নি। উনি জানতেন যে মেয়েদের, বিশেষত বাঙালী মেয়েদের, যৌবন কত ক্ষণস্থায়ী। বলতেনও তো প্রায়ই, এইবার তো বেঢপ মোটা হয়ে যাবে, এই বেলা যা পারি ক'রে নিই। তা নিয়েছেনও প্রায় তিনশো স্কেচ। তার কখানাই বা কাজে লাগিয়েছেন! যদি আরও বছর কতক বাঁচতেন তা হ'লে হয়তো সেগুলো শেষ হ'ত।'

তা হ'লে ইনিই সেই, যার জন্যে অতবড় একজন শিল্পী প্রাণ দিল!

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় মনটা ভ'রে যায়।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হয়। প্রশ্ন করি, 'কিন্তু ওঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ঘুচল কেন? কি নিয়ে অশান্তি হ'ল?'

ব'লেই বুঝতে পারি যে, অশোভন হয়ে গেছে প্রশ্নটা। অনধিকার চর্চা তো বটেই। লজ্জিত হয়ে অন্য কথা পাড়তে যাব, তার আগেই তিনি সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, 'কই, সম্পর্ক তো ঘোচে নি। মরবার সাত দিন আগেও আমার বাড়িতে এসেছিলেন, কত গল্প ক'রে গেছেন! তখন কি জানি যে, এই সব সাংঘাতিক মতলব ওঁর মাথায় খেলছে! ক্ষীরের পানতুয়া তৈরি করেছিলুম, চেয়ে চেয়ে খেয়ে গেলেন বাবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।'

এ আবার কি কথা?

কিন্তু তখন আর কৌতূহল চাপবার ক্ষমতা নেই। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ব'লেই ফেললাম, 'বাবু? উনি তা হ'লে আপনার কে ছিলেন?'

'পোড়া কপাল! বাবুর বন্ধু ব'লেই তো ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ! আমি ওঁকে ঠাকুরপো বলতুম, উনি বলতেন বউদি। একদিন বাবুকে এসে বললেন, বউদির এমন ফিগার—ওঁকে যদি মডেল পেতুম, তা হ'লে ভারি সুবিধে হ'ত। বাস্, বাবুর হুকুম হ'ল যে, ওঁর স্টুডিওতে যাও। তা অবিশ্যি আমি যাই নি। আমারই বাইরের একটা ঘরে উনি তখনকার মতো স্টুডিও করেছিলেন। এই পর্যন্ত। শেষে আমার বিরক্তি ধ'রে গেল, তা ছাড়া তখনই

মোটা হতে শুরু করেছি। ওঁরও আর দরকার রইল না।'

প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি ধমক খাব ; কিন্তু তবু সাহস যেন বেড়েই চলছিল।

ব'লে বসলাম, 'কিন্তু ছবি আঁকতে আঁকতে কোন ঘনিষ্ঠতা হয় নি ?'

'কি দুঃখে হবে বাবা! আমার এমন রাজা বাবু। ষোল বছর বয়সে ওঁর পায়ে ঠাঁই পেয়েছি, আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও কারুর কাছে উনি যান নি। মন্তর পড়া হয় নি শুধু, নইলে আমরা স্বামী-স্ত্রী। তা ছাড়া ওঁর ছেলেও আমাকে নতুনমা বলে, বাড়িতে আসে। এসব বিষয়-সম্পত্তিও সে-ই পাবে, উইল ক'রে দিয়েছি। তুমি হাসালে বাবা, ওই বাউণ্ডুলে আর্টিস্ট, কি ছিল ওর ? ছবি বিক্রি যখন হ'ত—দু-চার দিন খুব উড়ত, তারপরই তো এসে হাত পাতত বন্ধুবান্ধবদের কাছে।'

চুপ ক'রেই থাকি।

শিল্পীর সাধনা, ধ্যান, তাঁর কৃতিত্ব—এসব তা হ'লে নিতান্তই কথার কথা! নারীর প্রেম পেতে হ'লে সেই সনাতন কাঞ্চনমূল্যেই পেতে হবে ?

খানিক পরে বললাম, 'আমার কথায় রাগ করছেন না তো মাসিমা ?'

'না না বাবা। ছি! তুমি তো অন্যায় কিছু বল নি।'

'আচ্ছা, তবে যে শুনেছিলুম উনি কোন এক মেয়ের জন্যেই—'

মাথা হেঁট করলেন মাসিমা। নীরবে নতমুখে বসে বসে উড়ে-আসা বালির ওপর দাগ কাটতে লাগলেন।

আমি মনে মনে একটা বিজয়গর্ব বোধ করলাম। এইবার ধরেছি তা হ'লে। কিছু একটা ছিল বইকি!

কিন্তু একটু পরেই মাসিমা মাথা তুলে বললেন, 'সে আমারই লজ্জার কথা বাবা। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমিই ওঁরমৃত্যুর জন্যে দায়ী। তখন কি জানি ছাই যে, ওঁর প্রকৃতি এমন হবে! একটা মেয়ে আমার বাড়ির নিচের তলায় ভাড়াটে আসে। যে ঘরে ওঁর স্টুডিও ছিল, সেই ঘরেই। খালি পড়ে থাকে, নিচের তলায় ব'লে আমি জোর ক'রে ভাড়া দিয়েছিলুম। নইলে ওঁর মত ছিল না মোটেই। আমার এক পাতানো মাসি ব'লে দিয়েছিলেন—ভাড়া নিয়ে কোন গণ্ডগোল হবে না, তিনি দায়ী। যে ভাড়া এল—নীরি, তার একটা সতেরো বছরের মেয়ে ছিল

সোনা ব'লে। কী বলব বাবা, এমন শ্রীহীন মেয়ে আমি দুটি দেখি নি। যেমন কালো তেমনি বেয়াড়া কাঠ-কাঠ গড়ন। একেবারে পুরুষ মানুষ। বলতে লজ্জা করে, মেয়েলী ধরন তার চেহারায় কোথাও ছিল না। নীরির এক বাবু ছিল ওই রকম, মেয়েটি নাকি তার মতোই হয়েছে। ইদানীং নীরির কেউ ছিল না, বয়সও হয়েছিল, টাকা সুদে খাটাত আর খেত। মেয়েটার বাবু জুটবে না তা সেও জানত। বিয়ের চেষ্টা করেছিল। আমাদের ঘরে এমন বিয়ে আখছার হয়, কিন্তু ওকে কে নেবে বাবা ? সে আশাও ছিল না। ওর নামই র'টে গিয়েছিল গাড়োয়ান-সোনা, গাড়োয়ানের মতো চেহারা। আমার বাড়ি আসবার পর, বোধ হয় ওর মায়ের টাকার গন্ধ পেয়েই, পাড়ার এক বিশ্ববখাটে ছোঁড়া লাগল ওর পেছনে। সোনাও—এর আগে তো ও স্বাদ পায় নি, সেদিকে ঢলল। এর ভেতর কি ক'রে কি হ'ল, একদিন ঠাকুরপোর চোখে প'ড়ে গেল মেয়েটা। কি যে দেখলেন ওর মধ্যে তিনি, ঈশ্বর জানেন, এত বড় শিল্পী ওই গাড়োয়ানের মতো মেয়েটার জন্যে পাগল হয়ে উঠলেন। কাপড় গয়না কত কি দিয়ে ডুবিয়ে দিলেন। ইদানীং কাজ পেয়েছিলেন ভাল, খুব রোজগার হ'ত, সবই ঢালতেন ওর পায়ে। মায়ের ভয়ে সোনা ওকে বাবু করলে। আর একখানা ঘর ভাড়া ক'রে সেখানে রাজপ্রাসাদের মতো সংসার পাতলেন ঠাকুরপো। অভাব নেই কিছুর, কিন্তু সে বেটিরও কি যে নজর, সেই বখাটে ছোঁড়ার জন্যে প্রাণ যেত ওর। ক'বার ধরা পড়ল। রাগারাগি অভিমান কত কি। সোনা ওঁর পরোয়া করত না, কথায় কথায় বলত—দূর হও, অমন বাবু আমার দরকার নেই। ঠাকুরপোই শেষে পায়ে ধরে আবার আসতেন। যেন কি গুণ করেছিল ছুঁড়ী। কিন্তু তবু এত ক'রেও মন পেলেন না। একদিন রাত্রে বাড়ি চলে গেছেন কিন্তু থাকতে পারেন নি, অনেক রাতে আবার ফিরে এসেছেন—দেখেন সেই মূর্তিমান ওর ঘরে, ওর বিছানায় বসে গল্প করছে। হেসে ঢলে পড়ছে তার গায়ে সোনা। কান পেতে শুনলেন ওঁকে নিয়েই হাসাহাসি—বাস্, পকেটে পিস্তল ছিল, হয়তো কিছু সন্দেহ ক'রেই এসেছিলেন। কিন্তু সোনাকে মারতে হাত উঠল না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বুকেই করলেন গুলি।'

মাসিমা চোখ মুছলেন। বলতে বলতে ওঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল।

আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম। অপরাহ্নের রোদ মিলিয়ে এসেছে। নীল

সমুদ্রে নামছে অন্ধ রাত্রির কালিমা। সমুদ্রবেলা থেকে ভেসে আসছে ঢেউয়ের শব্দের সঙ্গে বহুকণ্ঠের মিলিত কলরব।

এখানে আমরা দুজনেই চুপচাপ।

বোধ করি একই ভাবনার অতলে তলিয়ে গেছি দুজন, মানবমনের বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় রহস্যের গহনে হারিয়ে গেছি।

গৃহিণী

ব্যাপারটা সামান্যই, কারুর টের পাবার কথাও নয়। যে লোকটি দীর্ঘকাল শুধু নিচে বাইরের কোণের ঘরে নিঃশব্দে বসে তামাক খেয়ে কাটিয়ে দিলেন, যাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যেত শুধু একদিন—প্রতি মাসের তিন তারিখে, যেদিন তিনি পেনসন আনতে যেতেন—অবশ্য কখনও কখনও, মাসের শেষের দিকে যখন মনোরমার হাতের টাকা ফুরিয়ে আসত তখন, কোন অজানা সঞ্চয় থেকে টাকা বার ক'রে দিতে হ'ত তাঁকে—সে সময়ও, সেই লোকটি যদি তেমনি নিঃশব্দে ভাত খেয়ে উঠে তামাক টানতে টানতে মারা যান তো এমন একটা কিছু সাড়া পড়বে চারিদিকে, এটা আশা করা উচিত নয়। মহেশবাবু যেমন নিভৃতে নিঃশব্দে বাস করতেন, তেমনিই একদা সকলের অজ্ঞাতে সরে পড়লেন—কারুর সেবা নিলেন না, কাউকে হা হুতাশ করতে দিলেন না, ডাক্তার ডাকারও অবসর হ'ল না।

মনোরমাও বিশেষ বিচলিত হলেন না, হবার উপায়ও ছিল না। বিরাট সংসার, বড় দুই ছেলে বিবাহিত, তাদেরও চার-পাঁচটি ক'রে ছেলে মেয়ে, এ ছাড়া চারটি মেয়ে বিবাহিতা, তাদের মধ্যে জন-দুই ক'রে ক্রমান্বয়ে মায়ের কাছে থাকতই—তাছাড়া কতগুলি নাতি-নাতনি। এ ছাড়া ছোট ছেলে বাপি এখনও কলেজে পড়ছে, তার ঝঞ্ঝাট কম নয়। এক কথায় তাঁর নিঃশ্বাস ফেলবারই সময় নেই, এর ভেতর স্বামীর জন্য শোক করার ফুরসত কই? আর সত্যি কথা বলতে কি, স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘকাল তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। মহেশবাবু পেনশন নেওয়ার পর থেকেই প্রায় ঐ কোণের ঘরটি আশ্রয় করেছিলেন, ঐখানেই সকালে তাঁর কাগজ আর চা আসত; দু-একজন বন্ধু-

বান্ধবও জুটত আগে আগে, কিন্তু যেদিন দেখা গেল যে তাঁদের জন্য বার বার চা চেয়ে পাঠিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না এবং মনোরমা একদিন স্পষ্টই ব'লে দিলেন, 'তোমার ঐ যত রাজ্যের বেকার বাউণ্ডুলে বন্ধুদের জন্যে কে একশোবার চা করবে তাই শুনি ? একটা তো ঠাকুর, এই ছেলেপুলের ঘরকন্না, সকলের আফিস-আদালত আছে—একশোবার যদি ভাতের হাঁড়ি দুধের কড়া নামিয়ে চা করতে হয় তাহ'লে কি সময়ে রান্নাই হবে, না ঠাকুরই টিকবে ? তোমার বাপু যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড !' তখন মহেশবাবু একরকম তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিষেধই ক'রে দিলেন আসতে। একাই বসে থাকতেন, লাইব্রেরী থেকে নিয়মিত একটা ক'রে বই আসত, কাগজ শেষ হ'লে সেটা পড়তেন। কি ভাগ্যি ছোট ছেলে বাপি এটা রোজ বদলে এনে দিত সন্ধ্যাবেলা, নইলে যে কি করতেন—হয়ত সত্যিই কড়িকাঠ গুণতে হ'ত !

আর একটি কাজ ছিল তাঁর, উঠে উঠে তামাক সাজা। আগে চাকরই এটা ক'রে দিত, কিন্তু সেখানেও একদিন মনোরমার অসন্তোষ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল —'তোমার সংসারে কাজ বাড়ছে বই কমছে না তো, সে তুলনায় ঝি-চাকর তো আর বাড়ে নি। তামাক খাওয়াটা একটু কমাও। অত মুহুর্মুহু কে তামাক সাজে বলো দিকি !' সেদিন থেকে ও কাজটা মহেশবাবু নিজেই ক'রে নিতেন। স্নানাহারের কোন তাড়া ছিল না যেমন তাঁর,—স্বাধীনতাও ছিল না। ঠাকুর সময়মতো এসে বলত, 'বাবু চান ক'রে নিন। অনেক বেলা হয়েছে।' তখনই উঠে স্নান করতে হ'ত। একটু গড়িমসি করলেই মনোরমার বিরক্তি ধ্বনিত হ'ত—'তিনপোর বেলা অবধি যদি হাঁড়ি হেঁশেল নিয়ে বসে থাকতে হয় তো ঠাকুরের চলে কি ক'রে বলো দিকি ! সেই কোন্ ভোরে লেগেছে ! আবার আড়াইটে না বাজতে বাজতে উনুনে আঁচ পড়বে, একটু বিশ্রাম করার সময় দেবে না ?' অগত্যা উঠে ও-পাট চুকিয়ে ফেলতে হ'ত। কোনদিন চৌবাচ্চায় জল থাকত, কোনদিন থাকত না—যেদিন থাকত না— সেদিন স্নানটা বাদ দিতেন, কাউকে কিছু বলতেন না, কাকেই বা বলবেন ? পনেরো-ষোলটি ছোট ছেলেমেয়ে যে বাড়িতে—সে বাড়িতে জল বেহিসেবী খরচ করার জন্যে কাউকে দায়ী করা চলে না।

আবার চলত সেই বই আর তামাক। বেলা তিনটেয় চা আসত।

রাত্রের খই-দুধ গৃহিণীই নিয়ে আসতেন এক-এক দিন, কারণ এই সময়টা ছিল তাঁর সংসারের খরচ-বৃদ্ধির ইতিহাস শোনানো এবং বাড়তি কিছু টাকা দাবী করার অবসর। কর্তা ঠাকুরঘরে উঠতেন না। এই ঘরেই কুলুঙ্গিতে একটু গঙ্গাজল থাকত—ফুরিয়ে গেলে আগে হাঁক-ডাক করতেন, ইদানীং ব্যাপারটা বৃথা জেনে নিজেই উঠে গিয়ে ঠাকুরঘরের দোরে হাজির হতেন। ঐটুকু ছিল বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। আগে আগে রাত্রে একবার শুতে যেতেন দোতলার ঘরে কিন্তু তাও শেষ পাঁচ বছর ত্যাগ করেছিলেন। গৃহিণীর সবাইকে নিয়ে 'গ্রুপ' ফটো তোলবার শখ হ'তে যখন চারটি মেয়েই জামাই-সুদ্ধ এসে হাজির হলেন তখন মনোরমা বললেন, 'একটা ঘর তুমি ছাড় বাপু। একটা মানুষ দুটো ঘর জোড়া ক'রে থাকলে চলে কি ক'রে?' তখন তিনি ওপরের ঘরটাই ছেড়ে দিলেন—সেই সঙ্গে খাট বিছানাও, একটি ছোট তক্তাপোশ কিনে এনে পৃথক শয্যা তৈরী হ'ল। মহেশবাবু হেসে বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যু-শয্যা!' কিন্তু সেটাও ঠিক না, কারণ ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক খেতে খেতেই কখন যে তাঁর মৃত্যু হ'ল তা যেমন কেউ টের পায় নি, বোধ হয় তিনি নিজেও তেমনি বুঝতে পারেন নি।

সম্পর্ক থাক বা না থাক, বাঙালী হিন্দুর ঘরে কর্তার মৃত্যু অত সহজ নয়। সিঁড়ির আড়ালে ঐ কোণের ঘরটা চোখের বাইরে থাকতে থাকতে মনেরও বাইরে চলে গিয়েছিল সকলের—মহেশবাবুর অস্তিত্ব এক-এক সময় মনোরমাই ভুলে যেতেন! কিন্তু ভদ্রলোক ম'রে যাবার পর তাঁর কথাটা একটু বেশী রকমই মনে পড়ল। মনোরমা কাঁদলেন—এটিও জীবনের অঙ্গ। ছেলেমেয়ে সবাই কাঁদল। তারপর ঘর-বাড়ি ধোওয়া মোছা, হবিষ্যির যোগাড়—নানা রকম ব্যাপারে বিরাট হৈ-চৈতে কাটল পরের দিনটাও। তার পরের দিন বেলা তিনটের সময় বড় দুই ছেলে একটু গম্ভীর মুখে মার কাছে এসে বসল।

সংসারের পাট সেরে আর একবার স্নান ক'রে আবার নিজের হবিষ্যির যোগাড় করা—মনোরমার খেয়ে উঠতেই তিনটে বেজেছে। তিনি মেঝেতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, এখন দুই ছেলেকে একত্রে আসতে দেখে উঠে ব'সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

মেজ ছেলে রাজেন সরকারী চাকরি করে—সে দাদার মতো মুখফোঁড় নয়; কিন্তু বড় ছেলে অনঙ্গ উকীল, তার সময়ের মূল্য আছে। রাজেনকে ইতস্তত করতে দেখে সে-ই কথাটা পাড়ল সোজাসুজি, 'তাহ'লে শ্রাদ্ধের কী রকম কি করা যাবে, মা?'

মনোরমা এটা তাঁর প্রাপ্য ব'লেই মনে করেন। সমস্ত সংসার তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত হয়, চিরকালই হ'য়ে আসছে। চিরকাল সকলেই তাঁর মতে চলে। এ ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক নিয়মেই এ প্রশ্ন করা হয়েছে, তবু তিনিই বা আর এ দায়িত্বে থাকবেন কেন? উদাসীন ভাবে বললেন, 'সে আর আমি কি বলব বাছা, তোমরা বড় হয়েছ, যা করলে ভাল হয়, ওঁর সম্মান বাঁচে সেই-রকমই ক'রো।'

অসহিষ্ণু ভাবেই অনঙ্গ বললে, 'সে কথা তো হচ্ছে না, আসল কথাটা বলো—টাকার কথা। হাতে কি রকম আছে বলো, সেই বুঝে তিলকাঞ্চন হবে না বৃষ হবে ঠিক করব।'

মনোরমা আকাশ থেকে পড়লেন, 'টাকা! টাকার কথা আমি কি জানি বাবা, উনি যতদিন বেঁচেছিলেন পেনশনের টাকাটা হাতে তুলে দিতেন, খরচ করেছি। এছাড়া তোমরা তো দিয়েছ কেউ কোন মাসে চাল্লশ, কেউ পঞ্চাশ। তাতে তো কখনই কুলোত না—মাসের শেষে হাত পাততুম, কত ঝগড়া ক'রে তবে আর কিছু কিছু বার করতেন। কোথা থেকে দিতেন, কি ছিল তাঁর, তা তো কোনদিন খোঁজ করি নি। আলমারির মধ্যে একটা হাতবাক্স ছিল, তাই থেকেই বার করতেন দেখেছি। তা সে চাবি তো তুমিই নিয়েছ ওঁর পকেট থেকে বার ক'রে।'

'সে তো রাজেনের সামনেই খুলেছি মা। একশো ত্রিশটি টাকা নগদ, দশখানা গিনি আর পোস্ট আপিসের খাতা একটা, তা তাতেও দেখেছি নব্বইটি টাকা পড়ে আছে। ওঁর ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটা পেয়ে জমা করেছিলেন, তাই থেকে মধ্যে মধ্যে তুলেছেন—এই তো দেখলুম। তা বাকি?'

মনোরমা ওর বলবার ভঙ্গীতে আহত হলেন, 'বাকী কোথায় আমি কি ক'রে জানব বাবা। আমাকে কি তিনি কোন কথা বলতেন, না আমিই জিজ্ঞাসা করেছি? আমার সে সময়ই বা কোথায়? বলে এক দণ্ড মরবার

ফুরসত নেই।'

'তবে এ সব হবে কি ক'রে?' একটু রুষ্ট ভাবেই বলে রাজেন।

'সে কথা কি আমি বলব? তোমরা তাঁর উপযুক্ত ছেলে—শ্রাদ্ধ করবে—কী করবে তা তোমরাই জানো, যা পারবে তাই করবে।'

অনঙ্গ ওকালতি-বুদ্ধির শরণ নিলে, 'না—সে তো বটেই। বলছিলুম, তুমি তোমার টাকা থেকে যদি কিছু দিতে—'

মনোরমা আরও বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'আমার টাকা? আমি কি সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে টাকা জমিয়েছি! যখন চাকরি ছিল ওঁর তখন দু-একটা টাকা জমিয়েছিলুম যা—তা এক-একবার মেয়েদের এক-এক হিড়িকে সব বেরিয়ে গেছে। নাতি-নাতনিদের অন্নপ্রাশন—এটা ওটা, তার এক পয়সাও নেই।'

রাজেন রাগ ক'রে বললে, 'বেশ, তাহ'লে ঐ কালীঘাটে গিয়ে শুদ্ধ হয়ে আসি, আমরা কোথায় কি পাবো?'

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে মনোরমা বললেন, 'তোমরা কি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওঁর শ্রাদ্ধ করবে এই ভরসায় ছিলে? তা ওঁর মতো লোকের শ্রাদ্ধ যদি কালীঘাটে গিয়ে করতে চাও তো করো, কী বলব। তোমরা উপযুক্ত ছেলে।'

'উপযুক্ত তো কত! দাদা নতুন উকীল, সবে এই দশ বারো বছর বেরোচ্ছে, কত রোজগার ওর? আর আমার চাকরি তো বাবাই ক'রে দিয়েছিলেন। কত মাইনে পাই তা তো জানোই। ছেলেমেয়েদের দুধের টাকা আলাদা দিয়ে, কাপড় জামা সব ক'রে তোমাকে সংসার খরচের টাকা ধরে দিয়ে কি থাকে? টাকার কি গাছ পোঁতা আছে আমাদের কাছে? যে নাড়া দিলেই পড়বে।'

মনোরমার খুব ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল যে এমনি কথা এর আগেও কার কাছ থেকে শুনেছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, যেবার সব ক'টি মেয়ে-জামাই এসে রইল প্রায় এক মাস, সেবার উনি বাড়তি খরচ করেছিলেন পুরো পাঁচশো টাকা। সেইবারই মহেশবাবু কথাটা বলেছিলেন। তার জন্ম কী লাঞ্ছনাই না করেছিলেন মনোরমা তাঁর। ওঁর বাক্যবাণে বিব্রত

হয়ে মহেশবাবু যখন টাকাটা বার ক'রে দিয়েছিলেন তখনও রেহাই দেন নি তাঁকে, বলেছিলেন, 'আমি টাকা চাইলেই অমন করো কেন বলো তো! ঘেন্না করে আমার এমন ক'রে হাত পাততে। এ কী আমি নিজের কোন শখ করব ব'লে নিই? তোমারই সংসারে লাগে ব'লে নেওয়া!'

তখন মহেশবাবুও কিছু বলতে পারতেন, বলতে পারতেন যে এই এতগুলো লোককে তিনি শখ ক'রে ডেকে আনেন নি—তাঁর গরজে সংসারের কলেবর এবং ব্যয় বাড়ে নি—কিন্তু কিছুই বলেন নি তিনি, শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন মাত্র।

শ্রাদ্ধটা কোন রকমে তিলকাঞ্চন ক'রেই হয়ে গেল। পাড়ার লোকে কেউ কেউ মনোরমাকে শুনিয়েই বললেন, 'অত বড় বাড়ি—পাঁচশো টাকা ক'রে তো পেনশনই পেত—তার কাজ এমন ক'রে সারা তোমার উচিত হয় নি ভাই। তারই তো সব—অথচ তার কাজটাও ভাল ক'রে করলে না? না হয় কিছু ভাঙতেই জমা পুঁজি থেকে। এই তো শেষ কাজ!'

অপমানে মনোরমার দু কান জ্বালা করেছে, দু চোখ এসেছে ঝাপ্‌সা হয়ে, তবু কিছু বলতে পারেন নি। সব কথা তো বলা যায় না।

কিন্তু সবচেয়ে আঘাত লাগল, যখন শ্রাদ্ধের পর বড় ছেলেকে ডেকে বলতে গেলেন, 'খরচপত্তর তো হাতে কিছুই নেই বাবা, টাকাকড়ি দে কিছু কিছু তোরা।'

অনঙ্গের মুখের হাঁ কিছুক্ষণ বুজলই না, 'টাকা! টাকা কোথায় পাব? এই যার একগাদা টাকা খরচ হয়ে গেল শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে। এখন আর কিছুদিন ওকথা মুখে উচ্চারণ করো না।'

'ওমা, না করলে চলবে কিসে? এই রাবণের সংসার—এর খরচা কি কম?'

'রাবণের সংসার রাখলে চলবে কেন বলো। বাবার টাকা ছিল যা খুশি করেছিলেন—এখন হয় খরচা কমাও, না হয় নিজের পুঁজি ভাঙো!'

আবারও সেই সংশয়।

মনোরমা ঝনাৎ ক'রে চাবিটা আঁচল থেকে খুলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'সব খুলে দেখে এসো বাবা, কোথায় কি পুঁজি রেখেছি। থাকে বার ক'রে নাও।'

অনঙ্গ একটু অপ্রতিভই হ'ল, 'সে কথা তো হচ্ছে না, আমাদেরও ছেলে-পুলে আছে—ধার ক'রে তো সর্বস্বান্ত হ'তে পারি না। যা হয় ক'রে চালাও। দেখো রাজ কিছু দেয় কিনা—ঐ বা কোথায় পাবে তা তো জানি না। তবে আফিসে কো-অপারেটিভ থেকে ধার পেতে পারে।···শ্রাদ্ধ তো মিটেই গেছে, এখনও মেয়েদের বসিয়ে রেখেছ কেন? সব পাঠিয়ে দাও না—'

মনোরমার চোখে জল এসে গেল, 'তোমরাই ঘাড় ধ'রে পাঠিয়ে দাও বাবা। আমার পেটের মেয়ে আমি কি ক'রে বলি যে বেরিয়ে যাও। এই শোক-তাপের সময়, আমি একটু ভুলে থাকব ব'লে ওরা আছে, নইলে কি তোমাদের অছেদ্দার ভাত খাবার জন্যে পড়ে থাকত?'

অনঙ্গ বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঐ তোমার বড় দোষ মা, সব কথা বাঁকা ভাবে ধরো, আমি কি তাই বলছি।···এই অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছ। আজকাল-কার বাজার—খরচ-পত্র তো কম নয়, বাবা ছিলেন মাথার ওপর, তিনি কি ক'রে চালাতেন তিনিই জানতেন। এখন আমরা পেরে উঠব কি ক'রে বলো। আয়টা তো রবারের জিনিস নয় যে ইচ্ছে ক'রে টেনে বাড়াব। আর বাবাকেও তো ঐ ক'রেই সর্বস্বান্ত করেছ—তখন যদি একটু বুঝে চলতে তাহ'লে এই ব্যাপারটা হ'ত না। অতবড় একটা লোক মারা গেল—অথচ তার ছেলেরা এক পয়সা পেলে না, উল্‌টে ধার ক'রে শ্রাদ্ধ করতে হ'ল!'

মনোরমার মনে পড়ল মহেশবাবুও একবার মেয়েদের নিয়ে তাঁকে খোঁটা দিয়েছিলেন। ছেলেদের সংসার ছাড়াও একশো সাতাশ টাকা দুধের বিল দেখে ব'লে উঠে'ছিলেন, 'কী সর্বনাশ! এ কি করেছ?'

তাতে মনোরমা ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, 'দুধ কি আমি খাই এক ফোঁটা যে আমাকে শোনাচ্ছ? তোমার তিন মেয়ের দরুন, বলতে নেই, সতেরোটি নাতি-নাতনি!'

কর্তা হেসে বলেছিলেন, 'এর চেয়ে ঘরজামাই রাখা যে ভাল ছিল নতুনবৌ, সে তবু জামাইদের মাইনের টাকাগুলো হাতে আসত!'

তার ফলে মনোরমা রাগ ক'রে দু'দিন খান নি—কান্নাকাটি, অভিমান—কর্তা হাতে-পায়ে ধ'রে মিটিয়ে নিতে বাধ্য হন।

আজ কেমন ক'রে মনের মধ্যেই বুঝতে পারেন মনোরমা যে এদের কাছে

সে অভিমানের কোন মূল্য নেই।...

দীর্ঘনিশ্বাসটাও ফেলতে লজ্জা করে, কোনমতে চেপে গিয়ে বললেন, 'তা এখন কি করবো ব'লে দাও, এক টুকরো কয়লা নেই, রেশন আনাতে হবে— ধোপা হিসেব চাইছে, রকমারি খরচা। অথচ আমার হাতে তো মোটে তিন চারটি টাকা প'ড়ে আছে—'

'বলো কি! না—না এমন করলে তো চলবে না। এই তো বাবা মরবার পরে দেখলুম পাঁচ মণ কয়লা এল—! না, তুমি দেখছি হিসেব ক'রে চলা কাকে বলে কিছুই জানো না। আজ সন্ধ্যাবেলা রাজেনের সঙ্গে বসতে হবে —আয় ব্যয় বুঝতে হবে, এমন করলে চলবে কি ক'রে, সে কত দেয়, আমি কত দিতে পারি বুঝে চালাতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি—আমাদের খরচ, কাপড় জামা, দুধ, ওষুধ, ডাক্তার সব তো নিজেরাই করছি, তার ওপর শুধু ডাল-ভাতের জন্যে একগাদা ক'রে টাকা দেবই বা কেন, আর পাবোই বা কোথায়? আজকাল ওকালতির যা আয়!'

ওকালতির এই আয়েই বড় বৌমা গত মাসেও নতুন গয়না গড়িয়েছেন। শালীর বিয়েতে তার আগের মাসে অনঙ্গ আড়াই ভরির কঙ্কন দিয়েছে। তাছাড়া তিনটে ইন্সিওরেন্স আছে মোটা টাকার। কিন্তু সে সব কথা মনে করিয়ে দিতে ঘৃণা বোধ হ'ল তাঁর, তিনি শুধু বললেন, 'তাই ভাল বাবা, তোমরা সংসারের ভারটা বুঝে নাও, আমি তো বাঁচি তাহ'লে।'

রুষ্ট কণ্ঠে অনঙ্গ বললে, 'ওভাবে এলিয়ে দিলে তো চলবে না। সবাই মিলে পরামর্শ ক'রে খরচ কমাতে হবে। মেয়েদের ওপর তোমার অহেতুক টান। আজ না হয় শ্রাদ্ধের জন্যে এসেছে, শোকতাপের সময়—কিন্তু চির-কালই তো দেখছি দুটি-তিনটি মেয়ে তোমার কাছে রাখা চাই-ই। কেন রে বাপু, তাদের বিয়ে-থা হয়েছে, ঘরকন্না আছে নিজেদের, জামাইরা কেউ অক্ষম নয়—বাবা দস্তুরমত খরচ ক'রেই মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন সৎপাত্র দেখে, সে সব টাকা আজ থাকলে আমাদের অভাব কি? তাদের এনে এখানে জিইয়ে রাখার দরকারটা কি? এর জন্যে বাবাকেই কি কম দুঃখটা দিয়েছ তুমি?'

আড়ষ্ট হয়ে যান মনোরমা, এখনও ষোলটি দিন কাটে নি কর্তা গেছেন— এরই মধ্যে এত কথা শুনতে হবে তা কি তিনি স্বপ্নেও ধারণা করেছিলেন? ঐ

তো সকলের চোখের আড়ালে ব'সে তামাক খেতেন—আছেন কি না কেউ খোঁজও করে নি—নাতি-নাতনিদের ডেকেও বেচারি সাড়া পেতেন না—তবু তাতেই মনোরমার যে প্রতাপ ছিল আজ আর তার কিছুই নেই? গৃহিণী বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন তিনি—সমস্ত কিছু হ'ত তাঁর মত আর নির্দেশমতো, খাওয়া-দাওয়া, বাজার-হাট, লোক-লৌকিকতা সব কিছু। কাদের জন্যে করেছেন তিনি এসব? সে কি নিজের কোন লাভে? উদয়-অস্ত খাটুনি খেটেছেন, এক মিনিট স্বামীর কাছে পর্যন্ত যাবার ফুরসত পান নি—তার আজ ভাল পুরস্কারই পেলেন বটে!

নিঃশব্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল মনোরমার। তাড়াতাড়ি মুছে ফেললেন তিনি—কেউ না দেখে।

সন্ধ্যাবেলা পরামর্শ সভায় রাজেন বললে, 'এস্টাব্লিশমেণ্ট কমাও। একটা ঝি, একটা ঠাকুর, আবার একটা চাকর—এত কেন? চাকরটা ছাড়িয়ে দাও। বোনেরা যদি কেউ না থাকে তো ঘর-দোর মোছার কাজ ঝিই করতে পারবে। বাজার আমরা পালা ক'রে ক'রে দেব এখন। আর রেশনটা বাপি আনতে পারবে না? বাপিকে বলো বরং একটা টুইশ্যানি খুঁজে নিতে, ওর নিজের হাত-খরচটাও যদি চালাতে পারে সেটাও তো কম নয়।'

বাঃ! মনোরমা হাসলেন মনে মনে। বিধাতার বিচার ঠিকই নেমে আসে—কিছুমাত্র ভুল হয় না। বাজার আগে ছেলেরাই করত—রাজেনের চাকরি হবার পরই সে ছেড়ে দিলে। সকালে বাজার ক'রে দাড়ি কামিয়ে আফিস করবে কখন? চাকর তখনই রাখা হ'ল। মনে আছে পেনশন পাবার পর কর্তা প্রস্তাব করেছিলেন চাকর ছাড়িয়ে দেবার—মনোরমাই ঝগড়া করেন, 'তোমার যেমন কথা! এতবড় সংসারের বাসন নিয়েই তো ঝিয়ের দিন কেটে যায়। ধোয়া-মোছা করে কখন? তাছাড়া বাজার-হাট, দোকান—কী নেই? …অনঙ্গের মক্কেলরা আসে সকালে, রাজেন অত তাড়াহুড়ো করতে পারে না—বাপিরও পড়াশুনো, চাকর না হ'লে চলে কখনও?'

আরও মনে হ'ল এই নতুন চাকরটা একবার মহেশবাবুর কথা শোনে নি, উল্টে আবার মুখের ওপর কি বলেছিল, মহেশবাবু বলেছিলেন ওকে জবাব

দেবার কথা। সেদিনও মনোরমা কম কটু কথা বলেন নি স্বামীকে, 'তোমার কি ভীমরতি হয়েছে নাকি? আজকালকার দিনে চাকর পাওয়াই দায়, নতুন লোক ব'লেই অত কম মাইনেতে পেয়েছি। ও গেলে কি আর ঐ টাকায় লোক পাবো ভেবেছ? এই রাবণের সংসার, তোমার কথায় লোক ছাড়িয়ে দিয়ে সবাই মিলে লোক খুঁজতে বেরুই। বেশ বুদ্ধি তো তোমার!'

সেই বোধ হয় মহেশবাবুর শেষ বিদ্রোহ। আর কখনও কাউকে কিছু বলেন নি। ঝি-চাকর, নাতি-নাতনি—ইদানীং কেউ তাঁর কথা শুনত না, একমাত্র বাপি এটা-ওটা ক'রে দিত তাঁর। হায় রে! সেদিন যদি সংসারের চেহারাটা চোখে পড়ত!

কানে গেল অনঙ্গ বলছে, 'কাগজ কলম নিয়ে নিখুঁত এস্টিমেট কষো—কে কত টাকা দিতে পারবে সেটাও ফ্যালো। আমি তো দু'শো টাকার বেশি এক পয়সাও কন্টিবিউট করতে পারব না।'

রাজেনের কণ্ঠস্বর উষ্ণ হয়ে ওঠে, 'বা রে, তা বললে চলবে কেন? আমার তো গোনা টাকা মাইনে। তোমার বরং নানাদিকে আয় ··'

ক্রমশ আবহাওয়া অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে। মনোরমা আস্তে আস্তে উঠে যান নিঃশব্দে।

ওপরে তখন তিন মেয়ে ব'সে জটলা করছে।

মনোরমার কানে গেল বড় মেয়ে বলছে, 'সত্যি, বাপের বাড়ি থেকে কত মেয়ের দেখো মোটা মোটা মাসোহারা যায়, আমরা তো কখনও কণা-রত্তি পেলুম না। এসেছি খেয়েছি ভাত-হাঁড়ির ভাত এই পর্যন্ত। শ্বশুরবাড়ি যাবো, সবাই বলবে অত বড়লোক বাপ ম'লো, তোমারা কি পেলে?'···

'আর আসাও তো ঘুচল। ভায়েদের যা কথার ধরন, এ-মুখো আর হ'তে হচ্ছে না। মার হাতে দু-এক পয়সা থাকত তবু জোর হ'ত—এই শেষ আসা বাপের বাড়িতে, ধরে রাখো। ভাইপোদের বিয়ে-পৈতেয় যে ডাকবে তাও মনে হয় না।'

সেজ মেয়ে বললে, 'মা তো কখনও হিসেব ক'রে চলে নি, এন্তার এলোপাতাড়ি খরচা করেছে। নইলে লক্ষপতি বাপ আমাদের, তাঁর শ্রাদ্ধ করার পয়সা থাকে না!'

বড় মেয়ে বলে, 'আর তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে কী ঝগড়াটাই করত। সত্যি কথা বলব বাপু, এদাস্তে মা একটা দিনের জন্যেও বাবাকে শান্তি দেয় নি। বাবা চুপ ক'রে থাকতেন তাই—মনে হ'লেও বুক ফেটে যায়।...'

মনোরমা আর শুনতে পারেন না, পায়ের নিচে সমস্ত মাটিটা যেন কাঁপছে তাঁর। কোনমতে হাতড়ে হাতড়ে ওপরে উঠে ঠাকুরঘরে গিয়ে আছড়ে পড়েন। ঠিকই হয়েছে তাঁর, এইটুকু শুধু বাকী ছিল, যাদের জন্য সকলের কাছে কলঙ্ক-ভাগী হলেন তাদেরই উপযুক্ত কথা বটে!

মহেশবাবু একদিন বলেছিলেন, 'একদিন বুঝবে নতুনবৌ। সংসার সংসার ক'রে অস্থির হচ্ছ—সংসারের শেষ পাওনাটা পেলে বুঝবে।'

এই কি শেষ পাওনা?

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ দেখলেন নিচে কোণের ঘরটা থেকে তাঁর স্বামীর জিনিসপত্রগুলো টেনে বাইরে ফেলা হচ্ছে।

'এ কী ব্যাপার রাজি?'

'ঘরটা ভাড়া দিতে হবে না। এইটেই একটেরে আছে—ভেতরের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এক কবিরাজ ভাড়াটে জুটেছে, চল্লিশ টাকা করে দেবে।... তা নইলে তো আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না। অন্তত বাপির খরচটাও যদি চলে—'

বাপি কালই বলছিল সে পড়া ছেড়ে চাকরি খুঁজবে। কিন্তু সে কথা আর মনোরমা তুললেন না। জঞ্জালের গাদা থেকে মহেশবাবুর টিকে-তামাকের বাক্স আর হুঁকো-কলকেটা তুলে নিয়ে ওপরে গিয়ে বাপিকে বললেন, 'ওঁর ঐ বসবার ইজিচেয়ারটা আমার ঘরে দিয়ে যাবি বাবা?'

'কী হবে মা? ও তো ভেঙেই গেছে—'

'তা হোক, ওটা এনে দে বাবা।'

তখনও চাকর ছিল, সে আর বাপি ধরাধরি করে চেয়ারটা মনোরমার ঘরে তুলে দিলে। বড়বৌ দেখে-শুনে মুখ টিপে হেসে বললে, 'তবু ভাল! মরবার পর শ্বশুরঠাকুরের একটু কদর হ'ল এ বাড়িতে।'

কথাটা মনোরমার কানে যেতে কোন বাধা ছিল না, তাঁকে ভয় করার

আর কোন কারণ নেই এ বাড়িতে। এখন বড়বৌই গিন্নী।

চেয়ারটা রেখে ওরা চলে যেতে মনোরমা অনেকক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়ে স্বামীর শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর সেইখানে মেঝের ওপর বসে পড়ে চেয়ারের একটা পায়া জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো তুমি আমাকে মাপ করো! আমাকে মাপ করো!'

জন্মান্তর ?

অকস্মাৎ যেন একটা কালো আর ভারী পর্দা টেনে দেওয়া হ'ল—উৎসব-বাড়ির সেই সমস্ত লোকগুলির মুখের ওপর। সবাই একসঙ্গে চুপ ক'রে গেল এবং চুপ ক'রেই রইল কিছুকাল।

কনক একটু অপ্রস্তুত হ'ল বৈকি!

সে যেন কেমন থতমত খেয়ে—একটু অবাক্ হয়েই এর ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। মুখে বোকার মতো এক ধরনের হাসি। অর্থাৎ অন্যায় ক'রে ফেলেছে কিংবা অবিশ্বাস্য কিছু বলে ফেলেছে—অথবা একেবারেই তার কথা কওয়া উচিত হয় নি, কিছুই স্থির করতে না পারার মাঝামাঝি একটা পন্থা। এর পর লজ্জিত হওয়া, অপরাধীর মতো মাথা নিচু করা—এমন কি কৌতুক-হাস্যে ফেটে পড়াও অত্যন্ত সোজা।

অথচ প্রশ্নটা নিতান্তই সামান্য—সহজও।

সে মাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, কালো মতো একটা মেয়েকে দেখলাম সিঁড়ির নিচের ঘরটা থেকে বেরিয়ে তোমার ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলে যেতে—ও কে? কই ওকে তো কখনও দেখি নি!'

তাতে এই রকম যে একটা ভয়াবহ স্তব্ধতা নেমে আসবে গোটা বাড়ির এই সমস্ত অধিবাসী ও অভ্যাগতদের মধ্যে—তা সে কেমন ক'রে জানবে?

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে অবস্থাটা তার অসহ্য হওয়াতে সে একটু অসহিষ্ণু ভাবেই প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার, কি? হ'ল কি তোমাদের? আরে!'

এর পর প্রাণ-লক্ষণ ফিরে এল ওর জ্যাঠাইমার মধ্যেই প্রথম। যেন প্রাণপণে কান্না চাপবার চেষ্টা করতে করতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ওপরে উঠে

গেলেন। অত প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর সেই অদম্য কান্নার একটা শব্দ কনকের কানে গিয়ে পৌঁছল। সে আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কী করলুম কি? হ'ল কি সবাইয়ের! য়্যাঁ?'

বিশেষত জ্যাঠাইমার এই ভাবান্তর তাকে সবচেয়ে বিচলিত করেছে। কারণ জন্মাবধি সে সবচেয়ে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে এই জ্যাঠাইমার কাছেই, বলতে গেলে তিনিই মানুষ করেছেন ওকে। মার চেয়েও বোধহয় এই জ্যাঠাইমা তাকে ভালবাসেন। ওর কোন কথাতে যদি তিনি আঘাত পেয়ে থাকেন তো তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হ'তে পারে?

কনকের এই প্রশ্নেই যেন বাকী সকলে সম্বিৎ ফিরে পেল। প্রথম প্রকৃতিস্থ হলেন ওর মামাই, বড় মামা ধমক দিয়ে উঠলেন সবাইকে, 'এত ভয় তোদের! অমনি কাকে না কাকে দেখেছে ও, আর তোরা ধরে নিলি বাড়িতে চোর ঢুকেছে! যত্ত সব ইয়ে হয়েছে।'

ইঙ্গিতটা বুঝে নিলে সবাই চোখের নিমেষে।

আবার কর্ম-কোলাহল উঠল, হাস্য-পরিহাসে মুখর হয়ে উঠল সারা বাড়িটা, যে যার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ছোট মামিমা বললেন, 'তা বাপু, ভয় হয় বৈকি! এই কাজের বাড়ি, একটা অজানা আন্‌টো লোক ঢুকলে কত কি মেরে নিয়ে চলে যাবে—কেউ টেরও পাবে না।'

অর্থাৎ চোরের ভয়টাই যেন প্রধান।

কনক বলে উঠল, 'ওমা কালো মতো মেয়ে একটা দেখলুম, হয়ত পনেরো-ষোল বছর বয়স হবে বড় জোর, সে চুরি করবে?'

মামিমা বললেন, 'হ্যাঁ, অমনি-সব মেয়েদেরই তো ছেড়ে দেয়, তাহ'লে আর কেউ সন্দ করবে না। বুঝলি না? এমন যে ঢের দেখা আছে আমাদের তাই তো সবাই অত ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।'

তবু একটা সংশয় যেন কনকের মন থেকে যেতে চায় না কিছুতেই। সে বললে, 'তা জ্যাঠাইমা অমন কেঁদে উঠলেন কেন?'

বড় মামা গলা নামিয়ে বললেন, 'সে অন্য ব্যাপার। ওঁর বড় ছেলে মানে তোর বড়দা—বেঁচে থাকলে বড়দাই বলতিস—মারা গেছেন না! আজ উৎসবের দিনে স্বভাবতই ওঁর মনে হচ্ছে যে, যদি সে বেঁচে থাকত তো কত আনন্দ করত

—আমাদেরও কত আনন্দ হ'ত—বেশ ছেলে ছিল রে!' বলতে বলতে ওঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল।

তবু কি কনকের মনে কোথায় একটা অসামঞ্জস্য ঠেকে? কোথায় একটা সংশয়ের কাঁটা বিঁধে থাকে?

কে জানে!

কথাটা সবাই সযত্নে এবং প্রাণপণে চেপে রাখবারই চেষ্টা করেছেন এত-কাল, চেপে রেখেও ছিলেন কিন্তু আর বুঝি থাকে না।

দুপুরে আর এক কাণ্ড হ'ল।

কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা বোধহয় একটু খুলে বলা দরকার।

আজ কনকের দিদির বিয়ে। উনিশ বছরের মেয়ে, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছিল, আর ক-টা মাস পরেই পরীক্ষা দিতে পারত কিন্তু হঠাৎ আশাতীত রকমের ভালো পাত্র প্রায় বিনা খরচে মিলে যাওয়াতে সকলে এটাকে বিধাতার যোগাযোগ বলেই ভাবলেন, তাই আই-এ পাস করার চেয়ে এই 'বিয়ে'-পাসটাই আগে হয়ে যাওয়া ভালো—সর্বসম্মতিক্রমে সেইটেই স্থির হ'ল। উর্মিলা একটা ক্ষীণ আপত্তি করেছিল বটে—তবে সেটা খুব আন্তরিক নয়—কেউ তাই তেমন গুরুত্বও দেয় নি সে আপত্তিতে।

একে এই সুবাঞ্ছিত বিয়ে, তায় বাড়ির প্রথম কাজ—অন্তত এ পুরুষের তো বটেই—তাই আনন্দ উৎসবের একটু ঘটা ছিল। কনকের জ্যাঠাইমা হেমলতার ছেলে নরেন মারা গেছে কনকেরও জন্মের এক বছর আগে, সেই জন্যেই বোধহয় কনকের প্রতি তাঁর এত স্নেহ। তাঁর দুটি মেয়ে আছে, তবে তারা উর্মিলার চেয়েও ছোট। কনকের মা নলিনীরও এই প্রথম সন্তান। সুতরাং এর আগে এ বাড়িতে কারও বিয়ে দেবার আর প্রয়োজনই হয় নি।

কাজেই, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও, আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাইকেই আনানো হয়েছিল। কলকাতাতে যাঁরা থাকেন তাঁদের তো কথাই নেই—এমন আন্তরিকতার সঙ্গেই সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে যে কেউই না এসে থাকতে পারবেন না।

এই উপলক্ষে বিজয়ারও আসবার কথা। বস্তুত নরেনের মৃত্যুর পর সে

আর কোনদিনই এ বাড়িতে আসে নি, তার নাম করাও কষ্টকর ছিল সকলের পক্ষে। এবার হেমলতাই নিজে তুলেছিলেন তার কথা। বিজয়ার বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেপুলের মা, তাকে বাদ দেওয়ার—এই এতকাল পরে—আর কোন কারণই থাকতে পারে না। বিশেষত সে যখন মিলির বড় মামিমার নিজের বোন। তাছাড়া, সম্পর্ক খুব নিকট না হ'লেও, এক কালে খুবই যাওয়া-আসা ছিল এ বাড়িতে। আর—

কিন্তু সে কথা থাক্। তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'লেও সে-কথাটা কেউ মুখে আনতে পারেন নি।

বিজয়া এল বেলা তিনটে নাগাদ। এতকাল পরে এতগুলি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হবে, কাজেই একেবারে সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রণ খেতে আসার মতো আসবার কোন মানেই হয় না। ওর দিদির সঙ্গেও দেখা হচ্ছে অনেক দিন বাদেই···

বিজয়া অবশ্য আজও সুন্দরী আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বয়সের একটা ছাপ পড়েছে সে মুখের ওপর। তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা···তাকে দেখে অন্তত কিশোর-বয়সী ছেলের মনে চাঞ্চল্য জাগবার কথা নয়।

কিন্তু সহসা এ কী কাণ্ড!

বিজয়া যখন এসেছে তখন কনক তেতলায় তার নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। প্রাথমিক অভ্যর্থনার হৈ-চৈটা কমে যাওয়ার পর এক ফাঁকে চুপি চুপি বিজয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দিদু, সে কোথায়? কোন্‌টি এর মধ্যে?'

মিলির বড় মামিমা একটু অবাক্ হয়েই তাকিয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে।

'কে রে? কার কথা বলছিস?'

'ঐ যে···কী যে বলে কনক···না কি!'

'ও, কনক?···সে তো এখানে নেই। হ্যাঁরে সদি, কনক কোথায় রে?'

'দাদা? সে তো তেতলায় ঘুমোচ্ছে···'

'সে তো ভালই। চলো না দিদু, দেখে আসি চুপি চুপি···'

'আর এখন উঠতে পারি না। সে তো নামবেই···এখনই তো নিচে আসবে।'

'না না···তার চেয়ে আমিই দেখে আসছি। ঘুমোচ্ছে এখন, সেই ভালো···'

এ বাড়ির ঘরদোর সবই বিজয়ার পরিচিত। তাই সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে এক সময়ে সে অনায়াসেই ওপরে উঠে গেল। আর, অনেকক্ষণ ধরে কনকের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর, নিঃশব্দে এবং সকলের অগোচরেই হয়ত নেমে আসত, যদি না ফিরে আসার সময় হঠাৎ ওর পা লেগে একটা চেয়ারে শব্দ হ'ত।

কনক ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। কাজের বাড়িতে এতটা ঘুমোবার জন্যে অবচেতন মনেও একটা লজ্জা ছিল বোধহয়, তাই অত সহজে অত বেশি জেগে উঠল।

'কে ?' প্রথম স্বাভাবিক প্রশ্নের পরই কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'তু···আপনি কে, কে বলুন তো ? আপনাকে তো কখনও দেখি নি।'

বিজয়া অপ্রতিভ হলেও পালাল না। বলল, 'আমি তোমার বড় মামিমার বোন। মাসি হই সম্পর্কে।'

'অ···আপনাকে তো কখনও দেখি নি। নাম শুনেছি বটে। তা বসুন না একটু—'

অগত্যা বিজয়াকে বসতে হ'ল।

একথা সেকথা—তুচ্ছ দু-একটা শিষ্ট আলাপের পরই কনক বলে উঠল, 'আচ্ছা আপনাকে আমার এত ভাল লাগছে কেন ? বড্ড···বড্ড ভাল লাগছে। বুকের মধ্যেটা যেন কেমন ক'রে উঠল আমার। কী যে মনে হচ্ছে। যেন কত কালের পরিচয়।···ঠিক কী মনে হচ্ছে তা বোঝাতে পারব না।···আচ্ছা কোথাও কি দেখি নি আপনাকে এর আগে ? ঠিক ক'রে বলুন তো।'

বিজয়ার চোখে কি জল ভরে উঠেছিল ?

তা ও অমন ছুটে পালালই বা কেন ?

'কি হ'ল, শুনছেন ? শুনুন না—'

বিজয়া যেন অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে, কোনমতে ঠোকর খেতে খেতে ছুটে নেমে এল নিচে—

স্তম্ভিত, বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে কনকের একটু সময় লাগল। এ আজ

ওর কি হ'ল, কেবলই কি ব্যথা দিয়ে বসছে সবাইকে! অথচ কারণটা যে কি, তাও তো বুঝতে পারছে না।···

একটু পরে কনকও নেমে এল।

'মা, ওমা, শুনছ? আচ্ছা, ঐ মাসিটি কে মা—ঐ যে বড় মামিমার বোন না কে—ওঁকে কি এর আগে কোন দিন দেখি নি? ওঁকে দেখে তবে অত চেনা-চেনা লাগছে কেন?···মনে হচ্ছে বহুকালের পরিচয়, অনেকদিন ধরে দেখছি ওঁকে?···আর কী ভাল যে লাগল—এমন ইচ্ছে করছিল—যেন জড়িয়ে ধরে খুব খানিকটা আদর করি।···বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় ক'রে উঠল ওঁকে দেখে—'

ও কি, আরে!

মা ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে চলে গেলেন কোথায়? এ কী হ'ল ওর? কনক কি পাগল হয়ে গেছে? না এরাই সব পাগল হ'তে বসেছে!

এসব কী কাণ্ড ঘটছে আজকে সকাল থেকে?

কারণ একটা ছিল বৈকি!

যে-কথাটা ওঁরা চেপে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন প্রাণপণে—সে ইতিহাসেরও আজ সতেরো বছর বয়স হ'ল বোধহয়—কি আরও বেশি।

সে কনকেরও জন্মের বছর দেড়েক আগের ঘটনা।

নরেনের তখন সবে একুশ বছর বয়স। অল্প বয়সে ম্যাট্রিক পাস করেছিল বলে ঐ বয়সেই সে এম.এস-সি. পরীক্ষা দিয়েছে। ভাল ছাত্র, সসম্মানেই পাস করবে নিশ্চয়। সুতরাং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করছে সবাই—আই-সি-এস পরীক্ষা দেবে কিংবা ফাইনান্স। কেউ বলছে ভালো ক'রে রিসার্চ করুক, ডক্টরেট পেলে অধ্যাপনাও করতে পারে সরকারী কলেজে।

সে সময় বিজয়াও এ বাড়িতে আসত প্রায়ই। ষোল বছরের রূপসী মেয়ে—নরেনের ভাল লেগেছিল ওকে। বিজয়ারও মনোভাব অনুকূল।

তখন কনকের বড় মামিমার বাবা বেঁচে ছিলেন, তিনি নরেনের বাবার কাছে প্রস্তাব ক'রে বসলেন, 'বিজয়ার সঙ্গে নরেনের বিয়ে দিন, আমি নরেনকে বিলেত পাঠিয়ে মানুষ ক'রে আনব।'

সবাই তখন সানন্দে মত দিয়েছিলেন। বয়স কম—সেটা কেউ এমন কিছু আপত্তিকর বলে মনে করেন নি। সব দিকেই যখন সুযোগ তখন ওটা এমন কিছু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আগে তো এরও ঢের আগে বিয়ে হয়ে যেত।

সব ঠিকঠাক—শুধু পরীক্ষার ফলটা বেরুলেই হয়, এমন সময় ব্যাপারটার সূত্রপাত।

একদিন সকালে উঠে নরেন উত্তেজিত ভাবে বললে, 'মা, ও কালো মতো মেয়েটা এত ভোরে কেন আমার ঘরে ঢুকেছিল বলো তো?'

'কে কালো মতো মেয়ে রে? কই কেউ তো আসে নি।'

'হ্যাঁ, আসে নি বললেই শুনব? দেখলুম আমি স্পষ্ট।'

'তুই তাহ'লে ঘুমের ঘোরে কি দেখতে কি দেখেছিস।'

'হ্যাঁ ঘুমের ঘোর বৈকি! বছর পনেরো-ষোলর একটা মেয়ে—নীলাম্বরী কাপড় পরা, পরিষ্কার দেখলুম! ভালো ক'রে দ্যাখো, কেউ কিছু চুরিটুরি ক'রে নিয়ে পালালো কিনা।'

সে ভয়টা নরেনের বাবারও হয়েছিল। কিন্তু তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও কোন জিনিস চুরি হয়েছে বলে জানা গেল না। সে মেয়েটারও কোন হদিস মিলল না। কেউই দেখে নি।

এর তিন চার দিন পরে আবার।

সেটা বলতে গেলে দুপুর বেলা। বেলা চারটেও বাজে নি। নরেন ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে হাজির—

'মা. আজ তো আর বলতে পারবে না যে ঘুমের ঘোর। এই তো সিঁড়ির নিচের ঘরটা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মেয়েটা—ঐ যে ঘরটাতে তোমার কাঠ-ঘুঁটে থাকে, সেই ঘরটা থেকে—'

'কে রে? কী বলছিস তুই?'

'ঠিকই বলছি। কে আসে ভাল ক'রে খবর নাও। ঝি চাকরদের কেউ কিনা। হয়ত তোমার হারাধন চাকরেরই কেউ—। আজ তাকে স্পষ্ট দেখেছি। কালো, নাকটা খাঁদা—চোখের চাউনিটা যেন কেমন কেমন। মোট কথা মেয়েটা ভালো না—'

সেদিন আর উড়িয়ে দেওয়া গেল না। হৈ-চৈ হ'ল খুব। সবাইকে

জেরা করা হ'ল, বিশেষত হারাধনকে। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারলে না। কোন খবরই মিলল না। ভয় দেখানো হ'ল সবাইকে নানা রকমে—তবুও না।

এর পাঁচ-ছ দিন পরে নরেনের জ্বর হ'ল। সামান্য ঘুষঘুষে জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা নিশ্চয়ই—নতুন হিমের সময়, সকলকারই এমনি হচ্ছে।

তিন দিন ডাক্তার ডাকা হ'ল না। তারপর পাড়ার কৈলাসবাবু এলেন। কত দিন পরে বড় ডাক্তার আনা হ'ল একজনকে।

টাইফয়েড? না।

ম্যালেরিয়া? না।

কালাজ্বর? না।

কী তবে?···ডাক্তার ধরতে পারেন না। পনেরো-কুড়ি দিন হয়ে যায়··· কোন মীমাংসাই হয় না। আরও বড় ডাক্তার এলেন। নরেনের বাবা প্রাণপণে চেপে-রাখা সংশয়টাও প্রকাশ ক'রে ফেললেন, 'তবে কি আপনারা টি. বি. সন্দেহ করছেন?'

তাও তো নয়। যত রকম পরীক্ষা আছে ডাক্তারী শাস্ত্রে একে একে সব শেষ হ'ল। এক্স্-রে, থুথু, রক্ত, প্রসাব···কিছুই দেখতে বাকী রইল না। কোন কিছুই পাওয়া যায় না, অথচ জ্বর সেই একশো' পর্যন্ত রোজই ওঠে, সাড়ে আটানব্বুইয়ের নিচে নামে না।

কেউ বললে, লিভারের জ্বর। কেউ বললে, বয়সের গরম···ওটা আসলে জ্বর নয়। ডাক্তার বললে··ভাত দাও। কাকা বললেন, 'হোমিওপ্যাথ ডাকো দাদা, ভালো চাও তো। আমি কবে থেকে বলছি। এরা রোগ নির্ণয় না করতে পারলে তো আর চিকিৎসা করতে পারবে না। হোমিওপ্যাথদের সিম্‌টম্ দেখে চিকিৎসা···'

নরেন ক্ষীণ হেসে মাকে একদিন বললে, 'মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছ মা—এ আমার সারবার অসুখ নয়।'

মা প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'কী বলছিস রে যা-তা! ছি ছি, অমন অলুক্ষুণে কথা বলতে নেই—'

'ঠিকই বলছি মা। তোমরা ভয় পাবে বলে বলি নি। সেই কালো মেয়েটা রোজ আসে আমার কাছে। তোমরা কেউ না থাকলেই পায়ের কাছে এসে

দাঁড়ায়, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে। কত বকেছি, কত ভয় দেখিয়েছি—শোনে না। তোমরা কেউ এলে বা জেগে উঠলেই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়—। আবার পরশু স্বপ্নে দেখলুম মেয়েটা বলছে, তুমি আমাকে ফেলে এসে ঐ বিজয়াকে নিয়ে সুখে থাকবে ভেবেছ—না? তা আমি হ'তে দেব না কিছুতেই। তোমাকে আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাবোই—'

আরও একটু হাসল নরেন। আরও ক্লান্ত, আরও ক্ষীণ সে হাসি।

হেমলতা চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এল। বাবা কাকা সকলে তিরস্কার করতে লাগলেন, 'এতদিন বলিস নি কেন খোকা—কী সর্বনাশ করেছিস বল্‌ তো।'

'তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন যে আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এসব আমাকে বিশ্বাস করতে নেই। অনেক দিন ধরে নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছি—এসব মিথ্যা, রুগ্ন মস্তিষ্কের কল্পনা বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছি নিজেকে। কিন্তু আর পারলুম না।'

সেই দিনই একজন ছুটলেন হাওড়া জেলার এক গ্রাম থেকে রোজা আনতে। পুরুত ঠাকুরকে ডাকা হ'ল—পরশু দিন ভাল তিথিক্ষণ আছে, সেদিন তিনি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করবেন। এক হাজার আটটি তুলসী দেবেন নারায়ণকে, আরও কত কি।

হেমলতা সন্ধ্যাবেলা একা ছাদে গিয়ে হাত জোড় ক'রে বললেন, 'কে এসেছ মা, দয়া ক'রে আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও, আমি নিজে গিয়ে গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসব। নয়ত আমাদের কাউকে নিয়ে ওকে অব্যাহতি দাও।'

রোজা ডাকতে যে গিয়েছিল সে শেষ-রাত্রে ফিরে এসে বললে, 'আজই সন্ধ্যাবেলা সে এসে পৌঁছবে। একটা জরুরী ডাক আছে তাই, নইলে সঙ্গেই আসত। যাক, তাকে টাকা আর ঠিকানা দিয়ে এসেছি, মোটা বকশিশের লোভ দেখিয়েছি। কোন ভয় নেই।'

কিন্তু বেলা দশটা থেকে অকস্মাৎ নরেনের জ্বর বিষম বেড়ে উঠল। ভুল-বকা শুরু হ'ল। কেবলই যেন কাকে বলছে, 'কেন এমন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আছ, আমার ভয় করে যে। তোমাকে আমার একটুও ভাল লাগে না, একটুও না। আমাকে নিয়ে গেলেও তোমার কোন লাভ হবে না। আচ্ছা, দেখো

—মিছিমিছি এত কাণ্ড করছ। তোমাকে আমি কিছুতেই ভালবাসতে পারব না।'

ডাক্তার এলেন তিন-চারজন। মাথায় বরফ চাপানো হ'ল। মা ঘর-বার করতে লাগলেন রোজার জন্যে। পুরুতকে ডেকে পাঠানো হ'ল, আজই কিছু করা যায় না?

তিনি বললেন, 'মা, আজকের দিন ভাল না। হিতে বিপরীত হ'তে পারে।'

বিকেলের দিকে জ্বর কমল কিন্তু ডাক্তারের মুখ হয়ে উঠল আরও গম্ভীর। স্পষ্ট শ্বাস ওঠবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, নাড়ীও পাচ্ছেন না তাঁরা। ইন্‌জেকশ্যন্‌, অক্সিজেন, চেষ্টার কোন ত্রুটিই হ'ল না। সন্ধ্যার সময় একবার চোখ খুলে শুধু বললে, 'মা, ভেবো না তুমি, আমি আবার পালিয়ে আসব—এবার হয়ত কাকীমার কোলে জন্মাব। কিন্তু যেমন ও জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, ওর কাছে কিছুতে থাকব না। ওকে জব্দ করবই—দেখে নিও—'

কথা কটা বলেই আবার ক্লান্তভাবে চোখ বুজল। মা কাকীমার কান্নাও বোধহয় ওর কানে গেল না।

ওধারে নিচে ততক্ষণে হাওড়ার সেই সুদূর গ্রাম থেকে রোজা এসে পৌঁচেছে।

এই কথাটাই চেপে ছিলেন ওঁরা প্রাণপণে। বোধহয় ভুলেও আসছিলেন। অন্তত নিশ্চিন্ত যে হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নরেনের সঙ্গেই তো শেষ হয়ে গেছে—কনকের ওপরে আর তার বিদ্বেষ কেন থাকবে? বিজয়ারও বিয়ে হয়ে গেছে কবে।

কনকের কানের পিছনে একটি ছোট্ট তিল আছে যেমন নরেনের ছিল। কিন্তু তা থাক। কনকই যে নরেন একথা বিংশ শতাব্দীতে কেউ বিশ্বাস করবে না। আর করলেই বা কি? ঈর্ষা বিদ্বেষ কি জন্মান্তরেও চলে?…

তবু কনকের মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন বিজয়ার কাছে, 'ওরে সর্বনাশী তুই যা, তুই চলে যা। আর কত সর্বনাশ করবি আমার বংশের?'

তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ওর হাত দুটো ধরে বললেন, 'ভাই, মাথার

আমার ঠিক নেই। কি বলতে কি বলেছি—কিন্তু জানিস তো সবই, আমার মনের অবস্থাও তো বুঝছিস? কিসে কি হয় তা কে জানে, ঘরপোড়া গোরুর মতো ভয় আমাদের, তুই যা ভাই।'

অপমানে চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠল বিজয়ার। কিন্তু সে চলেই গেল শেষ পর্যন্ত। কনকের কথা শুনে সে আগেই কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। হয়ত ভয় পেয়েছিল সে-ও।

অতীতের তীর থেকে কোন স্মৃতির বাতাসও কি দোলা দিয়েছিল তার মনে? দেওয়াই তো স্বাভাবিক। সুন্দর সুপুরুষ মিষ্টভাষা নরেন তার প্রথম কৈশোরের তরুণ দেবতা। সে কি সত্যিই তাহ'লে ফিরে এসেছে কনকের মধ্যে?

বিজয়ার চলে যাওয়াটাই একমাত্র বিষাদের পর্ব এই বিবাহানুষ্ঠানে। যাই হোক—সন্ধ্যার দিকে সবাই একরকম ভুলে গেল সে কথা। নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে বিয়েটা চুকে গেল। নাচে গানে আমোদে আহ্লাদে বাসরঘরে মেতে উঠল সকলেই।

শেষরাত্রে দেখা গেল বারান্দার এক কোণে কনক শুয়ে ঘুমোচ্ছে মেঝেতেই। ওর মা তাড়াতাড়ি ঠেলে তুলে দিতে গিয়ে দেখলেন, গা গরম।

আশঙ্কায় প্রায় সবাইকারই মুখ শুকিয়ে উঠল, যদিও মুখে কেউ কিছু বললে না। অবশ্য যার জ্বর সে অত গ্রাহ্য করে নি। হেসে খেলে বেড়ালো সারা সকালটা। এমন কি বর-কনে বেলা এগারোটা নাগাদ যখন বিদায় হ'ল তখনও সে এসে তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল। কিন্তু বিকেলে শুয়ে পড়তে বাধ্য হ'ল বেচারী। জ্বর তখন একশো' দুই।

ডাক্তার এলেন তখনই। এবার আর ভুল হয় নি। সেইদিনই রোজা ডাকতে পাঠানো হ'ল। তুলসী দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

রোজা এসে তার যা কৃত্য করল। অবশ্য সবটাই কনকের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। পুরুত ঠাকুরের পরের দিনকার স্বস্ত্যয়নটার কথাও সে জানে না।

কিন্তু সব চুকে যাবার পরও সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ একটু তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে কনক বললে, 'মা, অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলুম জানো?···মনে হ'ল কে

একটা কালোমতো মেয়ে—সেই যেমন সেদিন দেখেছিলুম—এসে ঐ পায়ের কাছটায় দাঁড়িয়ে বলছে, আমি চললুম কিন্তু তোমাকেও রেখে যাব না। তুমিও আসবে শীগ্‌গিরই।···কী বিশ্রী স্বপ্ন—না মা?'

জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘরে পড়ে রইলেন দিন রাত। বাড়িসুদ্ধ সকলকারই মানসিকের পর মানসিক জমতে লাগল মনে মনে। জ্বর কিন্তু কমল না। আবারও সেই রক্ত, থুথু, প্রস্রাব পরীক্ষা হ'ল। এক্‌স্‌রে হয়ে গেল। শেষে হোমিওপ্যাথও ডাকা হ'ল। তবু জ্বর সেই এক ভাবেই রয়ে গেছে।

আজও তা ছাড়ে নি। কোন দিন ছাড়বে কিনা কে জানে। অনেকে বলেছে হাওয়া বদল করতে, কিন্তু ডাক্তারদের তা মত না। অত দুর্বল, নাড়াচাড়া করা ঠিক হবে না।

প্রারব্ধ

সেবার ক'বন্ধু বৃন্দাবন যাচ্ছিলাম ওখানের সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিতে। যাচ্ছিলাম এখনকার মধ্যবিত্ত ট্রেনে—অর্থাৎ ডিলুাক্স এক্‌স্‌প্রেসে, কম ভাড়ায় ঠাণ্ডা গাড়িতে যাবার সুযোগ নিতে। এই ট্রেনে টুণ্ড্‌লায় নেমে আগ্রা হয়ে বাস-এ বৃন্দাবন যাব—এই ব্যবস্থা ছিল।

চেয়ারের পরিমিত স্থানে বসে যাওয়া, অনেক লোককে আশেপাশে পাওয়া যায়, অথচ ঠাণ্ডায় মেজাজ থাকে ভাল—স্থান নিয়ে কলহ-বিবাদ বাধে না, আড্ডাটা জমে ওঠে সহজেই। আর আড্ডার যা ধর্ম—ওঠে না এমন কোন প্রসঙ্গই নেই। আমাদের সেদিনের আড্ডাও তার ব্যতিক্রম নয়, প্রসঙ্গর অবিরাম পরিবর্তন ঘটছিল। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি—তা থেকে জন্মান্তরবাদ, কর্মফল, প্রারব্ধ—শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রে এসে পৌছল। খবরের কাগজে যে সব উদ্ভট সংবাদ প্রকাশিত হয়—তা সত্যি, না ওখানে তৈরী হয়?

এই প্রসঙ্গ চলতে চলতেই আমাদের জিতেনবাবু বললেন, 'আচ্ছা, দিন কয়েক আগে একটা নিউজ দেখেছেন আপনারা? খুবই ছোট হরফে ছিল বটে—তবু ছিল প্রায় সব কাগজেই। মুর্শিদাবাদের কোন এক গ্রামের

ছোকরা ডাক্তার একটা নরকঙ্কাল বুকে জড়িয়ে ধরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছে? মনে আছে আপনাদের?'

আছে বৈকি! আমাদের সকলেরই মনে আছে। খবরটা সত্যিই একটু বিচিত্র ধরনের তাতে সন্দেহ নেই। আত্মহত্যা বহু লোক করে—প্রত্যহই একটা-দুটো আত্মহত্যার খবর থাকে কাগজে, তার পদ্ধতি বহু বিচিত্র—কিন্তু ঠিক এরকমটা এর আগে আর শুনি নি। বিশেষত লোকটা ডাক্তার, আজকাল সাধারণ লোক ঘুমের বড়ি খেয়ে মরছে—ডাক্তারের সে কথাটা মনে পড়ল না একবারও? নদীতে ঝাঁপ দেওয়াও তবু একরকম—কঙ্কাল জড়িয়ে ঝাঁপ দেওয়া একেবারে অভিনব। তাও বিশেষ সংবাদদাতারা লিখেছেন, সে নাকি কঠিন আলিঙ্গন, কঙ্কালের তো আলিঙ্গন করা সম্ভব নয়—ডাক্তারই জড়িয়ে ছিল—এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে, জল থেকে তোলবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে বাহুবন্ধন শিথিল করতে পারা যায় নি।

সেই সব কথাই উঠল এবার, নবতর প্রসঙ্গ হিসেবে। ভবনাথবাবু বলে উঠলেন, 'বাট হোয়াই হ্যাট কঙ্কাল? কঙ্কালই বা একটা গোটা মানুষের এল কোথা থেকে? একটা পুরো স্কেলিটন সংগ্রহ করল লোকটা মরবে বলে? বলিহারী শখ বটে! না কি তান্ত্রিক সাধনা-টাধনা করতে গেছল?'

ওপাশে একটি ভদ্রলোক এতক্ষণ একমনে কী একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক পড়ছিলেন; আমাদের এ আলোচনায় তাঁর কান আছে তা একবারও মনে হয় নি—তাঁর নিবিষ্টতা দেখে। হঠাৎ এখন তিনি কাগজটা সরিয়ে শান্ত-ভাবে বলে উঠলেন, 'কঙ্কালটা ও কিনেছিল ডিস্‌পেন্‌সারী সাজাবে বলে। অনেক টাকা খরচ করেছিল ওটার জন্যে।'

'কিনেছিল? কিন্তু ডিস্‌পেন্‌সারী সাজাতে স্কেলিটনের কী দরকার তা তো বুঝলুম না!' শশিবাবু নড়েচড়ে বসে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আর কই, সে কথা তো কোন কাগজে লিখেছে বলে মনে পড়ছে না!'

'কাগজে আর লিখবে কি ক'রে বলুন! তবে আমি জানি,' ভদ্রলোক আগের মতোই অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, বরং যেন ঈষৎ করুণই শোনাল তাঁর কণ্ঠ—তবে সেটা আমাদের ভুল হ'তে পারে, 'কারণ, আমার স্ত্রীই এর জন্যে অনেকটা দায়ী। যার কথা বলছেন, ঐ ডাক্তার—ভাস্কর ওর

নাম, আমি ওর ভগ্নিপতি হই।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন নিথর হয়ে গেলাম আমরা। যে সংবাদটা খবরের কাগজে ছাপা হয়—সে যেন কোন্ সুদূর লোকের ঘটনা, তার পাত্র-পাত্রীরাও যেন কল্পনালোকের মানুষ। তার বা তাদের আত্মীয়স্বজন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে—এটা যেন ভাবাই যায় না।

তবে তার পরেই—বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই, পিছন দিক থেকে আরও ক'জন হুড়মুড়িয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন। জিতেনবাবু উত্তেজিতভাবে পর পর তিন-চার টিপ নস্যি নিয়ে বলে উঠলেন, 'কী রকম, কী রকম—ব্যাপারটা কি বলুন তো?··· মশাইয়ের নাম? কী রকম শালা হ'ত আপনার—ঐ ডাক্তার?'

হাসলেন ভদ্রলোক—প্রচ্ছন্ন-করুণ হাসি এক ধরনের—সবিনয়ে বললেন, 'আমার নাম যতীশ্বর, যতীশ বলেই বন্ধুরা ডাকেন সাধারণত। হ্যাঁ, ভাস্কর আমার শালা, নিজেরই শালা। ও যখন ডাক্তারী পাস করে এসে দেশে ডিস্‌পেনসারী সাজিয়ে বসল, তখন আমার স্ত্রীই তুলেছিলেন স্কেলিটনের কথাটা। আমাদের দেশে—হাওড়া জেলাতেই আমাদের দেশ—বুঝলেন, বহুদিন আগে, সে ধরুন বছর চল্লিশ কি তারও আগে, এক ডাক্তার এসে বসল প্র্যাক্‌টিশ করবে বলে। তখন ওখানে বাবুলাল বলে এক বাঘা ডাক্তার ছিল, খুব নাম-ডাক তার। তার সঙ্গে কম্পিটিশ্যন দেওয়ার আর কোন সম্বল মনে না পড়ায় ভদ্রলোক কোথা থেকে একটা স্কেলিটন যোগাড় ক'রে বিরাট কাঠের শো-কেসে সাজিয়ে রাখলেন। পাড়াগাঁ জায়গা—কলকাতা থেকে যদিও খুব দূরে নয়, মাইল আষ্টেকের মধ্যেই, তবু তখন একেবারেই জঙ্গলে-জায়গা ছিল—ওর সেই স্কেলিটন দেখতেই পাঁচখানা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল একেবারে, দিনরাত যেন রথ দেখার ভীড় লেগে গেল বাড়ির সামনে। কথাটা চাউরও হয়ে গেল খুব। যে ডাক্তার এই সব হাড়গোড় নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সে ডাক্তার যে খুব পণ্ডিত লোক তাতে আর কারও সন্দেহ রইল না। ফলে অতবড় বাবুলাল ডাক্তারের চোখের সামনেই নতুন ডাক্তারের পশার জমে উঠল।···সেই কথাই আমার স্ত্রী বলেছিলেন ভাইকে, ভাইয়েরও কথাটা খুব প্রাণে লেগেছিল। তখন কে

জানত যে, এই প্রস্তাবই কাল হবে বেচারীর জীবনে।'

কথাটা বলতে বলতে শেষের দিকে গলা কেঁপে উঠল যতীশবাবুর। তিনি বোধ করি মনের আবেগ সামলাতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে ওপাশে ফিরে বসলেন।

কিন্তু মানুষের যখন কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে অপরের আবেগের কথা বিবেচনা করবে—এতটা আশা করা উচিত নয়। আমরাও কেউ করলুম না সে বিবেচনা। চারদিক থেকে ভদ্রলোকের ওপর অজস্র প্রশ্ন বর্ষিত হ'তে শুরু করল :

'আচ্ছা, তা আত্মহত্যার আসল ব্যাপারটা কী মশাই?'

'ওর কি পশার জমে নি বলেই—?'

'তা ডুবলেন ডুবলেন—ও স্কেলিটনটাকে জড়িয়ে ডুবতে গেলেন কেন? ওর মিস্ট্রিটা কি?'

'আচ্ছা, আপনার শালা কি কোন তান্ত্রিক সাধনা-টাধনা—?'

'ভদ্রলোক বিয়ে-থা করেছিলেন নাকি? কে আছে আর ওঁর?'

'এ বোধহয় কোন হতাশ প্রণয়ের ব্যাপার—না? কী বলেন? না কি কোন পারিবারিক কলহ?'

এমনি অন্তহীন ও অর্থহীন নানা প্রশ্ন।

স্থির হয়ে বসে শুনলেন যতীশবাবু—অলস কৌতূহলের এই নগ্ন ও স্বার্থপর প্রকাশ। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার এদিকে ফিরলেন। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলে যে ভাল করেন নি, তা বুঝতে পেরেছেন, সেই সঙ্গে এও বুঝেছেন যে, আর ফেরবার পথ নেই কোথাও। মানুষের কৌতূহলকে জাগ্রত করা আর ঘুমন্ত বাঘের ঘুম ভাঙানো—প্রায় একই রকম।

তিনি বললেন, 'বলছি। সব কথাই বলব। গোপন ক'রে আর লাভও নেই। যার লোকসান হবার কথা সে তো সমস্ত লাভ-লোকসানের বাইরে চলে গেছে।··· এ-ঘটনার আসল কারণটা একমাত্র আমিই জানি, ওর ভগ্নীও নয়। টুকরো টুকরো ক'রে সংগ্রহ করেছি সবটা; ভাস্করও—কে জানে কেন—সমস্ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আমাকেই সবচেয়ে বিশ্বাস করত, বোধ করি

আমিও তাকে ও-বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতুম। সে মরবার আগে অশান্তির কারণটা আমাকে খুলে বলেছিল—আত্মহত্যার কারণও—শুধু সেই আত্মহননের ইচ্ছাটা বাদ দিয়ে। সেটা ভাঙে নি—ভাঙলে আমি বাধা দেব ব্যস্ত হবো—এই জন্যেই বলে নি সেটা। আমিও অত বুঝতে পারি নি। আমি তাকে নানারকমে বুঝিয়েছিলুম—ভেবেছিলুম সে কতকটা বুঝেছে, শান্ত হয়েছে। এখন বুঝছি সেটা আমার ভুল বা অহমিকা। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর সবটুকুই পরিষ্কার হয়ে গেছে, দুই আর দুইয়ে যোগ দিতে আটকায় নি। তার মৃত্যুর পরও জেনেছি কিছু। এসব কথা আপনাদের না বললেই ভাল হ'ত হয়ত—ওরা আত্মীয়রা শুনলে ক্ষুণ্ণ হবে, রাগ করবে। তবে আমার আবার অন্য ধারণা। লোকে বলে—দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে দুঃস্বপ্নের কথাটা কাউকে খুলে বলে যদি কোন দেওয়ালে বা ভিতের গায়ে দু' আঁজলা জল ঢেলে দেয়, তাহলে সে স্বপ্ন আর ফলে না, তার দোষ কেটে যায়। আমার মনে হয় তেমনি পাপ কাজের বিবরণটা লোকের সামনে খুলে বললে সে পাপ কিছুটা স্খালন হয়ে যায়। সেই জন্যেই আরও বলছি।···এমনিই তো অপঘাত মৃত্যু—আমাদের শাস্ত্রমতে অনন্ত-নরক ওর প্রাপ্য—তার ওপর ঐ কৃতকর্মের বোঝা যদি আপনাদের খুলে বলার ফলে কিছুটা হাল্‌কা হয়ে যায় তো যাক।'

যতীশবাবু আস্তে আস্তে থেমে থেমে অনুত্তেজিত কণ্ঠে বিবৃত ক'রে গেলেন সমস্ত ঘটনাটা। শুনে আমার অন্তত মনে হ'ল—না বলাই উচিত ছিল তাঁর, মৃত ব্যক্তির গোপন অপরাধ আর দুর্ভাগ্যের কথাটা এভাবে সহানুভূতিশূন্য কৌতুক-কৌতূহলী পরস্যাপি পরের কাছে বলার কোন অধিকারই তাঁর নেই।···

ভাস্কর বরাবরই ভাল ছাত্র ছিল। ডাক্তারী পড়ার সময় কখনও ফেল করে নি, শেষ পরীক্ষাও যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে পাস করেছে। পড়ার শেষে ওকে হাউস ফিজিসিয়ান করেছিলেন অধ্যাপকরা, সরকারী বড় চাকরিরও ব্যবস্থা ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন অপেক্ষা করলে রিসার্চ ও বিলেতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু ওর বাবার নাকি খুব ইচ্ছা ছিল, ছেলে পাস করে দেশে এসে বসে—দেশে এক-

জনও ভাল ডাক্তার না থাকায় কি অসুবিধা তা তিনি জীবনভোর অনুভব করেছেন, বিশেষ ক'রে ভাস্করের এক ভগ্নী ও ঠাকুরমার মৃত্যুর সময়। ভাস্কর যখন পাস করে বেরোয়, তখন ওর বাবা আর বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর সেই ঐকান্তিক ইচ্ছার স্মৃতিটা ছিল। সেই উদ্দেশেই যে তিনি বহু কষ্ট ক'রে ওকে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন, তাও সে ভোলে নি। সেই কারণেই সে সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ ক'রে দেশে এসে ডিস্‌পেন্‌সারী সাজিয়ে বসেছিল।

নিজস্ব ডিস্‌পেন্‌সারী না থাকলে পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারী করার কোন মানে হয় না, কারণ, ভাল বা আধুনিক ওষুধ ওসব জায়গায় দুর্লভ, তাছাড়া ওষুধের দোকান মাত্রেই কোন না কোন ডাক্তারের অধীন। তারা অপর ডাক্তারের প্রেসক্রপশ্যন সহজে 'সার্ভ' করতে চায় না; এটা নেই, ওটা নেই বলে অসুবিধার সৃষ্টি করে। ভাস্করের হাতে টাকা ছিল না, ওদের জমিজমা যা ছিল তাতে কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র, নগদ টাকা যা ছিল তা ওকে পড়াতে আর বোনের বিয়ে দিতেই শেষ ক'রে ফেলেছিলেন ওর বাবা, বরং কিছু ঋণ রেখে গিয়েছিলেন ছেলের জন্যে। সুতরাং ভাস্করকে বিয়ে ক'রে শ্বশুরের টাকাতেই ডাক্তারখানা সাজাতে হয়েছিল। অত ভাল ছাত্র যে, তার ধনী শ্বশুরের অভাব হয় না, ভাস্করেরও হয় নি। তিনি ওদের বৈঠকখানার চালাঘর ভেঙে নতুন ক'রে তুলে দামী আসবাব, আধুনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও মোটামুটি সবরকম দিয়ে ডিস্‌পেন্‌সারী সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এত খরচ যখন করতে হচ্ছে তখন কোন শহরেই বসা ভাল—এই কথাটা বার বার বোঝাতে চেয়েছিলেন শ্বশুর ভদ্রলোক, কিন্তু ভাস্কর তা বুঝতে চায় নি। সে ঐ বন-গাঁয়েই বসবে এই জেনে তাঁরা মেয়ে দিতে চান তো দিন—নইলে অন্য পাত্র দেখুন, সাফ কথা বলে দিয়েছিল।

ওর তেজস্বিতা আর পিতৃভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ভদ্রলোক সে শর্ত পালন করেছিলেন, কোথাও কোন কার্পণ্যও করেন নি। ওর বৌ কৃষ্ণাও, ধনীকন্যা হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ভাল ছিল, সহজেই এদের বাড়িতে মিশে গিয়েছিল। ছড়াঝাঁট দেওয়া থেকে পূজার যোগাড়, রান্না করা—সব কাজেই এগিয়ে আসত, শিখেও নিয়েছিল খুব দ্রুত। শুধু গোয়াল নিকোনো আর ক্ষার কাচা এটা তার শাশুড়ী করতে দেন নি বলেই করে নি। এক কথায় সুখে

শান্তিতে সমৃদ্ধিতে জীবন কাটার কথা ভাস্করের। কাটতও তাই—যদি না ঐ কলঙ্কটা এসে জুটত। হয়ত এই জন্যেই মেয়েরা লক্ষণ অলক্ষণ শব্দ দুটোর ওপর অত জোর দেয়।

কঙ্কালের কথাটা যতীশবাবুর স্ত্রী সোমলতাই তুলেছিলেন, তবে সেটা শুধুই শখ বা খেয়াল নয়। কারণও একটু ছিল। ভাস্করদের গ্রামে বড় ডাক্তার না থাক—পাশের গ্রামে বাঘা ডাক্তার একজন ছিলেন—সত্য-ডাক্তার। তিনি রাত-বিরেতে আসতে চাইতেন না, এমনিও খাঁই ছিল প্রচণ্ড; আশপাশের গ্রাম থেকে ডাকতে এলে বিষম চাপ দিতেন, সেই কারণেই ওর বোন চারুলতা প্রায় বেঘোরে মারা গিয়েছিল—এঁরা যথাসময়ে অগ্রিম নগদ ফী এবং পাল্‌কী যোগাড় ক'রে নিয়ে যেতে পারেন নি বলে। অত দুর্ব্য-বহার করা সত্ত্বেও ভাল ডাক্তার বলে পসার খুব ছিল। সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে রোগীরা তাঁর দোরে ধন্না দিত।

সেই সত্য-ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা উঠতেই সোমলতা তার শ্বশুরবাড়ির দেশের এককড়ি ডাক্তারের কথা তুলেছিল; কেমন ক'রে কঙ্কালের জোরে অতবড় বাবুলাল ডাক্তারের নাকের সামনে পসার জমিয়েছিল—সেই গল্প করেছিল। কথাটা শুনে কৃষ্ণা তার বাবার কাছে কথাটা বলে। তিনি বহু অর্থ ব্যয় ক'রে একটা কঙ্কাল সংগ্রহ ক'রে কাঁচের শো-কেস এনে সাজিয়ে দেন।

অবশ্য এর সুফলও যে ফলে নি তা নয়। যতীশবাবুদের দেশের মতোই সাতখানা গাঁ ভেঙে পড়েছিল এই ভয়াবহ বস্তুটি দেখতে—সেই সঙ্গে ভাস্করেরও একটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল। দুটো একটা ডাক এবং জনকতক ক'রে রোগীও পেতে শুরু করেছিল। তারপর অবশ্য সে যে ভাল ডাক্তার এটা জানাজানি হ'তে আর রোগীর অভাব হয় নি—তার গ্রাম তো বটেই, পাশের গ্রাম, এমনকি সত্য-ডাক্তারের গ্রাম থেকেও রোগী আসতে শুরু করেছিল ইদানীং। রোজ ডিস্‌পেন্‌সারীতে বিশ-পঁচিশটা ক'রে রোগী আর অন্তত পাঁচ-সাতটা কল আসত। সে গ্রামে দু'টাকা, আর পাশের গ্রামে গেলে চার টাকা নিত, আর অন্তত সেই সঙ্গে সাইকেল-রিক্‌শা ভাড়া—তাতেই রাজী হয়ে ডেকে নিয়ে যেত। এছাড়া কলাটা, লাউটা, ডিমটা,

মাছটা—এসব ফাউ তো ছিলই। সকলেই আশা করছিল কালে সে সাত-খানা গ্রামের মধ্যে একাধিপত্য করতে পারবে।

কিন্তু সব আশায় বাধ সাধল ঐ নরকঙ্কালটা।

নর বললে ভুল হবে, নারীকঙ্কাল। যেদিন ওর শ্বশুরমশাই লরী বোঝাই ক'রে এনে জিনিসটা তুলে দিয়ে যান—সেদিন ভাস্করই সেটা লক্ষ্য করে, আর আড়ালে স্ত্রীকে বলে, 'তোমার বাবাই শেষে তোমার সতীন এনে বসিয়ে দিলেন!'

তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি করে ওরা। কৃষ্ণা বলেছিল, 'পেত্নী সতীনে আমার ভয় নেই। রক্তমাংসের দেহ আর তার যৌবনকাল—এর সঙ্গে কম্পিটিশ্যনে পেরে উঠবে না ও। ভয় আমার মানুষ সতীনকে, ডাক্তাররা নাকি মেয়েছেলে পেশেন্ট দেখতে গিয়ে অনেক সময় আটকে যায়, তুমিও না তাই একটা জুটিয়ে বসো—এই আমার ভয়।'

হেসে উঠেছিল কৃষ্ণা বলতে বলতেই, দু'জনেই একচোট হেসেছিল—সেই সঙ্গে হেসেছিলেন বুঝি বিধাতাও, রক্ত-মাংস আর যৌবনের স্পর্ধা দেখে।...

বিধাতার সে হাসি ব্যর্থ হয় নি। ঐ কঙ্কালটাই শেষ পর্যন্ত সতীন হয়ে উঠল কৃষ্ণার।...

প্রথমটা অত বুঝতে পারে নি ভাস্কর। একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল ঠিকই—তবে সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে দেরি হয়েছিল। অস্বস্তিটা যে কি তাও যেমন বোঝে নি, সেটা যে ঐ কঙ্কালটা আসার পর থেকেই শুরু হয়েছে তাও অত লক্ষ্য করে নি। এমন কি, যখন অস্বস্তিটা আর গোপন রইল না, তখনও কয়েকদিন পর্যন্ত এই যোগাযোগটা ধরা পড়ে নি।

ভাল লাগছে না ওর, কেমন যেন ছটফট করছে মনটা। কী যেন একটা গ্লানি, কিসের যেন একটা অপরাধবোধ আর তার আনুষঙ্গিক বিষাদ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে—অথচ তার কারণটা বুঝতে পারছে না কিছুতেই, প্রথমটা এই রকমই বোধ হয়েছিল। কয়েকদিন যেতে কারণটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অপরাধ একটা সত্যিই ঘটেছিল। গুরু অপরাধ তাতে সন্দেহ নেই—তবু এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এ অবস্থায় অনেকেই এমন ক'রে

থাকে, আবার ভুলেও যায়।

ছাত্রাবস্থার প্রথম দিকের কথা। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনার কেস এসে পড়েছিল হাসপাতালে, বাস-এ ধাক্কা লাগার ব্যাপার। তখনও কোন ওয়ার্ডে ডাক পড়ার সময় আসে নি ভাস্করের, এমার্জেন্সীর দিকে তো যাওয়ার কোন কারণই ছিল না। দৈবেরই যোগাযোগ বলতে হবে। ভাস্কর কলেজ থেকে বেরোচ্ছিল, মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে আসছিলেন রাস্তার জনকয়েক ভদ্রলোক। সম্ভ্রান্ত চেহারার মহিলা দেখে ভাস্কর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এমার্জেন্সীতে এসেছিল, প্রাথমিক চিকিৎসার পর সে-ই ধরপাকড় ক'রে একটা বেড-এরও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল। মহিলাটির সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছিল তাকে সে লক্ষ্যও করে নি প্রথমে। মহিলাকে যখন স্ট্রেচারে ক'রে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন কান্নাকাটি করায় এবং সঙ্গে যেতে চাওয়ায় সামান্য যে একটু গোলমাল হয়েছিল, সেই সময়ই প্রথম দেখে সে তাকে। আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, সুশ্রী দেখতে এই পর্যন্ত—এমন কোন অসাধারণত্ব ছিল না কোথাও। মেয়েটি অসহায়ভাবে কাঁদছিল—একটু অবুঝও হয়ে পড়েছিল সেই সময়টায়; ভাস্কর তার অবস্থা দেখে দয়ার্দ্র হয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাসপাতালে যে সব সময় আত্মীয়স্বজনদের ভেতরে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়, সেটা বুঝিয়ে বলে অফিস ঘরে বসিয়ে রেখে ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে—নিজেই ওদের বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছিল, যাতে তাঁরা কেউ এসে মেয়েটিকে নিয়ে যান।

ব্যাপারটা সেইখানেই চুকে যাবার কথা। কিন্তু চোকে নি। পরের দিন কৌতূহলী হয়েই খবর নিতে গিয়েছিল। মহিলাটির কিছু কিছু সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যেরও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল। মহিলাটি সেজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করে-ছিলেন, সেই সূত্রেই ভিজিটিং আওয়ারে ওকে ডেকে পাঠিয়ে মেয়ে রেবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ভাস্কর যে তাঁর ছেলের কাজ করেছে, সে-কথা বলতে গিয়ে মেয়ের কাছে জেনেছিলেন গতদিনের কথা, রেবার ও তাঁর কৃতজ্ঞতার আরও কারণ আছে। ভাস্করের কাছ থেকে যে সাহস ও সহানু-ভূতি পেয়েছিল রেবা—তা হাসপাতালে আশা করে নি সে, হাসপাতাল সম্বন্ধে

জনশ্রুতিতে যতটুকু ধারণা হয়েছিল, তার সঙ্গে এ-আচরণ মেলে না। দু'-জনের মিলিত কৃতজ্ঞতায় সেদিন বিব্রতই বোধ করেছিল ভাস্কর।

সুতরাং এ-পরিচয় যে হাসপাতালে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা বলাই বাহুল্য। মহিলা বিধবা, সম্ভ্রান্তবংশের বধূ ঠিকই, কিন্তু বিত্তশালিনী নন। এক স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করেন, পটলডাঙ্গার দিকে ছোট্ট একটু বাড়ি আছে, তারই নিচের তলা ভাড়া দিয়ে—ওপরতলার দুটি ঘরে কোনমতে মাথা গুঁজে থাকেন। এই একটি মেয়ে রেবা—ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। আত্মীয়স্বজন এ শহরে ওঁদের কিছু কম নেই—কিন্তু দুদিনে তাঁরা কেউ দেখেন নি এই অভিমানে ভদ্রমহিলা তাঁদের এড়িয়ে চলেন।

রেবার মা বাড়ি ফিরেই একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন ভাস্করকে। বার বার মিনতি জানিয়ে বলে দিলেন, অবসর পেলেই যেন সে এসে এখানে খেয়ে যায়, ছুটির পর সন্ধ্যের দিকে আধঘণ্টার জন্যেও যদি সে থাকে, তিনি খাইয়ে দিতে পারবেন। হোটেলের খাওয়ায় শরীর টেঁকে না—এ তিনি বিলক্ষণ জানেন।

খাওয়ার জন্য নয়—এমনিই মাঝে মাঝে আসতে শুরু করল ভাস্কর। ক্রমশ সেটা প্রায় নিয়মিত হয়ে উঠল। আকর্ষণটা স্নেহেরই—এই কথাই বোঝাল সে নিজেকে, কিন্তু আসল আকর্ষণ যে রেবা—কিছুদিন পরে সেটা আর নিজের মনের কাছেও চাপা রইল না। রেবাও গোড়ার দিকে ভেবেছিল—সে যে কলেজ থেকে ফিরে নিত্য উৎকণ্ঠ-প্রতীক্ষায় কাল গোনে সেটা কৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়—সে ভুল যখন ভাঙল তখন বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে, তখন মোহ নেশাতে পরিণত হয়েছে—ফেরার বা সতর্ক হবার আর পথ নেই।

ফলে বাড়ির বাইরেও দেখা হতে শুরু হ'ল। ক্রমশ দেখা গেল সেইটেই সুবিধে। কার কবে কখন ছুটি—দু'জনেরই মুখস্থ হয়ে গেল। ছুটির পর সিনেমা, গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং ছুটির দিনে বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি অপরিহার্য হয়ে উঠল প্রায়। রেবার মার বহুকালের রুদ্ধ অপত্যস্নেহ—পুত্রসন্তানের বিকল্প হিসেবে পড়েছিল ভাস্করের ওপর। তিনি যেন অন্ধ হয়ে রইলেন, এই ঘনিষ্ঠতায় দোষের কিছুই

দেখতে পেলেন না।

চমক যখন ভাঙল তখন সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। রেবা বলল, 'বিয়ে করো আমাকে। আমার ধর্ম ও ইজ্জত বাঁচাও।'

ভাস্করের মুখ শুকিয়ে উঠল। বলল, 'সে আমি পারব না। অনেক কষ্ট ক'রে সব রকমে নিজেকে ও পরিবারকে বঞ্চিত ক'রে আমাকে ডাক্তারী পড়াচ্ছেন বাবা। তাঁর আশা আমি পাস ক'রে দেশে গিয়ে বসব। তা বসতে গেলে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করা ছাড়া আমার উপায় নেই।'

'তাহ'লে আমার উপায়?' শান্ত কঠিন কণ্ঠ রেবার।

উপায় যা ভাস্করের হাতে ছিল, সেই প্রস্তাবই সে দিল। ওষুধ এনে দেবে সে, ওটা নষ্ট ক'রে ফেলুক রেবা।

'কোথায় করব?...বাড়িতে হবে না, মা জানতে পারলে আত্মহত্যা করবেন। তার পর আর তাঁর ছাত্রীদের মুখের দিকে চেয়ে তাদের শাসন করা সম্ভব হবে না, জীবিকাই বন্ধ হয়ে যাবে। ভাড়াটে আছে বাড়িতে—জানাজানি কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না।'

এই উত্তর দিতে পারে নি ভাস্কর। তখনও হাসপাতালে তার এত প্রতিপত্তি হয় নি যে, সেখানে কাজ সারবে। নীরবে মাথা হেঁট ক'রে রইল সে—বিহ্বল হয়ে বুদ্ধির দুয়ারে মাথা কুটতে লাগল মনে মনে—একটা উপায়ের জন্যে। কিন্তু কোন সম্ভাব্য উপায়ের কথাই মনে পড়ল না সে-মুহূর্তে।

রেবা আর একটিও কথা বলে নি। অনুযোগ করে নি, কলহ করে নি, গঞ্জনা দেয় নি। যেন নীরব উপেক্ষায় ওকে পরিহার ক'রে বাড়ি চলে গিয়েছিল। আর দেখা করে নি কোনদিন, ভাস্করেরও সাহস হয় নি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে।

তবু মনে হয়, রেবা অপেক্ষাই করেছিল ওর জন্যে। হয়ত শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিল ওর পৌরুষ এবং সৎসাহস জাগ্রত হবে, নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে এগিয়ে আসবে, ওকে এই আসন্ন সর্বনাশ ও অসম্মান থেকে রক্ষা করতে। অন্তত এইরকম বিপদ এড়াবার একটা উপায়ও বার করবে খুঁজে। কিন্তু ভাস্কর কিছুই করতে পারে নি। তার না

ছিল অর্থের জোর—না ছিল তেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি। পাড়াগাঁয়ের নির্বান্ধব ছেলে—শহরের ছেলেদের মতো অসংখ্য মতলব তার জানা ছিল না। তার কৃতিত্বও তখনও পর্যন্ত এমন প্রমাণিত হয় নি যে, অধ্যাপকদের প্রশ্রয় বা আনুকূল্য লাভ করবে।

মাসখানেক পরে একখানা চিঠি পেল সে। রেবার চিঠি।

তাতে কোন সম্বোধন কি সম্ভাষণ ছিল না, শুধু লেখা ছিল, 'অতঃপর যে একমাত্র পথ আমার কাছে খোলা ছিল—এ-জীবনটা নষ্ট করা, সেই পথ ধরতেই চললুম। তবে এখানে মরব না, মায়ের জীবন এমনিই যথেষ্ট বিড়ম্বিত করেছি, সকলের সামনে তাঁর মাথাটা চিরদিনের মতো হেঁট করতে চাই না আর। এমন জায়গাতেই মরব, যেখানে কেউ কোনমতে আমার পরিচয় পাবে না, সে-পরিচয় এখানে এসে মাকে আঘাত করবে না। তোমাকে আমার বলার কিছুই নেই। শুধু একটি কথাই বলে যাচ্ছি, তোমাকে আমি অনেক চেষ্টা করেও ক্ষমা করতে পারলুম না। কেবলই মনে হচ্ছে তুমি আমাকে বিয়ে ক'রেও বাবার আশা পূর্ণ করতে পারতে, শুধু ঝঞ্ঝাটটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই করলে না। তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি—শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দিয়ে যাব—জীবনে তোমার বড় আশাটাই যেন ব্যর্থ হয়, যেমন ব্যর্থ তুমি আমার জীবনটা করলে।'

রেবার মাও তার খানিক পরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছিলেন ওর কাছে। রেবা কোথায় চলে গেছে—শুধু এক লাইন লিখে রেখে গেছে, 'আমাকে খুঁজো না, পাবে না। ভেবে নিও যে, তোমার মেয়ে জলে ডুবে মরেছে।'

প্রথম একটু মন খারাপ হয়েছিল বৈকি। কিন্তু যৌবন এক আশ্চর্য সর্বদুঃখহর মহৌষধ—সব দুঃখ সব দুঃস্মৃতি সে অনায়াসে ভুলিয়ে দেয়। তাছাড়া আশা আর সুবিপুল সম্ভাবনার সিংহদ্বার যার সামনে অবারিত, সে পেছনে-ফেলে-আসা পথের এক তুচ্ছ ঘটনাকে আঁকড়ে পেছিয়ে পড়ে থাকবে—এটা সম্ভবও নয়। ভাস্কর ক্রমে ক্রমে শুধু যে সেই দুঃখ ও লজ্জাবোধটা ভুলল তাই নয়—ঘটনাটাও ভুলে গেল ক্রমশ। কে জানে রেবার এই মৃত্যুতে সে অবচেতন মনে একটু স্বস্তিই অনুভব করেছিল কিনা। লেখা-

পড়ার চাপও বেড়ে গেল একটু একটু ক'রে, আরও সাফল্য বৃহত্তর সাফল্যের আশা ও উন্মাদনায় সামনের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল—সেই জয়যাত্রার রথচক্র-ধূলার আব্‌ছায়ায় একটি করুণ কোমল মুখ কোথায় আচ্ছন্ন অবলুপ্ত হয়ে গেল—তা ও টেরও পেল না।

আশ্চর্য, এতদিন পরে সেই বিগত বিস্মৃত অপরাধের স্মৃতিই যেন নতুন ক'রে তার সমস্ত লজ্জা ও অনুশোচনার অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠল। এ-অস্বস্তিটা তারই। কেবলই মনে হতে লাগল—ও যখন নিজের অবস্থা জানতই, তখন ওরই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। রেবার এত জানার কথা নয়, সে শহরের মেয়ে, বিধবার কোলে মানুষ হয়েছে। জীবনের ঘোরপ্যাঁচ সে কিছুই জানত না। সে সরল মনেই তাকে অবলম্বন করেছিল, ভালবেসেছিল—বিশ্বাস করেছিল। অমন একটা প্রাণ নষ্ট ক'রে দিয়ে আজ আর সুখী ও নিশ্চিন্ত হবার বুঝি কোন অধিকারই নেই ওর।

কিন্তু সেই কবেকার ভুলে-যাওয়া অপরাধই বা আজ এতদিন পরে এমনভাবে তার জীবনে দেখা দিল কেন—তার রাত্রের নিদ্রা ও দিনের কর্ম নষ্ট করতে? কিছুতেই সে যেন মন দিতে পারছে না, কোন কাজেই না। রোগী দেখাও হয়ে উঠছে না আর তেমন ক'রে। তারা বিরক্ত হচ্ছে, অনুযোগ করছে···

কেন? কেন? সেই বিস্মৃতপ্রায় কৃতকর্মের বোঝা অকস্মাৎ এমন দুঃসহ হয়ে উঠল কেন? ভাস্করও বার বার এই প্রশ্ন করে নিজেকে।···

আর সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়েই কুটিল একটা সংশয় দেখা দেয় মনে। তবে কি সেই স্মৃতির সঙ্গে এ কঙ্কালটার কোন যোগাযোগ আছে? ওটা আসার পর থেকেই ওর এই অস্বস্তি বোধ হতে শুরু করল কেন? তবে কি ও-কঙ্কালটা রেবারই? শুধু অভিসম্পাত দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে নি—মৃত্যুর পরপার থেকে ওর পরিপূর্ণ সুখের সময় এসে দেখা দিয়েছে—প্রতিশোধ নেবার জন্য ও প্রদত্ত অভিশাপকে সত্য করার জন্য?···

প্রথম প্রথম সম্ভাবনাটা নিজের কাছেই অবাস্তব ও অসম্ভব বোধ হয়েছে—তবু চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতেও পারে নি মাথা থেকে। ক্রমে সে-চিন্তা তার বুদ্ধি-যুক্তিকে অভিভূত করেছে। বার বার ছুটে গিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে

থেকেছে কঙ্কালটার দিকে। দেখতে দেখতে মনে হয়েছে রেবার উচ্চতা ঠিক এতটাই ছিল, হাড়ের প্রস্থও অবিকল তেমনি। তার হাতের হাড় চওড়া ছিল দেহের অনুপাতে—তা নিয়ে কতদিন ঠাট্টা করেছে ভাস্কর।

ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা কল্পনায় এসে স্থিরবদ্ধ হয়েছে। সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে এক সময়—এ-কঙ্কাল রেবারই। অবশ্য খবরাখবর নেবার চেষ্টা যে একেবারে করে নি তা নয়—কিন্তু সে অনুসন্ধান বেশী দূর এগোতে পারে নি।...

দিশাহারা বিহ্বল ভাস্কর ছুটে এসেছে যতীশবাবুর কাছে। সব শুনে যে পরামর্শ দেওয়া উচিত, অন্তত হিন্দুর পক্ষে—যতীশবাবু সেই পরামর্শই দিয়েছেন, 'স্কেলিটনটা কাউকে দিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও, আর গয়াতে গিয়ে চুপি চুপি একটা পিণ্ডি দিয়ে এসো। অপঘাত মৃত্যু হলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় শুনেছি—কিন্তু তার মা কি কিছু করেন নি? অবশ্য সে-সময়ও হয় নি—নিরুদ্দেশ হবার পর বারো বছর না গেলে শ্রাদ্ধশান্তি করে না। সে যা-ই হোক, তুমি গিয়ে গয়ার কাজটা সেরে এসো, যদি সে এখনও সত্যি সত্যিই প্রেতযোনিতে থেকে থাকে, উদ্ধার হয়ে চলে যাবে। তোমাকেও ক্ষমা করবে।'

ভাস্করও কথাটা বুঝেছে। সু-যুক্তি বলে স্বীকার করেছে। অন্তত যতীশবাবু তাই ভেবেছিলেন। সেই জন্যেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। নইলে হয়ত নিজে ওর সঙ্গে গিয়ে কাজটা করাতেন। তাহলে আজ আর এ-আপসোসটা থাকত না। কিন্তু অতটা বোঝেন নি। শেষ মুহূর্তে কী যে হ'ল, ভাস্করের মতি পরিবর্তনের তৎকালিক প্রত্যক্ষ কারণটা কি তা আজও তিনি জানেন না, একেবারে যখন খবর পেলেন, তখন যা হবার তা হয়েই গেছে। বস্তুত তিনি ও-তরফ থেকে চিঠি পাবার আগে সংবাদপত্রেই প্রথম জানতে পারেন ঘটনাটার কথা।...

দীর্ঘ কাহিনী শেষ ক'রে যতীশ্বরবাবু যখন রুমালটা বার ক'রে চোখ মুছে আবারও বাইরের দিকে মুখ ফেরালেন, তখন আমাদেরও কারও কোন প্রশ্ন করার অবস্থা নেই। গাড়ির শব্দ ও দূরে দূরে অবাঙালী যাত্রীদের আপসে কথা বলার একটা স্তিমিত গুঞ্জন ছাড়া আমাদের এদিকটা নীরব-নিথর হয়ে গেছে।

তবে এ-স্তম্ভিত অবস্থা বেশিক্ষণ রইল না বলা বাহুল্য। "মধুচক্রে লোষ্ট্রবৎ" আলোচনা শুরু হয়ে গেল দেখতে দেখতে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে ঘোরতর তর্ক বেধে উঠল। উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর যখন প্রায় সকলেরই পঞ্চমে পৌঁছেছে, তখন হঠাৎ যতীশ্বরবাবু আবার এদিকে ফিরে বসলেন। বললেন, 'সবচেয়ে মজা কি জানেন? এরপর আমি নিজে কিছু কিছু খোঁজ নিয়েছি—আমার প্রথম থেকেই মনে সন্দেহটা ছিল, পরে নিঃসন্দেহে জেনেছি, রেবা আদৌ মরে নি। এখনও পর্যন্ত সে বেঁচে আছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করি নি—মিছিমিছি এ-কথা তাকে আর জানিয়ে লাভই বা কি, এমনিই সে যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছে—তবে তাকে দেখে এসেছি। তার খবরও সব সংগ্রহ করেছি। সে গঙ্গায় ডুবে মরবে বলে প্রথমে কাশী, পরে বিন্ধ্যাচলে যায় কাশীতে বহু বাঙালী, হয়ত কেউ চিনে ফেলতে পারে এই ভেবেই বিন্ধ্যাচলে গিয়েছিল। সেখানে এক সন্ন্যাসিনী, এক পাঞ্জাবী মাতাজী ওর চেহারা আর ভাবভঙ্গী দেখে আসল ব্যাপারটা অনুমান ক'রে ওকে আটক করেন এবং আশ্রয় দেন। তিনিই ওকে নিয়ে যান ঋষিকেশে—নিজের আশ্রমে। সেখানেই সে আজও আছে, সেও সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করছে। ছেলেটিও বেঁচে আছে, আশ্রমেই মানুষ হচ্ছে। যদি বেঁচে থাকে, সে-ই ভাস্করের বংশরক্ষা করবে একদিন।'

বায়ুভূতো

দু' চোখ রগড়ে আবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখল কুণাল, না কেউ কোথাও নেই আর। বহু পরিচিত, এক কালের অতি-প্রিয় যে উপস্থিতি তার সামনে, অত্যন্ত কাছে সে দেখেছে, যার কথা এখনও কানে বাজছে, তার আর কোন চিহ্ন মাত্রও নেই। গভীর রাত্রে যেমন জনহীন থাকে মেলট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরার করিডর, তেমনই জনশূন্য, নিস্তব্ধ। সব যাত্রীই বোধ হয় ঘুমে অচেতন, সব কামরাই অর্গল বন্ধ। কেবল তার ছোট কামরাটারই ঠেলা দরজা ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, যেমন সে রেখে এসেছিল। তবে সেখানেও কেউ নেই, নীল আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভেতরটা। আর একজন মাত্র

আরোহী জনৈক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন।

অথচ, একটু আগেই যে ইরা এখানে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাঁ ইরাই। বারো বছর বাস করেছে যার সঙ্গে, তাকে চিনতে ভুল হবে, তা সম্ভব নয়। তাছাড়া তার গলা, ঐ হাসির শব্দ, এ সবই যে অত্যন্ত পরিচিত। তাহলে মানুষটা গেল কোথায়? গাড়ি গত এক ঘণ্টার মধ্যে কোথাও থামে নি, দু'দিকের চারটে দরজা যেমন লক করা তেমনিই আছে, জানলায় শিক দেওয়া—তবে? গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না, চলন্ত গাড়ি থেকে চলে যাওয়াও সম্ভব নয়, সে দরজা, সে পথ বন্ধ। তবে?

অশরীরা! বিদেহী আত্মা?

এ ধরনের উপস্থিতি এতকাল বিশ্বাস করে নি কখনও, বরং অন্য কেউ কথা তুললেও হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, কারণ বিশ্বাস করার মতো কোন প্রমাণ পায় নি এ পর্যন্ত, তেমন কোন ঘটনাও জীবনে ঘটে নি। কিন্তু এখন তো এই পর পর দুটো ঘটনার অন্য কোন ব্যাখ্যাও চোখে পড়ছে না।

ইরা সশরীরে নয়, সূক্ষ্ম দেহ না কি যেন বলে, সেই ভাবে এসেছিল।

কিন্তু সে কি এতটা বাস্তব হতে পারে? এতখানি জান্তব?

সেই দেহ, সেই বড় বড় দুটি টানা চোখের স্নিগ্ধ সকৌতুক চাহনি, গলার সেই একদা-অতিপ্রিয় খাঁজটি, ঠোঁটের ওপরে, চুলের কোল ঘেঁষে ঘামের বিন্দু, সুডৌল হাত দুটির মনোরম ভঙ্গী, এ সবই যে অত্যন্ত পরিচিত। কাছে, এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল—ওর এ দেখার মধ্যে ব্যবধানের মায়া বা মোহ রচিত হওয়ারও তো সুযোগ ছিল না। সে সময়টা অন্তত, মনে হচ্ছিল—গায়ের, প্রসাধনের পরিচিত গন্ধটাও পাচ্ছে।

শরীরী অশরীরী যা-ই হোক, এর ফলাফলটা স্পষ্ট, সুপ্রত্যক্ষ।

সাধারণ লোক যাকে বলে পাপের শাস্তি, যে কথাটা এতকাল আধো অবজ্ঞা আধো অমনোযোগের সঙ্গেই শুনে এসেছে, সেই কথাটা তার পূর্ণ অর্থে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওর চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও জঘন্য অপরাধের সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তিই বিধাতা নির্দিষ্ট করেছেন তার জন্যে। বেঁচে থাকা। তার মরবার কোন উপায় নেই, বেঁচেই থাকতে হবে তাকে।

কী যেন বলে ইংরেজীতে ? কনডেম্‌ড টু ডেথ ? না, সে তো সহজ। তার অদৃষ্টে শেষ শব্দটা পালটে গেছে, কনডেম্‌ড টু লিভ। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন দায়রা আদালতের বিচারকরা, তাকে তার বিচারক, এককালের প্রিয়তমা, জীবনদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।

কিন্তু ঠিক এতটাই অপরাধ কি করেছিল সে ? সব দায়িত্বটাই কি তার ?

সে তো ইরাকে ভুলিয়ে আনে নি। ইরাই বরং তাকে ভোলাতে এসেছিল, সে-ই আগে এসেছিল। অবশ্য যদি ভোলানো শব্দটা ব্যবহার করতে হয়।

ইরার মা যখন মারা যান তখনই ওর বাবা পঙ্গু, লো-প্রেসারে শয্যাগত। মা কি সব সেলাইয়ের কাজ, টিউশনি ইত্যাদি ক'রে সংসার চালাতেন। তখন ইরা স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে চাকরি খুঁজছে, দাদা তু' বছর আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, বোন ক্লাস সেভেনে পড়ে। কুণাল তখন সবে ইরাদের পাড়ায় এসে নতুন দোকানটা খুলেছে, অথবা বলা যায় মূল দোকানের ব্রাঞ্চ। ওর দোকানের আসবাব ও সজ্জা দেখে তার অবস্থা কল্পনা করতে দেরি হয় নি ইরার, সে কোন সই-সুপারিশের চেষ্টা না ক'রে সোজা এসে চাকরি চেয়েছিল।

চোখে ভাল লেগেছিল কুণালের, এটাও ঠিক। চাকরি দিয়েছিল সে সেই জন্যেই, যোগ্যতা বিচার করে নি। পরিচয়-পত্র দেখতে চায় নি। তখন কুণালের স্ত্রী বনলতা তেরো-চোদ্দ বছরের পুরনো হয়ে গেছে, চারটি ছেলে-মেয়ে। ওদের জাতে এখনও ছেলেরা একুশ-বাইশ পেরোতে না পেরোতে বিয়ে করে, তাছাড়া বনলতা দেখতে মোটামুটি ভাল হলেও বিয়ের সময়ই মোটা ছিল। এখন তো রীতিমতো স্থূলাঙ্গী মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক বলে মনে হয়। তাকে আর কোনমতেই প্রেয়সী বলে ভাবা যায় না। বিয়ে করেছিল, বা বাবা দিয়েছিলেন, পয়সার জন্যেই ; সেই পয়সাতেই দোকানের পত্তন, মধ্যে যে এত উন্নতি বা কলকাতায় আর একটা বাড়ি কেনা, সে অবশ্য কুণালেরই কৃতিত্ব, তবু মূলে বনলতারই পৈতৃক টাকা। তা হোক, 'বনলতা হ্যাজ হ্যাড হার শেয়ার অফ হার ওন', তাকে যথেষ্ট দিয়েছে কুণাল। এখন সে খেয়ে পরে, সুখে থাক, কুণালকেও তার মতো সুখ খুঁজতে দিক। সেদিন এই ছিল ওর মনোভাব।

কুণাল এ চাকরির বদলে কি চাইবে তা ইরার অজানা ছিল না। সেও প্রস্তুত ছিল কিন্তু তার আগে ভবিষ্যতের ব্যবস্থাটাও পাকা করে নিয়েছিল সে। ওর মূল টালিগঞ্জের দোকানে ভাইয়ের একটা চাকরি, বোনের জন্যে ভাল বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা, নিজের একটা ছোট নিজস্ব ফ্ল্যাট এবং বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা।

এর সবগুলোই মেনে নিতে হয়েছিল কুণালকে। সে তখন ইরার নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, না মেনে উপায়ও ছিল না। পুরোহিত ডেকে তিন-চারটি বন্ধুকে সাক্ষী রেখে একটা বিয়ের ব্যাপারও করতে হ'ল। বনলতা সবই জানল, কিন্তু তার বাধা দেওয়ার উপায় ছিল না বলে চুপ ক'রে রইল।

তারপর দশটা বছর কুণালের বেশ সুখেই কেটেছে বলতে হবে। ইরার একটি ছেলে হয়েছে। তাকে রাঁচীতে একটা মিশনারী ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছে। বনলতাও একটা সন্ধি ক'রে নিয়েছে ইরার সঙ্গে, আসা যাওয়া নিমন্ত্রণাদি চলছে। নইলে স্বামীকে একেবারেই হারাতে হচ্ছিল, দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত হচ্ছিল না।

হঠাৎই তারপর এসে পড়ল এই ভয়াবহ আর্থিক বিপর্যয়ের দিন। মালের দাম ক্রমাগত চড়তে চড়তে সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। এ অবস্থায় দু-সংসারের খরচ টানতে প্রাণান্ত হয়ে উঠল ক্রমশ, বিশেষ হাত একবার বাড়িয়ে ফেললে কমানো কষ্টকর। স্বামীর অবস্থা বুঝে বনলতাই প্রস্তাব করল ওখানের সংসার উঠিয়ে ইরাকে এ বাড়িতে তুলতে। বলল, 'সবাই যখন জেনে গেছে, তাছাড়া তোমার বিয়ে করা বৌ, তখন আর লজ্জা কি?'

ইরাকেও রাজী হতে হ'ল—অর্ধ অনিচ্ছায়। সে বেশি খবর রাখত বনলতার চেয়ে, কিছুটা বুঝতও। এখন এ ব্যবস্থায় রাজী না হ'লে একদিন হয়তো একেবারেই পথে বসতে হবে।

বনলতা ভাল ব্যবস্থাই ক'রে দিল। তেতলায় ওদের দুটো ঘর—অপেক্ষাকৃত নতুন—ছেলেমেয়েরাই থাকত এতদিন—তাদের সরিয়ে এনে পুরো তিনতলাটা ছেড়ে দিল। যেমন ওখানে ছিল, তেমনই সংসার গুছিয়ে বসল ইরা।

এর পর বনলতার কাছে কৃতজ্ঞতাবোধ করবে কুণাল এ স্বাভাবিক। কৃতজ্ঞতা থেকে পুরাতন প্রেমের স্মৃতি ফিরে আসাও আশ্চর্য নয়। এর ভেতর একটু বাধ্যবাধকতার মধ্যেও পড়তে হ'ল আবার। বনলতার নিজস্ব টাকা থেকে হাজার দশেক টাকা হাওলাত নিয়ে ব্যবসার একটা টাল সামলাতে হল। সবটা জড়িয়ে বনলতার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দুটোই বেড়ে গেল স্বামীর ওপর।

এ-ই অশান্তির সূত্রপাত।

ইরা বুদ্ধিমতী কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে, বিশেষ আহত অভিমানে কোন মেয়েরই বুদ্ধি কাজে লাগে না। ইরারও লাগল না। মান-অভিমান, কান্নাকাটি কলহ, ক্রমে অশান্তি চরমে উঠল। তার ফলে কুণাল যে আরও বেশি ক'রে শত্রুশিবিরে চলে যাচ্ছে, বনলতার হাসিখুশি আদর যত্নর প্রভাবে দুটি স্ত্রীলোকের তফাত বুঝতে শুরু করছে, এটা তার মাথায় গেল না। এ হিসাব মিথ্যা, সবটাই বনলতার সুপরিকল্পিত, সেটা বোঝবার অবসরও পেল না কুণাল আর সেজন্যে ইরাই দায়ী। হয়তো বনলতা স্বামীর অনুপস্থিতিতে ইরার জীবন দুর্বহ ক'রে তুলেছিল, যাকে বলে অন্তর্টিপুনি দিয়ে, কে জানে। এখন কুণালের তাই মনে হয়।

সে যাই হোক, ব্যবসায়ে চরম দুর্দিন, তার ফলে দুশ্চিন্তা—এদিকে এই নিত্য অশান্তি, কুণালের ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল। একদিন চরমেও উঠল; কুণাল যা জীবনে করে নি, ইরাকে মেরেই বসল। ফলে ইরা আত্মহত্যার চেষ্টা ক'রে অশান্তি আরও বাড়িয়ে তুলবে, সেও স্বাভাবিক। ডাক্তার হাসপাতাল থানা পুলিস উৎকোচ, নিজেরই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়েছিল কুণালের সেদিন। তবে তা হয় নি, যা হ'ল তা এই—

তবু সেইজন্যে হিসেব ক'রে যে এ কাজ করেছিল কুণাল তা নয়। বরং মনে হয়, পরে তো প্রমাণ পেয়েছে, ইরাই এক রকম তাকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছে। হাতের লেখাটা কোন বিদেশী আত্মার, একথা আজও ঠিক বিশ্বাস হয় না।

ইদানীং কোন স্ত্রীর ঘরেই শুত না কুণাল, একতলার বৈঠকখানা ঘরে নিজের শোবার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিল। ইরার বিশ্বাস ওটা লোক-দেখানো,

বনলতা সেখানে নিয়মিত যায় গভীর রাত্রে। সেইজন্যেই কুণালের ছলনার ব্যবস্থা এটা। এ সন্দেহের কথাটা জানা ছিল না কুণালের। এমন কেউ ভাবতে পারে তাও মনে হয় নি। সেদিন ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে, ইদানীং টাকার চিন্তায় রাত্রে ভাল ক'রে ঘুম হচ্ছিল না কোনদিনই, নইলে স্বাভাবিক নিয়মে আটটার আগে ওঠার কথা নয়, ছাদের কথাটাই প্রথম মনে হয়েছিল। একটু খোলা আকাশ, নির্মল বাতাস আর টবের কটা ফুলগাছের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের জন্যে মনটা আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল। এগুলো যেন তার জীবনে শান্তির প্রতীক তখন, প্রথম জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য সচ্ছলতা ও আনন্দের স্মৃতি বহন ক'রে আনে।

তাই সোজা ছাদেই উঠে গিয়েছিল সে। ইরার কথা মনে পড়ে নি। বাড়ির কেউই ওঠে নি তখনও, ইরাই বা উঠবে কেন? কিন্তু ছাদে পা দিতেই প্রথম নজর পড়ল তার, ইরাও উঠে একটা দেওয়ালে একদিকের গাল ও কান চেপে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি কঠিন, স্থির। সম্ভবত তারও ভাল ক'রে ঘুম হয় নি কিংবা আদৌ ঘুমোয় নি।

এরপর কিছু মামুলী সম্ভাষণ করা ছাড়া উপায় কি? তার উত্তরে কিছু বক্রোক্তির জন্যে প্রস্তুত ছিল কুণাল, কিন্তু এল যেটা সেটা, কটূক্তি। কটূক্তি বললেও কিছু বলা হয় না, কুৎসিত কদর্য গালাগালি। মনে হ'ল যেন সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে ইরা। কুণাল এই আকস্মিক হিংস্র আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিল না।

প্রত্যূষের সেই শান্ত প্রসন্ন মনোভাব, নির্জন পরিবেশের জন্যে আকুলতা যেন এক নিমেষে কোন্ দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। অকারণে এই জঘন্য আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়াতে মনটা তিক্ত বিষাক্ত হয়ে উঠল।

কুণালের তখনকার মনোভাব, যদি ক্ষেপে ওঠবারই আগের অবস্থা হয় তো বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তারও মুখের লাগাম ও মনের মুখোশ খসে পড়ল। ইতর অভিযোগের জবাবে সেও কদর্য ইঙ্গিত করতে লাগল।—জেনে-শুনেই নিজেকে বিক্রী করতে এসেছিল ইরা, করেওছে, এখন ভালবাসা দাবী করে কোন্ আস্পর্ধায়? ইত্যাদি—

শেষে ইরা, সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়েই যেন এগিয়ে এসে ওকে দুদ্দাড় কিল চড়

মারতে লাগল। তাতেও ক্ষতি ছিল না, কুণাল ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে এমন ভাবে আঙুলগুলোর ভঙ্গী ক'রে তেড়ে এল, মনে হ'ল ওর চোখ দুটোই বুঝি উপড়ে নেবে।

এরপর আর প্রকৃতিস্থ থাকা সম্ভব নয়, কুণালও থাকতে পারে নি। জেনে, ফলাফল বুঝেই জোর ক'রে ধাক্কা দিয়েছে ইরাকে। খোলা ছাদ, সামান্য একটু সম্ভাব্য ঘরের আদরার মতো ইট গাঁথা আছে, এক ফুটও নয়, তা পেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়া তো এক মুহূর্তের ব্যাপার। আর অত উঁচু থেকে নিচে পড়লে বাঁচবার কথা নয়, বাঁচেও নি।

পড়ার সময় 'মাগো' বলে যে আর্তনাদ করেছিল ইরা, তা কারও কারও কানে গিয়েছিল। বাড়ির লোকও অনেকে শুনেছে, দাসী চাকর দুজন তো বটেই।

তবে সেটাও বড় কথা নয়, দৈবাৎ পড়লেও অমন চেঁচিয়ে ওঠে মানুষ। এমন কি আত্মহত্যা করলেও। ব্যাপারটা আয়ত্তের বা ইচ্ছার বাইরে চলে যায় যখন, মৃত্যু আসন্ন বুঝে এমন আর্তনাদ ক'রে ওঠে অনেকে। জীবনে বেঁচে থাকার অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা যখন আর একেবারেই থাকে না, তখন আকুল হয়ে হতাশায় আর্তনাদ করে।

এখানে বড় প্রশ্ন হ'ল ওদের কথা-কাটাকাটি কলহের শব্দও পেয়েছে অনেকে। মুখ ভেঙে দেব—গলায় বাঁশ দিয়ে চুপ করাব—খুন ক'রে ফেলব, এসব কথাও কানে গেছে অনেকের। সুতরাং সামান্য ঘুষঘাষ দিয়ে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার কথা ভাবাও বাতুলতা হয়ে উঠল।

কিন্তু এইবার, এ পর্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর ঘটনাটা ঘটে গেল। ভেল্‌কিবাজীর খেলা যাকে বলে। এর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না কুণাল, এমন ভাবে বেঁচে যাবে, বাঁচতে পারবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি সে। বরং থানা থেকে ফোন পাবার পর ফাঁসির দড়ির স্পর্শ ই অনুভব করেছিল গলায়।

পুলিসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে, বনলতার বিলাপ এড়াতেই কতকটা, ইরার ঘরে ঢুকেছিল। অন্যমনস্ক ভাবেই ইরার বালিশটা তুলে দেখেছিল একবার। কিছু পাবে তা আশা করে নি। কিন্তু দেখা গেল সেখানে

ছুটি টুকরো কাগজ একটা ভাঁজের মধ্যে বেশ পরিপাটি ক'রে রেখে দিয়েছে কে।

তুলে দেখল দুখানা চিঠি। একটি ওকে উদ্দেশ করে লেখা, "এ কাজ যে করবে তা তো বুঝতেই পারছি। আমি না মলে, পথ থেকে সরে না গেলে শান্তি নেই। দেরিও নেই আর, তা নিজের মনেই টের পেয়েছি। আমারও আর বাঁচবার সাধ নেই। কিন্তু তোমার দীর্ঘ জীবন এখনও সামনে পড়ে। অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। সেই জন্যেই এই চিঠিটা রেখে গেলাম। তোমার না কোন বিপদ হয়।...তুমি সুখী হও, শান্তিতে থাকো। আমাকে ভুলে যাও।"

অপর কাগজটিতে মাত্র এক ছত্রই লেখা—"আমি আত্মহত্যা করিতেছি। আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে।" পরিষ্কার গোটা গোটা সই তার তলায়।

যন্ত্রচালিতের মতোই নিজের নামের স্বাক্ষরহীন চিঠিখানা মুচড়ে দুমড়ে দলা পাকিয়ে এক সময় বাথরুমে ঢুকে কমোডের সিস্টার্ণের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। পুলিস আসতে দ্বিতীয়টির সদ্ব্যবহার করতেও দ্বিধা করে নি।

ইরার হাতের লেখা বহু লোকই জানত। এমন কি তার দাদাও মানতে বাধ্য হল যে এ সই তার বোনেরই বটে, জাল নয়।

পুলিস আর সামান্য কিছু খোঁচাখুঁচি ক'রে চুপ ক'রে গেল, যেতে বাধ্য হ'ল। অর্থাৎ ফাঁসির দড়িটা অল্পের জন্যে সরে গেল গলার কাছ থেকে।

এর পর, যখন এ প্রসঙ্গ থিতিয়ে লোকে অন্য উত্তেজক প্রসঙ্গ খুঁজে বেড়াচ্ছে, নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত শান্তিতে দিন কাটাবার কথা, তখনই শুরু হয়েছে তার এই মানসিক বিপর্যয়। প্রতিক্রিয়া? পাপের পরিণাম?

তাই হয়তো হবে। কে জানে, কুণাল অত বোঝে না। অত লেখাপড়া করে নি সে। আকৈশোর ব্যবসা নিয়েই দিন কেটেছে, এভাবে মানুষের চরিত্র কি জীবন জানবার বোঝবার অবসর পায় নি। এমন কি এটা অনুতাপ কিনা তাও বলতে পারে না সে। খুব অনুতপ্ত হবার কি কারণ ঘটেছিল কোনও? সে যা করেছে, এ অবস্থায় যে কেউই তা করত না কি?

তবে এ অস্থিরতা কিসের? কেন এত মন খারাপ হয়ে থাকে সর্বদা? কেন একটা গ্লানি বোধ করে, একটা অপরাধী অপরাধী ভাব? মনে হয় পাড়ার সবাই পিছন থেকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখায়, খুনে বলে চিহ্নিত করে। এমন কি নিজের ছেলেমেয়েরাও তার দিকে কেমন এক রকমের অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হয়তো সবটাই তার কল্পনা। তাও ঠিক বুঝতে পারে না।

এই ধরনের এলোমেলো পরস্পরবিরোধী চিন্তা, মনে মনে এই অর্থহীন যুক্তি-প্রতিযুক্তি প্রয়োগ, তাকে যেন পেয়ে বসে ক্রমশ। ব্যবসায় মন বসে না, বৈষয়িক কাজে অমার্জনীয় ভুল হয়। বন্ধুবান্ধবদের পরিহার ক'রে চলে—তারা পরিহার করবে এই ভয়ে, কাজেই তাদের কারও কাছ থেকে কোন পরামর্শ পায় না, পাবার চেষ্টাও করতে পারে না।

শেষে সবচেয়ে সাংঘাতিক প্রশ্নটাও মনে উঁকি মারে, সেটাকে দৈহিক বল-প্রয়োগের মতো করে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেও সরানো যায় না—সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? এইবার অসহ্যও বুঝি হয়ে ওঠে এই জীবন; মনের মধ্যেকার স্ব-অভিযুক্ত অপরাধের চেহারাটা দৈত্যের আকার ধারণ করে।

আর তার মধ্যে যেটা অবশ্যম্ভাবী সেই ভাবনাটাও আকার ধারণ করে এক সময়—এ জীবনটা শেষ ক'রে দিলেই তো হয়! ইরাকে যেভাবে যেখান থেকে ফেলেছে, সেই ভাবে যদি সে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে? তাহ'লে তো কারুর কিছু বলবার থাকে না, অশান্তির শেষ হয়ে যায়?

প্রথম প্রথম এই চিন্তা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্র শিউরে উঠত। না না, এ কি ভাবছে সে! ছেলেমেয়েরা এখনও নাবালক, অনেক দায়দায়িত্ব তার। ওদের সে-ই সংসারে এনেছে, এভাবে ভাসিয়ে দিয়ে গেলে আরও বড় অপরাধ ঘটবে। কিন্তু এক সময় এসব বিচার-বিবেচনা আর কোন কাজেই আসে না। যাকে প্রথমটা পলায়নী-মনোভাব ভাবছিল তার কাছেই আত্মসমর্পণ করে। যা হবার হোক না, সে আর পারে না, আর পারছে না। কোন স্বাভাবিক কারণে মারা গেলে তাদের কি হবে! তখনও যা হত এখনও তাই হবে।

অনেক ভেবে মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রে একদিন সেই প্রত্যূষবেলায় ছাদে এসে দাঁড়ায় আবার। ঐ সেই ছাদের কোণটা, নিচু আলসে। নিচে

নটবর সরখেলের গলি। আর বেশি ইতস্তত করে না, দুর্বল হয়ে পড়বার সময় দেয় না নিজেকে। একরকম ছুটেই এসে সেইখানটায় দাঁড়ায়।

আর তখনই প্রথম ঐ অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে—ভেল্‌কি-খেলটা।

ঠিক সামনে, দুই হাত প্রসারিত ক'রে প্রায় আগলে এসে দাঁড়ায় ইরা, মুখে সস্নেহ সপ্রেম সকৌতুক স্নিগ্ধ হাসি, পরিষ্কার বলে ওঠে, বহু পরিচিত অভ্যস্ত কণ্ঠে—'ও কী হচ্ছে কি? পাগলামি? কিছু হয় নি আমার। আমার জন্যে মন খারাপ করতে হবে না। যাও, নিচে যাও বলছি। নইলে এখুনি সবাইকে ডেকে চেঁচিয়ে হাট বাধাব। আশ্চর্য! ছেলেমেয়েগুলোর কথাও মনে পড়ল না তোমার! ছিঃ!'

পা পা ক'রে পিছিয়ে আসতে হ'ল কুণালকে।

এতই স্বাভাবিক, এতই পরিচিত সবটা, ঐ চেহারা, উপস্থিতি, পথ আগলে দাঁড়ানো, ঐ কণ্ঠস্বর যে—এটা সম্ভব কি অসম্ভব, ইরা মরে গেছে, তার দেহ ভস্মীভূত, এখন এভাবে এখানে তার দেহী-সত্তার আগমন সম্ভব যা, এসব কোন কথাই মনে পড়ল না তখন।

তারপর এই।

সেদিন কিছু ভাবার অবস্থা ছিল না সত্য কথা, কিন্তু পরে অনেক ভেবেছে—এ ওর উত্তপ্ত অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা। আসলে মরতে ভয় পেয়েছিল বলেই এ সব কল্পনা করেছে, নিজের বিবেকের কাছে সাফাই গাইবার জন্যে।

কিছুদিন চেষ্টাও করেছে এর পর সহজ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার। পারে নি। সেই যন্ত্রণা অব্যাহতি দেয়নি তাকে। মানসিক অস্থিরতা।

না, মরতেই হবে তাকে। এ জীবন্মৃত অবস্থা, সকলের চোখে ঘৃণিত হয়ে থাকা সহ্য হবে না তার। মরার পর কি হবে? সে তখন ভাববার অনেক সময় পাওয়া যাবে। হয়তো কিছু ভাবার প্রয়োজনও হবে না। নিজের ছেলে-মেয়েরা অন্তত তারপর আর হয়তো এতটা অসম্মানের চোখে দেখবে না। অনুকম্পার জলে রক্তের রেখা ধুয়ে যাবে তাদের মন থেকে—

লক্ষ্যটা ভেবে নিয়ে পথের, পদ্ধতির কথাটা ভাবতে বসেছে। আগের মতো ভুল আর করবে না। ওখানে ওভাবে নয়। আত্মা যদি থাকেও, অপঘাতের

আত্মা ঘটনাস্থলটা ছাড়তে পারে না, এ অনেকের কাছেই শুনেছে। ইরার আত্মা যদি থাকেও, ঐখানেই আছে। আবারও বাধা দেবে হয়তো।

তার চেয়ে বাড়ি থেকে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোথাও কাজটা সারা যেতে পারে। এই যুক্তিটাই ভাল বোধ হ'ল। হয়তো কেউ জানতেও পারবে না। জানতে না পারলে আলোচনাও হবে না।

কথাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় লক্ষ্ণৌ যাবার এই প্রয়োজনটা দেখা দিল। বোধ হ'ল ঈশ্বরেরই যোগাযোগ। তার যন্ত্রণায় দয়ার্দ্র হয়ে মুক্তির পথ ক'রে দিলেন।...

বেশ উৎসাহের সঙ্গেই রওনা হয়েছিল। অনেকদিন পরে তাকে প্রফুল্ল দেখে বনলতাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। নিজে হাতে স্যুটকেস গুছিয়ে দিয়েছিল।

সব আয়োজন পরিকল্পনা ঠিক, কোন্ স্টেশন থেকে কোন্ স্টেশনের মধ্যে কাজ করবে তাও ভাবা ছিল, সকলে ঘুমিয়ে পড়তে উঠে বেশ সহজ ভাবেই নিজের কামরা থেকে বেরিয়েছিল, যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে। বগীতে য়্যাটেণ্ডেণ্ট একজন থাকার কথা, সেও নেই, আগের স্টেশনেই লক্ষ্য করেছে, এও মনে হয়েছিল বিধাতার আনুকূল্য। নিশ্চিন্ত ভাবে কামরার ঠেলা দরজাটা আর খানিক টেনে দিয়ে গাড়ির দরজার দিকে ফিরেছে, দেখল আগের মতোই প্রসারিত দুই হাতে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ইরা।

'ছিঃ। আবার!' সস্নেহ হাসির সঙ্গে মৃদু অনুযোগে, পরিষ্কার শুনল কুণাল, 'কেন এসব ছেলেমানুষী করছ বল তো? মরা তোমার এখন হবে না। আমার জন্যে মরবেই বা কেন। কী হয়েছে? আমি একটুও দুঃখিত হই নি, বিশ্বাস কর। দুঃখিত হব আমার ছেলেটাকে যদি এই ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাও। আর সে আমি হতে দেবও না। যাও শুয়ে পড়ো গে—'

তারপরই, স্তম্ভিত বিহ্বল কুণালের দৃষ্টির সামনেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে। আর তারপর থেকেই এই শূন্য দীর্ঘ করিডরটা তাকে নীরবে উপহাস ক'রে চলেছে, তার বিভ্রান্ত মানসিক অবস্থাকে।

কন্‌স্টেব্‌ল্‌

গঙ্গারামের সর্বাপেক্ষা বড় গর্ব ছিল এই যে তাহার মতো হুঁশিয়ার কন্‌স্টেব্‌ল্‌ সারা শহরে একজনও নাই। সব-ইন্‌স্পেক্টর জিতেনবাবু প্রায়ই বলিতেন, 'এতদিন চাকরী করছি, গঙ্গারামের মতো হুঁশিয়ার জমাদার আর একজনও দেখলুম না।' চাকুরীও জিতেন বাবু বড় কম দিন করিতেছেন না; আগামী অগ্রহায়ণে দুই বৎসর পূর্ণ হইবে।

গঙ্গারাম কিন্তু বহুদিন কাজ করিতেছে। প্রায় সাত বৎসর হইবে। ইহারই মধ্যে হুঁশিয়ারী ও কর্মকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ তাহার পদ-বৃদ্ধিও হইয়াছে। গঙ্গারাম এই দীর্ঘ সাত বৎসর সময়ের মধ্যে একবার মাত্র ঘরে গিয়াছিল। কারণ সংসার বড়, জমি-জমা তাহার পিতার দোষে প্রায় সবই গিয়াছিল, পিতা নিজেও গিয়াছেন; কাজেই সংসারের সব দায়িত্ব এখন তাহার উপর—খরচেও কুলায় না। টাকা সে যত উপার্জন করে সবই দেশে পাঠাইতে হয়। সুদূর গোরখপুর জেলার কুশল-ভাগবত গ্রাম—যাওয়া আসায় অন্ততঃ আঠারোটি টাকা খরচ। সুতরাং একবারের বেশী আর যাওয়া হয় নাই।

গঙ্গারাম আঠারো বৎসর বয়সে পঞ্চমী রামপিয়ারীকে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের চার বৎসর পরেই চাকুরী করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসে। তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর পত্নীর দ্বিরাগমন উৎসব উপলক্ষে পনেরো টাকা ধার করিয়া গঙ্গারাম দেশে গিয়াছিল। সেই ধার শোধ করিতেই তাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। সেইজন্য আর যাওয়ার কথা মুখে আনিতে পারে নাই।

কিন্তু রামপিয়ারীর এখন ষোল বৎসর বয়স। কথাটা মনে করিতেও গঙ্গা-রামের বুকের ভিতরটা হু-হু করিয়া ওঠে। রামপিয়ারী সুন্দরী ইহা সে দ্বিরাগমনের সময়েই লক্ষ্য করিয়াছিল। সুন্দরী ষোড়শী বধূর বিরহ-কাতর মুখ কল্পনা করিতেই নিজের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ নিঃশ্বাস একটা বাহির হইয়া আসে। সম্প্রতি গঙ্গারামের মনে সুখ নাই।

সে হুঁশিয়ারীর জন্য সে বিখ্যাত, সেই হুঁশিয়ারীও যেন তাহার ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। 'বিটে' পাহারা দিতে দিতে মন তাহার কলিকাতা

শহর ফেলিয়া চলিয়া যায় গোরখপুর জেলায়। স্ত্রীর মুখ সে কল্পনা করিতে চেষ্টা করে। বত রকমের অপরূপ মুখ সে কল্পনায় আনিতে পারে, আর 'বিটে' পাহারা দিতে দিতে যত রকমের সুন্দর চেহারা চোখে পড়ে, কোনটাই যেন রামপিয়ারীর সহিত মেলে না। ঠিক অত সুন্দর হয়ত নয়, কিন্তু খুবই সুন্দর!

ষোল বৎসরে মেয়েদের চেহারা যতটা পুষ্ট হয় রামপিয়ারী বোধ হয় তাহার অপেক্ষা কিছু কৃশ। কারণ বিরহ। রামপিয়ারীর স্বামী ঘরে নাই—মনেও সুখ নাই নিশ্চয়ই। ভাল করিয়া খায়ও না হয়ত। গঙ্গারামের বুক চিরিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ওঠে।

সম্প্রতি পাড়ার দীনশরণ মিশিরকে দিয়া মা চিঠি লিখাইয়াছেন, কিছুদিন যাবৎ নাকি রামপিয়ারীর শরীর মোটেই ভাল যাইতেছে না! গঙ্গারামের একবার আসা দরকার। মধ্যে মধ্যে উহার জ্বরও হইতেছে। ইত্যাদি—

রামপিয়ারী স্বামীকে কতটা ভালবাসে কে জানে। গঙ্গারামেরও শরীর মোটে ভাল যাইতেছে না। প্রত্যহ সে পঞ্চাশটি ডন্ দিয়া আধ সের ছোলা খায়, তথাপি চেহারার তাদৃশ উন্নতি নাই। অবশ্য জ্বর হয় নাই বটে কিন্তু তাহা হইলে চাকুরী থাকিবে না। তবুও মনে হয় যেন সে রামপিয়ারীকে যতটা ভালবাসে তাহার অপেক্ষা রামপিয়ারীই বেশি···

মায়ের যেমন কাণ্ড, ডাক্তারও হয়ত একবার দেখানো হয় নাই। শরীর গরম হইলে জ্বর হওয়া বিচিত্র নয়। একটু ঘোল কিম্বা কাঁচা দুধের সরবৎ খাওয়াইলে অনেক সময় ফল পাওয়া যায়। গঙ্গারামের হুট করিয়া দেশে তো গেলেই চলে না। অন্ততঃ বিশটি টাকা দরকার। জমাদার লুঠন তেওয়ারী কুড়ি টাকা হয়ত ধার দিতে পারে, কিন্তু টাকা পিছু চার পয়সা করিয়া সুদ চাহিবে। মাসে পাঁচসিকা করিয়া সুদ, ভাবিলেও গা শিহরিয়া ওঠে—

গঙ্গারাম আকাশ পাতাল ভাবে; তবু উপায় স্থির হয় না। মনের আকুলতা বাড়ে খালি।

আগের দিন রাত্রে গঙ্গারাম রামপিয়ারীকে স্বপ্ন দেখিয়াছে, অত্যন্ত কৃশ; কিছুই খায় না, শুধুই কাঁদে। গঙ্গারাম গিয়াছে, কিন্তু তাহাকেও যেন সে চিনিতে পারে না—

মনটা তাহার সমস্ত দিনই খারাপ হইয়া রহিয়াছে।

জিতেন বাবু কহিলেন, 'টালিগঞ্জের দিকে গত তিন রাত্রি উপরি উপরি চুরি হয়ে গেছে। একজনের বাড়ি থেকে ঘটি গেলাস থালা কতকগুলো, আর একজনের বাড়ি থেকে একখানা কাপড় শুধু, আরও একজনের বাড়ি থেকে একটা গাড়ু ছাড়া কিছু নিতে পারে নি। কোনও দাগী আসামীকেও সন্দেহ হচ্ছে না ঠিক। বোধ হয় নতুন লোক হবে। তিনটে বাড়ি খুব কাছাকাছি··· ওখানকার থানাও অবশ্য চেষ্টা করছে খুব। ইন্‌স্পেক্টর বাবু এই মাত্র আমায় বলছিলেন যে ঐ বিট্‌টা রাত্রে সুপারভাইজ করার জন্য একজন হুঁশিয়ার জমাদার দিতে পারি কিনা। আমি তোমার নাম করেছি। তুমি যেতে পারবে তো?'

গঙ্গারাম সেলাম করিয়া কহিল, 'হুজুরের হুকুম হ'লেই যাব।'

—'বেশ, আজ রাত্রি দশটা থেকে বিট্‌ শুরু করবে।···তার আগে ইন্‌স্পেক্টর বোসের সঙ্গে দেখা করো। তিনি তোমায় কাজ বুঝিয়ে দেবেন।'

গঙ্গারাম আহারাদি সারিয়া গুটি গুটি টালিগঞ্জের দিকে রওনা হইল। সেদিন রাত্রে তাহাকে অন্য চিন্তা ছাড়িতে হইবে। তাহার হুঁশিয়ারীর খাতিরে দেশ বিদেশ হইতে ডাক পড়ে, সুতরাং মনোযোগ দিয়া কাজ করিতেই হইবে, না হইলে এই বিপুল খ্যাতি নষ্ট হইয়া যাইবে। মনে মনে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া সে রামপিয়ারীকে মনে না করিবার জন্য অসম্ভব উপায় কল্পনা করিতে লাগিল।

দশ সালে একজন কন্‌স্টেবল কৌশল করিয়া এগারো জন ডাকাত ধরিয়াছিল; ফলে সরকার বাহাদুর উহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। গঙ্গারাম যদি ঐ রকম একটা কিছু করিতে পারে তো মন্দ হয় না। একশত টাকায় উহার প্রয়োজন নাই, কুড়িটি টাকা হইলেই রামপিয়ারীকে—

সীতারাম সীতারাম! আবার ঐ নামটা মনে আসিয়া যায়!

বিড়িগুলায় আজকাল আর নেশা জমে না।···একটা গাড়োয়ান পাইলে একটু খৈনির যোগাড় দেখা যাইত···শালা চোরদের স্পর্ধা যেন বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। আচ্ছা, উহারা কি অস্ত্র লইয়া বাহির হয়?···মনে যেন একটু ভয়ের মতো দেখা দিল, মনে পড়িল রামপিয়ারীর প্রথম যৌবন···।

আবার ঐ নাম মনে আসে। নাঃ—শালারা বিড়িতে ধুলা না কি পুরিয়াছে, নেশা মোটেই জমে না।

গঙ্গারাম জোরে জোরে পায়চারী শুরু করিল।

সহসা এক সময়ে মোড় ঘুরিতেই গঙ্গারামের চোখে পড়িল, শ্বেত বস্ত্রাবৃত কে একজন একটা বাড়ির পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বাঘের মতো গর্জন করিয়া গঙ্গারাম লাফাইয়া পড়িল।

একটা স্ত্রীলোক কাপড়ের আড়ালে একটা ছোট ঘড়া লুকাইয়া এদিক ওদিক চাহিতে ছিল। গঙ্গারাম বজ্রমুষ্টিতে উহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'চোট্টা···!'

আর কোনও কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। দেশ দিন দিন কি হইতেছে? রাত্রি মোটে এগারোটা, বাড়ির লোকজন জাগিয়া আছে এখনও, গঙ্গারামের মতো হুঁশিয়ার জমাদার পাহারা দিতেছে—উঃ! স্পর্ধাও তো কম নয়!

রাস্তার আলোক মেয়েটির মুখে আসিয়া পড়িল। আরে, এ যে ছেলে-মানুষ। বড়জোর ষোল-সতের বৎসর বয়স হইবে। এই বয়সেই—?

মেয়েটি অকস্মাৎ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া গঙ্গারামের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, কহিল, 'স্বামীর বড় অসুখ বাবা, খাওয়াতে পাচ্ছি না, চোখের সামনে বিনা চিকিচ্ছেয় মরছে, সইতে পারিনি ব'লেই···। আজকে আমায় ছেড়ে দাও, নইলে যে মরে যাবে। ওর অসুখ ভাল হোক্, আমি জেল খেটে দিয়ে আসব', ইত্যাদি ইত্যাদি।

গঙ্গারামের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, জিলা গোরখপুরে কুশল-ভাগবত গ্রামের এক ষোড়শীর রোগ-পাণ্ডুর কৃশ মুখ। গঙ্গারামের অসুখ করিলে, স্বামীকে ঐ অসহায় অবস্থায় দেখিয়া সে-ই কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিত? হয় তো সে-ও···!

গঙ্গারামের জীবনে যাহা কখনও হয় নাই তাই ঘটিয়া গেল। কখন যে তাহার বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই, চৈতন্য যখন হইল মেয়েটি তখন কাছে নাই।

পরদিন থানায় আসিয়া সে তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করিল, তারপর,

লুঠন্ তেওয়ারীর কাছে টাকা পিছু চার পয়সা সুদে কুড়ি টাকা ঋণ।

কথায় কথায় কহিল, 'লুঠন্, ভর দুনিয়ামে সব্‌সে বড়া উল্লু কভি দেখা হ্যায় ?'

লুঠন্ স্বীকার করিল যে, সে তাহা এখনও দেখে নাই।

গঙ্গারাম নিজের বুকে একটা আঙ্গুল রাখিয়া কহিল, 'অব্ দেখো··· ।'

কাজ্‌বাব্

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়াটা ঠিক কী বস্তু তা সত্যধনবাবু জানেন না, কথার কথা শুনেছেন মাত্র। কিন্তু এখন ওঁর যা অবস্থা তাতে মনে হ'ল সেটাও বোধ করি এর চেয়ে ঢের সহনীয় হ'ত!

চাকরি যাবে না এটা ঠিক, এত সহজে আজকাল কারো চাকরি যায় না। আগেকার দিন নয়, মানে বাদশাহী আমল নয় যে কাঁচা মাথাটাই উবে যাবে কাঁধের ওপর থেকে। এ কথা কোন ওপরওলাই এ যুগে বলতে পারেন না যে, সাতদিনের মধ্যে জবাব না পেলে তোমার গর্দান যাবে—কিংবা 'বলতে পারলে অর্ধেক রাজত্ব আর এক রাজকন্যা মিলবে'। সে দিনকাল তো নেইই, এমন কি ইংরেজ আমলও নেই। সেদিক দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত। তবু অপমান তো বটেই। মহামান্য হাকিমের ভ্রূকুটিকুটিল মুখে যে বিরক্তি, তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা ফুটে উঠবে—দুদিকের য়্যাডভোকেট ব্যারিস্টারের দল প্রকাশ্যেই যে ভাবে হাসাহাসি করবেন—'আজকাল বিদ্যে সকলেরই সমান!' এই বলে—সেটা তো মানসচক্ষে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন সত্যধনবাবু। এতকাল সসম্মানে চাকরি করে এসে বুড়ো বয়সে, রিটায়ার করার আর মাত্র দুটি বছর বাকী থাকতে এই দুর্নামটা কুড়োবেন তিনি? না, এর চেয়ে থ্রম্বসিস হয়ে মরে যাওয়াও বোধ করি ঢের ভাল ছিল!

অথচ আইনতঃ তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারেন না—তা সত্যধনবাবুও জানেন। খেয়ালখুশিমতো উদ্ভট উদ্ভট শব্দের অর্থ বাতলাবার জন্য তাঁকে চাকরিতে নিয়োগ করাও হয় নি। কিন্তু তবু সে কথা কী আর বলতে পারলেন! কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হ'ল তাঁকে নিঃশব্দে।

আর এতগুলি অনুবাদক থাকতে তাঁর ওপরই বা এ চোট পড়ে কেন!

এ স্রেফ অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। কী কুক্ষণেই 'চীফ' ছাপটা পড়েছিল তাঁর চাকরির ওপর। ঐ তো সব ছোঁড়ার দল আছে—এম. এ. পাস বলে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, একজন সাধারণ বি. এ.র অধীনে কাজ করতে হয় বলে বিলাপের অন্ত নেই, ঠারেঠোরে প্রায় প্রত্যহই তাঁকে জানিয়ে দেয় যে ওরা তাঁর চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানে, অথচ কাজের দিকে চাইলে তো সত্যধনবাবুর চোখ কপালে ওঠে, অভিধান খুলে দেখেও ঠিকমতো অর্থটা বুঝে নিতে পারেন না বাবুরা—! কেন, ওদের কাউকে ডাকতে পারলেন না হাকিম, বিদ্যের দৌড়টা বুঝে নিতেন একবার!

নিতান্তই অদৃষ্ট বলতে হবে। নইলে আজ তো তাঁর আসবার কথাও ছিল না।

আজ কামাই করবেন বলেই ঠিক করে রেখেছিলেন, কথা ছিল সোমবার আজ স্ত্রীকে নিয়ে তারকেশ্বর যাবেন। কী যে দুর্বুদ্ধি হল, শেষ মুহূর্তে গৃহিণীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আগামী রবিবার পর্যন্ত যাত্রাটা মুলতুবী রেখে অফিসেই বেরিয়ে পড়লেন।

কে জানে—বাবা তারকনাথেরই রোষ পড়ল কিনা!

নইলে সবে ছুটোর পর হাত মুখ ধুয়ে এসে বাড়ি থেকে আনা বড় বই-ডিবেটা খুলে লুচির দিস্তেয় হাত দিয়েছেন আর অমনি সান্যাল হুজুরের চাপরাসী এসে দাঁত বার ক'রে দাঁড়াবে কেন? 'হুজুর সেলাম দিয়া!'

সেলাম দিয়া তো দিয়া—তাই কি খাস কামরামে দিয়া! একেবারে আদালতঘরে, গিসগিস করছে লোকজন, বাদীপ্রতিবাদা ব্যারিস্টার য়্যাটর্নীর দল প্যাটপ্যাট করে চেয়ে আছে চারদিক থেকে, তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হল বলির পাঁঠার মতো।

'আমাকে ডেকেছেন মি লর্ড?'

"ও আপনিই আমাদের চীফ ট্র্যানস্লেটর মিঃ মল্লিক? দেখুন তো—এটার কিছু মানে করতে পারেন কি না!"

সামনে পড়ে আছে কোন্ আপীল কেসের কাগজপত্র—ছাপা কাগজের বইয়ের মতো। তার মধ্যে থেকে একখানা তুলে ইঙ্গিত করলেন চাপরাসীকে

—সে এসে মেলে ধরল সামনে।

নীচের আদালতে বিবদমান কোন পক্ষের জবানবন্দি বা সাক্ষ্য—তারই ইংরেজী অনুবাদ। তার মধ্যে একটা জায়গায় মোটা ক'রে লাল পেনসিলে দাগ দিয়েছেন মহামান্য জজ বাহাদুর; ইংরেজী হরফেই লেখা কিন্তু বিচিত্র তার উচ্চারণ, "কীজ্ বাব্"। ইংরেজীতে ঠিক এমনি লেখা আছে "Keez Baab." সত্যধনবাবু বারকতক পড়লেন শব্দটা।

আগের বাক্যের সঙ্গে পরের বাক্যগুলো মিলিয়ে ঐ বিশেষ শব্দটার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করলেন—অর্থাৎ চট্ ক'রে কিছু খাপ খেয়ে যায় কিনা।

তারপর—সামান্য একটু পরেই সে চেষ্টার নির্বুদ্ধিতাটা নিজের কাছে ধরা পড়ল—এঁরা কি আর ও চেষ্টা না ক'রেই তাঁকে ডেকেছেন? নিশ্চয় বেয়ে-ছেয়ে দেখেছেন আগে।

শূন্যদৃষ্টি তুলে তাকালেন সত্যধনবাবু একবার চারদিকে।

হাকিম বাহাদুর, চারদিকে কৌঁসুলীর দল—আমলাফয়লা চাপরাসী বাদী-প্রতিবাদী—মায় এই বড় উঁচু ঘরখানার সাজ-পাট, ছাদের খিলেন প্রলম্বিত পাখাগুলো—সবেতেই তাঁর সেই শূন্য দৃষ্টি ঘুরে এল একবার।

কিন্তু কোথাও কিছু বুঝি পেলেন না অবলম্বন। এমন কোন সূত্র মনে এল না যে সেই সূত্র ধরে এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

ঘেমে উঠলেন দেখতে দেখতে। কান ও কানের পাশগুলো আগুন হয়ে উঠল যেন। মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। পা দুটোতে অকারণ একটা দুর্বলতা বোধ করলেন।

এখনকার ঐ সব তরুণ ছেলেরা গ্রাহ্যও করত না। তারা সটান বলে দিত—'আমি জানি না।' জানতেই যে হবে তার মানে কি?

কিন্তু এইখানেই ওঁর সঙ্গে ওদের তফাত।

উনি এই এতগুলো লোকের সামনে বলতে পারবেন না যে, আমি জানি না।

এতকাল ধরে এইখানে কাজ করছেন, বহু দুরূহ শব্দের অর্থ করেছেন, অনুবাদ করেছেন অনেক অপ্রচলিত শব্দের—আর এখন বলবেন যে 'আমি পারি না!' ছি!!

উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছেন মহামান্য বিচারপতি। তাকিয়ে আছে সকলে।

সেদিকে চেয়ে একবার ঢোঁক গিললেন সত্যধনবাবু।

তারপর মাথা হেঁট ক'রে জানালেন, মি লর্ডের কাছ থেকে তিনি একটু সময় চান। খুবই অপ্রচলিত শব্দ—সুতরাং একটু সময় না পেলে বলা শক্ত হবে।

'বেশ তো। খুব ভাল কথা। বলুন কতটা সময় চান। কাল বলতে পারবেন?'

'আজ্ঞে, চেষ্টা করব খুব—নয়ত আর এক দিন!' বলে ফেললেন সত্যধনবাবু।

'বেশ তাই হোক। আপনি পরশু বুধবার ছুটোর সময় আমাকে জানিয়ে যাবেন দয়া ক'রে।'

হাতের ইঙ্গিতে তাঁকে অব্যাহতি দিলেন মহামান্য বিচারপতি। অন্য প্রসঙ্গে মন দিলেন তার পরে।

গৃহজাত লুচি এবং আলুপিঁয়াজ চচ্চড়ি জীবনে এমন বিস্বাদ কখনও লাগে নি তাঁর—এর আগে।

'কি হল দাদা? কী বললেন হুজুর?'

প্রশ্ন করল দু-একজন সহকর্মী।

'না, ও একটা শব্দের মানে করতে পারছিলেন না—তাই!'

খাবারের কৌটো ঠেলে রেখে চায়ের গেলাসটা টেনে নিলেন সত্যধনবাবু।

ক্ষুধা আর কিছু মাত্র নেই; পিপাসাই বরং প্রবল হয়ে উঠেছে, বুক পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে ওঁর। চা-ই এখন শুধু প্রয়োজন একটু। খুব গরম আর কড়া চা।

'তা মানে করে দিয়ে এলেন?'

খুব সরল ভাবে প্রশ্ন করে তরুণ গাঙ্গুলী। কিন্তু তবু গলার আওয়াজে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরটুকু ঠিক বোঝা যায়। মহা ফক্কড় ছোকরা। তবু যদি না বাংলায় এম. এ. হত। ইংরেজী শব্দের মানে খুঁজতে মিনিটে চোদ্দবার গাঙ্গুলীর ডিক্‌স্‌নারী হাতড়াতে হয়।

'হুঁ।' বলে গম্ভীরভাবে হাতের কাজ টেনে নিলেন।

'হুঁ' শব্দটা দ্ব্যর্থক। 'হ্যাঁ'ও হয়—'না'ও হয়, আবার 'আচ্ছা দেখছি বা চেষ্টা করছি'—এ রকমও হ'তে পারে।

কিন্তু কাজে মন দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা নয় ওঁর। এ রকম শব্দ কখনও শোনেন নি তিনি। এর জাত পর্যন্ত চেনেন না এটাও ঠিক। অর্থাৎ কোন্ ভাষার কথা তাই বুঝতে পারছেন না। কোন্ ভাষা আন্দাজ করতে পারলেও না হয় ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে গিয়ে অভিধান দেখা চলত।

কাকে জিজ্ঞাসা করবেন তিনি?

কে বলতে পারবে? অথবা এই অন্ধকারে একটু পথ দেখাতে পারবে? মানে কোন্ দিক ধরে চললে, কাকে ধরলে এর হদিস মিলতে পারে—সেটুকু অন্ততঃ বাতলাবে?

এই প্রশ্নই অনবরত মনে মনে ক'রে যেতে লাগলেন তিনি।

অবশেষে ভাবতে ভাবতে যখন প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন—হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুকুমার বাঁড়ুয্যের কথা।

এই তো! এই তো ঠিক হয়েছে! বাঁড়ুয্যের কাছে গেলেই তো সমস্যা মিটে যায়।

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্, জগৎজোড়া নাম। নিজে চব্বিশটি ভাষায় কথা কইতে পারেন।

এঁর কথাটা মনে পড়ে নি এতকাল! আশ্চর্য! বিপদে পড়লে মানুষ এমনিই বেহুঁশ বুদ্ধু বনে যায় বটে।

ওঁর কাছেই তো আগে যাওয়া উচিত ছিল।

অত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু উদ্ধত অহঙ্কারী নন আদৌ—সত্যধনবাবুর সঙ্গেও আলাপ আছে একটু। খাতিরও করেন। সুকুমারবাবুর বেয়াই—মেয়ের শ্বশুর—হলেন সত্যধনবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একেবারে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

সেদিনের মতো কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে উঠে পড়লেন সত্যধনবাবু। ব্যাগের মধ্যে টিফিনের বই-ডিবে আজ ভরতিই রইল—আহারে কিছুমাত্র রুচি নেই আর। খাওয়া যে হয় নি, সে কথাটাও মনে পড়ল না।

প্রথমে গেলেন বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতেই। দেখা হ'ল না।

শুনলেন ফিরতে দেরি হবে—ইউনিভার্সিটিতে কী বুঝি জরুরী মিটিং আছে।

গেলেন সেখানে।

সেখানে শোনা গেল যে তিনি অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন। আরও দুটো কি মিটিং সেরে এসিয়াটিক সোসাইটিতে যাবেন।

অগত্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকে আবার সেই দুরারোহ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে হ'ল, আবার বাস ধরতে হ'ল।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে তখন বুঝি কি জরুরী সভা হচ্ছে—সুতরাং বসতে হ'ল তাঁকে। বাঁড়ুয্যে মশাই বেরোলেন রাত নটারও পর।

'কী ব্যাপার? আরে, বেয়াই মশাই যে!'

আন্তরিকতার অভাব হ'ল না। বেশ সৌহার্দ্যের সুরেই কথা বললেন সুকুমারবাবু, হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালেন চামড়া-আঁটা একটা বড় চেয়ারে।

ওঁর নাহক ঘোরাঘুরির সব বৃত্তান্ত শুনে মুখে একটা আন্তরিক সহানুভূতি-সূচক শব্দ ক'রে বললেন, 'ইস! তাইতো, বড় তো ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে আপনাকে! তা কী ব্যাপারটা বলুন তো? এত কী জরুরী দরকার পড়ল!'

ব্যাপারটা বললেন সত্যধনবাবু। আদ্যোপান্ত খুলেই বললেন, আনুপূর্বিক ইতিহাস সহ।

'কীজ্‌ বাব্‌? কীজ বা—ব!...তাই তো! আপনি ঠিক দেখেছেন? কীজ বুফ্‌ নয়? আর্মেনিয়ান একটা কথা আছে K-i-e-t-z B-o-u-f-f—তাই নয় তো?'

'আজ্ঞে তার মানে?'

'তার মানে—আমার ঠিক মনে নেই—যতদূর মনে হচ্ছে এক ধরনের নাচ। বলেন তো গিয়ে আর একবার অভিধান দেখে নেব।'

'আর্মেনিয়ান বললেন তো? আচ্ছা আমিই দেখব'খন। বহু ধন্যবাদ। তবু একটা পথ দেখালেন যা হোক। খুব উপকার হ'ল। নমস্কার!'

শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন সত্যধনবাবু বাড়ির বাস ধরলেন।

উপকার কিছুই হ'ল না বলা বাহুল্য।

বানানও ও নয়। ভাল ক'রেই দেখেছেন সত্যবাবু।

তাছাড়া অর্থের সঙ্গে কোন মিল তো হচ্ছেই না।

নাচ বটে—তবে সে নাচ নাচছেন তিনি। অন্য কোন নাচের সঙ্গে মিলবে না।

সে রাতটা একরকম জেগেই কাটল। স্ত্রীকে কিছু বললেন না, মেয়েছেলের বুদ্ধি অল্প, কল্পনাশক্তি আরও অল্প—সহানুভূতিরও কোন মূল্য নেই। ওরা শুধু চেঁচাতেই জানে। এ কথা বললে কিছু বুঝবে না। হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। তার ওপর গৃহিণী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার কী হয়েছে বল তো, মুখ ভার, সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে আছ, কোন কথার উত্তর দিচ্ছ না? বলি ব্যাপার কী? বুড়োবয়সে চাকরিটা খোয়ালে নাকি?'

তাইতে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। কোন উত্তরই দিলেন না।

একেবারে তাঁর দিকে পিছন ফিরে শুলেন, সমস্ত আলোচনার সম্ভাবনায় ছেদ টেনে দিয়ে।

বিনিদ্র শুয়ে শুয়ে বহু চিন্তার পর আর একটি নাম মনে পড়ল। ডবসন রোডের আদ্যনাথবাবু, পণ্ডিত লোক—ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্য বিদ্যাবিশেষজ্ঞ হিসেবে খুব নাম আছে। এদিকেও সত্যধনবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। শুধু বিদ্বানই নন, বহু দেশ ঘুরেছেন, বিশেষ করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বহুদিন ছিলেন—ওদিককার জবান খুব রপ্ত। যতদূর মনে হচ্ছে শব্দটার চেহারা দেখে ও ধ্বনি শুনে—শব্দটা আরবী ফারসী ঘেঁষাই। নিশ্চয়ই ওঁর কাছে গেলে হদিস মিলবে।

আদ্যনাথবাবুর নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন সত্যবাবু, ঘুমিয়েও পড়লেন শেষের দিকে একটু। কিন্তু সে ঐ একটুই। ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুম ভেঙে গেল এবং কোনমতে তাড়াহুড়ো করে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে প্রথম ট্রামটি পাওয়া মাত্র হাওড়ার গাড়িতে চেপে বসলেন। এমন যে তাঁর প্রিয় প্রভাতী চা, সে কথাও মনে রইল না।

কিন্তু ডবসন রোডও হতাশ করল তাঁকে।

আত্মনাথবাবু শুনেই অবশ্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, 'আরে তুমি দেখছি একেবারে বালক সত্যধন! এর জন্য এত চিন্তা! আর, ঐ সামান্য অক্ষর বাদ পড়েছে—ওটা হবে কীজ কাবাব, লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ও কাবাবটার খুব চল আছে। আমি নিজে খেয়েছি—মানে তখন তো মাংস খেতাম খুব—তোফা খেতে!'

আত্মনাথবাবু এখন গোঁড়া বৈষ্ণব।

প্রথমটা ওঁর উৎসাহের ছোঁয়াচে সত্যধনবাবুও কিছুটা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু এখন যেন মনে হ'ল গায়ে কে জল ঢেলে দিল তাঁর।

তিনি শুষ্ক মুখে বললেন, 'কিন্তু কথাটা যেখানে আছে—সেখানে ঠিক কোন খাবারের নাম খাপ খাবে না। তুমি অন্য কিছু ভাব।'

'অন্য কিছু হতেই পারে না। গিয়ে মিলিয়ে ছাখো গে ভাল ক'রে।' একটু যেন ধমকই দিয়ে উঠলেন আত্মনাথ।

'দেখি।' বলে উঠে পড়লেন সত্যধনবাবু।

'ওকি! আরে এরই মধ্যে চললে কোথায়! বসো বসো—চা-টা খাও অন্ততঃ!'

'না ভাই আত্মনাথ। ও সব কিছু আর ভাল লাগছে না। এর একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত—'

'তোমার ও মীমাংসা হয়েই আছে। তুমি যদি না বোঝ তো কী করব! তোমার মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে চাকরির ভাবনায়!'

শেষের দিকে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে আত্মনাথবাবুর কণ্ঠস্বর।

'না ভাই—ও তুমি বুঝবে না! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বুঝতেও না হয়—এতকাল সসম্মানে চাকরি ক'রে এসে এখন এই শেষ দশায় একটা অপ্রতিভ হওয়া—বিশেষ ঐ চ্যাংড়াগুলোর সামনে—মনে হয় তার চেয়ে জ্যান্ত সীতা দেবীর মতো মাটির মধ্যে সেঁধনো ভাল।...তুমি ভাই রাগ ক'রো না লক্ষ্মীটি—একটু আমাকে সাহায্য করো। কোথায় কার কাছে গেলে এটা জানা যেতে পারে যদি বলো—'

আত্মনাথবাবু এবার বোধহয় কিছু বুঝলেন ব্যাপারটার গুরুত্ব—কিছুক্ষণ

চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'মনে তো হচ্ছে আরবী ফারসী বা ঐ ধরনেরই কিছু হবে শব্দটা—তা তুমি একটা কাজ করো না বাপু, এখানে ওখানে না ঘুরে কলকাতা মাদ্রাসায় বড় মৌলবী সাহেবের কাছে যাও না। একেবারে খুঁটি ধরগে, খড় কুটো ধরতে যেয়ে লাভ কি?'

কথাটা সত্যধনবাবুর মনেও ধরল। সত্যিই তো ধরতে গেলে মূল যে তাকে ধরাই ভাল।

তিনি ওখান থেকেই ঠিকানা জেনে নিয়ে এসে উঠলেন মৌলবী সাহেবের বাসায়।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে বসে দাড়িতে হাত বুলোলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক হয়েছে। আমার যতদূর মনে হচ্ছে কথাটা আরবী—ওটার উচ্চারণ হবে কীজ্ বুব্। বালির ওপর উট চলে গেলে পায়ের ঠিক দাগ না প'ড়ে একটু বড় বড় গর্তের মতো চিহ্ন প'ড়ে থাকে—তাকেই বলে কীজ্ বুব্। মানে ঠিক পায়ের ছাপ নয় অথচ চলে যাওয়ার চিহ্ন—সেই আর কি!'

অগত্যা সেখান থেকেও হতাশ হয়ে উঠতে হল। বলতে বলতেই বোধ করি নিজের পাণ্ডিত্যের কৃতিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন মৌলবীজি।

নিতান্ত বাংলাদেশের এক অজ পাড়াগাঁর ব্যাপার, একঝাড় বাঁশ নিয়ে মামলার সূত্রপাত এর মধ্যে আর যাই হোক উটের পদচিহ্নের কথা আসে না। সে কথাটা আর অনাবশ্যক বোধেই মৌলবী সাহেবকে বললেন না সত্যধন-বাবু, শুষ্ক একটি ধন্যবাদ দিয়ে সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে এলেন।

জীবনটাই এখন মরুময় ঠেকছে তাঁর এই মাত্র! সেখানে একটা কারো পায়ের চিহ্ন, পথের আড়াল পেলে বেঁচে যেতেন!

সেদিন অফিসে পৌঁছলেন অনেক আগেই।

কেন, তা তিনিও জানেন না।

আসলে বাড়িতে থাকলেই অজস্র প্রশ্ন। নানা রকম জবাবদিহি।

'আচ্ছা কী হয়েছে তোমার বলো তো? কী ভাবছ কাল থেকে অত? মুখ অত শুকনো কেন? অফিসের ক্যাশট্যাশ ভাঙো নি তো?'

কিংবা 'তোমার কী হয়েছে বলো তো বাবা? দাঁত ব্যথা করছে? য়্যাসপিরিন খাও না একটা!' ইত্যাদি। মনের বর্তমান অবস্থায় এসব

জবাবদিহির কথা ভাবাও যায় না।

তার চেয়ে অফিসে এসে চুপ ক'রে বসে থাকাও ভাল।

তিনি যখন এসেছেন তখন আর কেউ আসে নি, বুড়ো দপ্তরী তৈফুর মিয়া ছাড়া।

সে একটু সকালেই আসে। চেয়ার টেবিল আলমারি বই—সব ঝেড়ে মুছে সাফ রাখে।

তার সঙ্গে কথা কইবার কোন প্রয়োজনই হয় না।

হয়তো মাসেও একটা কথা বলেন কিনা সত্যধনবাবু সন্দেহ।

তবু আজ তাঁর ঐ রকম নিস্তব্ধ ম্রিয়মাণ হয়ে বসে থাকার ভঙ্গীটা তার কাছেও কেমন লাগল। বার কতক আড়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখে ঝাড়ন-খানা হাতে নিয়ে এগিয়ে এল একটু। তারপর একটু সেলামের ভঙ্গী ক'রে বললে, 'কী-কী-কী হয়েছে গা ম-মল্লিকবাবু। অমন বোদাপারা মুখ ক'রে বসে আছেন কেন? বা-বাড়িতে কোন খা-খারাপ খবর আছে নাকি? নাকি আ-আ আপনার তবিয়তটাই খারাপ?'

দপ্তরী একটু তোতলা, কানেও একটু কম শোনে।

উড়িয়ে দেবারই কথা, 'কিছু নয়' বলে থামিয়ে দেওয়াই হয়তো উচিত ছিল কিন্তু কী যে মনে হ'ল সত্যধনবাবুর, বুঝি তখন তাঁর মনের যা অবস্থা কাউকে কথাটা খুলে না বলে তিনি আর থাকতে পারছেন না—তাই ব্যাপারটা আস্তে আস্তে ওকে খুলেই বললেন।

তৈফুর একটা হাত কোদালের মতো ক'রে ডান কানে লাগিয়ে মন দিয়েই শুনছিল, তবু সন্দেহ নিরসনের জন্য প্রশ্ন করল, 'কী-কী-কী বললেন? ক-কথাটা যেন কী? কী-কী-কী জবাব?'

অকস্মাৎ যেন সত্যধনবাবুর মনে হ'ল একসঙ্গে এক হাজারটা কোন কাঁসার বাসন পাথরে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে 'ঝন' ক'রে উঠল। যেন মনে হ'ল জমাট বাঁধা নিবিড় অন্ধকারের হিমালয় বিদীর্ণ হয়ে আলোর ঝরনা নেমে এল চোখের সামনে।

তিনি যেন ছিলাছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠলেন। একটা কী অব্যক্ত শব্দও বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

'কী-কী-কী হ'ল গো ম-ম-মল্লিক বাবু? ক্ষে-ক্ষেপে উঠলেন নাকি?'

তৈফুর মিয়া বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

কিন্তু তখন তাকে উত্তর দেবার সময় নেই। পড়ি কি মরি ক'রে ছুটেছেন সত্যধনবাবু বেঞ্চ ক্লার্কের কাছে।

বেঞ্চ ক্লার্ক বিহারীবাবু তখন সবে এসেছেন অফিসে। ধীরেসুস্থে বসে পকেট থেকে একটা খড়কে কাঠি বার ক'রে দাঁতের খাঁজ থেকে পানের কুঁচি বার করছেন। হঠাৎ সত্যবাবুকে অমন পাগলের মতো ঢুকতে দেখে তিনি একটু যেন ভয় পেয়ে গেলেন, 'আরে, কী হ'ল—ব্যাপার কি সত্যধনবাবু, কোন খারাপ খবর—?'

'উঁহুঁ উঁহুঁ। কিছু নয়। আচ্ছা বিহারীবাবু, সান্যাল হুজুর যে ডিপোজিশ্যানটি কাল দেখাচ্ছিলেন সেটা আছে আপনার কাছে? দেখি একবার।'

'আছে বইকি!' বিহারীবাবু কাগজের সমুদ্র থেকে সেটা খুঁজে বার ক'রে দিয়ে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'বলছি। বলছি!'

কম্পিত হাতে পাতা উলটে দাগ দেওয়া জায়গাটা বার করলেন সত্যধনবাবু।

'আঃ! জয় জগদীশ্বর! জয় বাবা তারকনাথ! এ রবিবার গিয়ে নির্ঘাত ষোল আনার পুজো দেবো বাবা! খুব মানটা রক্ষা ক'রে দিয়েছ!'

কথাটা তখনও ভাঙলেন না কারুর কাছে সত্যধনবাবু।

আদালতের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনমতে অপেক্ষা করলেন। তারপর দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে গিয়ে ঢুকলেন সান্যাল হুজুরের এজলাসে।

'আসতে পারি মি লর্ড?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কী খবর মিঃ ট্র্যানশ্লেটর? সেটা কি পেয়ে গেছেন—সেই মানেটা?'

'হ্যাঁ মি লর্ড, সেই কথাটাই বলতে এসেছি।'

'কী বলুন তো? কই, সে জায়গাটা গেল কোথায়?'

বিহারীবাবু তাড়াতাড়ি জায়গাটা খুলে দাগ দেওয়া অংশটা দেখিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ বলুন।' হুজুর বললেন।

'ওটা মি লর্ড আসলে "কী জবাব?" বাংলায় যিনি লিখেছিলেন তিনি লেখবার সময় 'কী'র পর ফাঁক না দিয়ে তাড়াতাড়িতে 'জ'র পর ফাঁক দিয়ে ফেলেছিলেন। যিনি অনুবাদ করেছেন তিনি সেটা না বুঝেই, অন্য কোন ফরেন শব্দ মনে ক'রে রোম্যান হরফেও ঐ উচ্চারণটা মেনটেন ক'রে গেছেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তো এই আসছে মি লর্ড।'

'দেখি দেখি। কী জবাব? তা মন্দ বলেন নি তো। বরং এইটেই ঠিক য়্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—তাই হবে।'

'ধন্যবাদ, বহু ধন্যবাদ মিঃ ট্র্যানশ্লেটার। ঠিকই ধরেছেন আপনি। আশ্চর্য, কথাটা আমাদের কারুর মনেই পড়ল না। স্ট্রেঞ্জ। মিছিমিছি আপনাকে ব্যস্ত করলাম। আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

সগর্বে ও সতৃপ্তনেত্রে চারিদিকে তাকালেন একবার সত্যধনবাবু। কালকের সেই বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিরই যেন প্রতিশোধ এটা।

দেখলেন, উপস্থিত বাদী-প্রতিবাদী-য়্যাটর্নী-কৌঁসুলী—সকলের চোখেই অনুমোদন এবং—বাঙালীর পক্ষে যতটা সম্ভব—একটু প্রশংসাও। একজন মুখ ফুটেই বললেন, ব্যারিস্টার ধনঞ্জয় চৌধুরী, 'ঠিকই বলেছেন আপনি, করেক্ট্! এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।'

এইতেই কৃতার্থ হয়ে গেলেন সত্যধনবাবু।

হুজুরকে বিশেষ ক'রে এবং বাকী সকলকে সাধারণভাবে একটি নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এলেন এজলাস থেকে।

বাইরের বারান্দায় পড়ে হঠাৎ সত্যধনবাবুর মনে হ'ল দিনটি আজ বড় চমৎকার। ওধারে নিউ সেক্রেটারিয়েটের চূড়ায় একটা মেঘভাঙা রঙিন রোদ পড়ে বড় চমৎকার দেখাচ্ছে, শুধু বাড়িটা নয়, চারিদিকের আকাশটাও। চাঁদপাল ঘাটে বুঝি কোন বড় জাহাজ থেকে 'ভোঁ' দিল একটা। দূরে স্ট্র্যাণ্ড রোডে বাস ট্রাম যাবার শব্দ—সবটা জড়িয়ে অদ্ভুত সুন্দর লাগল ওঁর।

আজ যেন অনেকদিন পরে মনে হ'ল পৃথিবীটা মোটের ওপর মন্দ নয়।

বেঁচে থাকাটাই একটা পরম উপভোগ্য বস্তু।

তাঁর গৃহিণী পুত্র কন্যা, আত্মীয়স্বজন—বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এমন কি তাঁর সঙ্গে ঐ যে চ্যাংড়াগুলো কাজ করে তারাও মোটামুটি মানুষগুলো সব ভালই। মায় ঐ দপ্তরী তৈফুর মিয়াও। উঁহু, তৈফুর মিয়া এদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। তৈফুর মিয়া তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্ধব। পরমাত্মীয়।

দপ্তরী তৈফুর মিয়া যে এত ভাল লোক তা এর আগে কোন দিন কল্পনাও করেন নি। ওর ঐ দন্তহীন ঈষৎ ঘাড় বাঁকা চেহারাটাও আজ ওঁর কাছে সুন্দর ঠেকল।...

'বলি ও তৈফুর, ও তৈফুর আলি।'

অফিসে ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে প্রথমেই দপ্তরীকে হাঁক দিলেন, 'সত্যধনবাবু?'

'কী-কী-কী গা ম-মল্লিক বাবু?'

'এই নাও, শোন।'

পকেট থেকে দু-টাকার নোট একটা বার ক'রেই রেখেছিলেন, তৈফুর কাছে আসতে হাতে গুঁজে দিলেন।

'কী-কী-কা হবে এ টা-টা-টাকা ম-মল্লিক বাবু?'

তৈফুর অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। সকাল থেকেই মল্লিকবাবুর ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না ওর। মাথা খারাপ হতে আরও দু-এক জনকে দেখেছে সে। গোড়ার দিকে নাকি এই রকমই হয়।

'মি-মিষ্টি!' ওকে ঈষৎ ভেঙিয়ে হাসি মুখে বলেন সত্যবাবু।

'মি-মি-মিষ্টি! ব-লি কে-কে-কে খাবে গা?'

'তু-তুমি!'

আদর ক'রে ওর কাঁধটা ধরে নেড়ে দেন একটু। তারপর একটু ঠেলেই ফেরত পাঠিয়ে দেন ওর কাজে।

মিলনান্ত

ফুলমাসিমারা যখন প্রথম আমাদের বাড়ির নিচেকার ঘরে ভাড়া আসেন তখন বেশিদিন যে তাঁহাদের রাখিতে পারিব, এ আশা আমাদের কাহারও ছিল না। সে অনেকদিনের কথা, এখন হইতে অন্তত দশ বৎসর আগে—কিন্তু একটু একটু করিয়া তাঁহারা রহিয়াই গেলেন, এবং এই দীর্ঘ দশ বৎসর পরে সম্পর্কটা আজ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা চলিয়া যাইবেন এ সম্ভাবনাই কাহারও মনে আসে না। এমন কি, যে চেঁচামেচি কান্নাকাটি প্রভৃতির জন্য প্রতিবেশীরা আমাদের উপর নোটিশ জারি করিয়াছিলেন যে আমরা যদি সাত দিনের মধ্যে অমন লক্ষ্মীছাড়া ভাড়াটেকে তাড়াইয়া না দিই তাহা হইলে তাঁহারা আদালতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন, তাঁহারাই সেই বস্তুটির অভাবে কাল আমাদের কাছে খোঁজ লইতেছিলেন. 'হ্যাঁ হে, বাড়ি তোমাদের নিস্তব্ধ কেন? ফুলদি (কাহারও বা ফুলপিসিমা) কি চলে গেলেন নাকি?' কিম্বা 'ফুল বৌদির কি অসুখ করেছে নাকি হে? সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না যে?'

ইতিহাসটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি।

ঘরখানা আমাদের অন্দর মহলের মধ্যেই, কিন্তু জ্যাঠামশাই বুদ্ধি করিয়া বাগানের দিকে তাহার একটা জানালার পরিবর্তে দরজা বসাইয়া সামনে একফালি রক বাহির করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। ঘরটা পড়িয়াই থাকিত, সুতরাং এই সামান্য খরচার বদলে ন'টা টাকা আয় বাড়িয়া যাইতে আমরা সকলেই খুশী হইলাম। ভাড়াটের সঙ্গে বন্দোবস্ত রহিল, তাঁহারা তোলা উনুন বাহিরে ধরাইয়া ভিতরেই রান্না করিবেন এবং বাগানের দিকের দরজাটা ব্যবহার করিবেন।

প্রথম যিনি ভাড়াটে আসিলেন তিনি এখানকারই পোস্টমাস্টার, মাস-কয়েক থাকিবার পরই কোয়ার্টার পাইয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার নাকি এখানে অসুবিধা হইতেছিল। তার পরই আসিলেন ভবেশবাবু বা ফুলমাসিমারা। ভবেশবাবু কী একটা বড় অফিসে কাজ করেন, বেশ

লেখাপড়া জানা অমায়িক ভদ্রলোক। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে খুব দ্রুত আলাপ জমিয়া উঠিল, শ্বশুরবাড়ির সূত্রে কী একটা কুটুম্বিতাও বাহির হইয়া পড়িল বুঝি—ফলে তখনই একেবারে এক মাসের ভাড়া অগ্রিম লইয়া তিনি রসিদ লিখিয়া দিলেন।

সেইদিনই অপরাহ্নে তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন। স্বামী আর স্ত্রী, মাত্র দুইটি লোক। পোস্টমাস্টারের মতো একপাল ছেলে-মেয়ে যে আসিল না ইহাতেই আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম, যাক্ বাবা, বাঁচা গেল।

কিন্তু হায় রে! সে আশা যে আমাদের কত মিথ্যা তাহা বোঝা গেল তাঁহারা আসিবার দ্বিতীয় দিনেই। প্রথম দিনটা বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরেই ভবেশবাবু সংযত হইয়া ছিলেন, কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যার পর তিনি অফিস হইতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে কী চেঁচামেচি, গণ্ডগোল, কান্নাকাটি! তখন ছোট ছিলাম সব ব্যাপারটা বুঝি নাই—শুধু শুনিলাম ভবেশবাবু মাতাল হইয়া আসিয়া স্ত্রীকে মারধোর করিতেছেন। পরে জানিয়াছিলাম যে ইহার আগে এইসব কারণেই কোন বাড়িতে পাঁচ-ছয় মাসের বেশি টিঁকিতে পারেন নাই।

সে যাহা হউক—ভবেশবাবুর মাতলামির বেশ একটা বিশেষত্ব ছিল। যেদিন পেটে একটু বেশী মদ পড়িত সেদিন বাড়ি ঢুকিতেন তিনি কাঁদো কাঁদো হইয়া। আসিয়াই বাজারের পুঁটুলিটা নামাইয়া 'মেজবউ' বলিয়া একটা হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রকের উপরই বসিয়া পড়িতেন। বলা বাহুল্য ফুলমাসিমার এ সমস্ত লক্ষণই জানা ছিল—তিনি সে আর্ত আহ্বানে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া গম্ভীরভাবে বাজারের পুঁটুলিটা লইয়া ঘরে চলিয়া যাইতেন এবং যথারীতি নিজের কাজে মন দিতেন। কিন্তু ভবেশ মেসো ছাড়িবার লোক নন। তিনি তারও পরে 'মেজবৌ—ওফ্!' বলিয়া গোটা দুই-তিন আর্তনাদ করিতেন, তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া মাসিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিতেন। প্রথম বেগটা না কাটা পর্যন্ত শুধুই চলিত কান্না, সে ঝোঁকটা কাটিলে কথা ফুটিত। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিতেন, 'মেজবৌ, আমার হাতে পড়ে কী কষ্টই পেলে, একটা

দিনের জন্যও তোমাকে সুখী করতে পারলুম না। ওফ্!' কিম্বা 'মেজবৌ, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি আমাকে বিষ এনে দাও—খেয়ে তোমাকে অব্যাহতি দিয়ে যাই। আর কত সহ্য করবে!' ইত্যাদি—

ইহার উত্তরে যদি-বা ফুলমাসিমা বলিতেন যে, না তিনি সুখেই আছেন, তাঁহার কোন অশান্তি নাই তাহা হইলেও অব্যাহতি ছিল না—ভবেশ মেসো প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেনই যে তিনি ফুলমাসিমার অযোগ্য স্বামী। তিনি ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেন, 'মেজবৌ, তুমি আমাকে স্তোক দিও না— মেজবৌ, তুমি আমার মুখ চেয়ে মিথ্যে কথা বলছ—মাইরি বলছি বিশ্বাস করো আমি পিশাচ, আমি চামার, আমি জানোয়ারের অধম' ইত্যাদি।

এ সব ক্ষেত্রে বিরক্ত হইয়া ফুলমাসিমা হয়ত মানিয়া লইতেন যে মেসোমশায়ের কথাই ঠিক, তিনি পিশাচ, তিনি জানোয়ার—তিনি নিজে যাহা বলিতেছেন, তাহাই—তখন আবার চলিত অন্য আক্রমণ।

'মেজবৌ, তাই ব'লে মার্জনা কি নেই? তোমার পায়ে পড়ি এবারকার মতো মাপ করো—আমি পশু, তুমি তো দেবী—এইবারটি মাপ করো—'

'মাপ করিয়াছি' বলিলেও নিস্তার নাই। 'মেজবৌ, সত্যি বলছ মাপ করেছ? মাইরি?…না, তোমার মনে রাগ হয়েছে। ওঃ, কী করব রে? গলায় দড়ি দেব? আপিং খাব? মেজবৌ, কী হ'লে তুমি খুশী হও বলো, আমি তাই করছি।'

এ সব কথা শুনিতে ফুলমাসিমার ভাল লাগিত কিনা আমাদের ঠিক জানা নাই, তবে ফুলমাসিমা প্রত্যহই খানিকটা করিয়া এই প্রলাপ সহ্য করিতেন; তাহার পর ছাড়িতেন তাঁহার অব্যর্থ অস্ত্র। জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া মাথায় এক বালতি জল ঢালিয়া দিতেন—ব্যাস্, যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িত। আর সে মানুষই নন। নিজেই মাথা মুছিয়া ঘরে আসিবেন, সহজ ভাবে কথা কহিবেন—শেষ পর্যন্ত হয়ত বা আমাদের ডাকিয়া গল্পই শুরু করিবেন।

কিন্তু বিপদ ছিল যেদিন পয়সা কম থাকিত বা কোন কারণে বেশী মদ-

খাওয়ার ইচ্ছা হইত না, সেই দিনই। বাড়ি ফিরিতেন একেবারে রুদ্রমূর্তিতে। জিনিস-পত্র ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া, ফুলমাসিমাকে গালাগালি দিয়া বাড়ি যেন মাথায় করিতেন। তাহার পর ফুলমাসিমা কোন জবাব দিন বা না দিন, কোন একটা ছুতা ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া প্রাণপণে ঠেঙাইতেন ; প্রথম প্রথম দুই-একদিন আমাদের বাড়ির মেয়েরা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন (কারণ সে সময়ে আমাদের বাড়ির পুরুষরা প্রায় কেহই বাড়ি থাকিতেন না) কিন্তু ভবেশবাবুর রুদ্রমূর্তি দেখিয়া আর কেহ কাছে যাইতে সাহস পান নাই। ইদানীং আবার তাঁহাকে ঐ ভাবে ফিরিতে দেখিলেই ফুলমাসিমা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতেন।

তবে ভরসার কথা এই যে, ফুলমাসিমাকে খানিকটা মারিবার পর আপনা-আপনিই তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিত। নিজেই কলতলায় গিয়া মাথায় জল দিয়া আসিতেন, ফুলমাসিমার পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিয়া লইতেন, তাহার পর বাহিরে গিয়া ব্র্যাণ্ডি কিংবা কেরোসিন তেল সংগ্রহ করিয়া একটা মালসাতে গুলের আগুন জ্বালিয়া মাসিমার কালসিটা-পড়া জায়গাগুলিতে মালিশ ও সেক করিতে বসিতেন। তারপর সারারাত ধরিয়া চলিত মাসিমার সেবা ও তোয়াজ। সে মানুষই নয় আর। এমন কি প্রহারের মাত্রাটা যেদিন একটু বেশি হইয়া পড়িত সেদিন হোটেলে গিয়া মাসিমার জন্য চপ-কাটলেটও কিনিয়া আনিতেন।

অবশ্য এ তো গেল ভিতরের কথা—কিন্তু পাড়ার লোকে এ সব ইতিহাসের ধার ধারিতেন না, তাঁহারা শুনিতেন শুধু ঐ চেঁচামেচি কান্নাকাটি। ফলে তাঁহারা অত্যন্ত গোলমাল শুরু করিলেন, একদিন তিন-চারজনে মিলিয়া আমাদের জানাইয়াই গেলেন যে সাতদিনের মধ্যে এই লক্ষ্মীছাড়া মাতাল ভাড়াটে উঠাইয়া না দিলে তাঁহারা আদালতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন। বাড়ির লোকরাও যে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয় কিন্তু বিপদ বাধিয়াছিল ফুলমাসিমাকে লইয়া, তিনি দুই-তিনদিনের মধ্যেই এমন ভাবে সকলের অন্তরঙ্গ ও প্রিয় হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার কল্পনাও হইয়া উঠিল কষ্টকর। মা তো নিজের বোনের মতোই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, জ্যাঠামশাই তাঁহাদের উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব

করিলেই তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। আর শেষ পর্যন্ত পাড়ার লোককে ফুলমাসিমাই ঠাণ্ডা করিলেন। নিজে যাচিয়া বাড়ির মধ্যে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পুরুষরাও কেহ তাঁহার ভাই, কেহ বোন-পো, কেহ বা বাবা হইয়া উঠিলেন, সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদের তাড়াইবার কথাটা আপনিই চাপা পড়িয়া গেল।

ফুলমাসিমার কথাবার্তায় সবচেয়ে যেটা বিস্ময়কর ছিল সেটা স্বামী সম্বন্ধে তাঁহার সহজ মনোভাব। ভবেশবাবুর ব্যবহারে তাঁহার যে কোন লজ্জা পাইবার কারণ আছে, অন্য মেয়েরা কেহ যে এ ব্যাপারে তাঁহাকে করুণা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারে—এ কথাটা একবারও তাঁহার মাথায় যাইত না। বরং কেহ সেই ধরনের কথা তুলিলে তিনি যেন একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাহার দিকে তাকাইতেন। অপরপক্ষ তাহাতেও নিরস্ত না হইলে তিনি নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন।

একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। দুপুরবেলা মেয়েদের আড্ডা বসিয়াছে, ছেলেমানুষ বলিয়া আমরাও সেই ঘরে আছি, কেহ নিষেধ করে নাই। তাহার আগের দিন রাত্রে ভবেশ মেসো একটু বেশি বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহার ফলে আজ সকালে আর ফুলমাসিমা উঠিতে পারেন নাই, অনুতপ্ত মেসোমশাই নিজেই রান্না করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া গিয়াছেন—সেই কথাটাই মাসিমা সগর্বে গল্প করিতেছিলেন। আমার মা শুনিতে শুনিতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, 'তুই থাম ফুল। ও কথা আর বাহাদুরি ক'রে গল্প করিস নি। তুই বলে তাই ঐ জানোয়ারটার ঘর করিস, আমি হ'লে অমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করার আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।'

মা সাধারণত এ ধরনের কথা কখনও ফুলমাসিমাকে বলিতেন না—সেদিন বোধ হয় অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই আর নিজেকে সামলাইতে পারেন নাই, কিন্তু মাসিমা এই রূঢ়তায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ বিবর্ণ মুখে বসিয়া থাকিবার পর বার-দুই ঢোঁক গিলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ভালবাসে বলে তাই, আপনার বলে তাই, নইলে কে কাকে মারে দিদি!'

তাহার পর আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নিচে চলিয়া গেলেন।

মা তো কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলেনই—ঘরসুদ্ধ সকলেই আড়ষ্ট হইয়া উঠিলেন। আমরা সকলেই ভাবিলাম যে ফুলমাসিমা বোধ হয় কিছুদিন আর আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেন না। কিন্তু দেখিলাম যে স্বামীর অপরাধ সহজে ক্ষমা করার অভ্যাস থাকায় সমস্ত অপরাধই তিনি ক্ষমা করিতে শিখিয়াছেন। একটু পরেই কী একটা ছুতায় তিনি উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবেই কথাবার্তা শুরু করিয়া দিলেন। আমরা সকলেই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম; যদিও সেইদিন হইতে মা বা আমাদের বাড়ির অন্য কেহ ভবেশ মেসো সম্বন্ধে আর কোন কটূক্তি তাঁহার কাছে করেন নাই। যে মানুষ কাহাকেও কখনও আঘাত ফিরাইয়া দেয় না, তাহার নিঃশব্দ বেদনার কারণ হইয়া লাভ কি?

এ হেন ফুলমাসিমার সংসার কয়দিন হইতে নিস্তব্ধ হইয়া আছে। বিস্ময়ের কথা বৈকি! ব্যাপারটার কারণ সম্বন্ধে অতি সন্তর্পণে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানা গেল তাহা আরও বিস্ময়কর। ভবেশ মেসো মাতাল হইয়া যাহাই করুন না কেন, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি ফুলমাসিমাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে আমরা কখনও তাঁহাকে মাসিমার কথায় প্রতিবাদ করিতে তো শুনিই নাই—কখনও তাঁহাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে এমনও শুনি নাই—হঠাৎ সেদিন কি একটা ব্যাপারে, বোধ হয় বাজার যাওয়া লইয়াই, দুজনের একটু মনান্তর হইয়াছিল এবং মেসোমশাই একটু চড়া গলায় কী জবাব দিয়াছিলেন। তাহার ফলে মাসিমা মুখ অন্ধকার করিয়া ছিলেন এবং বাজার হইতে ফিরিবার পরে কথা কহেন নাই, এমন কি আহারের সময়েও প্রশ্ন করেন নাই আর কিছু চাই কি না। ফলে ভবেশবাবু যখন অফিসে যান তখন খুবই মুহ্যমান অবস্থাতে বাহির হইয়াছিলেন।

এদিকে ফুলমাসিমার আশা ছিল যে, সেদিন ভবেশবাবু একটা ভাল রকমের কিছু উপহার লইয়া বাড়ি ঢুকিবেন এবং সন্ধির প্রস্তাব স্বরূপ মদ না খাইয়া ফিরিবেন। কিন্তু ভবেশবাবু সে সব কিছুই করেন নাই, অফিসের বেয়ারা দিয়া খবর পাঠাইয়াছেন যে তিনি দিন তিনেকের ছুটি লইয়া তাঁহার

দাদার কাছে আসানসোল চলিয়া যাইতেছেন—ফুলমাসিমা যেন না ভাবেন।

কথাটা সামান্য, কিন্তু সংবাদটা শুনিবার পর ফুলমাসিমার মুখের যে অবস্থা হইল তাহা অবর্ণনীয়। তিনি দুঃখিত হইয়াছেন, কিম্বা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, ইহা বিরহ কিম্বা ক্ষোভ কিছুই বোঝা গেল না, শুধু অপরিসীম একটা বেদনার ছবি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রি তো তিনি রান্না করিলেনই না, মায়ের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে আমাদের এইখানেই সামান্য কিছু মুখে দিলেন মাত্র—পরের দিনও তাঁহার সে দিকে কোন চেষ্টা দেখা গেল না। মা অবশ্য নিজেই তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুই আর এ কদিন রাঁধিস নি ফুল, ভবেশ যতদিন না আসে আমার এখানেই খাস।' ফুলমাসিমা তখন একবার বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাইলেন, কোন জবাব দিলেন না, প্রতিবাদও করিলেন না। কিন্তু সেদিন আহারে বসিয়া কিছুই খাইলেন না, খানিকটা নাড়াচাড়া করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বলা বাহুল্য এতটা বাড়াবাড়ি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত খারাপ লাগিল। ফুলমাসিমা কচি খুকী নহেন, ভবেশ মেসোরও চল্লিশ পার হইয়াছে। তা ছাড়া তাঁহারা নাকি একুশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছেন, এ অবস্থায় স্বামী যদি দুইদিনের জন্য বাহিরে গিয়াই থাকেন তো হা-হুতাশ করিবার কি আছে! মা কিন্তু—মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবারই চেষ্টা করিলেন—কাকিমা বৌদির দল আড়ালে হাসাহাসি করিতে লাগিলেন প্রচুর।

কিন্তু বিরক্তিটা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল ফুলমাসিমার রকম দেখিয়া। মেয়েলি ভাষায় 'আদিখ্যেতা'র একটা সীমা থাকা দরকার। অন্য দিন বারোটা বাজিলেই নিজের কাজ সারিয়া ফুলমাসিমা উপরে আসিয়া মেয়ে-মজলিসে যোগ দিতেন, বেলা চারিটার আগে আর নিচে নামিতেন না—ঘুম পাইলে উপরেই কোথাও পড়িয়া গড়াইতেন। অথচ আজ, উপরেই খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, কোনমতে থালার কাছ হইতে উঠিয়া একেবারে নিচে নামিয়া গেলেন এবং সারাদিন আর ঘর হইতে বাহির হইলেন না। একেবারে সন্ধ্যার পর মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় কাচিয়া যখন উপরে চা খাইতে আসিলেন তখনও মুখ তেমনি থমথমে, তেমনি উদাস। চা খাওয়া হইয়া

গেলে খালি পেয়ালাটা হাতে নাড়াচাড়া করিতে করিতে অস্বাভাবিক রকম মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, 'দিদি একটা কথা বলব ?'

মা একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, 'অত ভণিতা ক'রে আবার কি বলবি ?'

'আজ আর আমার আটা মেখো না দিদি, আমার একদম খিদে নেই। আমার—আমার শরীরটা বড় খারাপ করছে।'

ইহার পর আর মায়ের ধৈর্য রাখা সম্ভব হইল না। এতদিনে ঘনিষ্ঠতাটা প্রায় আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া মা আর ইদানীং কথা বিশেষ হিসাব করিয়া বলিতেন না। আজও মুখে লাগাম রাখিলেন না। একেই অপ্রিয় সত্যভাষণের জন্য পাড়ার মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছিল, তাহার উপর দুইদিন ধরিয়া মনের মধ্যে রোষ ধূমায়িত হইয়া আজ সকল ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করিল। তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া যখন থামিলেন তখনও কিন্তু ফুলমাসিমা একটি প্রতিবাদের কথা উচ্চারণ করিলেন না, বা উঠিয়াও গেলেন না, শুধু তাঁহার দুই চোখ প্লাবিয়া গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মা সেই জল দেখিয়াই হউক বা নিজের রূঢ়তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই হউক—হঠাৎ অত্যন্ত কোমল হইয়া পড়িলেন, কাছে বসিয়া মাসিমাকে একেবারে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'কেন অমন কচ্ছিস বল্ দেখি ফুল ? সত্যি কথা বলবি।'

এবার ফুলমাসিমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। মায়ের গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ রাখিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিজেই একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, 'যা ভাবছ দিদি তা নয়। এ আমার কপাল পোড়ার কথা যে! আমার আর কি কিছু ভাল লাগছে ?'

'সে কি রে ? কী বলছিস্ পাগলের মতো!'

'ঠিকই বলছি দিদি—'আর একবার কান্নার জোয়ার আসিল—'এতদিন বিয়ে হয়েছে দিদি, মারুক আর ধরুক, যাই করুক—আমি সত্যি রাগ করেছি বুঝতে পারলে ও দু চোখে অন্ধকার দেখত—পাগলের মতো চেষ্টা করত যাতে আমার রাগ ভাঙে, যাতে আমার মুখে একটু হাসি ফোটে—। যতক্ষণ না আমি আবার হেসে কথা কইতুম, ততক্ষণ যেন জ্ঞান থাকত না। এই

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দিদি, যত মাতালই হোক না কেন, আমি বিরক্ত হচ্ছি বুঝতে পারলে ওর নেশা পর্যন্ত ছুটে যেত। আর সেই লোক কিনা, আমি মুখ ভার করে আছি দেখেও স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে গেল, কেন রাগ করলুম একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না, উল্‌টে একটা চাকর দিয়ে চিরকুট পাঠিয়ে সটান বিদেশ চলে গেল। কী বলছ দিদি, আমার বুকের মধ্যে যে কী আগুন জ্বলছে তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। অত সাহস ওর আসে কোথা থেকে, অন্যদিকে যদি টান না থাকবে?'

শেষের কথাগুলি আবার কান্নায় জড়াইয়া গেল। মা যে কী কষ্টে গম্ভীর হইয়া রহিলেন তা তিনিই জানেন। কোনমতে কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা টানিয়া আনিয়া কহিলেন, 'এই কথা! পাগলী কোথাকার, আমি বলি না জানি কি! এ যে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছিস ফুল! শোন্, মুখ তোল্, আমার দিকে চা—ওরে, আমার ঢের বয়স হয়েছে, অনেকদিন ধরে এই এত বড় সংসার চালাচ্ছি, লোকও দেখলুম ঢের—আমি বলছি তোর কপাল অত সহজে পুড়বে না, ভবেশ সে রকম লোক নয়। তোর ওপরে ওর যা ভালবাসা, সে কি এতই ঠুনকো ভাবিস?···আ আমার কপাল, এতদিনেও স্বামীকে বিশ্বাস করতে শিখলি না।'

ফুলমাসিমার ললাটের মেঘ কাটিয়া যেন নিমেষে এক ঝলক আলো ফুটিয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে মুখ তুলিয়া কহিলেন, 'তুমি সত্যি কথা বলছ দিদি, আমার ভয় নেই? না, আমাকে স্তোক দিচ্ছ?'

'না রে, সত্যি বলছি।'

'তবে ও অমন করলে কেন?'

'সে যখন তোদের ঝগড়া মিটে যাবে তখন তাকেই জিজ্ঞেসা করিস।'

আবারও ফুলমাসিমার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। বলিলেন, 'তা ঝগড়াই বা করলে কেন দিদি, এতদিনের মধ্যে তো কখনও আমাদের মনান্তর হয় নি!'

মা কোনমতে ঠোঁট কামড়াইয়া মুখভাব শান্ত রাখিলেন। বলিলেন, 'ওকে কি মনান্তর বলে রে পাগলী? ও হ'ল ঠোকাঠুকি লাগা। নে, নে, ওঠ্, —ময়দাটায় জল দে দিকি; কাজ কর্।'

ফুলমাসিমা উঠিলেন বটে, সেদিন আহারও করিলেন স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু তাঁহার মনের দ্বিধা বা সংশয় যে একেবারে কাটে নাই, তা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। কথার ফাঁকে ফাঁকে অকারণ দীর্ঘশ্বাস তাঁহার পড়িতেই রহিল।

হঠাৎ সে মেঘ কাটিল আরও দুইদিন পরে। একটা ঘোড়ার গাড়ির শব্দে ঘুম ভাঙিয়া দেখি ভবেশবাবুর সহিত একটি প্রায়-প্রৌঢ়া মহিলা নামিতেছেন, সঙ্গে গুটি-দুই ছেলেমেয়ে। আরও ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে চিনিতেও পারিলাম, ইনি ভবেশবাবুর বৌদি—আসানসোলে থাকেন, এতকালের মধ্যে বছর-পাঁচেক আগে একবার মাত্র আসিয়াছিলেন দিন-কয়েকের জন্য।

ভদ্রমহিলা গাড়ি হইতে নামিয়া একেবারে ফুলমাসিমাকে বুকে জড়াইয়া রহিলেন। সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, 'বুড়ো বয়স পর্যন্ত বুঝি তোদের পাগলামি ঘোচে না। কী বলেছিলি ওকে ?'

কণ্ঠস্বর অতি কষ্টে ফোটে। অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে মাসিমা বলেন, 'কি বলেছি ?'

'তা জানি নে বাপু। গিয়ে বলে, লাইফ-ইন্সিওরের টাকা কটা তোমাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তোমরাই ওকে দেখো, এই আমার ব্যাঙ্কের বই, এই সব কাগজপত্র—আমি আর এসব কিছু জানি না, আমি আত্মহত্যা করব—'

ফুলমাসিমা জায়ের আলিঙ্গনের মধ্যেই শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বৌদি কহিলেন, 'হ্যাঁ, শোন্ না। সে কিছুতে থামাতে পারি না, বলে, আর আমি কিছুতেই এ জীবন রাখব না, আমি মরবই। যত বলি, ব্যাপার কি, সব খুলে বলো, তত ঐ এক কথা, ওকে তোমরা দেখো, আর তো কেউ নেই, মোদ্দা আমি মরবই।···অনেক মাথার দিব্যি দেবার পর শুনি যে, তুই নাকি শুধু শুধু ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস, আবার ওর ওপরই রাগ ক'রে মুখ ভার করে আছিস—এমন কি ভাত দিয়ে একবার খোঁজ পর্যন্ত করিস নি যে, আর কিছু ওর চাই কিনা—এই বাবুর একেবারে মাথায় আগুন জ্বলে গেছে,—এ ছার প্রাণ আর রাখব না!

ঠাণ্ডা করতে কি পারি—কোন কথা শুনতে চায় না।···যত সব পাগলের কাণ্ড তো, কী করে বসবে তা কি জানি, তাই আবার নিজেকে আসতে হ'ল। নাও ভাই, তোমার জিনিস বুঝে নাও, আমার সেখানে ঘর-কন্না সব আতান্তরে ফেলে এসেছি।'

এতক্ষণে মেঘ সত্য-সত্যই কাটিল। কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম কোপ টানিয়া আনিয়া স্বামীর দিকে কটাক্ষ হানিয়া হাসি হাসি মুখে ফুলমাসিমা কহিলেন, 'আহা, ন্যাকামি!'

বিচিত্র প্রতিযোগিতা

চৈতন্য চাকলাদারের গলিটা চওড়াতে মাত্র ষোল ফুট হলেও মর্যাদাতে কোন আশি ফুট রাস্তার চেয়ে কম নয়। এ গলিতে অনেক ভাল ভাল লোক থাকেন: একজন ম্যাজিস্ট্রেট, দু'জন উকীল, জনতিনেক বড় সরকারী চাকুরে, আর তার চেয়েও যা গর্ব করার মতো—একজন নামকরা কমিক-অভিনেতা এবং কোন ফার্স্ট ডিভিশন টিমের এক বিখ্যাত গোল-কীপার! সুতরাং অনেক বড় বড় রোড বা স্ট্রীটও যে এই ক্ষুদ্র লেনটিকে ঈর্ষার চোখে দেখবে, এ আর আশ্চর্য কি!

গলি অবশ্য লম্বাতেও খুব বেশি নয়—হয়ত একশো গজ হবে বড় জোর—তবু এ রাস্তার মর্যাদামাফিক গলির দুই মুড়োয় দুটি বড় ক্লাবও ছিল। একটি হল 'জয়শ্রী স্পোর্টিং' আর একটি 'পাড়াশ্রী ইউনাইটেড'।

এক গলিতে যখন দুটি ক্লাব তখন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে এটাও স্বাভাবিক। বাজে লোকেরা বলে, 'আড়াআড়ি' বা 'রেষারেষি', কিন্তু ওরা—মানে উক্ত দুই ক্লাবের মেম্বাররা এ দুটি শব্দ শুনলেই চটে যায়। ওরা বলে, 'স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বা 'হেলদি কম্পিটিশান' না থাকলে আর জীবন কি? কম্পিটিশানের অভাবই তো মৃত্যু। আমরা দু'দলের কেউই মার খাওয়ার দল নই—বেঁচে থাকার এগিয়ে যাওয়ার দল।'

ফলে, 'জয়শ্রী'র সরস্বতী পূজোয় থিয়েটার হলে 'পাড়াশ্রী'র পূজোয় জলসা

কিম্বা বায়স্কোপের আয়োজন করা হয়ে থাকে। জয়শ্রী যেবার শীতলা পূজোর ব্যবস্থা করে সেবার পাড়াশ্রী সর্বজনীন ঘেঁটুপূজোর আয়োজন করে এবং শীতলা পূজোতে যদি যাত্রা দেওয়া হয় তাহলে ঘেঁটুপূজোতে তরজা কবির লড়াই কিংবা পাঁচালী গান—আসবেই আসবে। ওরা ওদের ফাংশানে ইলেকট্রিক আলোর ওপর জোর দিলে এরা কোথা থেকে একগাদা য়্যাসিটিলিন ভাড়া করে এনে দিনের মতো আলো করে দেয়।

এইভাবেই চলছিল বেশ কিন্তু এবার রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর হুল্লোড় শুরু হতে ওরা বড় ফাঁপরে পড়ল। কারণ এই ব্যাপারটাতে বৈচিত্র্য আনার উপায় বড় কম; আবৃত্তি, গান, নৃত্যনাট্য অভিনয়—মোটামুটি এর বাইরে যাবার উপায় নেই। সর্বত্রই এই হচ্ছে, নিয়ে দিয়ে কে কত দামী 'আর্টিস্ট' আনতে পারে আর কে কত বড় সাহিত্যিককে সভাপতি করতে পারে—এর ওপরই প্রতিযোগিতা। কিন্তু সেদিক দিয়ে আবার এদের বেশ একটু অসুবিধা আছে, কেননা, ছোট গলির মধ্যে দুটি ক্লাব, চাঁদা তোলার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। একই সঙ্গে দু'দল চাঁদা চাইলে সাধারণ দাতারা যা দেবার দু-ভাগ করে দেন। টাকার অভাব, স্থানের অভাব, কর্মীর অভাব। অন্য ব্যাপারে প্রতিযোগিতা হলে আগুপিছু ক'রে করা যায়—এটা প্রায় একসময়ই করতে হবে, বড়জোর এক সপ্তাহের কি দশদিনের তফাত করা যেতে পারে। বৈশাখ থেকে না হয় জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত টানা যায়—আষাঢ়, শ্রাবণ টানলে দুর্নাম হবে। সভাপতি নিয়েও হাঙ্গামা। ভাল ভাল সাহিত্যিকদের টানটা বিদেশের ওপর, পরের পয়সায় দেশ ভ্রমণ, ভাল খাওয়া-দাওয়া চলে তাতে। পাড়াঘরে গলিঘুঁজির সভাতে আসতে চান না তাঁরা।

কী করা যেতে পারে—অর্থাৎ বাজে লোকদের ভাষায় সাধারণ রেষারেষিতে না নেমে কিভাবে হেল্দি কম্পিটিশনে চৈতন্য চাকলাদার লেনের গৌরব বৃদ্ধি করা যায়—এই আলোচনা করতে ঘন ঘন দুই ক্লাবের যুক্ত-বৈঠক আহ্বান করা চলতে লাগল; কিন্তু সে বৈঠকেও বিশেষ কিছু মীমাংসা হ'ল না। ইতিমধ্যে গলির পুঁচকে ছেলের দল 'পিছিয়ে যাওয়ার যাত্রী সংঘ' নাম দিয়ে কোন এক বড় কাগজের একজন ছোট সাব-এডিটরকে সভাপতি ক'রে গলির মধ্যেই তেরপল পেতে সভা সেরে ফেলল। সে খবর আবার

ফলাও ক'রে উক্ত কাগজে ছাপাও হয়ে গেল। কী বিপদ! এখন এরা তাহলে করে কি?

অনেক চিন্তার পর— অর্থাৎ পঁচিশে বৈশাখ পেরিয়ে গেলে এক সময় ঠিক হ'ল যে এইসব অসুবিধার মধ্যেই ওদের করতে হবে এটা। নইলে পাড়ার ও ক্লাবের প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। সবাই সেরে ফেলল প্রায়, আর এটা যখন জাতীয় কর্তব্যের মধ্যেই পড়ছে—তখন বেশি চিন্তা করে লাভ নেই। এই মাসেই করা হবে, তবে সাতদিনের তফাতে। কে কী করবে তা অপর দলকে বলবে না, সম্পূর্ণ 'সারপ্রাইজ' দেওয়া হবে বা চমক লাগানো হবে। চাঁদাটা খালি যুক্তভাবে তুলে সমান ভাগ ক'রে নেবে দু'দল। তাতে যা হবার যতদূর যা হবার তাই হবে। এতে করে সুবিধা—কে বেশি তুলল, কে কম তুলল তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা ও মনঃপীড়ার কারণ থাকবে না, পাড়ার লোকরাও বিব্রত হবে না।

এ মীমাংসায় সবাই খুশী হল। একজন শুধু ক্ষীণকণ্ঠে প্রস্তাব করতে গিছলেন যে, 'দুদলে মিলেই তাহলে বড় করে ফাংশান করা হোক' কিন্তু তাতে সকলেরই দেখা গেল প্রবল আপত্তি। তাতে নাকি হেল্‌দি কম্পিটিশানের ব্যাঘাত হয়।

এখন শুধু একটা প্রশ্ন রইল, কে আগে আর কে পরে করবে। কেউই নিজের অগ্রাধিকার ছাড়তে রাজী নয়। অনেক টানাহেঁচড়ার পর একজন প্রস্তাব করলেন যে, দুই ক্লাব মিলিয়ে যে সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ মেম্বার তার মত জিজ্ঞাসা করা হোক।

এ প্রস্তাব অনেকেরই মনোমত হ'ল। খোঁজ করতে করতে তেমন মেম্বারও একজন বেরিয়ে গেল—বোঁচা। বোঁচার বয়স সাত—তার চেয়ে ক্ষুদে মেম্বার দুই ক্লাবে একজনও নেই। সে অবশ্য জয়শ্রীর মেম্বার—পাড়াশ্রীর কর্তাব্যক্তিরা সেজন্যে একটু ক্ষুণ্ণই হলেন এবং ওর মধ্যেই ফিস্‌ফিস্ ক'রে সংকল্প করলেন পরস্পরকে সাক্ষী রেখে যে, অতঃপর ওরা একটি এক বছরের ছেলে, ও খোঁজ ক'রে একটি একশো বছরের বুড়োকে মেম্বার ক'রে নেবেন, দুদিকই বাঁধা থাকবে, কে জানে কাকে কখন দরকার হয়।

সে যাই হোক, আপাতত বোঁচার অধিকার চ্যালেঞ্জ করা চলে না।

তাছাড়া বোঁচা যে এ মীমাংসার উপযুক্ত অধিকারী সে বিষয়েও সকলে নিঃসন্দেহ। কারণ সে বয়সে ছোট হলেও জ্ঞানে কারোর চেয়ে খাটো নয়। ফুটবল ও ক্রিকেটের জগৎ তার নখদর্পণে। আশ্চর্য স্মৃতিশক্তিও। এ সম্বন্ধে কারোর কিছু জানবার প্রয়োজন হ'লে নিঃসঙ্কোচে তাকে প্রশ্ন করতেন সবাই। এম-সি-সির কোন্ খেলোয়াড় কি রঙের পর্দা ভালবাসেন তা থেকে শুরু ক'রে কলকাতার বিখ্যাত ব্যাক ভাদু গোঁসাইয়ের কটা বেড়াল বাচ্ছা—এসব তার কণ্ঠস্থ।

এ-হেন বোঁচার সামনে সমস্যাটা উপস্থাপিত করা মাত্র সে এক কথায় মীমাংসা ক'রে দিলে ; বললে, 'আরে—এ তো খুব সোজা, টস করুন না।'

তখন সবাইকে মানতেই হল যে এটা খুবই সোজা এবং তাদের সকলেরই মনে পড়া উচিত ছিল।

অতঃপর একটা আধুলি যোগাড় ক'রে কেলোদাকে দিয়ে টস্ করানো হ'ল। কেলোদা নাকি সাতখানা পাড়ার মধ্যে টস্-এর মাস্টার। জয়শ্রী হেড্ নেবে না পাড়াশ্রী হেড্ নেবে, এ নিয়েও একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল অবশ্য কিন্তু সেটা বেশিদূর গড়াতে পারল না। বোঁচা দুটো আঙাল বাড়িয়ে বলল 'আপনাদের দুই সেক্রেটারী ধরুন একটা ক'রে—আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি কে হেড্ আর কে টেল!'

আঙুল ধরাতে জয়শ্রীই হেড্ পেলে। তাতে করে একটা চাপা গুঞ্জন যে না উঠেছিল তা নয়—যে যেহেতু বোঁচা জয়শ্রীর লোক সে ইচ্ছে ক'রে ওদের হেডটা পাইয়ে দিলে,—তবে সে গুঞ্জনে তাঁরা কেউই কর্ণপাত করলেন না। কেলোদা সাড়ম্বরে সকলের সামনে টস্ করলেন এবং তার ফলে পাড়াশ্রীই পেল অগ্রাধিকার। বোঁচা 'আনফেয়ার মীনস্' বা অন্যায় উপায় অবলম্বন করেছিল কিনা—এ ক্ষোভ আর পাড়াশ্রীর কোন মেম্বারের মনে রইল না।

এরপর দুই পক্ষই চুপচাপ। আলোচনা হয় কমিটি বসে—সব ক্লাব-ঘরের দরজা জানলা বন্ধ ক'রে। 'ইন-ক্যামেরা' মিটিং না কি বলে ওকে। মেম্বারদের সব শপথ করানো হয়েছে যে এই মিটিং-এ কি আলোচনা হয়েছে তা কোন মেম্বার ঘরের বাইরে আলোচনা করবে না—এমন কি অপর মেম্বারদের সঙ্গেও না।

যথারীতি এমনি গুটিকতক 'ইন-ক্যামেরা' মিটিং-এর পর এবং একত্রে তোলা চাঁদা ভাগ ক'রে নেওয়ার পর—বেশ কয়েকদিন কাটলে জয়শ্রীর 'অনি' প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও জয়েন্ট সেক্রেটারীগণ, ভাইস প্রেসিডেন্টগণ ও মেম্বাররা পাড়াশ্রীর চিঠি পেলেন :—আগামী শনিবার বেলা চারটার সময় পাড়াশ্রীর সভা ; সভাপতি কবি-মহেশ্বর দাশরথি রায় ; স্থান—সাদার্ণ এভিনিউ, 'রবীন্দ্র সরোবরের প্রবেশ পথের সম্মুখস্থ বাস-স্টপ !'

চিঠি পেয়ে এঁরা বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। ওদের সভায় খুব লোক হবে না এটা সত্যি কথা, এ তো আর জয়শ্রীর ব্যাপার নয়—তবু একটা বাস-স্টপে, রাস্তার ওপরে সভা আহ্বান করা—এ যেন বড্ডই বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ? প্রবীণ কবি দাশরথি রায় মশাই আসছেন, এ তো তাঁরও অপমান।

নাঃ, ওদের আর মানুষ করা গেল না !

তবু, যাই হোক না কেন, পাড়াশ্রীকে জব্দ করার একটা সহজাত ইচ্ছা জয়শ্রীর সব সভ্যদের মনেই সুপ্ত থাকবে—এটা স্বাভাবিক। সুতরাং আবারও রুদ্ধদ্বার মন্ত্রণা-অধিবেশনে স্থির হল যে, এ ক্লাবের সকলে সেদিন তো পাড়াশ্রীর সভাতে যাবেই—পাড়ার সকলেই (মেম্বার নির্বিশেষে) যাতে যান সেজন্য এরা খুব সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকবে। কোথায় ওরা জায়গা দেয়—তা দেখে নেবে এরা।···

তারপর যথাসময়ে ও যথানির্দিষ্ট দিনে জয়শ্রীর সভাপতি—সহসভাপতি—সম্পাদক—যুগ্ম-সম্পাদক—কোষাধ্যক্ষের দল একেবারে দল বেঁধেই গিয়ে হাজির হলেন। পাড়ার আর কারা যাবেন না যাবেন এখনও জানা যায়নি। কিন্তু একটা বাস-স্টপের পক্ষে এই ক'জনাই তো যথেষ্ট। পেভ্‌মেটের সবটা জুড়ে সামিয়ানা খাটালেও বড় জোর দুশো আড়াইশো লোক বসতে পারবে তার নিচে। এরাই তো যাচ্ছে ত্রিশ-চল্লিশজন।

কিন্তু সেই বিশেষ বাস-স্টপটিতে পৌঁছে বিষম ঘাবড়ে গেলেন তাঁরা। এই প্রথম ঘাবড়ে গেলেন এ যাত্রায়। কোথায় সভা আর কোথায় সামিয়ানা ? গোটা পেভ্‌মেন্ট আর তার সামনের রাস্তা যেমন পড়ে ছিল তেমনি পড়ে আছে। বাস-স্টপ-এ সাধারণত যা দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে তা-ই ছিল, বাস আসতেই উঠে চলে গেল তারা।

সভা কোথায় ?

বোকা বানাল নাকি তাঁদের পাড়াশ্রীর দল ?

কিন্তু আজ তো পয়লা এপ্রিল নয়। মে মাস—তা-ও তো শেষ হতে চলেছে। তবে ?

তাঁরা বোকা সেজেই দাঁড়িয়ে রইলেন, বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন পরস্পরের মুখের দিকে। কী করবেন, এক্ষেত্রে কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারলেন না। ফিরে যাবেন না আর একটু দাঁড়িয়ে থাকবেন তাও স্থির করতে পারলেন না।

এইভাবে মিনিট চার-পাঁচ কাটবার পর তাঁদের মনে হ'ল যে কাছ থেকে কেমন একটা গুঞ্জন ভেসে আসছে। খুবই কাছে কোথাও থেকে। যেন বেশ কিছু লোক চাপাগলায় কথা বলছে—

আর সেই সঙ্গেই হঠাৎ এক সময় মনে হল তাঁদের মাথার ওপরের শিরীষ গাছটা থেকে যে পরিমাণ আধ-শুকনো ফুল আর পাতা খসে পড়ছে সেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়—একটু অস্বাভাবিক রকমের বেশি।

কথাটা মনে হতে হতেই কে একজন চাইলেন যেন ওপর দিকে—

সঙ্গে সঙ্গেই 'আঁক্' ক'রে একটা বিস্ময়সূচক চিৎকার করে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন !

আর তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ওপর দিকে চেয়ে বাকী কজনও তেমনি আঁতকে চেঁচিয়ে উঠে তেমনি হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। বিস্ময়েই তাঁদের সকলকার কথা হরে গেল যেন !

দেখলেন তাঁরা—শিরীষ গাছে শুধু ফুলই নয়, ফলও ধরেছে। অসংখ্য ফল। সে ফল আর কিছু নয়, জুতো-পরা জোড়া জোড়া পা।

অর্থাৎ পাড়াশ্রীর রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সভার আয়োজনটা হয়েছে এই বাস-স্টপের এই প্রসারিত বিপুল শিরীষ গাছটিতে।

এঁদের আঁতকে ওঠা চিৎকারেই সম্ভবত, ওপরওয়ালাদের চোখ পড়ল নিচের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কলরব করে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আসুন, আসুন, দাদারা আসুন। চলে আসুন ওপরে, আপনাদের জন্যে বেস্ট্ সীট সব রেখে দিয়েছি।

সভাপতির পাশের মোটা ডালটিই রাখা হয়েছে আপনাদের জন্যে। কোন ভয় নেই, চলে আসুন।'

আর প্রায় তখনই সড়াক করে ওপর থেকে লম্বা একটি বাঁশের মই নেমে এল। সম্ভবত ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাইয়ের বড় মই—এই সভার জন্য না-বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

তবু এঁরা নীরব। মই বেয়ে গাছে উঠে সভার শোভাবর্ধন করার মতো উৎসাহ এঁদের মধ্যে বিশেষ দেখা গেল না।

'কী দাদারা—চেপে গেলেন যে! ফুটবল সিজন্‌-এ এ কাজ তো করতেই হয়। গাছে চড়া তো আর নতুন নয়। ফুটবলের জন্যে যা পারেন কবিগুরুর জন্যে তা পারেন না?'

এঁরা কী জবাব দেবেন ভেবে ঠিক করার আগেই হুস করে এক ট্যাক্সি এসে গেল। পাড়াশ্রীর ড্রামাটিক সেক্রেটারী অতনু নন্দার সঙ্গে তা থেকে নামলেন কাব-মহেশ্বর দাশরথি রায়।

'আসুন স্যার, এই যে, এই মই বেয়ে উঠে পড়ুন—'

হাত ধরে মৃদু একটু টান দিলেন অতনু নন্দা।

প্রস্তাবটা শুনে বলা বাহুল্য কবি-মহেশ্বরেরও চক্ষু স্থির। তিনি থপ্‌থপে অথর্ব মানুষ, জীবনে কখনও খেলাধুলো করেন নি—গাছে-টাছে চড়তে তিনি পারবেন না, ও মই বেয়ে তো নয়ই! তাতে সভাপতি তাঁকে না করা হয় সেও ভাল।

তিনি সাফ জবাব দিয়ে গেলেন।

কিন্তু তাঁর সে জবাব শুনছে কে? অতনু নন্দী তো ছিলেনই, ততক্ষণে সড়সড় ক'রে নেমে এসেছেন আরও দু-চারজন পাড়াশ্রীর কর্তাব্যক্তি, তাঁরা 'না না কোন ভয় নেই, আমরা আছি কী করতে, গায়ে আঁচ লাগতে দেব না স্যার আপনার' ইত্যাদি বলতে বলতে আগুপিছু করে একরকম টেনেই তুলে নিলেন মই দিয়ে—এবং তিনি ওপরে ওঠামাত্র মইটি আবার সরিয়ে নিলেন। তার মানে—কবি-মহেশ্বরের ইচ্ছা থাকলেও নেমে পালাবার আর পথ রইল না।

এই হাঙ্গামে এঁদের—কিনা জয়শ্রীদের—ওঠা হ'ল না ওপরে। তখন আর মই নামানো যায় না, যদি সভাপতি পালান সেই ফাঁকে? এঁদের অবশ্য

ওঠবার বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু তাই বলে চলেও গেলেন না ; সেই গাছের গোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইলেন সকলে। লাউড স্পীকার তো রয়েছেই— সভাতে যোগ দেবার কোন অসুবিধা নেই। কতদূর কী হয় দেখাই যাক না। যথাদস্তুর সভা শুরু হ'ল। সভাপতিবরণ, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সভাপতিকে মাল্যদান প্রভৃতির পর ন্যাড়া মিত্তিরের উদ্বোধন সঙ্গীত, ঝুনু মল্লিকের আবৃত্তি ও চীনেবাদাম মজুমদারের কৌতুকাভিনয়ের পরই সভাপতি মশায়ের অভিভাষণ আরম্ভ হল। কারণ সভার উদ্যোক্তারা বুঝেছিলেন যে, জোর করে সভাপতিকে যদি বা ধরে রাখা যায়, পরে আর কাজ করানো যাবে না, যে রকম নার্ভাস হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ—হয়তো এবার অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাবেন।

কবি মহেশ্বর বারকতক কেশে গলা সাফ ক'রে অভিভাষণ শুরু করলেন, 'সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,—পড়ে যাব না তো ?—আজ আমরা যে পবিত্র কর্তব্যের জন্য এখানে সমবেত হয়েছি—পড়ে যাব না তো ?—সে কর্তব্য শুধু পবিত্রই নয়, আনন্দদায়কও বটে। এ আমাদের—পড়ে যাব না তো ?—বলতে গেলে জাতীয় কর্তব্য। কারণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—পড়ে যাব না তো ?—তাঁর কীর্তির দ্বারা আমাদের জাতিকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে—পড়ে যাব না তো ?—প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। তাঁর কাছে—পড়ে যাব না তো ?—আমাদের ঋণের অবধি নেই ! তিনি—'ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলল সভাপতির অভিভাষণ। এর মধ্যে অন্তত বার-আশি তিনি ঐ অর্ধস্বগত প্রশ্নটি করলেন নিজেকে, কিংবা ভাগ্যকে, কিংবা আশপাশের সভ্যদের। বলা বাহুল্য এই স্বগতোক্তিটি খুব নিম্নস্বরেই করছিলেন দাশরথিবাবু, কিন্তু মুখটা মাইকের কাছে থাকায় শ্রোতাদের শোনবার কোন অসুবিধাই হচ্ছিল না। এমন কি, পাড়াশ্রীর কর্মসচিব বকুল মাইতি যে খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কাছে অনুনয় করলেন, যাতে তাঁরা অভিভাষণের রিপোর্ট থেকে ঐ অর্ধস্বগত প্রশ্নটি বাদ দেন দয়া ক'রে—সেটা পর্যন্ত জয়শ্রীর এঁরা শুনতে পেলেন !

ঠোঁটের কোণে এঁদের সকলকারই একটি মধুর হাসি ফুটে উঠল। কতকটা যেন সস্নেহ প্রশ্রয়েরই হাসি।

ছেলেমানুষ ওরা, যা করেছে তা করেছে—তার জন্য তাঁরা অন্তত কোন

দোষ ধরবেন না, বা আলোচনা করবেন না—তাঁদের হাসির ভাবটা হ'ল এই।

এইবার জয়শ্রীর পালা।

তাঁরা কী করবেন তা তাঁরাও সাবধানে গোপন করে রাখলেন। সরকারী টপ্ সিক্রেটের মতো চাউর হওয়ার উপায় ছিল না, এমনি কড়া মিলিটারী ডিসিপ্লিন ওঁদের।

তবে টেক্কা যে দেবেন পাড়াশ্রীর ওপর তা কে না জানে!

সেই টেক্কাটাই কেমন হবে—কতখানি 'ডাউন' দেবেন তাঁরা পাড়াশ্রীকে সেটা জানবার জন্য পাড়াশ্রীরা ছট্‌ফট করতে লাগলেন—তবু জানা গেল না।

অবশেষে সেই দিনটি এল। অনেক বিনিদ্র রজনীর অবসানে—অনেক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর।

নিমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছল জয়শ্রীর।

কিন্তু এ কী? তাঁরাও যে বাস-স্টপেই নিমন্ত্রণ করেছেন! তবে সাধারণ কোন স্টপ নয়—ঘাঁটি। ন'নম্বর বাস যেখান থেকে ছাড়ে সেইখানেই বিশেষ স্টপটিতে যেতে বলা হয়েছে রবীন্দ্রানুরাগী সুধীদের।

এই! তাহ'লে ওরা আর নতুন কিছু ভাবতে পারলে না!

সকলে হেসেই খুন হলেন প্রথমটা। হাসি থামলে সভাপতি পাকদমন পাকড়াশী একজনকে ডেকে বললেন, 'এই বঙ্কা, দেখে আয় তো ওখানের গাছটা কত বড়, আর কেমন! ওখানে খুব বড় গাছ তো দেখেছি বলে মনে হয় না!'

কিন্তু বঙ্কাকে যেতে হল না শেষ পর্যন্ত, ওকে বাঁচিয়ে দিল খোদন, সে বলে উঠল, 'পাকু কাকা—কিন্তু গাছ হ'লে শেষের এই লাইনটা লিখবে কেন? সভায় যোগদানেচ্ছু সুধীবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া অপরাহ্ণ পাঁচটা সাত মিনিটের মধ্যে আসিবেন—নহিলে সভায় যোগদান সম্ভব হইবে না। এর মানে কি? গাছ তো আর পালায় না? ওরা বাস রিজার্ভ করে নি তো?'

খোদনের মানবজীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে এই সুগভীর জ্ঞান ও গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন।...সত্যিই তো, গাছ হলে এমন কথা লিখবে কেন?

পাকদমন বললেন, 'খোদন, আসছে বারে তোকেও একটা ভাইস প্রেসিডেন্ট করে নেব—দেখিস!'

একটা প্রশ্ন অবশ্য উঠেছিল যে ওরা এত টাকা পেলে কোথায়—কিন্তু সেটাকে কেউ তত আমল দিলে না। সরকারী চাঁদার ভাগ ছাড়াও নিজেরা চাঁদা তুলতে পারে, সেটায় তো কোন আইনের বাধা নেই! তাছাড়া ওদের দলের পাঁচু শীল একাই একশো—একুশ বছর বয়সে বাপের বড় কাগজের দোকানের মালিক হয়ে বসে দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।

কিন্তু দেখা গেল ওরা অর্থাৎ জয়শ্রী'রা এ ব্যাপারেও আর একচোট টেক্কা দিয়েছে। রিজার্ভ করার ঝামেলায় আদৌ যায় নি।

'বাস রিজার্ভ করব কোন্ দুঃখে! এতগুলো লোক উঠে বসলেই তো রিজার্ভ! তারপর আর উঠবে কে? কোথায়ই বা উঠবে? এক ট্রিপ যাওয়া আর এক ট্রিপ আসা—এর মধ্যেই আমরা সভা সেরে ফেলব। ব্যস্ ফিনিশ!'

'কিন্তু তাতেও তো কম যাবে না!' একটু দমে গিয়েই যেন প্রশ্ন করলেন পাকদমন পাকড়াশী।

'দেখা যাক' সংক্ষেপে বললেন ওদের সভাপতি। হাসলেনও একটু মুচকে। বেশ রহস্যময় হাসি।

সে হাসির অর্থ বোঝা গেল আর একটু পরেই। সভাপতি বরণের সময়।

সভাপতি ও প্রধান অতিথি হয়েছেন ট্রিপের দুই কণ্ডাক্টর; উদ্বোধক হলেন ড্রাইভার স্বয়ং। তাঁর সামনে এমনভাবে মাইক দেওয়া হয়েছে যাতে গাড়ি চালাতে চালাতেই তিনি ভাষণ দিতে পারেন।

খোদন উত্তেজিত হয়ে পাকদমনের কানে কানে বললেন, 'উঃ, কী বুদ্ধি দেখেছেন! কনডাক্টররা এখনই মনে মনে লেক্‌চার ভাঁজছে, টিকিট বিক্রীর কথা মনে আছে ওদের! অর্ধেক টিকিট নেওয়াই হবে না। সব গুলিয়ে যাবে। আর ও ড্রাইভার ভেবেছেন কোন স্টপে থামবে আর! এ তো অর্ধেক খরচেই রিজার্ভ হয়ে গেল ওদের!'

তার মধ্যেই অতনু নন্দী গলাটা বাড়িয়ে বললে, 'শুধু কি তাই? শুনছি যে যদি কোন ইন্‌স্‌পেক্টর ওঠেন, তখুনি তাঁকে বিশেষ অতিথি ক'রে নেওয়া হবে। তারপর আর তিনি টিকিট দেখতে চাইবেন কোন্ লজ্জায়!'

সভা চলতে লাগল। ভালই চলল সভা। রাস্তার দুপাশে লোক জড়ো হয়ে গেল গান আর আবৃত্তি শুনতে। এবং এখন ওরা আপসোস করতে লাগল একটা নৃত্যনাট্য ব্যবস্থা করে নি বলে। না হয় আর একটা ট্রিপই লাগত।

'উঃ, বেড়ে জমালে তো!' জয়শ্রী'র একজন ফিসফিস ক'রে বললেন।

'হিট্! সুপার হিট্!' জবাব দিলেন তিনি গম্ভীর বিমর্ষ মুখে।

সভা ভাঙতে নামবার সময় অতনু আর থাকতে পারলেন না—জিজ্ঞাসা করলেন এ দলের পাঁচু শীলকে, 'আচ্ছা, এ প্ল্যানটা এসেছিল কার মাথায় বলুন তো!'

'বোঁচার।' সংক্ষেপে উত্তর দিলে পাঁচু।

সেইদিনই পাড়াশ্রীর বিশেষ অধিবেশনে স্থির হ'ল যে, অতঃপর যেমন ক'রেই হোক বোঁচাকে এ দলে ভাঙিয়ে আনতে হবে। তার জন্যে যদি ভাইস প্রেসিডেন্টের সংখ্যা পনেরো থেকে ষোল করতে হয়—সেও ভাল।

পাকদমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'উহুঁ, আমার একটা য়্যামেণ্ডমেণ্ট রইল। যদি প্রেসিডেণ্ট হয়েও এ দলে আসতে চায়—সে ভি আচ্ছা! আমি সানন্দে আমার পোস্ট ছেড়ে দেব! মোদ্দা আনা চাই-ই ওকে!'

সবাই 'চিয়ার' 'চিয়ার' বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

ফ্রীজ্

ঠিক তার আগের দিনই আমাদের আড্ডায় ঘোরতর তর্ক বেধেছিল: আধুনিকতার চিহ্ন কি? অর্থাৎ আধুনিক বলে চিহ্নিত হ'তে গেলে কোন্ অভ্যাস বা বস্তু অত্যাবশ্যক—essential. তুমুল তর্ক হ'ল, নানা লোকের নানা মত, এবং—বলা বাহুল্য যে কোন দুটি মতই মিলল না, প্রত্যেকটিই প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন আর স্বতন্ত্র। অনেক কিছুই বললেন অনেকে। ফাঁপানো পাখীর-বাসা চুল, নর্দমা প্যাণ্ট ও টপলেস পোশাক থেকে শুরু ক'রে ট্র্যাঞ্জিস্টার হাতে সমুদ্র-স্নান করতে যাওয়ার অভ্যাস পর্যন্ত—নানা লোকে নানা তথ্য উপস্থাপিত করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তেই পৌছানো

গেল না। জিতেনবাবু গম্ভীরভাবে রায় দিলেন, 'ও কোনটাই ঠিক সর্বজন-গ্রাহ্য নয়। এমন একটা কিছু নাম করতে হবে যা সর্বজনীন। যা ঘরে ঘরে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।'

সে রকম কোন কিছুই মনে পড়ল না। ঘোরতর উত্তেজনার মধ্যে প্রশ্নটা নিরুত্তরিত রেখেই উঠে পড়তে হ'ল।

উত্তরটা পাওয়া গেল পরের দিনই। অপ্রত্যাশিতভাবে।

রেডিওটা কদিন থেকেই ঘড়ঘড় করছিল। পাশের বাড়ির শিবুকে বলে রেখেছিলুম ; এটা তার পেশা নয়, শখ, তাই তার ওপর বেশি বিশ্বাস আমার —অন্তত ইচ্ছে ক'রে বিগড়ে দেবে না। তা তারও সময় হয় নি কদিন, সেদিন একেবারে সকালবেলাই এসে হাজির হ'ল।...বেশ একটু বিগড়েছিল যন্ত্রটা, খুলে সারতে সারতে বেশ বেলা হয়ে গেল। এতক্ষণ মেহনত করল ছেলেটা (বিনা পারিশ্রমিকে !), সুতরাং আমার স্ত্রী একটু কি খাবার আর এক গ্লাস জল এনে দিলেন। গরমের দিন, গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় খাটছে এতক্ষণ— পিপাসাও খুব পেয়েছে নিশ্চয়—এই ভেবে তিনি বেশ বড় এক গ্লাস জলই এনেছিলেন। শিবু মিষ্টি সব কটাই খেল, কিন্তু জল খেল না, শুধু দুটো আঙুল ডুবিয়ে হাত ধোওয়ার কাজটা সেরে নিল ঐ গ্লাসেই।

আমার স্ত্রী বললেন, 'ও কি রে, জল খেলি না ? ভাল জল—খাবার জল ফুটিয়ে রাখা হয় আমাদের জানিস তো—'

'উহুঁ, ঐটি মাপ করবেন মাসিমা। জল বাড়ি ছাড়া আর কোথাও খাওয়া সম্ভব নয়। ফ্রীজের জল খেয়ে খেয়ে এমন অব্যেস হয়ে গেছে যে, আর কোন জল গলা দিয়ে নামে না।'

'ও, ফ্রীজ কিনেছিস বুঝি তোরা ? কবে কিনলি ?' আমার স্ত্রী সাগ্রহে প্রশ্ন করেন। তাঁর মুখ কালি হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। তিনিও বেশ কিছুদিন ধরে বস্তুটির জন্য দরবার করছেন—অপরে, বিশেষ পাশের বাড়ির লোক আগে কিনে নিল এটা ঘোরতর অপমান তাঁর কাছে।

'ওমা—জানেন না ? এই তো, তা প্রায় পনেরো দিন হয়ে গেল।... ইচ্ছে ছিল না বাবার, তা বৌদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। আজকালকার মেয়েরা বোঝেন তো, কেউ আর বিকেলে রান্নাঘরে ঢুকতে রাজী নয়। যত

দিন মা করেছেন করেছেন—এখন ওদের রাজত্ব, ওদের মতেই চলতে হবে, উপায় কি ? খুব সুবিধেও কিন্তু মাসিমা—সত্যি সত্যিই, রবিবারের রান্না মাংস বুধবার পর্যন্ত খেয়েছি, ভাবতেও অবাক লাগে, না ?···আর কত ইকনমিক, একবেলার কাঠ-ঘুঁটে-কয়লা সব বেঁচে যাচ্ছে, এটা কি কম লাভ ?'

শিবু উঠে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। এ সময় স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়ানো উচিত নয় বুঝে তার পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম।···

গলির মোড়ে পড়তেই দেখা হ'ল সান্যালদের মেয়ে সুধা আর হাসির সঙ্গে, দোকানে যাচ্ছে সম্ভবত, দই কি বেগুনি কিনতে। এই সময় ওদের মা প্রায়ই এই দুটি বস্তু কিনতে পাঠায়। ওদের দেখে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল, বললাম, 'হ্যাঁ রে—শুক্রবার সিন্নি দিলি নে যে বড় ?'

'হুঁ হুঁ—' সাত বছরের গিন্নি মেয়ে হাসি হাত-পা নেড়ে বলল, 'আর এখন আমরা পাড়ায়-পাড়ায় সিন্নি বিলোব না, এখন আমাদের ফ্রীজ এসেছে—সিন্নি তোলা আছে সব, আমরা রোজ একটু একটু ক'রে বার ক'রে ক'রে খাই—জলখাবারের সময়। অনেক পয়সা বেঁচে যাবে—মা বলেছে।'

ফ্রীজে সিন্নি! চমকেই উঠছিলুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, মুকুল সেদিনই বলছিল কথাটা, তাদের নিচের তলার ভাড়াটেও সকালে সিন্নি দিয়ে (স্ত্রী উপোস করতে পারে না বলে সকালেই শ্রেয়।) ফ্রীজে রেখে দেন—সন্ধ্যায় সকলকে ডেকে সেই সিন্নি খাওয়ান। ভদ্রলোক আবার হ্যাম খেতে ভালবাসেন, সেই পবিত্র শূকর-মাংসও নাকি ঐ ফ্রীজে থাকে। তবে—মুকুল বললে, 'সে তো নিচে থাকে। মাঝের থাকে ওঁদের ডাল-তরকারী খাবার এই সব রাখেন। ওপরে ফল বা সিন্নি প্রসাদ—এই ধরনের জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকে না।'

মুকুলের মুখেই শুনলুম, ওদের বালিগঞ্জ পাড়ায় নাকি সিন্নি মেখে ভোগ দেওয়া হয় না, আটা, দুধ, কলা ও গুড় আলাদা আলাদা দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে গোটা ফল—রাত্রে অতিথি প্রসাদ-প্রার্থীরা এলে টাটকা মেখে দেওয়া হয় সিন্নি।···

মরুক গে, যে যা বোঝে—এই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরলুম।

একটু ভয়ে ভয়েই ফিরছিলুম কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখি গৃহিণীর একেবারে অন্য মূর্তি। প্রায় রোরুদ্যমানা। কারণ—পাখা চলছে না, কলে জল নেই। অর্থাৎ বিদ্যুৎই বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের কলে পাম্প দিয়ে জল সরবরাহ করা হয় টিউবওয়েল থেকে, সে পাম্প বিদ্যুতে চলে। এদিকে পাখা এবং জল এ দুটি ছাড়া শ্রীমতীর এক দণ্ড চলে না, সুতরাং উদ্বেগের সীমা নেই তাঁর।

আসল আক্রমণটা থেকে বেঁচে গেলুম এই আনন্দে প্রায় দিশেহারা হয়ে খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই স-কলরবে সান্ত্বনা দিলুম, 'আরে পাড়াসুদ্ধ ফিউজ্ হয়েছে—শুধু তো তোমার বাড়ি নয়, ও আর কতক্ষণ। এল বলে!'

ভেবেও ছিলুম তাই, পনেরো-বিশ মিনিট কি বড়জোর আধ ঘণ্টা। দিনের বেলা বিনা নোটিশে আর কতক্ষণ বন্ধ রাখবে? 'লোড শেডিং'-এর কোন কথাও তো শুনি নি এর মধ্যে।

কিন্তু আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা—শেষে যখন দু'ঘণ্টা কেটে গেল তবুও পাখা ঘুরল না বা কলে জল এল না—তখন গৃহিণী কেন, আমিও ধৈর্য হারালুম। পচা গরম পড়েছে সেদিন—পাখার তলাতেই ঘাম হচ্ছে, পাখা ছাড়া এই শহরের বাড়িতে টিকব কি ক'রে?

একটু খোঁজ-খবর করা দরকার। কেউ পাড়ার বিজলীঘরে খবর দিয়েছে তো? (আমরা সকলেই আশা করি দায়িত্বটা অপরে পালন করবে) না কি সবাই অপরের ওপর বরাত দিয়ে বসে আছে। কাকেই বা ডেকে খবর নিই, তাও তো বুঝি না। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ—এখন বাইরে বেরিয়ে খবর নেওয়া সম্ভব নয় ঘুরে ঘুরে।...অনেক ভেবে-চিন্তে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল পাড়ার সুজিত যাচ্ছে সামনের রাস্তা দিয়ে। আমাকে দেখেই হাতের সিগারেটটা আশ্চর্য কৌশলে আঙুলের ফাঁকে লুকিয়ে বলে উঠল, 'দেখেছেন কাকাবাবু ব্যাপারটা!'

'সেই কথাই তো বলছি বাবা। এ কী কাণ্ড! দু ঘণ্টা ইলেকট্রিসিটি বন্ধ, পাখা নেই, জল নেই—এতগুলো প্রাণী এই গরমে থাকি কী ক'রে!'

'সবচেয়ে অসুবিধে আমার। ফ্রীজের বরফ সব গলে জল হয়ে গেল—দুপুরটা কাটবে কি করে ভাবুন দিকি!'

সুজিতরাও ফ্রীজ কিনেছে ! জানতুম না তো। বেশ একটু ধাক্কা খেলুম যেন মনে মনে।

প্রশ্নটাও ক'রে ফেললুম, 'ফ্রীজ্ কবে কিনলি রে, কই জানি না তো !'

সুজিত যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, 'না—এই আটদিন হ'ল আজকে নিয়ে। মানে গত রবিবারই—'

'কত পড়ল রে ? কত বড় ফ্রীজ্ ?'

'প্রকাণ্ড। পড়ল অবশ্যই সামান্যই। দাদার সাহেব বদলি হয়ে গেল কিনা, তারই জিনিস, এক রকম জোর ক'রেই দিয়ে গেছে। বলেছে যা হয় দিও। দাদা এখনও কোন পেমেণ্ট করে নি অবশ্য, তবে দিতে হবেই কিছু। দাদার একটা প্রেস্টিজ আছে তো !'

'তা তো বটেই।' সায় দিয়ে ভেতরে পালিয়ে এলুম বলতে গেলে। এতক্ষণে আমিও স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে উঠেছি, এর পর আর একটা ফ্রীজ্ ঘরে না আনলে মান-সম্ভ্রম কিছুই থাকে না ! ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেওয়া যাবে না শেষ অবধি !

কিন্তু সে তো পরের কথা। এখন যে প্রাণ যায় ! আমাদেরই প্রায় সুজিতদের ফ্রীজের বরফের অবস্থা হয়ে উঠল, গলে ক্ষয়ে যাবার যোগাড় হ'ল ঘামে ঘামে। তার ওপর ভাল ক'রে স্নান হ'ল না, এতগুলি প্রাণী আধ চৌবাচ্ছা জল—স্নান করব কী দিয়ে—? কোনমতে ছুটো ভাত মুখে গুঁজে হাতপাখা নিয়ে এসে পড়লুম, কিন্তু ঘুমোবার দফা তো রফা হয়েই আছে। মনে মনে রবিবারকে অভিসম্পাত করতে করতে ছটফট করতে লাগলুম শুধু। সামনের রবিবার অবশ্য অবশ্য কাজের অছিলায় বেরিয়ে অফিসে চলে যাব কিংবা কোন ঠাণ্ডা সিনেমা ঘরে গিয়ে ঘুমোব—বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলুম মনে মনে।

অবশেষে, বেলা তিনটেরও পর, অকস্মাৎ সেই বহু-প্রত্যাশিত, বহু-আকুলিত-পথ-চাওয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের দেখা মিলল, পাখা উঠল ঘুরে, শরীর জুড়িয়ে গেল নিমেষে। আছে, এখনও সময় আছে—এই আশ্বাসে ভাল ক'রে পাশবালিশটা জড়িয়ে ধরে পাশ ফিরে শুলুম।

কিন্তু সেদিন বিধাতা অদৃষ্টে দিবা-নিদ্রা লেখেন নি, চেষ্টা করলে কী হবে !

সবে তন্দ্রায় চোখের দু-পাতা জুড়ে এসেছে, ক্রিং ক্রিং ক'রে সরবে টেলিফোন বেজে উঠল। গৃহিণী উঠে ধরবেন না জানি—তা যতক্ষণই কেন বাজুক না, অগত্যা আমাকেই উঠে ধরতে হ'ল।

বিরক্ত উষ্ণ কণ্ঠে নিজের নম্বরটা বলতেই ভেসে এল আমার বড় শ্যালিকার মধুর স্নেহঝরা কণ্ঠ, 'ভাই, তোমাকেই চাইছিলুম মনে মনে, ঠাকুর ঠাকুর করছিলুম, বেরিয়ে না গিয়ে থাকো!'

অর্থাৎ এখন আধ ঘণ্টা বকতে হবে ওঁর সঙ্গে। এ তো শুধু গৌরচন্দ্রিকা। নিশ্চয় টানা তিনটি ঘণ্টা ঘুম দিয়ে উঠেছেন নিজে, নইলে অনাবশ্যক ঠাকুরকে না ডেকে আগেই ফোন করতেন। আরও বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার বলে ফেলুন তাড়াতাড়ি, এখনই বেরুতে হবে, জামা-কাপড় পরা হয়ে গেছে, নিচে গাড়ি তৈরী!'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। তুমি যে খুব কাজের লোক তা আমরা জানি।' ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন দিদি, 'আমাদের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই যত সময়ের অভাব হয় তোমার। আসলে তোমরা সাহিত্যিক জাতটাই এমনি, অল্পবয়সী মেয়ে হ'লে দেখতুম তোমার কাজের তাড়া কোথায় থাকত!'

'সবই তো জানেন দিদি, এখন দয়া ক'রে বক্তব্যটাই বলে ফেলুন না!' কণ্ঠস্বরে তিক্ততা বুঝি চাপা থাকে না।

কিন্তু তাঁর কণ্ঠ থেকে ঝাঁজ ততক্ষণে একেবারে বিলুপ্ত। আবারও যেন মধু ঢেলে বললেন, 'এই যে, বলতেই তো বসেছি। আমারও তাড়া, এখনই জামাই এসে পড়বেন!···বলছিলাম, একটা বড় লজ্জায় পড়ে গেছি ভাই, শনিবারের এন্‌গেজমেণ্টটা তো ক্যানসেল করতে হয়, কোন উপায় নেই!'

'শনিবারের এনগেজমেণ্ট!' প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল ভায়রা-ভাইয়ের জন্মদিন আসছে শনিবার, সেই উপলক্ষে আমাদের, ছোট শালীদের আর মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছেন দিদি, আরও দশদিন আগে। আসতেই হবে, কোন অন্য এন্‌গেজমেণ্ট নিয়ে বসে না থাকি—এই জন্যেই অত আগে বলা।

'কেন বলুন তো, কী হ'ল আবার?' সত্যিই অবাক হয়ে যাই। এত আকিঞ্চন, হঠাৎ মতলব ঘুরে গেল কেন?

'আর বলো কেন ভাই, আমার ফ্রীজ্‌টা কাল থেকে বিগড়ে বসে আছে। যে সারে সাধারণত—আমাদের অনেক দিনের চেনা মিস্তিরি, যাকে-তাকে তো দিতে পারি নে—তা সে গিয়ে বসে আছে দেশে, সামনের শুক্রবারের আগে নাকি ফিরবে না। এ অবস্থায় এতগুলি লোকের ঝুঁকি নিই কী ক'রে বলো। উনি তো ঐ ব্যস্ত মানুষ, নিজের বৌ-ছেলে ম'ল কি বাঁচল, তা-ই খবর নেবার সময় নেই। যা করতে হবে আমাকেই তো। মাছ তো বাজার থেকে উধাও। ভেবে রেখেছিলুম যে ঘুরে ঘুরে যে-দিন যা ভাল পাই—চিংড়ি, ভেটকি পোনা—কিনে কিনে স্টক করব, ইচ্ছেমতো তো পাওয়ার যো নেই—আর ও আমার পছন্দও নয়, বাজার আসবে তবে রান্নার ব্যবস্থা—ও ডেয়ো-ডোকলার ঘরে পোষায়। আমি বেস্পতিবার বাজার শেষ করব, তবে শনিবারে লোক খাওয়ানোর আয়োজন করব, এই আমার কথা।'

আর একটু দম নিয়ে পুনশ্চ বললেন, 'তা ছাড়া আইসক্রীম খাওয়াতে পারব না, দই মিষ্টি আম—একটু ঠাণ্ডা ক'রে রাখতে পারব না—সবচেয়ে জল ঠাণ্ডা হবে না—এমন অবস্থায় এতগুলো ভদ্রসন্তানকে খেতে বলি কী ক'রে বলো? বরফ তো নাম করার জো নেই আজকাল পোড়া কলেরার ভয়ে—। তাই বলছি এ হপ্তাটা থাক্, পরে পশ্চাতে একদিন হবে—ফ্রীজ্‌টা সারানো হলে—কী বলো? মায়াকেও বলে দিলুম, তার বড়জাকে বুঝিয়েসুজিয়ে বললুম, তা তিনিও তো বুঝদার মানুষ, এসব বোঝেন—বললেন, তা তো বটেই ভাই, ফ্রীজ না থাকলে কী আর আমাদের গেরস্ত ঘরে এসব ঝঞ্ঝাট করা সাজে?'

'তা তো ঠিকই,' আমিও প্রবল উৎসাহে সমর্থন করলুম কথাটা, 'না না, এই গরমে আর ওসব হাঙ্গামা করবেন না।···সে তখন পরে যে কোনদিন করলেই হবে! এত তাড়ার আছেই বা কি?'

বেঁচে গেলুম আসলে, কারণ জন্মদিনে বাড়িসুদ্ধ খেতে গেলে একটা ভাল গোছের উপহার নিয়ে যেতে হ'ত। পরে অন্য কোনদিন খাওয়ালে আর সে বাধ্য-বাধকতা থাকবে না।

আর উত্তরটাও পেয়ে গেলুম আমাদের সমস্যার। কালই জিতেনবাবুকে বলতে হবে।

অসহিষ্ণু

বাগ্‌চিদের বড় বৌ ইলা তার বাবার চতুর্থীর দিন ব্রাহ্মণ খাওয়ায় নি।

'খাওয়ায় নি' কথাটা ইচ্ছা ক'রেই বললাম, কারণ খাওয়াতে পারে নি বললে একটু ভুল হ'ত। ইচ্ছে ক'রেই সে আয়োজন করে নি সেদিন। পুরোহিতকে একটু দই মিষ্টি খাইয়ে শুদ্ধ হয়েছিল।

ওর বাবা ওর হাতের রান্না খেতে ভালবাসতেন। বিয়ের পর সে সুযোগ বড় একটা ঘটে নি। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই সন্তান এসে গেল, তারপরও, পর পর দুটি সন্তান, একটি চিররুগ্ন। তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হ'ত। শ্বশুরবাড়ি এসে বাবা খাবেন না। ওরও সে অবসর বা তত স্বাধীনতা ছিল না। ইলাও ওখানে গিয়ে সারাদিন থেকে রান্না ক'রে খাইয়ে আসবে, সে অবসর কোথায়?

তারপর, বিয়ের মাত্র সাত বছরের মধ্যে বিধবা হ'ল। স্বামী কিছু টাকা রেখে গিছলেন, একটা পেন্‌সনও বরাদ্দ হয়েছিল তাঁর আপিস থেকে—তবু মেয়ে দুটির ভবিষ্যৎ ভেবেই ওকে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে একটা চাকরি নিতে হয়েছিল—তার ফলে অনবসর আরও বেড়েই গিছল।

সেই জন্যেই এই আয়োজন সেদিন। বাপের বাড়ির আসল অশৌচ শ্রাদ্ধশান্তি কেটে যাবার পর ধীরে সুস্থে—পর-পর দুদিন ছুটি পেয়ে আগের দিন নিজে বাজার-হাট ক'রে রেখে, পরের দিন ভোর থেকে রান্না চড়িয়েছিল, যা যা বাবা খেতে ভালবাসতেন—চাপ চাপ ছোলার ডাল, ধোঁকার ডালনা, কপির কোফ্‌তা, মাছের ফ্রাই—মনে ক'রে ক'রে সব ব্যবস্থা করেছিল ইলা। বাবা বেলা হ'লে খেতেন না বলেই ভোর থেকে আয়োজন—এগারোটার মধ্যেই যাতে ব্রাহ্মণরা খেতে বসতে পারেন।

দুজন ঠিক ঠিক এসে খেয়ে গেলেনও, তৃপ্তি ক'রে, ইলার রান্নার বহুল প্রশংসা ক'রে—এলেন না তৃতীয় ব্যক্তি—ওর সহকর্মী একজন, শশধরবাবু। বেলা বারোটার সময় খবর পাঠালেন, সেদিনই সকালে তাঁর তরুণ ভাগ্নী-জামাই হঠাৎ মারা গেছে, তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এখান থেকে যেতে

পারবেন না—শ্মশানেও যেতে হবে। সুতরাং ইলা যেন কিছু মনে না করে, অন্য কাউকে ধরে কাজটা সেরে নেয়।

ইলা মাথায় হাত দিয়ে পড়ল।

এমন সময়—এই বেলা বারোটায় কাকে পাবে সে ?

অনিমন্ত্রিত কে আসবে তার এই দায় উদ্ধার করতে ?

অনেক ভাবার পর মনে পড়ল এই পাড়ারই বলাইবাবুর কথা। ভদ্রলোক ছুটির দিন অনেক বেলায় খান, মানুষটিও অমায়িক—হয়ত ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে আসতে পারেনও।

এখন প্রশ্ন—কে যাবে সে অনুরোধ জানাতে ?

ওর নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। না যাওয়াটা অন্যায় শুধু নয়, ভুলই হ'ল। কিন্তু ভোর থেকে পরিশ্রম, আগুনতাত, উপবাস এবং দুর্ভাবনায় ওর তখন মাথা ঘুরছে, হাত পা কাঁপছে থর থর ক'রে। সে বড় মেয়ে এষাকে অনেক ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে—কী বলতে হবে আর কি ভাবে বলবে, বলতে গেলে রিহার্স্যাল দিইয়ে—পাঠাল বলাইবাবুর বাড়ি।

বলাইবাবু তখন বাথরুমে ঢুকেছেন স্নান করতে। ওঁর স্ত্রী বললেন (তিনি মানুষ খারাপ নন), 'তুই একটু দাঁড়া, আমি দোরের বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করে আসি।'

তিনি গেছেন—তাঁদের মেয়ে গোপা, এষারই সহপাঠিনী, ইয়ার্কির ছলেই বললে, 'ক্যান্‌রে, আমার বাবাকে তোরা তু করে ডাকবি আর বাবা ছুটবে নাচতে নাচতে ? বাবা কি ফেলনা ? না খেতে পায় না ?'

ইয়ার্কিই, তবে রসিকতা সম্বন্ধে সকলের ধারণা তো সমান নয়, মুখের ভাষা ও গলার স্বরও সকলের এক্তিয়ারে থাকে না—এষারও অবস্থা তখন খুব স্বাভাবিক নয়।

তাছাড়া এ কালটাই অসহিষ্ণুতার। কারও কথার ঘা কারও সহ্য হয় না। হয়ত জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি ও ব্যস্ততাই এর মূলে। এষা ছুটে বেরিয়ে এল এবং কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালো গোপার কথাগুলো আর ব্যবহার।

গোপার মা যে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করতে গেছেন—এই তুচ্ছ তথ্যটার কথা সেই অপমানবোধের মুখে আর মনে রইল না।

ইলাও কেঁদে কেটে কপাল চাপড়ে—সেই বাকী সমস্ত দুর্লভ, দুর্মূল্য, সযত্নে প্রস্তুত খাদ্যবস্তু একটা থালায় ক'রে নিয়ে গিয়ে পাড়ার রায়পুকুরে ঢেলে দিয়ে থালা ধুয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল।

সবে বাড়ির দরজা পেরিয়েছে—বলাইবাবুর সস্নেহ কণ্ঠস্বর কানে এল, 'কই গো বৌমা, কোথায় গেলে? আমি ভাল ক'রে মাথাও মুছি নি, কোনমতে গেঞ্জিটা গায়ে গলিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছি। বলি এত বেলা পর্যন্ত উপোস ক'রে আছ—।'

—ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত—